জন্ম শতবর্ষ স্মরণে

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা

জন্ম-শতবর্ষ-স্মরণে

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা

চতুর্থ খণ্ড
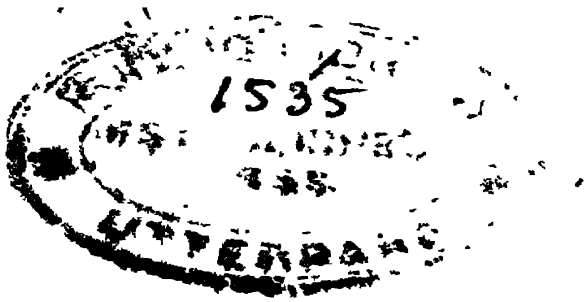
উদ্বোধন কার্যালয়
কলিকাতা

প্রকাশকের নিবেদন

'স্বামীজীর বাণী ও রচনা'র চতুর্থ খণ্ডে প্রধানতঃ ভক্তি-বিষয়ক বক্তৃতা ও কথোপকথন সংগ্রথিত হইল। সাধারণতঃ এই ধারণাই প্রচলিত যে, স্বামীজী জ্ঞান ও কর্ম সম্বন্ধে যেভাবে যত কথা বলিয়াছেন, ভক্তি সম্বন্ধে ততটা বলেন নাই। সকল প্রচলিত ধারণার মতো এই ধারণাও আংশিক সত্য। স্বামীজী ভক্তি সম্বন্ধে বেশী কথা বলেন নাই, কিন্তু যেখানে যতটুকু বলিয়াছেন, তাহা অতীব গভীর—এই সংকলনে তাহা স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্বামীজীর প্রচারিত ভক্তি পরাভক্তি, এবং পরাভক্তি ও পরজ্ঞান একই। স্বামীজীর এই 'ভক্তিযোগ' সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক ভাবের উর্ধ্বে—সমন্বয়ই ইহার মূলতত্ত্ব। জ্ঞান ও ভক্তির যে দ্বন্দ্ব, তাহা পথের দ্বন্দ্ব, লক্ষ্যের নয়।

এই খণ্ডের প্রথমাংশে আছে 'ভক্তিযোগ' নামক বিখ্যাত বক্তৃতাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র, পরবর্তী অংশ 'ভক্তিরহস্যে' প্রায় একই বিষয় আলোচিত হইয়াছে, সবিস্তারে ও সহজভাবে। উভয়ত্র আমরা প্রকাশিত পুস্তকের বিষয়-বিন্যাস অনুসরণ করিয়াছি।

তৃতীয় অংশ 'দেববাণী' 'Inspired Talks' নামক বিখ্যাত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। গ্রন্থারম্ভে ভূমিকা ও পটভূমিকায় পরিবেশ ও বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্যের আভাস পাওয়া যাইবে। গ্রন্থপাঠে বুঝা যাইবে 'দেববাণী'তে স্বামীজীর জীবন-বাণী ঘনীভূতভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা একাধারে জ্ঞান ও ভক্তির একখানি অমূল্য সঞ্চয়ন।

শেষাংশ 'ভক্তিপ্রসঙ্গে'—নূতন সঞ্চয়ন। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে ভক্তি সম্বন্ধে প্রদত্ত বক্তৃতা ও কথোপকথন এখানে সংকলিত হইল। 'নারদভক্তি-সূত্রে'র নির্বাচিত অংশের অনুবাদ, এবং ভক্তিবিষয়ক গল্প-দুইটি স্বামীজীর বহুমুখী প্রতিভার এক অজ্ঞাত দিকের পরিচয় বহন করে।

এই গ্রন্থাবলী প্রকাশে যে-সকল শিল্পী ও সাহিত্যিক আমাদের নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, বর্তমান গ্রন্থাবলীর প্রচ্ছদপট তাঁহারই পরিকল্পনা।

কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'স্বামীজীর বাণী ও রচনা' প্রকাশে আংশিক অর্থসাহায্য করিয়া আমাদের প্রাথমিক প্রেরণা দিয়াছেন। সেজন্য তাঁহাদিগকে আমরা ধন্যবাদ জানাইতেছি।

প্রকাশক

সূচীপত্র

ভক্তিযোগ

(ইংরেজী) দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা হইতে

বর্তমান গ্রন্থের পাঠক হয়তো অবগত আছেন যে, মহাপ্রাণ স্বামী বিবেকানন্দের নামে যে-সকল গ্রন্থ আছে, ঐগুলির প্রায় সবই তাঁহার স্বল্প-পরিসর কর্মময় জীবনে ভারতে ও ভারতের বাহিরে প্রদত্ত বক্তৃতাবলীর সাঙ্কেতিক নোট হইতে সংকলিত হইয়াছে। পূর্বে লিখিত নোট অবলম্বন করিয়া স্বামীজী কখনও বক্তৃতা দিতেন না, বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া যাহা মনে উঠিত, তাহাই বলিয়া যাইতেন। স্বামীজী যখন লণ্ডনে প্রথম বক্তৃতামালা আরম্ভ করেন, তখন বর্তমান সম্পাদক তাঁহার সঙ্গে থাকিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন; প্রতিভাসম্পন্ন স্বামীজীর দার্শনিক বক্তৃতাগুলির নোট গ্রহণ করিবার উপযুক্ত সাংকেতিক-লিপিকার পাওয়া প্রথমতঃ দুষ্কর ছিল—ইহা সকলেই বুঝিতে পারেন। এজন্যই স্বামীজীর মার্কিন বন্ধুগণ একসময়ে তাঁহার মূল্যবান্ বক্তৃতাগুলির সংরক্ষণ-বিষয়ে হতাশ হইয়াছিলেন। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা ছিল যে, বক্তৃতাগুলি মানব-কল্যাণের জন্য লিপিবদ্ধ হউক, এই নিঃস্বার্থ জীবনের কর্মপ্রচেষ্টাসমূহ চিরস্থায়ী হইয়া মানবজাতিকে শান্তিদান করুক—সেজন্যই যেন অবশেষে ইংলণ্ডের বাথ-নিবাসী পরলোকগত মিঃ জে. জে গুডউইনের মতো একজন কৃতী সাঙ্কেতিক-লিপিবিদ্‌কে পাওয়া গিয়াছিল। মিঃ গুডউইন পরে স্বামীজীর অন্যতম অনুরাগী শিষ্যে পরিণত হন, এবং স্বামীজী যেখানে যাইতেন, তিনিও সঙ্গে যাইতেন। স্বামীজীর অসংখ্য বন্ধু, অনুরাগী ছাত্র ও শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই এখনও জানেন না, এই নিরলস কর্মীর অমূল্য সেবার নিকট তাঁহারা কত গভীরভাবে ঋণী। স্বামীজীর মানবলীলা-সংবরণের প্রায় তিন বৎসর পূর্বে মিঃ গুডউইন ভারতে মহীশূরের অন্তর্গত উতকামণ্ডে আন্ত্রিক জ্বরে অকালে দেহত্যাগ করেন। গুডউইন এ শুভ কার্যে অগ্রণী না হইলে স্বামীজীর ইংরেজীতে প্রদত্ত বক্তৃতাবলী কখনও প্রকাশিত হইতে পারিত না; এবং মানবসমাজও এই অমূল্য সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইত।

সম্পাদকের ধারণা ছিল যে, সাধারণতঃ স্বামীজীর গ্রন্থাদি যেভাবে প্রকাশিত, বর্তমান গ্রন্থে সেই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। ১৮৯৪-৯৫ খৃঃ

স্বামীজী যখন প্রথমবার আমেরিকায় ছিলেন, তখন ধারাবাহিক প্রবন্ধাকারে এই গ্রন্থ মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত বেদান্ত-মাসিক 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকায় প্রথম বাহির হয়, এজন্য তাঁহার ধারণা হইয়াছিল, এই গ্রন্থ স্বামীজী ঐ পত্রিকার জন্য স্বয়ং লিখিয়াছেন, কিন্তু আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানের ফলে জানা গেল যে, প্রথম যে-কয়েকটি অধ্যায়ে স্বামীজী শঙ্কর, রামানুজ ও অন্যান্য প্রাচীন আচার্যদের ভাষ্যসমূহ হইতে দীর্ঘ উদ্ধৃতিগুলি সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, সেই অধ্যায়গুলি ছাড়া সমগ্র গ্রন্থখানি ঐকালে নিউ ইয়র্কে শিক্ষার্থীদের নিকট প্রদত্ত 'ভক্তি' সম্বন্ধে ভাষণগুলি অবলম্বন করিয়া সংকলিত হইয়াছে। সাংকেতিকলিপিতে গৃহীত নোটগুলি পরলোকগত মিঃ গুডউইনের মতো একজন সুদক্ষ ব্যক্তিদ্বারা ভাষায় রূপায়িত হওয়া সত্ত্বেও কিছু কিছু বাদ গিয়াছে, কিছু ভুল-ত্রুটি হইয়াছে এবং কোন কোন বাক্য স্থানচ্যুত হইয়াছে। এখানে সেখানে তাড়াতাড়ি একটু চোখ বুলানো ছাড়া স্বামীজী নিজে কখনও সাংকেতিক-লিপিতে গৃহীত নোটগুলির দিকে বেশী মনোযোগ দিতেন না এবং সর্বদাই বিশেষ ভুল-ত্রুটিগুলি সংশোধন করিয়া এবং কোন সময় ততটুকু না করিয়াও মুদ্রণের জন্য পাঠাইয়া দিতেন, এ-সব কারণে বিশেষতঃ যখন স্বামীজী আজ আমাদের মধ্যে নাই, তখন তাঁহার বক্তৃতাবলী পুনঃপরীক্ষা করিবার আয়াসসাধ্য গুরুদায়িত্ব সম্পাদকের উপর আসিয়া পড়িয়াছে।

* * *

সুতরাং গ্রন্থের অনেক স্থানে অর্থ স্পষ্ট করিবার জন্য সম্পাদক ভাষা ও যতি-চিহ্নাদির ত্রুটিগুলি পরিবর্তন এবং নিজের কয়েকটি শব্দ সংযোজনের কার্যে বাস্তবিক অত্যন্ত সংশয়াকুল চিত্তে অগ্রসর হইয়াছেন।

* * *

উপসংহারে সম্পাদক জানাইতেছেন, স্বামীজীর বক্তব্যের অর্থ যথাসম্ভব স্পষ্ট করিবার উদ্দেশ্যেই অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি সম্পাদনার কাজ করিয়াছেন, পাঠকের নিকট গ্রন্থখানি অধিকতর উপযোগী করিতে যত্নের ত্রুটি করেন নাই এবং আশা করেন, ইহাতে সফলকাম হইয়াছেন।

সম্পাদক

মঠ, বেলুড়, হাওড়া (সারদানন্দ)
১৫ই মার্চ, ১৯০৯

স তন্ময়ো হ্যমৃত ঈশসংস্থো

জ্ঞঃ সর্বগো ভুবনস্যাস্য গোপ্তা।

য ঈশেঽস্য জগতো নিত্যমেব

নান্যো হেতুর্বিদ্যতে ঈশনায় ॥

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং

যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।

তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং

মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে ॥

—শ্বেতাশ্বতর উপ., ৬।১৭-১৮

তিনি জগন্ময়, অমর, নিয়ন্তৃরূপে অবস্থিত, জ্ঞাতা, সর্বব্যাপী, এই জগতের পালয়িতা। তিনি অনন্তকাল জগৎ শাসন করিতেছেন। এই জগৎ-শাসনের অন্য হেতু কেহ নাই।

যিনি আদিতে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং পরে তাঁহাকে বেদ প্রদান করিয়াছিলেন, মোক্ষলাভের ইচ্ছায় আমি আত্মবিষয়ক বুদ্ধির প্রকাশক সেই দেবেরই শরণ লইতেছি।

ভক্তির লক্ষণ

অকপটভাবে ঈশ্বরানুসন্ধানই ভক্তিযোগ; প্রীতি ইহার আদি, মধ্য ও অন্ত। মুহূর্তস্থায়ী ভগবৎ-প্রেমোন্মত্ততা হইতেও শাশ্বতী মুক্তি আসিয়া থাকে। নারদ তদীয় 'ভক্তিসূত্রে' বলিয়াছেন, 'ভগবানে পরম প্রেমই ভক্তি।' 'ইহা লাভ করিলে জীব সর্বভূতে প্রেমবান্ ও ঘৃণাশূন্য হয় এবং অনন্তকালের জন্য তৃপ্তি লাভ করে।' 'এই প্রেমের দ্বারা কোন কাম্য বস্তু লাভ হইতে পারে না, কারণ বিষয়বাসনা থাকিতে এই প্রেমের উদয়ই হয় না।' 'কর্ম, জ্ঞান এবং যোগ হইতেও ভক্তি অধিকতরা, কারণ সাধ্যবিশেষই উহাদের লক্ষ্য, কিন্তু ভক্তি স্বয়ংই সাধ্য ও সাধনস্বরূপা।'[১]

আমাদের দেশের সকল মহাপুরুষই ভক্তিতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। শাণ্ডিল্য, নারদাদি ভক্তিতত্ত্বের বিশেষ ব্যাখ্যাতাগণকে ছাড়িয়া দিলেও স্পষ্টতঃ জ্ঞানমার্গ-সমর্থনকারী ব্যাসসূত্রের মহান্ ভাষ্যকারও ভক্তিসম্বন্ধে অনেক ইঙ্গিত করিয়াছেন। সমুদয় না হউক, অধিকাংশ সূত্রই শুষ্ক জ্ঞান-সূচক অর্থে ব্যাখ্যা করিবার আগ্রহ ভাষ্যকারের থাকিলেও সূত্রগুলির, বিশেষতঃ উপাসনা-বিষয়ক সূত্রগুলির অর্থ নিরপেক্ষভাবে অনুসন্ধান করিলে সহজে তাহাদের ঐরূপ ব্যাখ্যা চলিতে পারে না।

সাধারণতঃ লোকে জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে যতটা পার্থক্য আছে মনে করে, বাস্তবিক তাহা নাই। ক্রমশঃ বুঝিব, জ্ঞান ও ভক্তি শেষে একই লক্ষ্যে মিলিত হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ জুয়াচোর ও গুপ্তবিদ্যার নামে ছলনাকারীদের হাতে পড়িয়া রাজযোগ প্রায়ই অসাবধান ব্যক্তিদের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। এরূপ না হইয়া মুক্তিলাভের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হইলে রাজযোগও সেই একই লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দেয়।

ভক্তিযোগে এক বিশেষ সুবিধা—উহা আমাদের চরম লক্ষ্য ঈশ্বরে পৌঁছিবার সর্বাপেক্ষা সহজ ও স্বাভাবিক পন্থা। কিন্তু উহাতে বিশেষ বিপদা-

---

১ ওঁ সা কস্মৈ পরমপ্রেমরূপা। —নারদ-সূত্র, ১ম অনুবাক, ২য় সূত্র
ওঁ সা ন কাময়মানা নিরোধরূপত্বাৎ। —ঐ, ২।৭
ওঁ সা তু কর্মজ্ঞানযোগেভ্যোঽপ্যধিকতরা। —ঐ, ৪।২৫
ওঁ স্বয়ং ফলরূপতেতি ব্রহ্মকুমারাঃ। —ঐ, ৪।৩০

শঙ্কা এই যে, নিম্নস্তরের ভক্তি অনেক সময়ে ভয়ানক গোঁড়ামির আকার ধারণ করে। হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টধর্মান্তর্গত গোঁড়ার দল—এই নিম্নস্তরের ভক্তিসাধকগণের মধ্যেই সর্বদা বিশেষভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। যে ইষ্ট-নিষ্ঠা ব্যতীত প্রকৃত প্রেম জন্মে না, সেই ইষ্টনিষ্ঠাই আবার অনেক সময় অন্য সকল মতের উপর তীব্র আক্রমণ ও দোষারোপের কারণ। সকল ধর্মের ও সকল দেশের দুর্বল অপরিণতমস্তিষ্ক ব্যক্তিগণ একটিমাত্র উপায়েই তাহাদের নিজ আদর্শ ভালবাসিতে পারে। সেই উপায়টি—অপর সমুদয় আদর্শকে ঘৃণা করা। নিজ ঈশ্বরাদর্শে, নিজ ধর্মাদর্শে একান্ত অনুরক্ত ব্যক্তিগণ অন্য কোন আদর্শের বিষয় শুনিলে বা দেখিলে কেন গোঁড়ার মতো চীৎকার করিতে থাকে, তাহার কারণ ইহা হইতেই বুঝা যায়। এরূপ ভালবাসা যেন প্রভুর সম্পত্তিতে অপরের হস্তক্ষেপ-নিবারণের জন্য কুকুরসুলভ সহজ প্রবৃত্তির মতো। তবে প্রভেদ এই—কুকুরের এই সহজ প্রবৃত্তি মানবযুক্তি হইতে উচ্চ; প্রভু যে বেশ ধরিয়াই আসুন না কেন, কুকুর তাঁহাকে কখনও শত্রু বলিয়া ভুল করে না। গোঁড়া কিন্তু সমুদয় বিচারশক্তি হারাইয়া ফেলে। ব্যক্তিগত বিষয়ে তাহার দৃষ্টি এত অধিক যে, কোন্ ব্যক্তি কি বলিতেছে, তাহা সত্য কি মিথ্যা, তাহা শুনিবার বা বুঝিবার কোন প্রয়োজন সে বোধ করে না; কিন্তু কে উহা বলিতেছে, সেই বিষয়েই তাহার বিশেষ দৃষ্টি। যে লোক স্বমতাবলম্বী ব্যক্তিগণের উপর দয়াশীল, ন্যায়পরায়ণ ও প্রেমযুক্ত, সেই নিজ সম্প্রদায়ের বহির্ভূত ব্যক্তিদের অনিষ্ট করিতে ইতস্ততঃ করে না।

তবে এ আশঙ্কা কেবল ভক্তির নিম্নস্তরেই আছে—এই অবস্থার নাম 'গৌণী'। উহা পরিপক্ক হইয়া পরাভক্তিতে পরিণত হইলে আর এরূপ ভয়ানক গোঁড়ামি আসিবার আশঙ্কা থাকে না। এই পরাভক্তির প্রভাবে সাধক প্রেমস্বরূপ ভগবানের এত নিকটতা লাভ করেন যে, তিনি আর অপরের প্রতি ঘৃণার ভাব বিস্তার করিবার যন্ত্রস্বরূপ হইতে পারেন না।

এই জীবনেই যে আমরা সকলে সামঞ্জস্যের সহিত চরিত্র গড়িয়া তুলিতে পারিব, তাহা সম্ভব নয়; তবে আমরা জানি—যে-চরিত্রে জ্ঞান, ভক্তি ও যোগ সমন্বিত হইয়াছে, সেই চরিত্রই সর্বাপেক্ষা মহৎ। উড়িবার জন্য পাখির তিনটি জিনিসের আবশ্যক—দুইটি পক্ষ ও চালাইবার হালস্বরূপ একটি পুচ্ছ। জ্ঞান ও ভক্তি দুইটি পক্ষ, সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য যোগ উহার পুচ্ছ।

যাঁহারা এই তিনপ্রকার সাধন-প্রণালী একসঙ্গে সামঞ্জস্যের সহিত অনুষ্ঠান করিতে না পারিয়া ভক্তিকেই একমাত্র পথ বলিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহাদের পক্ষে এটি সর্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, বাহ্য অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপ প্রথম অবস্থায় সাধকের পক্ষে অত্যাবশ্যক হইলেও ভগবানের প্রতি প্রগাঢ় প্রেমের অবস্থায় আগাইয়া দেওয়া ব্যতীত এগুলির আর কোন উপযোগিতা নাই।

জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গের আচার্যগণের মধ্যে সামান্য একটু মতভেদ আছে,—যদিও উভয়েই ভক্তির প্রভাবে বিশ্বাসী। জ্ঞানীরা ভক্তিকে মুক্তির উপায়মাত্র বলিয়া বিশ্বাস করেন, কিন্তু ভক্তেরা উহাকে উপায় ও উদ্দেশ্য—একাধারে দুই-ই মনে করিয়া থাকেন। আমার বোধ হয়, এ প্রভেদ নামমাত্র। প্রকৃতপক্ষে ভক্তিকে সাধন-স্বরূপ ধরিলে নিম্নস্তরের উপাসনামাত্র বুঝায়, আর একটু অগ্রসর হইলে এই নিম্নস্তরের উপাসনাই উচ্চস্তরের ভক্তির সহিত অভিন্নভাব ধারণ করে। প্রত্যেকেই যেন নিজ নিজ সাধন-প্রণালীর উপর ঝোঁক দিয়া থাকেন। তাঁহারা ভুলিয়া যান—প্রকৃত জ্ঞান অযাচিত হইলেও পূর্ণ ভক্তির সহিত আসিবেই আসিবে, আর পূর্ণ জ্ঞানের সহিত প্রকৃত ভক্তিও অভিন্ন।

এইটি মনে রাখিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা যাক—এ বিষয়ে বেদান্তের মহান্ ভাষ্যকারেরা কি বলেন। ‘আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ’—এই সূত্র ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ভগবান্ শঙ্কর বলেন, ‘লোকে এইরূপ বলিয়া থাকে—অমুক গুরুর ভক্ত, অমুক রাজার ভক্ত। যে গুরুর বা রাজার নির্দেশানুবর্তী হয় এবং সেই নির্দেশানুবর্তনকেই একমাত্র লক্ষ্য রাখিয়া কার্য করে, তাহাকেই ভক্ত বলিয়া থাকে। লোকে আরও এইরূপ বলিয়া থাকে—পতিপ্রাণা স্ত্রী বিদেশগত পতির ধ্যান করিতেছে। এখানেও একরূপ সাগ্রহ অবিচ্ছিন্ন স্মৃতিই লক্ষিত হইয়াছে।’[১] শঙ্করের মতে ইহাই ভক্তি।

আবার ভগবান্ রামানুজ ‘অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা’ সূত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন:

১ তথা হি লোকে গুরুমুপাস্তে ইতি চ যস্তাৎপর্যেণ গুর্বাদীননুবর্ততে স এবমুচ্যতে। তথা ধ্যায়তি প্রোষিতনাথা পতিমিতি বা নিরন্তরস্মরণা পতিং প্রতি সোৎকণ্ঠাসৈবমভিধীয়তে।

—শাঙ্করভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।১

'এক পাত্র হইতে অপর পাত্রে নিক্ষিপ্ত অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় প্রবাহিত ধ্যেয় বস্তুর নিরন্তর স্মরণের নাম ধ্যান। যখন ভগবৎ সম্বন্ধে এইরূপ অবিচ্ছিন্ন স্মৃতির অবস্থা লব্ধ হয়, তখন সকল বন্ধন নাশ হয়।' এইরূপে শাস্ত্র এই নিরন্তর স্মরণকে মুক্তির কারণ বলিয়াছেন। এইরূপ স্মরণ আবার দর্শন করারই সামিল। কারণ 'সেই পর ও অবর (দূর ও সন্নিহিত) পুরুষকে দর্শন করিলে হৃদয়গ্রন্থি নাশ হয়, সমুদয় সংশয় ছিন্ন হইয়া যায় এবং কর্মক্ষয় হইয়া যায়।' —এই শাস্ত্রোক্ত বাক্যে 'স্মরণ' দর্শনের সহিত সমার্থকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। যিনি সন্নিহিত, তাঁহাকে দর্শন করা যাইতে পারে ; কিন্তু যিনি দূরবর্তী, তাঁহাকে কেবল স্মরণ করা যাইতে পারে ; তথাপি শাস্ত্র আমাদিগকে সন্নিহিত ও দূরস্থ উভয়কেই দর্শন করিতে বলিতেছেন, সুতরাং ঐরূপ স্মরণ ও দর্শন এক পর্যায়ের কার্য বলিয়া সূচিত হইল। এই স্মৃতি প্রগাঢ় হইলে দর্শনের তুল্য হইয়া পড়ে। ··· আর উপাসনা-অর্থে সর্বদা স্মরণ, ইহা শাস্ত্রের প্রধান প্রধান শ্লোক হইতে দৃষ্ট হয়। জ্ঞান—যাহা নিরন্তর উপাসনার সহিত অভেদ, তাহাও নিরন্তর স্মরণ-অর্থে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।···সুতরাং স্মৃতি যখন প্রত্যক্ষানুভূতির আকার ধারণ করে, তাহাই শাস্ত্রে মুক্তির উপায় বলিয়া কথিত হইয়াছে। 'নানাবিধ বিদ্যা দ্বারা, বুদ্ধির দ্বারা, কিংবা বহু বেদাধ্যয়নের দ্বারা আত্মা লভ্য নন। যাঁহাকে এই আত্মা বরণ করেন, তিনিই সেই আত্মাকে লাভ করেন। তাঁহার নিকটে আত্মা আপন স্বরূপ প্রকাশ করেন।' এস্থলে প্রথমে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মা লব্ধ হন না বলিয়া পরে বলিতেছেন, 'আত্মা যাঁহাকে বরণ করেন, তাঁহার দ্বারাই আত্মা লব্ধ হন' ; অত্যন্ত প্রিয়কেই 'বরণ' করা সম্ভব। যিনি আত্মাকে অতিশয় ভালবাসেন, আত্মা—তাঁহাকেই অতিশয় ভালবাসেন, এই প্রিয় ব্যক্তি যাহাতে আত্মাকে লাভ করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে ভগবান্ স্বয়ং তাঁহাকে সাহায্য করেন। কারণ ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন, 'যাহারা নিরন্তর আমাতে আসক্ত এবং প্রেমের সহিত আমাকে উপাসনা করে, আমি তাহাদিগের বুদ্ধি এমনভাবে চালিত করি, যাহাতে তাহারা আমাকে লাভ করে।'[১] অতএব কথিত

---

১ ধ্যানং তৈলধারাবদবিচ্ছিন্নস্মৃতিসংতানরূপা ধ্রুবা স্মৃতিঃ। 'স্মৃত্যুপলম্ভে সর্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ' ইতি ধ্রুবায়াঃ স্মৃতেরপবর্গোপায়ত্বশ্রবণাৎ। সা চ স্মৃতির্দর্শনসমানাকারা ; 'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে' ইত্যনেনৈকার্থ্যাৎ এবং চ সতি

হইয়াছে যে, প্রত্যক্ষ অনুভবাত্মক এই স্মৃতি যাঁহার অতি প্রিয় (উহা ঐ স্মৃতির বিষয়ীভূত পুরুষের অতি প্রিয় বলিয়া) তাঁহাকেই সেই পরমাত্মা বরণ করেন, তাঁহার দ্বারাই সেই পরমাত্মা লব্ধ হন। এই নিরন্তর স্মরণ 'ভক্তি' শব্দের দ্বারা লক্ষিত হইয়াছে।

পতঞ্জলির 'ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা' সূত্রটির ব্যাখ্যায় ভোজ বলেন—'প্রণিধান অর্থে সেইরূপ ভক্তি, যাহাতে সমুদয় ফলাকাঙ্ক্ষা (যেমন ইন্দ্রিয়ের ভোগাদি) ত্যক্ত হইয়া সমুদয় কর্ম সেই পরম গুরুর উপর সমর্পিত হয়।'[১] আবার ভগবান্ ব্যাস উহার ব্যাখ্যায় বলেন, 'প্রণিধান অর্থে ভক্তিবিশেষ, যদ্দ্বারা যোগীর নিকট সেই পরম পুরুষের কৃপার আবির্ভাব হয় এবং তাঁহার বাসনা-সকল পূর্ণ হয়।'[২] শাণ্ডিল্যের মতে 'ঈশ্বরে পরমানুরক্তিই ভক্তি।'[৩] ভক্তরাজ প্রহ্লাদ কিন্তু ভক্তির যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহাই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। 'অজ্ঞলোকের ইন্দ্রিয়-বিষয়ে যেরূপ তীব্র আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়, তোমাকে স্মরণ করিবার সময় তামার প্রতি সেইরূপ তীব্র আসক্তি যেন

'আত্মা বারে দ্রষ্টব্য' ইত্যনেন নিদিধ্যাসনস্য দর্শনরূপতা বিধীয়তে। ভবতি চ স্মৃতের্ভাবনপ্রকর্ষাদ্দর্শন-রূপতা। বাক্যকারেণৈতৎ সর্বং প্রপঞ্চিতম্। 'বেদনমুপাসনম্ স্যাৎ তদ্বিষয়ে শ্রবণাদিতি।' সর্বাস্বুপনিষৎসু মোক্ষসাধনতয়া বিহিতং 'বেদনমুপাসনম্' ইত্যুক্তং 'সকৃৎপ্রত্যয়ং কুর্যাচ্ছব্দার্থস্য কৃতত্বাৎ প্রযাজাদিবৎ' ইতি পূর্বপক্ষং কৃত্বা 'সিদ্ধং তুপাসনশব্দাৎ' ইতি বেদনমসকৃদাবৃত্তং মোক্ষ-সাধনমিতি নির্ণীতম্। 'উপাসনং স্যাদ্ ধ্রুবানুস্মৃতির্দর্শনান্নির্বচনাচ্চেতি' তস্যৈব বেদনস্যোপাসনরূপস্যা-সকৃদাবৃত্তস্য ধ্রুবানুস্মৃতিত্বমুপবর্ণিতম্। সেয়ং স্মৃতিদর্শনরূপা প্রতিপাদিতা, দর্শনরূপা চ প্রত্যক্ষতা-পত্তিঃ। এবং প্রত্যক্ষতাপন্নামপবর্গসাধনভূতাং স্মৃতিং বিশিনষ্টি—'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্' ইতি অনেন কেবলশ্রবণমননিদিধ্যাসনানামাত্মপ্রাপ্ত্যনুপায়তামুক্ত্বা 'যমেবৈষ বৃণুতে তেনৈব লভ্যঃ' ইত্যুক্তম্। প্রিয়তম এব হি বরণীয়ো ভবতি, যস্যায়ং নিরতিশয়প্রিয়ঃ স এবাস্য প্রিয়তমো ভবতি। যথায়ং প্রিয়তম আত্মানং প্রাপ্নোতি, তথা স্বয়মেব ভগবান্ প্রযতত ইতি ভগবতৈবোক্তং—'তেষাং সতত-যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকং। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে' ইতি 'প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ' ইতি চ। অতঃ সাক্ষাৎকাররূপা স্মৃতিঃ স্মর্যমাণাত্যর্থপ্রিয়ত্বেন স্বয়মপ্যত্যর্থপ্রিয়া যস্য স এব পরমাত্মনা বরণীয়ো ভবতীতি তেনৈব লভ্যতে পরমাত্মেত্যুক্তং ভবতি, এবংরূপা ধ্রুবানুস্মৃতিরেব ভক্তিশব্দেনাভিধীয়তে। —রামানুজভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র, ১।১।১

১ প্রণিধানং তত্র ভক্তিবিশেষো বিশিষ্টমুপাসনং সর্বক্রিয়াণামপি তত্রার্পণং। বিষয়সুখাদিকং ফলমনিচ্ছন্ সর্বাঃ ক্রিয়াস্তস্মিন্ পরমগুরাবর্পয়তি। —ভোজবৃত্তি, পাতঞ্জল যোগসূত্র, ১।২৩

২ 'প্রণিধানাদ্ভক্তিবিশেষাদাবর্জিত ঈশ্বরস্তমনুগৃহ্ণাত্যভিধ্যানমাত্রেণ' ইত্যাদি।
—ব্যাসভাষ্য, ১।ঐ, ঐ

৩ 'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে' —শাণ্ডিল্যসূত্র, ১।২

আমার হৃদয় হইতে অপসারিত না হয়।'[১] আসক্তি—কাহার জন্য? পরম প্রভু ঈশ্বরের জন্য। আর কাহাকেও ভালবাসা—তা তিনি যত বড়ই হউন না কেন, তাঁহাকে ভালবাসা কখনই 'ভক্তি' হইতে পারে না। ইহার প্রমাণস্বরূপ রামানুজ শ্রীভাষ্যে এক প্রাচীন আচার্যের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, —'ব্রহ্মা হইতে ক্ষুদ্র তৃণ পর্যন্ত জগদন্তর্গত সকল প্রাণী কর্মহেতু জন্ম ও মৃত্যুর বশীভূত; তাহারা অবিদ্যার অন্তর্গত ও পরিবর্তনশীল বলিয়া সাধকের ধ্যানের সহায় নয়।'[২] শাণ্ডিল্যসূত্রের 'অনুরক্তি' শব্দ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ব্যাখ্যাকার স্বপ্নেশ্বর বলেন, 'উহার অর্থ: অনু—পশ্চাৎ, ও রক্তি—আসক্তি অর্থাৎ ভগবানের স্বরূপ ও মহিমাজ্ঞানের পর তাঁহার প্রতি যে আসক্তি আসে।'[৩] তাহা না হইলে যে-কোন ব্যক্তির প্রতি, যেমন স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি অন্ধ আসক্তিও ভক্তি হইয়া যায়। অতএব আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি, সাধারণ পূজাপাঠাদি হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশ্বরে প্রগাঢ় অনুরাগ পর্যন্ত আধ্যাত্মিক অনুভূতির জন্য চেষ্টাপরম্পরার নাম ভক্তি।

১ যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু। —বিষ্ণুপুরাণ, ১।২০।১৯

২ আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্তা জগদন্তর্ব্যবস্থিতাঃ।
প্রাণিনঃ কর্মজনিতসংসারবশবর্তিনঃ।
যতস্ততো ন তে ধ্যানে ধ্যানিনামুপকারকাঃ।
অবিদ্যান্তর্গতাঃ সর্বে তে হি সংসারগোচরাঃ।

৩ ভগবন্মহিমাদিজ্ঞানাদনু—পশ্চাজ্জায়মানত্বাদনুরক্তিরিত্যুক্তম্।
—স্বপ্নেশ্বরটীকা, শাণ্ডিল্যসূত্র ১।২

ঈশ্বরের স্বরূপ

ঈশ্বর কে? 'যাঁহা দ্বারা জন্ম, স্থিতি ও লয় হইতেছে'[১] তিনি ঈশ্বর—'অনন্ত, শুদ্ধ, নিত্যমুক্ত, সর্বশক্তিমান্, সর্বজ্ঞ, পরমকারুণিক, গুরুর গুরু।'[২] আর সকলের উপর 'তিনি অনির্বচনীয় প্রেমস্বরূপ।'[৩]

এগুলি অবশ্য সগুণ ঈশ্বরের সংজ্ঞা। তবে কি ঈশ্বর দুইটি? 'নেতি নেতি' করিয়া জ্ঞানী যে সচ্চিদানন্দে উপনীত হন, তিনি একটি এবং ভক্তের প্রেমময় ভগবান্ আর একটি? না, সেই একই সচ্চিদানন্দ—প্রেমময় ভগবান্, একাধারে তিনি সগুণ ও নির্গুণ। সর্বদাই বুঝিতে হইবে, ভক্তের উপাস্য সগুণ ঈশ্বর, ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বা পৃথক নন। সবই সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্ম'। তবে নির্গুণ পরব্রহ্মের এই নির্গুণ স্বরূপ অতি সূক্ষ্ম বলিয়া প্রেম বা উপাসনার পাত্র হইতে পারেন না। এইজন্য ভক্ত ব্রহ্মের সগুণ ভাব অর্থাৎ পরমনিয়ন্তা ঈশ্বরকেই উপাস্যরূপে নির্বাচন করেন। একটি উপমার দ্বারা বুঝা যাক:

ব্রহ্ম যেন মৃত্তিকা বা উপাদান—তাহা হইতে অনেক বস্তু নির্মিত হইয়াছে। মৃত্তিকারূপে ঐগুলি এক বটে, কিন্তু রূপ বা প্রকাশ উহাদিগকে পৃথক করিয়াছে। উৎপত্তির পূর্বে তাহারা ঐ মৃত্তিকাতেই অব্যক্তভাবে ছিল। উপাদান হিসাবে এক, কিন্তু যখন বিশেষ বিশেষ রূপ ধারণ করে, আর যতদিন সেই রূপ থাকে, ততদিন সেগুলি পৃথক্ পৃথক্। মাটির ইঁদুর কখনও মাটির হাতি হইতে পারে না। কারণ আকার গ্রহণ করিলে বিশেষ আকৃতিই বস্তুর বিশেষত্বের জ্ঞাপক। বিশেষ কোন আকৃতিহীন মৃত্তিকা হিসাবে অবশ্য উহারা একই। ঈশ্বর সেই পূর্ণ সত্যস্বরূপের উচ্চতম অভিব্যক্তি অথবা মনুষ্যমনের সর্বোচ্চ উপলব্ধি। সৃষ্টি অনাদি, ঈশ্বরও অনাদি।

বেদান্তসূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে মুক্তাত্মা যে প্রায়-অনন্ত শক্তি ও জ্ঞানের অধিকারী হয়, তাহা বর্ণন করিয়া ব্যাস আর এক সূত্রে

---

১ জন্মাদ্যস্য যতঃ। —ব্রহ্মসূত্র, ১।১।২

২ পাতঞ্জল যোগসূত্র, ১।২৫-২৬

৩ স ঈশ্বরোঽনির্বচনীয়প্রেমস্বরূপঃ। —শাণ্ডিল্যসূত্র

বলিতেছেন, 'কিন্তু কেহই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের শক্তিলাভ করিবে না, তাহা কেবল ঈশ্বরের।'[১] এই সূত্রব্যাখ্যার সময় দ্বৈতবাদী ভাষ্যকারগণ পরতন্ত্র জীবের পক্ষে ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি ও পূর্ণ স্বতন্ত্রতা লাভ করা যে কোন কালে সম্ভব নয়, তাহা অনায়াসে দেখাইতে পারেন। পূর্ণ দ্বৈতবাদী ভাষ্যকার মধ্বাচার্য বরাহপুরাণ হইতে একটি শ্লোক তুলিয়া তাঁহার প্রিয় সংক্ষিপ্ত উপায়ে এই সূত্রটির ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এই সূত্র ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বিশিষ্টাদ্বৈত ভাষ্যকার রামানুজ বলেন ঃ

সংশয় উপস্থিত হয় যে, মুক্তাত্মাদিগের শক্তির মধ্যে পরম পুরুষের অসাধারণ শক্তি অর্থাৎ জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়শক্তি ও সর্বনিয়ন্তৃত্ব অন্তর্ভুক্ত কিনা? অথবা উহার অভাবে পরম পুরুষের সাক্ষাৎ দর্শনই কেবল তাঁহাদের ঐশ্বর্য কিনা? মুক্তাত্মা জগতের নিয়ন্তৃত্ব লাভ করেন, ইহা যুক্তিযুক্ত মনে করা যাক। কেন? কারণ শ্রুতি বলেন, 'মুক্তাত্মা পরম একত্ব লাভ করেন' (মুণ্ডক উপনিষদ্, ৩।১।৩)। আরও উক্ত হইয়াছে, 'তাঁহার সমুদয় বাসনা পূর্ণ হয়'। এখন কথা এই, পরম একত্ব ও সকল বাসনার পরিপূরণ পরম পুরুষের অসাধারণ শক্তি—জগন্নিয়ন্তৃত্ব ব্যতীত হইতে পারে না। অতএব সকল বাসনার পরিপূরণ ও পরম একত্ব লাভ হয় বলিলেই মানিতে হইবে, মুক্তাত্মা সমগ্র জগতের নিয়ন্তৃত্বও লাভ করেন। ইহার উত্তরে আমরা বলি, মুক্তাত্মা কেবল জগন্নিয়ন্তৃত্ব ব্যতীত আর সমুদয় শক্তিলাভ করেন। 'জগন্নিয়মন' অর্থে—জগতের সমুদয় স্থাবর জঙ্গমের বিভিন্ন প্রকার রূপ, স্থিতি ও বাসনার নিয়ন্তৃত্ব। মুক্তাত্মাদিগের কিন্তু এই জগন্নিয়মন-শক্তি নাই, যাহা কিছু ঈশ্বরের স্বরূপ আবৃত করে, তাঁহাদের দৃষ্টিপথ হইতে সে-সকল আবরণ চলিয়া গিয়াছে এবং তাঁহাদের প্রত্যক্ষ ব্রহ্মানুভূতি হয়—ইহাই তাঁহাদের একমাত্র ঐশ্বর্য। ইহা কিরূপে জানিলে? নিখিল-জগন্নিয়ন্তৃত্ব কেবল পরব্রহ্মেরই গুণ বলিয়া যে শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, সেই শাস্ত্রবাক্যবলেই ইহা জানিয়াছি। 'যাঁহা হইতে সমুদয় বস্তু জন্মায়, যাঁহাতে অবস্থান করে এবং যাঁহাতে প্রলয়কালে প্রবেশ করে, তাঁহার সম্বন্ধে জানিবার ইচ্ছা কর, তিনি ব্রহ্ম।'—(তৈত্তি. উপ., ৩।১)। যদি এই জগন্নিয়ন্তৃত্ব মুক্তাত্মাদেরও

১ জগদ্ব্যাপারবর্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাচ্চ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১৭

সাধারণ গুণ হয়, তবে উদ্ধৃত শ্লোক ব্রহ্মের লক্ষণ হইতে পারে না, কারণ তাঁহার নিয়ন্তৃত্ব-গুণের দ্বারা তাঁহার লক্ষণ করা হইয়াছে। অসাধারণ গুণগুলিকেই বিশেষ লক্ষণ বলা হয়। অতএব নিম্নোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যসমূহে পরমপুরুষকেই জগন্নিয়মনের কর্তারূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, আর ঐ ঐ স্থলে মুক্তাত্মার এমন বর্ণনা নাই, যাহাতে জগন্নিয়ন্তৃত্ব তাঁহাদের উপর আরোপিত হইতে পারে। বেদবাক্যগুলি এই: 'বৎস, আদিতে একমেবাদ্বিতীয়ম্ ছিলেন। তিনি আলোচনা করিলেন, আমি বহু সৃষ্টি করিব। তিনি তেজ সৃজন করিলেন।' 'কেবল ব্রহ্মই আদিতে ছিলেন। তিনি পরিণত হইলেন। তিনি ক্ষত্র নামে এক সুন্দর রূপ সৃজন করিলেন। বরুণ, সোম, রুদ্র, পর্জন্য, যম, মৃত্যু, ঈশান এই সকল দেবতাই ক্ষত্র।' 'আদিতে আত্মাই ছিলেন। ক্রিয়াশীল আর কিছুই ছিল না। তিনি আলোচনা করিলেন, আমি জগৎ সৃষ্টি করিব—পরে তিনি এই জগৎ সৃজন করিলেন।' 'একমাত্র নারায়ণই ছিলেন। ব্রহ্মা, ঈশান, দ্যাবা-পৃথিবী, তারা, জল, অগ্নি, সোম কিংবা সূর্য কিছুই ছিল না, তিনি একাকী সুখী হইলেন না। ধ্যানের পর তাঁহার একটি কন্যা ও দশ-ইন্দ্রিয় জন্মিল।' 'যিনি পৃথিবীতে বাস করিয়া পৃথিবী হইতে স্বতন্ত্র', 'যিনি আত্মাতে বাস করিয়া' ইত্যাদি।[1]

---

১ কিং মুক্তস্যৈশ্বর্যং জগৎস্রষ্ট্র্যাদি পরমপুরুষসাধারণং সর্বেশ্বরত্বমপি উত তদ্রহিতং কেবলপরমপুরুষানুভববিষয়মিতি সংশয়ঃ, কিং যুক্তং, জগদীশ্বরত্বমপীতি, কুতঃ, নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতীতি পরমপুরুষেণ পরমসাম্যাপত্তিশ্রুতেঃ, সত্যসঙ্কল্পত্বশ্রুতেশ্চ, নহি পরমসাম্যসত্যসঙ্কল্পত্বং সর্বেশ্বরাসাধারণজগদ্ব্যাপাররূপজগন্নিয়মনেন বিনোপপদ্যতে অতঃ সত্যসঙ্কল্পতাপরমসাম্যোপপত্তয়ে সমস্তজগন্নিয়মনরূপমপি মুক্তৈশ্বর্যমিত্যেবং প্রাপ্তেঃ, প্রচক্ষ্মহে, জগদ্ব্যাপারবর্জমিতি, জগদ্ব্যাপারো নিখিলচেতনাচেতনস্বরূপস্থিতিপ্রবৃত্তিভেদনিয়মনন্তদ্বর্জং নিরস্তনিখিলতিরোধানস্য নির্ব্যাজব্রহ্মানুভবরূপং মুক্তস্যৈশ্বর্যং, কুতঃ প্রকরণাৎ নিখিলজগন্নিয়মনং হি পরং ব্রহ্ম প্রকৃত্যাম্নায়তে, 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্মেতি'। যদ্যেতন্নিখিলজগন্নিয়মনং মুক্তানামপি সাধারণং স্যাৎ, ততশ্চেদং জগদীশ্বরত্বরূপং ব্রহ্মলক্ষণং ন সঙ্গচ্ছতে। অসাধারণস্য হি লক্ষণত্বং তথা 'সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তত্তেজোহসৃজতেতি' 'ব্রহ্ম বা ইদমেকমেবাগ্র আসীত্তদেকং সন্নব্যভবৎ, তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ক্ষত্রং যান্যেতানি দেবক্ষত্রাণীন্দ্রো বরুণঃ সোমো রুদ্রঃ পর্জন্যো যমো মৃত্যুরীশান' ইতি 'আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ স ঐক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি স ইমাল্লোঁকানসৃজত' ইতি। 'একো হ বৈ নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা নেশানো নেমে দ্যাবাপৃথিবী ন নক্ষত্রাণি নাপো নাগ্নির্ন সোমো ন সূর্যঃ স একাকী ন রমতে তস্য ধ্যানান্তস্থস্যৈকা কন্যা দশেন্দ্রিয়াণি' ইত্যাদিষু 'যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তর' ইত্যারভ্য 'য আত্মনি তিষ্ঠন্ ইত্যাদিষু চ নিখিলজগন্নিয়মনং পরমপুরুষং প্রকৃত্যৈব শ্রূয়তে' অসন্নিহিতত্বাচ্চ, ন চৈতেষু নিখিলজগন্নিয়মনপ্রসঙ্গেষু মুক্তস্য সন্নিধানমস্তি যেন জগদ্ব্যাপারস্তস্যাপি স্যাৎ।—রামানুজভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১৭

পরসূত্র-ব্যাখ্যায় রামানুজ বলিতেছেন, 'যদি বলো ইহা সত্য নয়, কারণ বেদে ইহার বিপরীতার্থপ্রতিপাদক অনেক শ্লোক আছে, তাহা হইলে বলিব তাহা নিম্নদেবলোকে মুক্তাত্মার ঐশ্বর্যবর্ণনা মাত্র।'[১] ইহাও একরূপ সহজ মীমাংসা হইল। যদিও রামানুজের মতে সমষ্টির ঐক্য স্বীকৃত হইয়াছে, তথাপি তাঁহার মতে এই সমষ্টির মধ্যে নিত্য ভেদসমূহ আছে। অতএব এই মতও কার্যতঃ দ্বৈত বলিয়া জীবাত্মা ও সগুণ ঈশ্বরের স্পষ্ট ভেদ রক্ষা করা রামানুজের পক্ষে সহজ হইয়াছে।

এখন আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব অদ্বৈতমতের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা এই বিষয়ে কি বলেন। আমরা দেখিব, অদ্বৈতমত কেমন দ্বৈতবাদীর সকল আশা আকাঙ্ক্ষা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সঙ্গে সঙ্গে মানবজাতির মহোচ্চ দিব্যভাবের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া নিজ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতেছেন। যাঁহারা মুক্তিলাভের পরও নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, ভগবান্ হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে চান, তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার ও সগুণ ব্রহ্মকে সম্ভোগ করিবার যথেষ্ট অবসর থাকিবে। ইহাদেরই কথা ভাগবত-পুরাণে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে: 'হে রাজন্, হরির এতাদৃশ গুণরাশি যে, যে-সকল মুনি আত্মারাম, যাঁহাদের সকল বন্ধন চলিয়া গিয়াছে, তাঁহারাও ভগবানের প্রতি অহেতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।[২]

সাংখ্যেরা ইঁহাদিগকেই 'প্রকৃতিলীন' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সিদ্ধিলাভ করিয়া ইঁহারা পরকল্পে কতকগুলি জগতের শাসনকর্তারূপে আবির্ভূত হন। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে কেহই কখন ঈশ্বরতুল্য হইতে পারেন না। যাঁহারা এমন এক অবস্থায় উপনীত হন, যেখানে সৃষ্টি সৃষ্ট বা স্রষ্টা নাই, যেখানে জ্ঞাতা জ্ঞেয় বা জ্ঞান নাই, যেখানে আমি তুমি বা তিনি নাই, যেখানে প্রমাতা প্রমেয় বা প্রমাণ নাই, 'সেখানে কে কাহাকে দেখে?'—এরূপ ব্যক্তি সমুদয়ের বাহিরে গিয়াছেন, 'যেখানে বাক্য অথবা মনও যাইতে পারে না।' এরূপ ব্যক্তি এমন স্থানে গিয়াছেন, যাহাকে শ্রুতি 'নেতি, নেতি' বলিয়া

---

১ 'প্রত্যক্ষোপদেশান্নেতিচেন্নাধিকারিকমণ্ডলস্থোক্তেঃ।' এই সূত্রের (ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১৮) রামানুজভাষ্য দ্রষ্টব্য।

২ আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥—শ্রীমদ্ভাগবত, ১।৭।১০

বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা এরূপ অবস্থা লাভ করিতে পারেন না বা এরূপ অবস্থায় যাইতে ইচ্ছা করেন না, তাঁহারা সেই এক অবিভক্ত ব্রহ্মকে প্রকৃতি, আত্মা, ঐ উভয়ের অন্তর্যামী ঈশ্বর—এই তিনরূপে বিভক্ত দেখিবেন। ভক্তির আতিশয্যে চেতনার ঊর্ধ্বতর স্তরে যখন প্রহ্লাদ নিজেকে ভুলিয়া গেলেন, তখন তিনি জগৎ ও তাহার কারণ কিছুই তো দেখিতে পাইলেন না, সমুদয়ই তাঁহার নিকট নাম-রূপে অবিভক্ত এক অনন্তরূপে প্রতীয়মান হইয়াছিল। কিন্তু যখনই তাঁহার বোধ হইল, তিনি প্রহ্লাদ, অমনি তাঁহার নিকট জগৎ ও অশেষকল্যাণগুণরাশির আধারস্বরূপ জগদীশ্বর প্রকাশিত হইলেন। মহাভাগা গোপীদিগেরও এই অবস্থা ঘটিয়াছিল। যতক্ষণ তাঁহারা কৃষ্ণের প্রতি গভীর অনুরাগে ও প্রেমে অহংজ্ঞানশূন্য ছিলেন, ততক্ষণ তাঁহারা সকলেই কৃষ্ণরূপে পরিণত হইয়াছিলেন। যখন তাঁহারা আবার তাঁহাকে উপাস্যরূপে পৃথক্‌ভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহারা আবার গোপীভাব প্রাপ্ত হইলেন। তখনই 'তাঁহাদের সম্মুখে মুখকমলে মৃদুহাস্যযুত, পীতাম্বরধারী, মাল্যভূষিত ও সাক্ষাৎ মন্মথের মন-মথনকারী কৃষ্ণ আবির্ভূত হইলেন।'[১]

এখন আবার আমরা আমাদের আচার্য শঙ্করের কথায় আসিতেছি। শঙ্কর বলেন, যাঁহারা সগুণব্রহ্মের উপাসনা করিয়া পরমেশ্বরের সহিত মিলিত হন, অথচ যাঁহাদের মন অব্যাহত থাকে, তাঁহাদের ঐশ্বর্য সসীম কি অসীম? এই সংশয় উপস্থিত হইলে যুক্তি দেখানো হয় যে, তাঁহাদের ঐশ্বর্য অসীম, কারণ শাস্ত্রে পাওয়া যায় 'তিনি স্বারাজ্য লাভ করেন', 'সকল দেবতা তাঁহার পূজা করেন,' 'সমগ্র জগতে তাঁহার কামনার পূর্তি হয়।' ইহার উত্তরে ব্যাসের উক্তি 'জগদ্ব্যাপার ব্যতীত।' মুক্তাত্মাগণ জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় ব্যতীত অণিমাদি অন্যান্য শক্তি লাভ করেন। জগতের নিয়ন্তৃত্ব কেবল নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরের। কারণ সৃষ্টিসম্বন্ধে যত শাস্ত্রীয় উক্তি আছে, সবগুলিতে তাঁহারই কথা বলা হইয়াছে। কোন প্রসঙ্গে সেখানে মুক্তাত্মাদের কোন উল্লেখ নাই। সেই পরমপুরুষ একাই জগন্নিয়ন্তৃত্বে নিযুক্ত। সৃষ্টাদি

---

১ তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ॥—শ্রীমদ্ভাগবত, ১০।৩২।২

বিষয়ে যত শ্রুতি আছে, সবই তাঁহাকে লক্ষ্য করিতেছে। আর তাঁহার প্রসঙ্গে 'নিত্যসিদ্ধ' এই বিশেষণও প্রদত্ত হইয়াছে। শাস্ত্র আরও বলেন, মুক্তাত্মাদের অণিমাদি-শক্তি ঈশ্বরের উপাসনা ও অন্বেষণ হইতেই লব্ধ হয়। অতএব সেই শক্তিগুলি অসীম নয়—সেগুলির আদি আছে ও সেগুলি সীমাবদ্ধ, সুতরাং জগতের নিয়ন্তৃত্ব-বিষয়ে মুক্তাত্মাদের কোন স্থান নাই। আবার তাঁহাদের নিজ নিজ মনের অস্তিত্ববশতঃ এরূপ সম্ভব যে, পরস্পরের ইচ্ছা ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে; একজন হয়তো সৃষ্টি ইচ্ছা করিলেন, আর একজন নাশ ইচ্ছা করিলেন। এই বিরোধ এড়াইবার একমাত্র উপায়—সমুদয় ইচ্ছা এক ইচ্ছার অধীন করা। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, মুক্ত পুরুষগণের ইচ্ছা সেই 'পরম পুরুষের অধীন।'[১]

অতএব সগুণ ব্রহ্মেরই প্রতি ভক্তি প্রয়োগ সম্ভব। 'যাহারা অব্যক্ত নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক তাহাদের ক্লেশ অধিকতর।'[২] ভক্তি মানবপ্রকৃতির অনুকূলে সহজভাবে প্রবাহিত। আমরা ব্রহ্মের মানবীয় ভাব ব্যতীত অপর কোন ভাব ধারণা করিতে পারি না—ইহা সত্য কথা। কিন্তু আমাদের জ্ঞাত আর সকল বস্তুর সম্বন্ধেও কি ইহা সমভাবে সত্য নয়? পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনোবিজ্ঞানবিৎ ভগবান্ কপিল বহুযুগ পূর্বে প্রমাণসহ দেখাইয়াছেন যে, আমাদের বাহ্য বা আন্তর সর্বপ্রকার বিষয়জ্ঞান বা ধারণার মধ্যে মানবীয় চেতনা বা বুদ্ধি অন্যতম উপাদান। শরীর হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশ্বর পর্যন্ত বিচার করিলে দেখিতে পাইব, আমাদের অনুভূত সমুদয় বস্তুই বুদ্ধি ও তাহার সহিত অপর কোন বস্তুর মিশ্রণ, তা সেটি যাহাই হউক। আর যাহাকে

১ যে সগুণব্রহ্মোপাসনাৎ সহৈব মনসেশ্বরসাযুজ্যং ব্রজন্তি কিন্তেষাং নিরবগ্রহমৈশ্বর্যং ভবত্যাহোস্বিৎ সাবগ্রহমিতি সংশয়ঃ। কিন্তাবৎ প্রাপ্তম্? নিরঙ্কুশমেবৈষামৈশ্বর্যং ভবিতুমর্হতি 'আপ্নোতি স্বারাজ্যম্' 'সর্বেঽস্মৈ দেবা বলিমাবহন্তি' 'তেষাং সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি' ইত্যাদিশ্রুতিভ্য ইত্যেবং প্রাপ্তে পঠতি—জগদ্ব্যাপারবর্জমিতি। জগদুৎপত্ত্যাদি ব্যাপারং বর্জয়িত্বাঽন্যদণিমাদ্যাত্মকমৈশ্বর্যং মুক্তানাং ভবিতুমর্হতি, জগদ্ব্যাপারস্তু নিত্যসিদ্ধস্যৈবেশ্বরস্য। কুতঃ? তস্য তত্র প্রকৃতত্বাদসন্নিহিতত্বাচ্চেতরেষাম্। পর এব হীশ্বরো জগদ্ব্যাপারেঽধিকৃতঃ তমেব প্রকৃত্যোৎপত্ত্যাদ্যুপদেশান্নিত্যশব্দনিবন্ধনত্বাচ্চ। তদন্বেষণবিজিজ্ঞাসনপূর্বকমিতরেষামাদিমদৈশ্বর্যং শ্রূয়তে। তেনাসন্নিহিতাস্তে জগদ্ব্যাপারে। সমনস্কত্বাদেব চৈষামনৈকমত্যে কস্যচিৎ স্থিত্যভিপ্রায়ঃ, কস্যচিৎ সংহারাভিপ্রায় ইত্যেবং নিরোধোঽপি কদাচিৎ স্যাৎ। অথ কস্যচিৎ সঙ্কল্পমন্বন্যস্য সঙ্কল্প ইত্যবিরোধঃ সমর্থ্যেত, ততঃ পরমেশ্বরাকূততন্ত্রত্বমেবেতরেষামিতি ব্যবতিষ্ঠন্তে।—শাঙ্করভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১৭

২ গীতা, ১২।৫

আমরা সচরাচর সত্য বস্তু বলিয়া মনে করি, তাহা এই অনিবার্য মিশ্রণ। বাস্তবিকই বর্তমানে বা ভবিষ্যতে মানবমনের পক্ষে সত্যের জ্ঞান যতদূর সম্ভব, তাহা ইহার অতিরিক্ত আর কিছু নয়। অতএব ঈশ্বর মানবধর্মী বলিয়া তাঁহাকে অসত্য বলা নিছক বাজে কথা। এ যেন পাশ্চাত্য দর্শনে বিজ্ঞানবাদ (Idealism) ও বাস্তববাদের (Realism) মধ্যে তুচ্ছ বিবাদের মতো। ঐ বিবাদ আপাততঃ ভয়াবহ বোধ হইলেও বাস্তব (real)-শব্দের অর্থ লইয়া মারপেঁচের উপর স্থাপিত। 'সত্য' শব্দের দ্বারা যত প্রকার ভাব সূচিত হইয়াছে, সে-সব ভাবই 'ঈশ্বর'ভাবটির অন্তর্গত। জগতের অন্যান্য বস্তু যতদূর সত্য, ঈশ্বরও ততদূর সত্য। আর বাস্তব-শব্দটি এখানে যে অর্থে প্রযুক্ত হইল, ঐ শব্দদ্বারা তদপেক্ষা অধিক আর কিছু বুঝায় না। ইহাই হিন্দুদর্শনে ঈশ্বরসম্বন্ধীয় ধারণা।

প্রত্যক্ষানুভূতিই ধর্ম

ভক্তের পক্ষে এই-সকল শুষ্ক বিষয় জানার প্রয়োজন—কেবল নিজ ইচ্ছাশক্তিকে দৃঢ় করার জন্য। এতদ্ব্যতীত উহাদের আর কোন উপযোগিতা নাই, কারণ তিনি এমন এক পথে চলিয়াছেন, যাহা শীঘ্রই তাঁহাকে যুক্তির অস্পষ্ট ও চিত্তচঞ্চলকারী রাজ্যের সীমা ছাড়াইয়া প্রত্যক্ষানুভূতির রাজ্যে লইয়া যাইবে; তিনি শীঘ্রই ঈশ্বরকৃপায় এমন এক অবস্থায় উপনীত হন, যেখানে পাণ্ডিত্যাভিমানিগণের শুষ্ক যুক্তি অনেক পশ্চাতে পড়িয়া থাকে, আর বুদ্ধির সাহায্যে অন্ধকারে বৃথান্বেষণের পরিবর্তে প্রত্যক্ষানুভূতির উজ্জ্বল দিবালোক প্রকাশিত হয়। তিনি তখন বিচার বা বিশ্বাস কিছুই করেন না, তিনি প্রত্যক্ষ অনুভব করেন। তিনি আর তর্ক করেন না, উপলব্ধি করেন। আর এই ভগবান্‌কে দেখা, তাঁহাকে উপলব্ধি করা ও তাঁহাকে সম্ভোগ করা কি তর্কবিচার হইতে উচ্চতর নয়? শুধু ইহাই নয়, অনেক ভক্ত আছেন, যাঁহারা ভক্তিকে মুক্তি হইতেও বড় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আর ইহা কি আমাদের জীবনের সর্বোচ্চ প্রয়োজনও নয়? এমন লোক জগতে আছেন, তাঁহাদের সংখ্যাও অনেক, যাঁহারা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যাহা কিছু মানুষকে শারীরিক সুখ দিতে পারে—তাহারই বাস্তবিক প্রয়োজন ও উপকারিতা আছে; ধর্ম, ঈশ্বর, পরকাল, আত্মা এবং এইরূপ অন্যান্য বিষয়গুলি কোন কাজের নয়, কারণ এগুলি দ্বারা টাকাকড়ি বা দৈহিক সুখ পাওয়া যায় না। এরূপ লোকের মতে যে-সকল পদার্থে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ না হয়, সেগুলির কোন প্রয়োজন নাই। যাহার যে বিষয়ে যেমন অভাববোধ, তাহার প্রয়োজনবোধও সেই বিষয়ে তদনুরূপ। সুতরাং যাহারা পান, ভোজন, অপত্য-উৎপাদন ও তারপর মৃত্যু—ইহার উপর আর উঠিতে পারে না, তাহাদের পক্ষে লাভবোধ কেবল ইন্দ্রিয়ের সুখে। তাহাদের হৃদয়ে উচ্চতর বিষয়ের জন্য সামান্য ব্যাকুলতা জন্মিতেও অনেক জন্ম লাগিবে। কিন্তু যাঁহাদের নিকট আত্মার উন্নতিসাধন ঐহিক জীবনের ক্ষণিক সুখাপেক্ষা গুরুতর বোধ হয়, যাঁহাদের চক্ষে ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি কেবল অবোধ শিশুর ক্রীড়ার মতো মনে হয়, তাঁহাদের নিকট ভগবান্ ও ভগবৎ-প্রেমই

মানবজীবনের সর্বোচ্চ ও একমাত্র প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হয়। ঈশ্বরেচ্ছায় এই ঘোর ভোগলিপ্সাপূর্ণ জগতে এইরূপ মানুষ এখনও কয়েকজন জীবিত আছেন।

পূর্বেই বলিয়াছি, ভক্তি পরা ও গৌণী—এই দুই ভাগে বিভক্ত; 'গৌণী' অর্থাৎ সাধনভক্তি, 'পরাভক্তি' উহারই পূর্ণ বা চরম অবস্থা। ক্রমশঃ বুঝিতে পারিব, এই ভক্তিমার্গে অগ্রসর হইতে হইলে সাধনাবস্থায় কতকগুলি বাহ্য সহায় না লইলে চলে না। বাস্তবিক সকল ধর্মের পৌরাণিক ও রূপক ভাগই প্রথমাবস্থায় উন্নতিকামী আত্মাকে ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে সাহায্য করে। আর ইহাও একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়—যাহাদের ধর্মপ্রণালী পৌরাণিকভাববহুল ও অনুষ্ঠানপ্রচুর, সেই-সকল সম্প্রদায়েই বড় বড় ধর্মবীর জন্মিয়াছিলেন। যে-সকল শুষ্ক গোঁড়ামিপূর্ণ ধর্মপ্রণালী—যাহা কিছু কবিত্বময়, যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মহান্, যাহা কিছু ভগবৎপথে স্খলিতচরণে অগ্রসর সুকুমার মনের দৃঢ় অবলম্বন-স্বরূপ, সেই ভাবগুলিকে একেবারে উৎপাটন করিয়া ফেলিতে চায়; যে-সকল ধর্মপ্রণালী আধ্যাত্মিক হর্ম্যের ছাদের অবলম্বন স্তম্ভগুলিকে পর্যন্ত ভাঙিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে এবং সত্যসম্বন্ধে অজ্ঞান ও ভ্রমপূর্ণ ধারণা লইয়া যাহা কিছু জীবনপ্রদ, যাহা কিছু মানবহৃদয়ে ক্রমবর্ধমান আধ্যাত্মিক জীবনরূপ চারাগাছটির গঠনোপযোগী উপাদান—সেগুলি পর্যন্ত দূর করিয়া দিতে চায়, দেখিতে পাওয়া যায়, সেই-সকল ধর্ম শীঘ্রই অন্তঃসারশূন্য একটি আধার, অনন্ত শব্দরাশি ও তর্কাভাসের স্তূপমাত্র, হয়তো একটু সামাজিক আবর্জনা-দূরীকরণ বা তথাকথিত সংস্কার প্রিয়তার আভাসযুক্ত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

যাহাদের ধর্ম এইরূপ, তাহাদের মধ্যে অনেকেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে জড়বাদী; তাহাদের ঐহিক ও পারত্রিক জীবনের লক্ষ্য কেবল ভোগ; উহাই তাহাদের মতে মানবজীবনের সর্বস্ব। মানুষের ঐহিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অভিপ্রেত রাস্তা ঘাট পরিষ্কার রাখা প্রভৃতি কার্যই[১] ইহাদের মতে মানব-জীবনের সর্বস্ব। এই অজ্ঞান ও গোঁড়ামির অদ্ভুত মিশ্রণের অনুগামিগণ যত শীঘ্র তাহাদের স্বরূপ প্রকটিত করিয়া বাহির হয় এবং নাস্তিক

১ ইষ্টাপূর্ত

জড়বাদীদের দলে যোগ দেয়—ইহাই তাহাদের করা উচিত—ততই সংসারের মঙ্গল। একবিন্দু ধর্মানুষ্ঠান ও অপরোক্ষানুভূতি রাশি রাশি বাক্‌প্রপঞ্চ ও মূর্খ-সুলভ ভাবোচ্ছ্বাস অপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। অজ্ঞান ও গোঁড়ামির এই শুষ্ক ধূলিময় ক্ষেত্রে একজন—মাত্র একজন অমিততেজা ধর্মবীর জন্মিয়াছেন, দেখাও তো! না পারো, চুপ করিয়া থাকো, হৃদয়ের দরজা-জানালা খুলিয়া দাও, সত্যের বিমল আলোক প্রবেশ করুক, তত্ত্বদর্শী সেই ভারতীয় সাধুগণের পদতলে বালকের ন্যায় বসিয়া শোন, তাঁহারা কি বলিতেছেন।

গুরুর প্রয়োজনীয়তা

জীবাত্মামাত্রেই পূর্ণতা লাভ করিবেই করিবে—শেষ পর্যন্ত সকলেই সিদ্ধাবস্থা লাভ করিবে। আমরা এখন যাহা হইয়াছি, তাহা আমাদের অতীত কার্য ও চিন্তারাশির ফলস্বরূপ। আর ভবিষ্যতে যাহা হইব, তাহা বর্তমানে যেরূপ চিন্তা ও কার্য করিতেছি, তাহার ফলস্বরূপ হইবে। কিন্তু আমরা নিজেরাই নিজেদের অদৃষ্ট গঠন করিতেছি বলিয়া যে বাহির হইতে আমাদের কোন সহায়তার আবশ্যক নাই, তাহা নয়। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরূপ সহায়তা একান্তভাবে প্রয়োজন। যখন এই সহায়তা পাওয়া যায়, তখন আত্মার উচ্চতর শক্তি ও আপাত-অব্যক্ত ভাবগুলি ফুটিয়া উঠে, আধ্যাত্মিক জীবন সতেজ হইয়া উঠে, উহার উন্নতি ত্বরান্বিত হয়, সাধক অবশেষে শুদ্ধস্বভাব ও সিদ্ধ হইয়া যায়।

এই সঞ্জীবনী শক্তি গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায় না। একটি আত্মা কেবল অপর এক আত্মা হইতে এই শক্তি লাভ করিতে পারে, আর কিছু হইতেই নয়। আমরা সারাজীবন পুস্তক পাঠ করিতে পারি, খুব একজন বুদ্ধিমান্ হইয়া উঠিতে পারি, কিন্তু শেষে দেখিব—আধ্যাত্মিক উন্নতি কিছুই হয় নাই। বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি হইলেই যে সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক উন্নতিও খুব হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। গ্রন্থপাঠ করিতে করিতে অনেক সময় ভ্রমবশতঃ ভাবি, আমাদের আধ্যাত্মিক উপকার হইতেছে। কিন্তু গ্রন্থপাঠে আমাদের কি ফল হইয়াছে, তাহা যদি ধীরভাবে বিশ্লেষণ করি, তবে দেখিব বড় জোর আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি হইয়াছে, অন্তরাত্মার কিছুই হয় নাই। আমাদের মধ্যে প্রায় সকলেরই আধ্যাত্মিক বাক্যবিন্যাসে অদ্ভুত নৈপুণ্য থাকিলেও কার্যকালে—প্রকৃত ধর্মভাবে জীবন-যাপন করিবার সময়—কেন এত ভয়াবহ ত্রুটিবিচ্যুতি লক্ষিত হয়, তাহার কারণ—আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতির পক্ষে গ্রন্থরাশি পর্যাপ্ত নয়। জীবাত্মার শক্তি জাগ্রত করিতে হইলে অপর এক আত্মা হইতে শক্তি সঞ্চারিত হওয়া আবশ্যক।

যে ব্যক্তির আত্মা হইতে অপর আত্মায় শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাঁহাকে 'গুরু' বলে; এবং যে ব্যক্তির আত্মায় শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাঁহাকে 'শিষ্য'

বলে। এইরূপ শক্তিসঞ্চার করিতে হইলে প্রথমতঃ যিনি সঞ্চার করিবেন, তাঁহার এই সঞ্চার করিবার শক্তি থাকা আবশ্যক; আর যাঁহাতে সঞ্চারিত হইবে, তাঁহারও গ্রহণ করিবার শক্তি থাকা আবশ্যক। বীজ সতেজ হওয়া আবশ্যক, ভূমিও ভালভাবে কর্ষিত থাকা প্রয়োজন। যেখানে এই দুইটি বিদ্যমান, সেইখানেই প্রকৃত ধর্মের অপূর্ব বিকাশ দৃষ্ট হয়। 'ধর্মের প্রকৃত বক্তা অবশ্যই আশ্চর্য পুরুষ হইবেন, শ্রোতারও সুনিপুণ হওয়া চাই।'[১] যখন উভয়েই আশ্চর্য ও অসাধারণ হয়, তখনই আশ্চর্য আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটে, অন্যত্র নয়। এইরূপ ব্যক্তিই প্রকৃত গুরু, এবং এইরূপ ব্যক্তিই প্রকৃত শিষ্য—মুমুক্ষু সাধক। আর সকলে ধর্ম লইয়া ছেলেখেলা করিতেছে মাত্র। তাহাদের কেবল একটু কৌতূহল, একটু জানিবার ইচ্ছামাত্র হইয়াছে, কিন্তু তাহারা এখনও ধর্মচক্রবালের বহির্দেশে রহিয়াছে। অবশ্য ইহারও কিছু মূল্য আছে, কারণ সময়ে ইহা হইতেই প্রকৃত ধর্ম-পিপাসা জাগিতে পারে। আর প্রকৃতির এই বিচিত্র নিয়ম যে, যখনই ক্ষেত্র উপযুক্ত হয়. তখনই বীজ নিশ্চয়ই আসিবে—আসিয়াও থাকে। যখনই আত্মার ধর্মলাভের আগ্রহ প্রবল হয়, তখনই ধর্মশক্তিসঞ্চারক পুরুষ সেই আত্মার সহায়তার জন্য অবশ্যই আসিবেন, আসিয়াও থাকেন। যখন গ্রহীতার ধর্মালোক আকর্ষণ করিবার শক্তি পূর্ণ ও প্রবল হয়, তখন সেই আকর্ষণে আকৃষ্ট আলোকশক্তি অবশ্যই আসিয়া থাকে।

তবে পথে কতকগুলি মহাবিঘ্ন আছে, যথা—ক্ষণস্থায়ী ভাবোচ্ছ্বাসকে প্রকৃত ধর্ম-পিপাসা বলিয়া ভ্রম হইবার সম্ভাবনা। আমরা নিজেদের জীবনেই ইহা লক্ষ্য করিতে পারি। আমাদের জীবনে অনেক সময়ে এরূপ দেখা যায়ঃ হয়তো কাহাকেও খুব ভালবাসিতাম, তাহার মৃত্যু হইল, আঘাত পাইলাম। মনে হইল, যাহা ধরিতেছি তাহাই হাত ফসকাইয়া চলিয়া যাইতেছে, আমাদের প্রয়োজন একটি দৃঢ়তর উচ্চতর আশ্রয়—আমাদিগকে অবশ্যই ধার্মিক হইতে হইবে। কয়েক দিনেই ঐ ভাবতরঙ্গ কোথায় চলিয়া গেল! আমরা যেখানে ছিলাম সেখানেই পড়িয়া রহিলাম। আমরা সকলেই এইরূপ ভাবোচ্ছ্বাসকে প্রকৃত ধর্ম-পিপাসা বলিয়া অনেক সময়েই ভুল করিতেছি।

১ 'আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা' ইত্যাদি।—কঠ উপ., ১।৩।৭

কিন্তু যতদিন এই ক্ষণস্থায়ী ভাবোচ্ছ্বাসগুলিকে ভ্রমবশে প্রকৃত ধর্ম-পিপাসা মনে করিব, ততদিন ধর্মের জন্য যথার্থ স্থায়ী ব্যাকুলতা জন্মিবে না, আর ততদিন শক্তিসঞ্চারকারী পুরুষেরও সাক্ষাৎ পাইব না। এই কারণে যখনই আমাদের মনে হয়, সত্যলাভের জন্য আমাদের এসকল চেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে, তখনই ঐরূপ মনে করা অপেক্ষা নিজেদের অন্তরের অন্তস্তলে অন্বেষণ করিয়া দেখা উচিত, হৃদয়ে প্রকৃত আগ্রহ জন্মিয়াছে কি না। এইরূপ করিলে অধিকাংশ স্থলেই দেখিব, আমরা সত্যগ্রহণের উপযুক্ত নই—আমাদের প্রকৃত ধর্ম-পিপাসা জাগে নাই।

আবার শক্তিসঞ্চারক গুরুসম্বন্ধে আরও অনেক বিঘ্ন আছে। অনেকে আছে, যাহারা স্বয়ং অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়াও অহঙ্কারে নিজেদের সর্বজ্ঞ মনে করে, শুধু তাই নয়, অপরকেও নিজ স্কন্ধে লইয়া যাইবে বলিয়া ঘোষণা করে। এইরূপে অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে যাইতে উভয়েই খানায় পড়িয়া যায়। 'অজ্ঞানে আচ্ছন্ন, অতি নির্বুদ্ধি হইলেও নিজেদের মহাপণ্ডিত মনে করিয়া মূঢ় ব্যক্তিগণ অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধের ন্যায় প্রতিপদবিক্ষেপেই স্খলিতপদ হইয়া পরিভ্রমণ করে।'[১]

এইরূপ মানুষেই জগৎ পরিপূর্ণ। সকলেই গুরু হইতে চায়। ভিখারীও লক্ষ টাকা দান করিতে চায়। এইরূপ লোক যেমন সকলের নিকট হাস্যাস্পদ হয়, এই গুরুগণও তেমনি।

১ অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিষন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥—মুণ্ডক উপ., ১।২।৮

গুরু ও শিষ্যের লক্ষণ

তবে গুরু চিনিব কিরূপে? সূর্যকে প্রকাশ করিতে মশালের প্রয়োজন হয় না। সূর্যকে দেখিবার জন্য আর বাতি জ্বালিতে হয় না। সূর্য উঠিলে আমরা স্বভাবতই জানিতে পারি যে সূর্য উঠিয়াছে; এইরূপে আমাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য লোক-গুরুর আবির্ভাব হইলে আত্মা স্বভাবতই জানিতে পারেন যে, তাঁহার উপর সত্যের সূর্যালোক-সম্পাত আরম্ভ হইয়াছে। সত্য স্বতঃপ্রমাণ, উহা প্রমাণ করিতে অপর কোন সাক্ষ্যের প্রয়োজন নাই—উহা স্বপ্রকাশ; সত্য আমাদের অন্তস্তলে প্রবেশ করে, উহার সমক্ষে সমগ্র জগৎ দাঁড়াইয়া বলে—'ইহাই সত্য।' যে-সকল আচার্যের হৃদয়ে জ্ঞান ও সত্য সূর্যালোকের ন্যায় প্রতিভাত, তাঁহারা জগতের মধ্যে সর্বোচ্চ মহাপুরুষ, আর জগতের অধিকাংশ লোকই তাঁহাদিগকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করে। কিন্তু আমরা অপেক্ষাকৃত স্বল্পজ্ঞানীর নিকটও আধ্যাত্মিক সাহায্য লাভ করিতে পারি। তবে আমাদের এরূপ অন্তর্দৃষ্টি নাই যে, আমরা আমাদের গুরু বা আচার্যের সম্বন্ধে যথার্থ বিচার করিতে পারি; এই কারণে গুরুশিষ্য উভয়ের সম্বন্ধেই কতকগুলি পরীক্ষা আবশ্যক।

শিষ্যের এই গুণগুলি আবশ্যক—পবিত্রতা, প্রকৃত জ্ঞানপিপাসা ও অধ্যবসায়। অশুদ্ধাত্মা পুরুষ কখনও প্রকৃত ধার্মিক হইতে পারে না। কায়মনোবাক্যে পবিত্র না হইলে কেহ কখন ধার্মিক হইতে পারে না। আর জ্ঞানতৃষ্ণা সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, আমরা যাহা চাই, তাহাই পাই—ইহা একটি সনাতন নিয়ম। যে বস্তু আমরা অন্তরের সহিত চাই, তাহা ছাড়া আমরা অন্য বস্তু লাভ করিতে পারি না। ধর্মের জন্য প্রকৃত ব্যাকুলতা বড় কঠিন জিনিস; আমরা সচরাচর যত সহজ মনে করি, উহা তত সহজ নয়। শুধু ধর্মকথা শুনিলে ও ধর্মপুস্তক পড়িলেই যথেষ্টভাবে প্রমাণিত হয় না যে, হৃদয়ে ধর্ম-পিপাসা প্রবল হইয়াছে। যতদিন না প্রাণে ব্যাকুলতা জাগরিত হয় এবং আমরা প্রবৃত্তির উপর জয়লাভ করিতে না পারি, ততদিন সদাসর্বদা অভ্যাস ও আমাদের পাশব প্রকৃতির সহিত নিরন্তর সংগ্রাম আবশ্যক। উহা দু-এক দিনের কর্ম নয়, কয়েক বৎসর বা

দু-এক জন্মেরও কর্ম নয়; শত শত জন্ম ধরিয়া এই সংগ্রাম চলিতে পারে। কাহারও পক্ষে অল্পকালের মধ্যেই সিদ্ধিলাভ ঘটিতে পারে, কিন্তু যদি অনন্তকালও অপেক্ষা করিতে হয়, ধৈর্যের সহিত তাহার জন্যও প্রস্তুত থাকা চাই। যে শিষ্য এইরূপ অধ্যবসায়-সহকারে সাধনে প্রবৃত্ত হয়, তাহার সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী।

গুরু সম্বন্ধে এইটুকু দেখিতে হইবে, তিনি যেন শাস্ত্রের মর্মজ্ঞ হন। জগতের সকলেই বেদ বাইবেল বা কোরান পাঠ করিতেছে, কিন্তু এগুলি শুধু শব্দ ও ব্যাকরণ—ধর্মের কয়েকখানা শুষ্ক অস্থিমাত্র। যে গুরু শব্দ লইয়া বেশী নাড়াচাড়া করেন ও মনকে কেবল শব্দের ব্যাখ্যা দ্বারা চালিত হইতে দেন, তিনি ভাব হারাইয়া ফেলেন। শাস্ত্রের মর্ম যিনি জানেন, তিনিই যথার্থ ধর্মাচার্য। শাস্ত্রের শব্দজাল যেন এক মহারণ্য, মানুষ নিজেকে উহার ভিতর হারাইয়া ফেলে, পথ খুঁজিয়া পায় না। 'শব্দজাল মহারণ্যসদৃশ, চিত্তের ভ্রমণের কারণ।'[1] 'শব্দযোজনা, সুন্দর ভাষায় বক্তৃতা ও শাস্ত্রমর্ম ব্যাখ্যা করিবার বিভিন্ন উপায়—পণ্ডিতদিগের বিচার ও আমোদের বিষয়মাত্র, উহা দ্বারা সিদ্ধি বা মুক্তিলাভের সহায়তা হয় না।'[2] যাহারা ধর্মব্যাখ্যার সময় এইরূপ প্রণালী অবলম্বন করে, তাহারা কেবল নিজেদের পাণ্ডিত্য দেখাইতে ইচ্ছুক, তাহাদের ইচ্ছা—লোকে তাহাদিগকে মহাপণ্ডিত বলিয়া সম্মান করুক। জগতের প্রধান ধর্মাচার্যগণ কেহই এইভাবে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে অগ্রসর হন নাই। তাঁহারা শাস্ত্রের শ্লোকের অর্থ যথেচ্ছ ব্যাখ্যা করিতে কখন চেষ্টা করেন নাই, শব্দার্থ ও ধাত্বর্থ লইয়া ক্রমাগত মারপেঁচ করেন নাই। তাঁহারা শুধু জগৎকে শাস্ত্রের মহান্ ভাব শিক্ষা দিয়াছেন। আর যাহাদের শিখাইবার কিছু নাই, তাহারা হয়তো শাস্ত্র হইতে একটি শব্দ লইয়া তাহারই উপর এক তিনখণ্ড পুস্তক রচনা করে। সেই শব্দের আদি কি, কে ঐ শব্দটি প্রথম ব্যবহার করিয়াছিল, সে কি খাইত, কতক্ষণ ঘুমাইত, এইরূপ বিষয় লইয়াই কেহ হয়তো আলোচনা করিয়া গেলেন।

---

১ শব্দজালং মহারণ্যং চিত্তভ্রমণকারণম্।—বিবেকচূড়ামণি, ৬০

২ বাগ্বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলম্।
বৈদুষ্যং বিদুষাং তদ্বদ্ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে।—ঐ, ৫৮

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ একটি গল্প বলিতেনঃ এক আম-বাগানে কয়েকজন লোক বেড়াইতে গিয়াছিল; বাগানে ঢুকিয়া তাহারা গনিতে আরম্ভ করিল, কটা আম গাছ, কোন্ গাছে কত আম, এক-একটা ডালে কত পাতা, আমের বর্ণ, আকার, প্রকার ইত্যাদি নানাবিধ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিচার করিতে লাগিল। আর একজন ছিল বিচক্ষণ, সে এসব গ্রাহ্য না করিয়া আম পাড়িতে লাগিল ও খাইতে লাগিল। বলো দেখি, কে বেশী বুদ্ধিমান্? আম খাও, পেট ভরিবে, কেবল পাতা গনিয়া—হিসাব করিয়া লাভ কি? এই পাতা-ডালপালা গোনা ও অপরকে উহার সংখ্যা জানাইবার চেষ্টা একেবারে ছাড়িয়া দাও। অবশ্য এরূপ কার্যের উপযোগিতা আছে, কিন্তু ধর্মরাজ্যে নয়। যাহারা এইরূপ পাতা গনিয়া বেড়ায়, তাহাদের ভিতর হইতে কখনও একটিও ধর্মবীর বাহির করিতে পারিবে না। ধর্ম—যাহা মানবজীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য, মানুষের শ্রেষ্ঠ গৌরবের জিনিস, তাহাতে পাতা-গোনারূপ অত পরিশ্রমের প্রয়োজন নাই। যদি তুমি ভক্ত হইতে চাও, তাহা হইলে কৃষ্ণ মথুরায় কি ব্রজে জন্মিয়াছিলেন, তিনি কি করিয়াছিলেন বা ঠিক কোন্ দিনে গীতা বলিয়াছিলেন, তাহা জানিবার কিছু আবশ্যক নাই। গীতায় যে কর্তব্য ও প্রেমসম্বন্ধীয় সুন্দর শিক্ষা আছে, আগ্রহের সহিত তাহা অনুসরণ করাই তোমার কাজ। উহার সম্বন্ধে অথবা উহার প্রণেতার সম্বন্ধে অন্যান্য বিশেষ বিবরণ জানা কেবল পণ্ডিতদের আমোদের জন্য। তাহারা যাহা চায়, তাহা লইয়াই থাকুক। তাহাদের পণ্ডিতী তর্কবিচারে 'শান্তিঃ শান্তিঃ' বলিয়া এস আমরা আম খাইতে থাকি।

দ্বিতীয়তঃ গুরুর নিষ্পাপ হওয়া আবশ্যক। অনেক সময়ে লোকে বলিয়া থাকে, 'গুরুর চরিত্র, গুরু কি করেন না করেন, দেখিবার প্রয়োজন কি? তিনি যা বলেন, তাহারই বিচার করিতে হইবে। সেইটি লইয়াই কাজ করা প্রয়োজন।' এ কথা ঠিক নয়। গতি-বিজ্ঞান, রসায়ন বা অন্য কোন জড়-বিজ্ঞানের শিক্ষক যাহাই হউন না কেন, কিছু আসে যায় না। কারণ উহাতে কেবল বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োজন হয়। কিন্তু অধ্যাত্মবিজ্ঞানের আচার্য অশুদ্ধচিত্ত হইলে তাঁহাতে আদৌ ধর্মালোক থাকিতে পারে না। অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি কী ধর্ম শিখাইবে? নিজে আধ্যাত্মিক সত্য উপলব্ধি করিবার বা অপরে শক্তি সঞ্চার করিবার একমাত্র উপায়—হৃদয় ও মনের পবিত্রতা।

যতদিন না চিত্তশুদ্ধি হয়, ততদিন ভগবদ্দর্শন বা সেই অতীন্দ্রিয় সত্তার আভাসজ্ঞানও অসম্ভব। সুতরাং ধর্মাচার্যের সম্বন্ধে প্রথম তিনি কি চরিত্রের লোক, তাহা দেখা আবশ্যক; তারপর তিনি কি বলেন, তাহাও দেখিতে হইবে। তাঁহার সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধচিত্ত হওয়া আবশ্যক, তবেই তাঁহার কথার প্রকৃত একটা গুরুত্ব থাকে; কারণ তাহা হইলেই তিনি প্রকৃত শক্তি-সঞ্চারকের যোগ্য হইতে পারেন। নিজের মধ্যেই যদি সেই শক্তি না থাকে, তবে তিনি সঞ্চার করিবেন কী? গুরুর মন এরূপ প্রবল আধ্যাত্মিকস্পন্দন-বিশিষ্ট হওয়া চাই যে, তাহা যেন সমবেদনাবশে শিষ্যে সঞ্চারিত হইয়া যায়। গুরুর বাস্তবিক কার্যই এই—কিছু সঞ্চার করা, কেবল শিষ্যের বুদ্ধিশক্তি বা অন্য কোন শক্তি উত্তেজিত করিয়া দেওয়া নয়। বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, গুরু হইতে শিষ্যে যথার্থই একটি শক্তি আসিতেছে। সুতরাং গুরুর শুদ্ধচিত্ত হওয়া আবশ্যক।

তৃতীয়তঃ দেখা আবশ্যক, গুরুর উদ্দেশ্য কি? গুরু যেন অর্থ, নাম-যশ বা কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধর্মশিক্ষাদানে প্রবৃত্ত না হন—সমগ্র মানবজাতির প্রতি শুদ্ধ প্রেমই যেন তাঁহার কার্যের নিয়ামক হয়। আধ্যাত্মিক শক্তি শুদ্ধ প্রেমের মাধ্যমেই সঞ্চারিত করা যাইতে পারে। কোনরূপ স্বার্থপূর্ণ ভাব, লাভ বা যশের ইচ্ছা এক মুহূর্তে এই সঞ্চারের মাধ্যম নষ্ট করিয়া ফেলে। ভগবান্ প্রেমস্বরূপ, আর যিনি ভগবান্‌কে প্রেমস্বরূপ বলিয়া জানিয়াছেন; তিনিই মানুষকে ভগবদ্ভাব শিক্ষা দিতে পারেন।

যদি দেখ গুরুতে এই-সব লক্ষণ বর্তমান, তবে জানিবে তোমার কোন আশঙ্কা নাই। নতুবা তাঁহার নিকট শিক্ষায় বিপদ আছে; যেহেতু তিনি যদি হৃদয়ে সদ্ভাব সঞ্চার করিতে না পারেন, তিনি হয়তো অসদ্ভাব সঞ্চার করিবেন। এই বিপদ হইতে নিজেকে সর্বতোভাবে সাবধান রাখিতে হইবে। 'যিনি বিদ্বান্ নিষ্পাপ ও কামগন্ধহীন, যিনি শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিৎ,'[১] তিনিই প্রকৃত সদ্গুরু।

যাহা বলা হইল, তাহা হইতে ইহা সহজেই প্রতীত হইবে যে, ধর্মে অনুরাগী হইবার, ধর্মের মর্মবোধ করিবার এবং উহা জীবনে পরিণত করিবার উপযোগী শিক্ষা যে কোন ব্যক্তির নিকট হইতে পাওয়া যায় না। 'পর্বতমালায়

১ শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতো যো ব্রহ্মবিত্তমঃ।—বিবেকচূড়ামণি,

ধর্মোপদেশ-শ্রবণ, কলনাদিনী নদীতে গ্রন্থপাঠ ও সর্বত্র শুভ দর্শন'[১] আলঙ্কারিক বর্ণনাহিসাবে সত্য বটে, কিন্তু যাহার নিজের মধ্যে সত্য বিকশিত হয় নাই, সে কখনও এগুলি হইতে এতটুকু জ্ঞানও আহরণ করিতে পারে না। পর্বত, নদী প্রভৃতি কাহাকে শিক্ষা দিতে পারে?—যাহার পবিত্র হৃদয়ে ভক্তি-কমল ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেই মানবাত্মাকে। আর যে আলোকে এই কমল সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠে, তাহা ব্রহ্মবিৎ সদ্‌গুরুরই জ্ঞানালোক। যখন এইভাবে হৃদয় উন্মুক্ত হয়, তখন সেই হৃদয়—পর্বত, নদী, তারা, সূর্য, চন্দ্র অথবা এই বিশ্বে যাহা কিছু আছে, তাহা হইতেই শিক্ষা লাভ করিতে পারে। কিন্তু যাহার হৃদয় এখনও উন্মুক্ত হয় নাই, সে এ-সকলে পর্বতাদি ব্যতীত আর কিছু দেখিতে পাইবে না। চিত্র-শালায় গিয়া অন্ধের কিছুই লাভ নাই। আগে তাহাকে চক্ষু দাও, তবেই সে সেখানকার বস্তুসমূহ হইতে কি শিক্ষা পাওয়া যায়, বুঝিতে পারিবে।

গুরুই ধর্মশিক্ষার্থীর চক্ষু খুলিয়া দেন। সুতরাং কোন ব্যক্তির সহিত তাহার বংশধরের যে সম্বন্ধ, গুরুর সহিত শিষ্যেরও ঠিক সেই সম্বন্ধ। গুরুর প্রতি বিশ্বাস, বিনয়নম্র আচরণ, তাঁহার নিকট শরণগ্রহণ ও তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ব্যতিরেকে আমাদের হৃদয়ে ধর্মের বিকাশ হইতেই পারে না। আর ইহাও বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, যে-সব দেশে গুরুশিষ্যের এরূপ সম্বন্ধ আছে, কেবল সেই সব দেশেই অসাধারণ ধর্মবীরসকল জন্মিয়াছেন; আর যে-সব দেশে গুরুশিষ্যের এ সম্বন্ধ রক্ষা করা হয় নাই, সে-সব দেশে ধর্মের শিক্ষক কেবল বক্তামাত্র। নিজের প্রাপ্যের দিকেই তাঁহার দৃষ্টি, আর শিষ্য কেবল গুরুর কথাগুলিতেই মাথা পরিপূর্ণ করেন এবং অবশেষে উভয়েই নিজ নিজ পথ দেখেন,—একে আর অপরের চিন্তা করেন না, এরূপ ক্ষেত্রে ধর্ম প্রায় অজ্ঞাতই থাকিয়া যায়; আধ্যাত্মিক শক্তিসঞ্চার করিবার কেহ নাই, গ্রহণ করিবারও কেহ নাই। এই-সব লোকের কাছে ধর্ম যেন ব্যবসায় হইয়া দাঁড়ায়। তাহারা মনে করে, অর্থ দ্বারা ধর্ম ক্রয় করা যায়। ঈশ্বরেচ্ছায় ধর্ম যদি এত সুলভ হইত! তাহাদের দুর্ভাগ্য এই যে, এরূপ হইবার নয়।

---

১ And this our life exempt from public haunt,
Finds tongues in trees, books in the running brooks,
Sermons in stones and good in every thing.
—Shakespeare's '*As you Like It,*' Act II, Sc. i

ধর্ম—সর্বোচ্চ জ্ঞানস্বরূপ যে ধর্ম, তাহা ধন-বিনিময়ে কিনিবার জিনিস নয়, গ্রন্থ হইতেও তাহা পাওয়া যায় না। জগতের সর্বত্র ঘুরিয়া আসিতে পারো, হিমালয় আল্পস্ ককেসস্ প্রভৃতি অন্বেষণ করিতে পারো, সমুদ্রের তলদেশ আলোড়ন করিতে পারো, তিব্বতের চারিকোণে অথবা গোবি-মরুর চতুর্দিকে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে পারো, কিন্তু যতদিন না তোমার হৃদয় ধর্ম গ্রহণ করিবার উপযুক্ত হইতেছে এবং যতদিন না তুমি গুরুলাভ করিতেছ, কোথাও ধর্ম খুঁজিয়া পাইবে না। বিধাতৃনির্দিষ্ট এই গুরু যখনই লাভ করিবে, অমনি বালকবৎ বিশ্বাস ও সরলতা লইয়া তাঁহার সেবা কর, তাঁহার নিকট প্রাণ খুলিয়া দাও, তাঁহাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বররূপে দেখ। যাহারা এইরূপ প্রেম ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া সত্যানুসন্ধান করে, তাহাদের নিকট সত্যের ভগবান্ সত্য শিব ও সুন্দরের অতি আশ্চর্য তত্ত্বসমূহ প্রকাশ করেন।

অবতার

যেখানে লোকে তাঁহার নামকীর্তন করে, সেই স্থান পবিত্র; আর যে-ব্যক্তি তাঁহার নাম করেন, তিনি আরও কত পবিত্র! আর যাঁহার নিকট আধ্যাত্মিক আলোক প্রাপ্ত হই, তাঁহার নিকট কতই না ভক্তির সহিত অগ্রসর হওয়া উচিত! ঐরূপ শ্রেষ্ঠ ধর্মাচার্যের সংখ্যা খুব বিরল বটে, কিন্তু জগৎ একেবারে এই-সকল আচার্য-বিরহিত হয় না। যে মুহূর্তে পৃথিবী একেবারে আচার্যশূন্য হয়, সেই মুহূর্তেই উহা এক ভয়ানক নরককুণ্ডে পরিণত হয় ও বিনাশের দিকে ধাবিত হয়। আচার্যগণই মানবজাতির সুন্দরতম প্রকাশস্বরূপ এবং 'অহেতুকদয়াসিন্ধু'।[১]

শ্রীকৃষ্ণ ভাগবতে বলিয়াছেন, 'আমাকে আচার্য বলিয়া জানিও।'[২] অর্থাৎ সাধারণ গুরুশ্রেণী অপেক্ষা উন্নততর আর এক শ্রেণীর গুরু আছেন—ঈশ্বরের অবতারগণ। ইঁহারা স্পর্শ দ্বারা, এমন কি, কেবল মাত্র ইচ্ছা দ্বারাই অপরের ভিতর ভগবদ্ভাব সঞ্চার করিয়া দিতে পারেন। তাঁহাদের ইচ্ছায় অতি দুশ্চরিত্র ব্যক্তিও মুহূর্তের মধ্যে সাধু হইয়া যায়। ইঁহারা সকল গুরুর গুরু, মানুষের ভিতর ভগবানের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি; আমরা তাঁহাদের ভিতর দিয়া ব্যতীত অন্য উপায়ে ভগবান্‌কে দেখিতে পারি না। মানুষ তাঁহাদিগকে উপাসনা না করিয়া থাকিতে পারে না; আর বাস্তবিক এই আচার্যগণকে উপাসনা করিতে আমরা বাধ্য।

এই-সকল নররূপধারী ঈশ্বর ব্যতীত ভগবান্‌কে দেখিবার আমাদের আর অন্য কোন উপায় নাই। আমরা যদি আর কোনরূপে তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করি, তবে আমরা একটা কিম্ভূতকিমাকার বস্তু গঠন করি এবং উহাকেই প্রকৃত ঈশ্বর বলিয়া মনে করি। গল্প আছে—এক আনাড়ীকে শিব গড়িতে বলা হয়; অনেক দিন চেষ্টা করিয়া সে একটি বানর গড়িয়াছিল। সেইরূপ ভগবান্‌কে নির্গুণ পূর্ণস্বরূপে যখনই আমরা ভাবিতে যাই, তখনই আমরা শোচনীয়ভাবে বিফল হই; কারণ যতদিন আমরা মানুষ, ততদিন তাঁহাকে

---

১ বিবেকচূড়ামণি, ৩৫

২ আচার্যং মাং বিজানীয়াৎ···।—শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।১৭।২৬

মানুষভাবে ছাড়া অন্যভাবে কখনই ভাবিতে পারিব না। অবশ্য এমন সময় আসিবে, যখন আমরা মনুষ্যপ্রকৃতি অতিক্রম করিয়া তাঁহার স্বরূপবোধে সমর্থ হইব, কিন্তু যতদিন সীমাবদ্ধ মানুষ থাকিব, ততদিন মানুষের ভিতর ও মানুষরূপেই তাঁহাকে উপাসনা করিতে হইবে। যাই বল না কেন, যতই চেষ্টা কর না কেন, ভগবান্‌কে মানব-ভাবে ছাড়া আর কোন ভাবেই চিন্তা করিতে পার না। ঈশ্বরসম্বন্ধে বা জগতের অন্যান্য বস্তু সম্বন্ধে খুব যুক্তিতর্ক-সমন্বিত বক্তৃতা দিতে পারো, খুব যুক্তিবাদী হইতে পারো, আর ভগবানের এই-সকল মনুষ্য-অবতারের কথা সব ভ্রমাত্মক—এ-কথা নিজের সন্তোষজনক-ভাবে প্রমাণ করিতে পারো, কিন্তু সহজ বুদ্ধিতে কি বলে তাহা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক্‌। দেখি, এই প্রকার অসাধারণ বুদ্ধিবৃত্তির পশ্চাতে কি আছে? কিছুই নাই—শূন্য, কেবল কতকগুলি বাক্যাড়ম্বর মাত্র। তারপর যখন দেখিবে, কোন লোক এইরূপ অবতারপূজার বিরুদ্ধে মহাযুক্তিতর্কের সহিত বক্তৃতা করিতেছে, তাহাকে ধরিয়া জিজ্ঞাসা কর:—ঈশ্বর সম্বন্ধে তোমার নিজের ধারণা কি? 'সর্বশক্তিমত্তা', 'সর্বব্যাপিতা' ও এইরূপ শব্দগুলি দ্বারা কি বোঝ? দেখিবে, ঐগুলির বানান ব্যতীত সে আর অধিক কিছু বোঝে না। এ-সকল শব্দের দ্বারা তাহার মনে কোন অর্থেরই বোধ হয় না, এমন কোন ভাব দ্বারা সে ঐগুলি ব্যক্ত করিতে পারে না, যাহা তাহার মানবীয় প্রকৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয় নাই। এই বিষয়ে রাস্তার যে লোকটা একখানা পুঁথিও পড়ে নাই, তাহার সহিত এ ব্যক্তির কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। তবে সে লোকটা শান্তপ্রকৃতি, জগতের শান্তিভঙ্গ করে না, আর এই বক্তা সমাজে অশান্তি ও দুঃখ সৃষ্টি করে। বাস্তবিক প্রত্যক্ষানুভূতিতেই ধর্ম, সুতরাং শূন্যগর্ভ বক্তৃতা ও প্রত্যক্ষানুভূতির মধ্যে আমাদের বিশেষ প্রভেদ করা আবশ্যক। আত্মার গভীরতম প্রদেশে আমরা যাহা অনুভব করি, তাহাকেই প্রত্যক্ষানুভূতি বলে। এই বিষয়ে সহজ জ্ঞান যত দুর্লভ, আর কিছুই তত দুর্লভ নয়।

আমাদের বর্তমান প্রকৃতি যেরূপ, তাহাতে আমরা সীমাবদ্ধ, ভগবান্‌কে আমরা মনুষ্যরূপে দেখিতে বাধ্য। মনে কর, মহিষদের ভগবান্‌কে পূজা করিবার ইচ্ছা হইল—তাহাদের স্বভাব অনুযায়ী তাহারা ভগবান্‌কে একটি বৃহৎ মহিষরূপে দেখিবে। মৎস্য যদি ভগবানের আরাধনা করিতে ইচ্ছা করে,

তবে তাহাকে ভাবিতে হইবে, ভগবান্ একটি বৃহৎ মৎস্য। মানুষকেও ভাবিতে হইবে, ভগবান্ মানুষ, আর ঐ-সকল সীমাবদ্ধ বিভিন্ন ধারণা বিকৃত কল্পনাসম্ভূত নয়। মানুষ, মহিষ, মৎস্য—এগুলি যেন ভিন্ন ভিন্ন পাত্রস্বরূপ, সবগুলি ভগবৎ-সমুদ্রে নিজ নিজ ধারণ-শক্তি ও আকৃতি অনুসারে পূর্ণ হইয়াছে। মানুষে ঐ জল মানুষের আকার ধারণ করিল, মহিষে মহিষের আকার ও মৎস্যে মৎস্যাকার ধারণ করিল। প্রত্যেক পাত্রে সেই এক ঈশ্বর-সমুদ্রের জল রহিয়াছে। নিজ মনের প্রকৃতি ও শক্তি অনুযায়ী যদি কেহ ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন ধারণা করে, আমরা তাহাকে দোষ দিতে পারি না। সুতরাং ঈশ্বরকে মানুষরূপেই উপাসনা করা ছাড়া আমাদের আর অন্য কোন পথ নাই।

দুই প্রকার লোক ভগবান্‌কে মানুষরূপে উপাসনা করে না। প্রথম—নরপশুগণ, যাহাদের কোনরূপ ধর্মজ্ঞান নাই; দ্বিতীয়—পরমহংসগণ, যাঁহারা মনুষ্যসুলভ সমুদয় দুর্বলতা অতিক্রম করিয়া মানবপ্রকৃতির সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছেন। সমুদয় প্রকৃতিই তাঁহাদের আত্মস্বরূপ হইয়া গিয়াছে। তাঁহারাই কেবল ভগবান্‌কে তাঁহার স্বরূপে উপাসনা করিতে পারেন। অন্য সব বিষয়ে যেমন, এখানেও তেমনি দুইটি চরম বিপরীত ভাব একরূপ দেখায়। অতিশয় অজ্ঞানী ও পরম জ্ঞানী—এ দুয়ের কেহই উপাসনা করে না; নরপশুগণ অজ্ঞান বলিয়া উপাসনা করে না, জীবন্মুক্ত পুরুষগণ সর্বদা আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে অনুভব করিতেছেন বলিয়া তাঁহাদের আর স্বতন্ত্র উপাসনা প্রয়োজন হয় না। যে-ব্যক্তি এই দুই চূড়ান্তভাবের মধ্যবর্তী, অথচ বলে, আমি ভগবান্‌কে মনুষ্যরূপে উপাসনা করিতে ইচ্ছা করি না, সেই ব্যক্তিকে বিশেষ যত্নের সহিত তত্ত্বাবধান করা আবশ্যক। কঠোরতর ভাষা প্রয়োগ না করিয়াও বলিতে হয়, সে প্রলাপ বকিতেছে, সে ভুল করিয়াছে; তাহার ধর্ম বিকৃতমস্তিষ্ক ও বুদ্ধিহীন ব্যক্তিগণেরই উপযুক্ত।

ভগবান্ মানুষের দুর্বলতা বুঝেন, এবং মানুষের হিতের জন্যই মানুষরূপে অবতীর্ণ হন।[১] 'যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি নিজেকে সৃজন করি। সাধুদের রক্ষা, পাপিগণের দুষ্কৃতিনাশ ও ধর্মসংস্থাপনের

১ স্যাৎ পরমেশ্বরস্য অপি ইচ্ছাবশাম্মায়াময়ং রূপং সাধকানুগ্রহার্থম্।

—শাঙ্করভাষ্য, বেদান্তসূত্র, ১।১।২০।

জন্য আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি।'[১] 'জগতের ঈশ্বর আমি,—আমার প্রকৃত স্বরূপ না জানিয়া অজ্ঞ ব্যক্তিরা মনুষ্যরূপধারী আমাকে উপহাস করে।'[২]

অবতার সম্বন্ধে গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা ঘোষণা করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, 'যখন প্রবল বন্যা আসে, তখন সব ছোট ছোট নদী ও খানা কানায় কানায় ভরিয়া যায়; সেইরূপ যখন অবতার আসেন, তখন আধ্যাত্মিক তরঙ্গ জগৎকে ভাসাইয়া লইয়া যায়, সাধারণ মানুষও তখন হাওয়াতেই ধর্মভাব অনুভব করে।'

১ যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥—গীতা, ৪।৭-৮

২ অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥—গীতা, ৯।১১

আমরা কিন্তু এখানে মহাপুরুষ বা অবতারগণের কথা বলিতেছি না; এখন আমরা সিদ্ধ গুরুদিগের বিষয় আলোচনা করিব। তাঁহাদিগকে সচরাচর মন্ত্র দ্বারা শিষ্যগণের ভিতর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বীজ বপন করিতে হয়। এই মন্ত্রগুলি কি? ভারতীয় দর্শনের মতে সমুদয় জগৎ নামরূপাত্মক। এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডরূপ মনুষ্য-চিত্তে এমন একটি তরঙ্গ থাকিতে পারে না, যাহা নামরূপাত্মক নয়। যদি ইহা সত্য হয় যে, প্রকৃতি সর্বত্র এক নিয়মে গঠিত, তাহা হইলে এই নামরূপাত্মকতা বিরাট ব্রহ্মাণ্ডেরও নিয়ম বলিতে হইবে। 'যেমন একটি মৃৎপিণ্ডকে জানিলে আর সমস্ত মৃত্তিকাকেই জানিতে পারা যায়,'[1] তেমনি এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বা দেহ-পিণ্ডকে জানিতে পারিলে বিরাট ব্রহ্মাণ্ডকেও জানিতে পারা যায়। রূপ বস্তুর বাহিরের আবরণ বা ত্বক্, আর নাম বা ভাব যেন উহার অন্তর্নিহিত শস্য। ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে শরীরই রূপ, আর মন বা অন্তঃকরণই নাম, এবং বাক্‌শক্তিযুক্ত প্রাণিসমূহে এই নামের সহিত উহাদের বাচকশব্দগুলি নিত্যযুক্তভাবে বর্তমান। অন্যভাষায় বলিতে গেলে ব্যক্তি-মানুষের ভিতরেই 'ব্যষ্টিমহৎ' বা চিত্তে এই চিন্তাতরঙ্গগুলি উত্থিত হইয়া প্রথমে শব্দ বা ভাবরূপে, পরে বাক্যে ও কর্মে তদপেক্ষা স্থূলতর আকার ধারণ করে।

বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডেও ব্রহ্মা, হিরণ্যগর্ভ বা 'সমষ্টিমহৎ' প্রথমে নিজেকে নামে, পরে রূপাকারে অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান জগদ্রূপে অভিব্যক্ত করেন। এই ব্যক্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎই 'রূপ'; ইহার পশ্চাতে অনন্ত অব্যক্ত 'স্ফোট' রহিয়াছে। স্ফোট বলিতে সমুদয় জগতের অভিব্যক্তির কারণ 'শব্দব্রহ্ম'। সমুদয় নাম বা ভাবের উপাদান-স্বরূপ নিত্য স্ফোটই সেই শক্তি, যাহা দ্বারা ভগবান্ এই জগৎ সৃষ্টি করেন; শুধু তাই নয়, ভগবান্ প্রথমে নিজেকে স্ফোটরূপে পরিণত করিয়া পরে অপেক্ষাকৃত স্থূল এই পরিদৃশ্যমান জগদ্রূপে বিকশিত করেন। এই স্ফোটের একটিমাত্র বাচক শব্দ আছে—'ওঁ'। আর কোনরূপ

[1] 'যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ' ইত্যাদি।—ছান্দোগ্য উপ., ৬।১।৪

বিশ্লেষণ-বলেই যখন আমরা ভাব হইতে শব্দকে পৃথক্ করিতে পারি না, তখন এই ওঙ্কার ও নিত্য-স্ফোট অবিভাজ্যরূপে বর্তমান। এজন্য শ্রুতি বলেন, সমুদয় নামরূপের উৎস—ওঙ্কাররূপ এই পবিত্রতম শব্দ হইতে এই স্থূল জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। তবে যদি বলো যে, শব্দ ও ভাব নিত্যসম্বদ্ধ বটে, কিন্তু একটি ভাবের বাচক বিবিধ শব্দ থাকিতে পারে, সুতরাং সমুদয় জগতের অভিব্যক্তির কারণস্বরূপ ভাবের বাচক যে এই একটি বিশেষ শব্দ ওঙ্কার, তাহা মনে করিবার কোন প্রয়োজন নাই। এই আপত্তির উত্তরে আমরা বলি, ওঙ্কারই এইরূপ সর্বভাব-প্রকাশক বাচক শব্দ, আর কোন শব্দ ইহার তুল্য নয়। স্ফোটই সমুদয় ভাবের উপাদান, ইহা কোন একটি বিশেষ ভাব নয়; অর্থাৎ বিভিন্ন ভাবগুলির মধ্যে পরস্পর যে বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা যদি দূর করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে এই স্ফোটই অবশিষ্ট থাকিবে। প্রত্যেকটি বাচক শব্দ এক একটি ভাব প্রকাশ করে, অতএব উহা স্ফোটের প্রতীক হইতে পারে না। কারণ স্ফোট সর্বভাবের সমষ্টি। আর কোন বাচক শব্দ দ্বারা অব্যক্ত স্ফোটকে প্রকাশ করিতে হইলে উহা তাহাকে এতদূর বিশিষ্ট করিয়া ফেলে যে, তাহাতে আর সমষ্টিভাব থাকে না, উহা একটি বিশেষ ভাবে পরিণত হয়। অতএব স্ফোটকে বুঝাইতে হইলে এমন একটি শব্দ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, যাহা দ্বারা স্ফোট খুব অল্প পরিমাণে বিশেষভাবাপন্ন হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে উহার বিশ্বব্যাপী প্রকৃতি যথাসম্ভব ভাবে প্রকাশ করে, তাহাই উহার সর্বাপেক্ষা প্রকৃত বাচক।

শ্রুতি বলেন ওঙ্কার, কেবলমাত্র ওঙ্কারই এইরূপ শব্দপ্রতীক। কারণ অ, উ, ম—এই তিনটি অক্ষর একত্রে 'অউম' এইরূপে উচ্চারিত হইলে উহাই সর্বপ্রকার শব্দের সাধারণ বাচক হইতে পারে। সমুদয় শব্দের মধ্যে 'অ' সর্বাপেক্ষা কম বিশেষভাবাপন্ন। এই কারণেই শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন, 'অক্ষরের মধ্যে আমি অকার।'[১] আর সমুদয় স্পষ্টোচ্চারিত শব্দই মুখগহ্বরের মধ্যে জিহ্বামূল হইতে আরম্ভ করিয়া ওষ্ঠ পর্যন্ত স্পর্শ করিয়া উচ্চারিত হয়। 'অ' কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত, 'ম' শেষ ওষ্ঠ্য বর্ণ। আর 'উ' জিহ্বামূল হইতে যে শক্তি আরম্ভ হইয়া ওষ্ঠে শেষ হয়, সেই শক্তিটি যেন

১ অক্ষরাণামকারোঽস্মি।—গীতা, ১০।৩৩

গড়াইয়া যাইতেছে—এই ভাব প্রকাশ করে। প্রকৃতরূপে উচ্চারিত হইলে এই ওঙ্কার সমুদয় শব্দোচ্চারণ ব্যাপারটির সূচক; আর কোন শব্দেরই সেই শক্তি নাই; সুতরাং এই শব্দটিই স্ফোটের যোগ্যতম বাচক, আর এই স্ফোটই ওঙ্কারের প্রকৃত বাচ্য। এবং বাচ্য হইতে বাচক পৃথক্ করা যাইতে পারে না, সুতরাং এই 'ওঁ' এবং 'স্ফোট' এক ও অভিন্ন। এই জন্য স্ফোটকে বলা হয় 'নাদব্রহ্ম', আর যেহেতু এই স্ফোট ব্যক্ত জগতের সূক্ষ্মতর দিক বলিয়া ঈশ্বরের নিকটতর এবং ঈশ্বরীয় জ্ঞানের প্রথম প্রকাশ, সেই হেতু ওঙ্কারই ঈশ্বরের প্রকৃত বাচক। আর সেই একমাত্র 'অখণ্ড সচ্চিদানন্দ' ব্রহ্মকে যেমন অপূর্ণ জীবাত্মাগণ বিশেষ বিশেষ ভাবে ও বিশেষ বিশেষ গুণযুক্তরূপে চিন্তা করিতে পারে, সেইরূপ তাঁহার দেহরূপ এই জগৎকেও সাধকের মনোভাব-অনুযায়ী ভিন্নরূপে চিন্তা করিতে হইবে।

উপাসকের মনে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণের যখন যেটি প্রবল থাকে, তখন তাহার মনে ঈশ্বর সম্বন্ধে তদনুযায়ী ভাবই উদিত হয়। ইহার ফল এই, একই ব্রহ্ম ভিন্ন ভিন্ন রূপে ভিন্ন ভিন্ন গুণপ্রাধান্যে দৃষ্ট হইবেন, আর সেই এক জগৎই ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হইবে। সর্বাপেক্ষা অল্প বিশেষভাবাপন্ন সার্বভৌম বাচক ওঙ্কারে যেমন বাচ্য ও বাচক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, তদ্রূপ এই বাচ্য-বাচকের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ ভগবানের ও জগতের বিশেষ বিশেষ খণ্ডভাব সম্বন্ধেও খাটিবে। আর ইহার সবগুলিরই বিশেষ বিশেষ বাচক শব্দ থাকা আবশ্যক। মহাপুরুষদের গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতি হইতে উত্থিত এই বাচক শব্দসমূহ যথাসম্ভব ভগবান্ ও জগতের এই বিশেষ বিশেষ খণ্ড-ভাব প্রকাশ করে। ওঙ্কার যেমন অখণ্ড ব্রহ্মবাচক, অন্যান্য মন্ত্রগুলিও সেইরূপ সেই পরমপুরুষের খণ্ড-ভাবগুলির বাচক। ঐ সবগুলিই ঈশ্বরধ্যানের ও প্রকৃত জ্ঞানলাভের সহায়।

প্রতীক ও প্রতিমা-উপাসনা

এইবার প্রতীকোপাসনা ও প্রতিমাপূজার বিষয় আলোচনা করিব। প্রতীক অর্থে যে-সকল বস্তু ব্রহ্মের পরিবর্তে উপাসনার যোগ্য। প্রতীকে ভগবদুপাসনার অর্থ কি? ভগবান্ রামানুজ বলিয়াছেন: 'ব্রহ্ম নয়, এমন বস্তুতে ব্রহ্মবুদ্ধি করিয়া ব্রহ্মের অনুসন্ধানকে প্রতীকোপাসনা বলে।'[১] শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন: 'মনকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিবে, ইহা আধ্যাত্মিক, আকাশ ব্রহ্ম ইহা আধিদৈবিক। মন আধ্যাত্মিক ও আকাশ বাহ্য প্রতীক—এই উভয়কেই ব্রহ্মস্বরূপে উপাসনা করিতে হইবে। এইরূপ আদিত্যই ব্রহ্ম, ইহাই আদেশ…যিনি নামকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন ইত্যাদি স্থলে প্রতীকোপাসনা সম্বন্ধে সংশয় হয়।'[২] প্রতীক শব্দের অর্থ—বাহিরের দিকে যাওয়া, আর প্রতীকোপাসনা-অর্থে ব্রহ্মের পরিবর্তে এমন এক বস্তুর উপাসনা, যাহা একাংশে অথবা অনেকাংশে ব্রহ্মের খুব সন্নিহিত, কিন্তু ব্রহ্ম নয়। শ্রুতিতে বর্ণিত প্রতীকের ন্যায় পুরাণ তন্ত্রেও অনেক প্রতীকের বর্ণনা আছে। সমুদয় পিতৃ-উপাসনা ও দেবোপাসনা এই প্রতীকোপাসনার অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে।

এখন কথা এই, ঈশ্বরকে—কেবল ঈশ্বরকে উপাসনা করার নামই ভক্তি। দেব, পিতৃ অথবা অন্য কোন উপাসনা ভক্তি-শব্দবাচ্য হইতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত; উহা উপাসককে কেবল কোন প্রকার স্বর্গভোগরূপ বিশেষ ফল প্রদান করে, কিন্তু উহাতে ভক্তির উদয় হয় না—উহা মুক্তিও দিতে পারে না। সুতরাং একটি কথা বিশেষরূপে মনে রাখা আবশ্যক। দার্শনিক দৃষ্টিতে পরব্রহ্ম হইতে জগৎ-কারণের উচ্চতম ধারণা আর হইতে পারে না; প্রতীকোপাসক কিন্তু অনেক স্থলে এই প্রতীককে ব্রহ্মের আসনে বসাইয়া উহাকে আপন অন্তরাত্মা বা

১ অব্রহ্মণি ব্রহ্মদৃষ্ট্যাঽনুসন্ধানম্।—রামানুজভাষ্য, ব্রহ্মসূত্রে, ৪।১।৫

২ মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীতেত্যধ্যাত্মম্। অথাধিদৈবতমাকাশো ব্রহ্মেতি। তথা আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশঃ। স যো নামব্রহ্মেত্যুপাস্তে ইত্যেবমাদিষু প্রতীকোপাসনেষু সংশয়ঃ।—শাঙ্করভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।৪। সংশয়ের উত্তর পরবর্তী সূত্রের ভাষ্যে প্রদত্ত হইয়াছে।

অন্তর্যামিরূপে চিন্তা করেন, এরূপ স্থলে সেই উপাসক সম্পূর্ণ বিপথে চালিত হন, কারণ প্রকৃত প্রস্তাবে কোন প্রতীকই উপাসকের আত্মা হইতে পারে না। কিন্তু যেখানে ব্রহ্মই উপাস্য, আর প্রতীক কেবল উহার প্রতিনিধিস্বরূপ অথবা উহার উদ্দীপক কারণমাত্র, অর্থাৎ যেখানে প্রতীকের সহায়তায় সর্বব্যাপী ব্রহ্মের উপাসনা করা হয়, প্রতীককে প্রতীকমাত্র না দেখিয়া জগৎকারণ-রূপে চিন্তা করা হয়, সেখানে এইরূপ উপাসনা বিশেষ উপকারী। শুধু তাই নয়, প্রবর্তকদিগের পক্ষে উহা একেবারে অনিবার্যরূপে প্রয়োজনীয়। সুতরাং যখন কোন দেবতা অথবা অন্য প্রাণীকে ঐ দেবতা অথবা প্রাণিরূপেই উপাসনা করা হয়, তখন এরূপ উপাসনাকে একটি আনুষ্ঠানিক কর্মমাত্র বলা যাইতে পারে। আর উহা একটি 'বিদ্যা' বলিয়া উপাসক ঐ বিশেষ বিদ্যার ফল লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু যখন কোন দেবতা অথবা অন্য কেহ ব্রহ্মরূপে দৃষ্ট ও উপাসিত হন, তখন উহা সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বরের উপাসনার সহিত তুল্যফল হইয়া পড়ে। ইহা হইতেই বুঝা যায়, অনেক স্থলে শ্রুতি, স্মৃতি—সর্বত্রই কোন দেবতা, মহাপুরুষ বা অন্য কোন অলৌকিক পুরুষের ব্যক্তিগত প্রকৃতি ভুলিয়া গিয়া তাঁহাদিগকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করা হয় কেন। ব্যাখ্যাস্বরূপে অদ্বৈতবাদী বলেন, 'নামরূপ বাদ দিলে সকল বস্তুই কি ব্রহ্ম নয়?' বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বলেন, 'সেই প্রভুই কি সকলের অন্তরাত্মা নন?' শঙ্কর তাঁহার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে বলিয়াছেন, 'আদিত্যাদির উপাসনার ফল ব্রহ্মই দেন, কারণ তিনিই সকলের অধ্যক্ষ। যেমন প্রতিমাদিতে বিষ্ণু-আদি দৃষ্টি আরোপ করিতে হয়, তেমনি প্রতীকেও ব্রহ্মদৃষ্টি আরোপ করিতে হয়, সুতরাং এখানে প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মেরই উপাসনা করা হইতেছে বুঝিতে হইবে।'[১]

প্রতীক সম্বন্ধে যে-সকল কথা বলা হইল, প্রতিমা সম্বন্ধেও সেই-সকল কথা খাটিবে, অর্থাৎ যদি প্রতিমা কোন দেবতা বা সাধুসন্তের সূচক হয়, তাহা হইলে সেইরূপ উপাসনাকে ভক্তি বলা যাইবে না, সুতরাং উহা হইতে মুক্তিলাভ হইবে না। কিন্তু উহা সেই এক ঈশ্বরের সূচক হইলে উহার উপাসনায় ভক্তি ও মুক্তি—উভয়ই লাভ হয়। জগতের প্রধান প্রধান

---

১ ফলন্তু···আদিত্যাদ্যুপাসনেঽপি ব্রহ্মৈব দাস্যতি সর্বাধ্যক্ষত্বাৎ। ···ঈদৃশং চাত্র ব্রহ্মণ উপাস্যত্বং যৎ প্রতীকেষু তদ্‌দৃষ্ট্যধ্যারোপণং প্রতিমাদিষু ইব বিষ্ণ্বাদীনাম্।—শাঙ্করভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র ৪।১।৫

ধর্মগুলির মধ্যে বেদান্ত, বৌদ্ধধর্ম ও খৃষ্টধর্মের কোন কোন সম্প্রদায় সাধকদের সহায়তার জন্য অবাধে পূর্বোক্ত ভাবে প্রতিমার সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন; কেবল মুসলমান ও প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্ম এই সহায়তা অস্বীকার করেন। তাহা হইলেও মুসলমানেরা তাঁহাদের সাধুসন্ত ও শহীদগণের কবর অনেকটা প্রতীক বা প্রতিমারূপেই ব্যবহার করিয়া থাকেন। প্রোটেস্ট্যাণ্টরা ধর্মে বাহ্য সহায়তার আবশ্যকতা উড়াইয়া দিতে গিয়া ক্রমশঃ আধ্যাত্মিক ভাব হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছেন, আর আজকাল খাঁটি প্রোটেস্ট্যাণ্টের সহিত কেবল নীতিমাত্রবাদী, অগস্ট কম্‌তের চেলা ও অজ্ঞেয়বাদীদের কোন প্রভেদ নাই। আবার খৃষ্ট বা ইসলাম ধর্মে প্রতিমাপূজার যেটুকু অবশিষ্ট আছে, সেটুকুতে কেবল প্রতীক বা প্রতিমাই উপাসিত হয়, 'ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ' অর্থাৎ ব্রহ্মদৃষ্টিসৌকর্যার্থে নয়। স্থতরাং উহা বড় জোর কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত মাত্র। অতএব উহা হইতে মুক্তি বা ভক্তিলাভ হইতে পারে না। এইপ্রকার প্রতিমা-পূজাতে সাধক সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বর ভিন্ন অন্য বস্তুতে আত্মসমর্পণ করে, স্থতরাং মূর্তি বা কবর, মন্দির বা স্মৃতিস্তম্ভের এইরূপ ব্যবহারই প্রকৃত পুতুলপূজা। কিন্তু তাহা হইলেও উহা কোন পাপকর্ম বা অন্যায় নয়, উহা একটি অনুষ্ঠান—একটি কর্মমাত্র; উপাসকেরা অবশ্যই উহার ফল পাইয়া থাকেন।

ইষ্টনিষ্ঠা

এইবার ইষ্টনিষ্ঠা সম্বন্ধে আমাদিগকে আলোচনা করিতে হইবে। যে ভক্ত হইতে চায়, তাহার জানা উচিত, 'যত মত তত পথ'—তাহার জানা উচিত, বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় সেই একই ভগবানের মহিমার বিভিন্ন বিকাশমাত্র।

'হে ভগবান্, লোকে তোমাকে কত বিভিন্ন নামে ডাকিয়া থাকে—লোকে তোমাকে বিভিন্ন নামে যেন ভাগ করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু ঐ প্রত্যেক নামেই যেন তোমার পূর্ণশক্তি বর্তমান। যে উপাসক যে ভাবে উপাসনা করিতে ভালবাসে, তাহার নিকট তুমি সেই নামের ভিতর দিয়াই প্রকাশিত হও। তোমার প্রতি আত্মার ঐকান্তিক অনুরাগ থাকিলে তোমাকে ডাকিবারও কোন নির্দিষ্ট কাল নাই। তোমার নিকট এত সহজে যাওয়া যায়, কিন্তু আমার দুর্দৈব—তোমার প্রতি অনুরাগ জন্মিল না।'[১]

শুধু তাই নয়, ভক্ত যেন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা জ্যোতির তনয়গণকে ঘৃণা না করেন; এমন কি তাঁহাদের সমালোচনা-বিষয়েও যেন বিশেষ সতর্ক থাকেন; তাঁহাদের নিন্দা শোনাও তাঁহার উচিত নয়। অবশ্য এমন লোক অতি অল্পই আছেন, যাঁহারা উদার, সহানুভূতিসম্পন্ন, অপরের গুণগ্রহণে সমর্থ আবার গভীর ভগবৎ-প্রেমসম্পন্ন। সচরাচর দেখা যায়, উদারভাবাপন্ন সম্প্রদায়গুলি আধ্যাত্মিক গভীরতা হারাইয়া ফেলে। ধর্ম তাহাদের নিকট একপ্রকার রাজনীতিক-সামাজিক-ভাবাপন্ন সমিতির কার্যে পরিণত হয়। আবার খুব সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিগণের নিজ আদর্শের প্রতি খুব ভালবাসা আছে বটে, কিন্তু তাহাদের এই ভালবাসার প্রতিটি বিন্দু অপর সকল সম্প্রদায়ের—যেগুলির মতের সহিত তাহাদের এতটুকুও পার্থক্য আছে—সেগুলির উপর ঘৃণা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। ঈশ্বরেচ্ছায় জগৎ যদি পরম উদার অথচ গভীরপ্রেমসম্পন্ন জনগণে পূর্ণ হইয়া যাইত, বড় ভাল হইত! কিন্তু

১ নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥—শিক্ষাষ্টকম্, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

এরূপ মহাত্মার সংখ্যা অতি বিরল। তথাপি আমরা জানি, জগতের অনেককে এই আদর্শে শিক্ষিত করা সম্ভব ; আর ইহার উপায় এই 'ইষ্টনিষ্ঠা'।

প্রত্যেক ধর্মের প্রতিটি সম্প্রদায় মানুষকে শুধু নিজের আদর্শটি দেখাইয়া দেয়, কিন্তু সনাতন বৈদান্তিক ধর্ম ভগবানের সেই মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার অনন্ত দ্বার খুলিয়া দেন, এবং মানবের সমক্ষে একরূপ অগণিত আদর্শরাশি স্থাপন করেন। সেই আদর্শগুলির প্রত্যেকটিই সেই অনন্তস্বরূপের এক-একটি বিকাশমাত্র। অতীত ও বর্তমানের মহামহিমময় ঈশ্বরতনয় বা ঈশ্বরের অবতারগণ মনুষ্যজীবনের বাস্তব ঘটনাবলীর কঠিন পর্বত কাটিয়া যে-সকল বিভিন্ন পথ বাহির করিয়াছেন, পরমকরুণাপরবশ হইয়া বেদান্ত উহা মুমুক্ষু নরনারীগণকেও দেখাইয়া দেন, আর বাহু প্রসারিত করিয়া সকলকে—এমন কি ভবিষ্যৎ মানবকেও সেই সত্য ও আনন্দের ধামে আহ্বান করেন, যেখানে মানবাত্মা মায়াজাল হইতে মুক্ত হইয়া পূর্ণ স্বাধীনতা ও অনন্ত আনন্দের অবস্থায় উন্নীত হয়।

ভক্তিযোগ এইরূপে ভগবৎপ্রাপ্তির বিভিন্ন পথগুলির একটিকেও ঘৃণা বা অস্বীকার করিতে নিষেধ করেন। তথাপ গাছ যত দিন ছোট থাকে, ততদিন বেড়া দিয়া রাখিতে হয়। অপরিণত অবস্থায় নানাপ্রকার ভাব ও আদর্শ সম্মুখে রাখিলে ধর্মরূপ কোমল লতিকা মরিয়া যাইবে। অনেক লোক উদার ধর্মভাবের নামে অনবরত ভাবাদর্শ পরিবর্তন করিয়া নিজেদের বৃথা কৌতূহল মাত্র চরিতার্থ করে। নূতন নূতন বিষয় শোনা তাহাদের যেন একরূপ ব্যারাম, একরূপ নেশার ঝোঁকের মতো। তাহারা খানিকটা সাময়িক স্নায়বীয় উত্তেজনা চায়, সেটি চলিয়া গেলেই তাহারা আর একটির জন্য প্রস্তুত হয়। ধর্ম তাহাদের নিকট যেন আফিমের নেশার মতো হইয়া দাঁড়ায়, আর ঐ পর্যন্তই তাহাদের দৌড়। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন : আর একপ্রকার মানুষ আছে, তাহারা মুক্তা-ঝিনুকের মতো। মুক্তা-ঝিনুক সমুদ্রতল ছাড়িয়া স্বাতীনক্ষত্রে পতিত বৃষ্টি-জলের জন্য উপরে আসে। যতদিন না ঐ জলের একটি বিন্দু পায়, ততদিন মুখ খুলিয়া উপরে ভাসিতে থাকে, তারপর গভীর সমুদ্রতলে ডুব দেয় এবং যে পর্যন্ত না বৃষ্টিবিন্দু মুক্তায় পরিণত হয়, সে পর্যন্ত সেখানে বিশ্রাম লয়।

এই উদাহরণে ইষ্টনিষ্ঠা-ভাবটি যেরূপ হৃদয়স্পর্শী কবিত্বের ভাষায় ফুটিয়া

উঠিয়াছে, আর কোথাও সেরূপ হয় নাই। ভক্তিপথে প্রবর্তকের এই একনিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজন। হনুমানের ন্যায় তাঁহার বলা উচিত, 'যদিও লক্ষ্মীপতি ও সীতাপতি পরমাত্মারূপে অভেদ, তথাপি কমললোচন রামই আমার সর্বস্ব।'[১] অথবা সাধু তুলসীদাস যেমন বলিতেন, 'সকলের সঙ্গে বসো, সকলের সঙ্গে আনন্দ কর, সকলের নাম গ্রহণ কর, যে যাহাই বলুক না কেন সকলকে হাঁ হাঁ বলো, কিন্তু নিজের ভাব দৃঢ় রাখিও'[২], তেমনি ভক্তিযোগীরও সেই আচার অবলম্বন করা উচিত। ভক্তসাধক যদি অকপট হন, তবে গুরুদত্ত ঐ বীজমন্ত্র হইতেই আধ্যাত্মিক ভাবের সুবৃহৎ বটবৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া শাখার পর শাখা ও মূলের পর মূল বিস্তার করিয়া ধর্মজীবনের সমগ্র ক্ষেত্র ছাইয়া ফেলিবে। পরিশেষে প্রকৃত ভক্ত দেখিবেন—যিনি সারা জীবন তাঁহার নিজের ইষ্টদেবতা, তিনিই বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভিন্ন নামে বিভিন্ন রূপে উপাসিত।

১ শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ॥

২ সব্‌সে বসিয়ে সব্‌সে রসিয়ে সব্‌কা লীজিয়ে নাম।
হাঁ জী হাঁ জী কর্‌তে রহিয়ে বৈঠিয়ে আপনা ঠাম॥—দোঁহা, তুলসীদাস

ভক্তির সাধন

ভক্তিলাভের উপায় ও সাধনসম্বন্ধে ভগবান্ রামানুজ তাঁহার বেদান্তভাষ্যে লিখিয়াছেন :

'বিবেক, বিমোক, অভ্যাস, ক্রিয়া, কল্যাণ, অনবসাদ ও অনুদ্ধর্ষ হইতে ভক্তিলাভ হয়।' 'বিবেক' অর্থে রামানুজের মতে খাদ্যাখাদ্যবিচার। তাঁহার মতে খাদ্যদ্রব্যের অশুদ্ধির কারণ তিনটি : (১) জাতিদোষ অর্থাৎ খাদ্যের প্রকৃতিগত দোষ, যথা—রশুন, পেঁয়াজ প্রভৃতি স্বভাবতঃ অশুচি খাদ্যের যে দোষ ; (২) আশ্রয়দোষ অর্থাৎ পতিত ও অভিশপ্ত ব্যক্তির হস্তে খাইলে যে দোষ ; (৩) নিমিত্তদোষ অর্থাৎ কোন অশুচি বস্তুর, যথা—কেশ, ধূলি আদি সংস্পর্শজনিত দোষ। শ্রুতি বলেন, 'আহার শুদ্ধ করিলে চিত্ত শুদ্ধ হয়, চিত্ত শুদ্ধ হইলে ভগবান্‌কে সর্ব্বদা স্মরণ করিতে পারা যায়।'[১] রামানুজ ছান্দোগ্য উপনিষদ্ হইতে এই বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন।

এই খাদ্যাখাদ্যবিচার ভক্তিমার্গাবলম্বিগণের মতে চিরকালই একটি গুরুতর বিষয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। অনেক ভক্তসম্প্রদায় এ-বিষয়টিকে অত্যন্ত অস্বাভাবিক করিয়া তুলিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে যে একটি গুরুতর সত্য নিহিত আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। আমাদের মনে রাখা উচিত, সাংখ্যদর্শনের মতে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি, এবং বৈষম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইলে উহারাই জগদ্রূপে পরিণত হয় ; এগুলি প্রকৃতির গুণ ও উপাদান দুই-ই ; সুতরাং ঐ সকল উপাদানেই প্রত্যেকটি মানুষের দেহ নির্মিত। উহাদের মধ্যে সত্ত্বগুণের প্রাধান্যই আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে অত্যাবশ্যক। আমরা আহারের দ্বারা শরীরের ভিতর যে উপাদান গ্রহণ করি, তাহাতে আমাদের মানসিক গঠনের অনেক সাহায্য হয়, সুতরাং আমাদিগকে খাদ্যাখাদ্যবিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এ বিষয়েও শিষ্যেরা চিরকাল যে গোঁড়ামি করিয়া থাকে, তাহা যেন আচার্যগণের উপর আরোপিত না হয়।

---

১ আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ।—ছান্দোগ্য উপনিষৎ, ৭।২৬

বাস্তবিক খাদ্যের শুদ্ধি-অশুদ্ধি-বিচার গৌণমাত্র। পূর্বোদ্ধৃত ঐ বাক্যটিই শঙ্কর তাঁহার উপনিষদ্ভাষ্যে অন্যরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঐ বাক্যস্থ 'আহার' শব্দটি যাহা সচরাচর খাদ্য অর্থে গৃহীত হইয়া থাকে, তাহা তিনি অন্য অর্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে 'যাহা আহৃত হয়, তাহাই আহার। শব্দাদি বিষয়ের জ্ঞান ভোক্তার অর্থাৎ আত্মার উপভোগের জন্য ভিতরে আহৃত হয়। এই বিষয়ানুভূতিরূপ জ্ঞানের শুদ্ধিকেই 'আহারশুদ্ধি' বলে। সুতরাং আহার-শুদ্ধি অর্থে আসক্তি- দ্বেষ- বা মোহ-শূন্য হইয়া বিষয়ের জ্ঞান আহরণ। সুতরাং এইরূপ জ্ঞান বা 'আহার' শুদ্ধ হইলে এইরূপ ব্যক্তির সত্ত্ব অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয় শুদ্ধ হইয়া যাইবে। সত্ত্বশুদ্ধি হইলে অনন্ত পুরুষের যথার্থ স্বরূপজ্ঞান ও অবিচ্ছিন্ন স্মৃতি আসিবে।'[১]

শঙ্কর ও রামানুজের ব্যাখ্যা দুইটি আপাতবিরোধী বলিয়া বোধ হইলেও উভয়টিই সত্য ও প্রয়োজনীয়। সূক্ষ্ম শরীর বা মনের সংযম স্থূল শরীরের সংযম হইতে উচ্চতর কাজ বটে, কিন্তু সূক্ষ্মের সংযম করিতে হইলে অগ্রে স্থূলের সংযম বিশেষ আবশ্যক। অতএব আহার সম্বন্ধে গুরুপরম্পরা যে-সকল নিয়ম প্রচলিত আছে, প্রবর্তকের পক্ষে সেগুলি পালন করা আবশ্যক। কিন্তু আজকাল ভারতীয় অনেক সম্প্রদায়ে এই আহারাদি বিচারের এত বাড়াবাড়ি, এত অর্থহীন নিয়মের বাঁধাবাঁধি, এত গোঁড়ামি দেখা যায় যে, মনে হয় ধর্ম যেন রান্নাঘরে আশ্রয় লইয়াছে। কখন যে ধর্মের মহান্ সত্যসমূহ সেখান হইতে বাহিরে আসিয়া আধ্যাত্মিকতার সূর্যালোকে উদ্ভাসিত হইবে, তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। এরূপ ধর্ম এক প্রকার জড়বাদ মাত্র। উহা জ্ঞান নয়, ভক্তি নয়, কর্মও নয়। উহা এক বিশেষ প্রকার পাগলামি মাত্র। যাহারা এই খাদ্যাখাদ্যের বিচারকেই জীবনের সার বলিয়া স্থির করিয়াছে, তাহাদের গতি ব্রহ্মলোকে না হইয়া সম্ভবতঃ বাতুলালয়ের দিকেই হইবে। সুতরাং ইহা যুক্তিসিদ্ধ বোধ হইতেছে যে, খাদ্যাখাদ্যের বিচার মনের স্থিরতারূপ উচ্চাবস্থা-লাভের জন্য কিছুটা আবশ্যক, অন্যথা এই স্থিরতা সহজে লাভ করা যায় না।

১ আহ্রিয়তে ইত্যাহারঃ শব্দাদিবিষয়জ্ঞানম্ ভোক্তুর্ভোগায়াহ্রিয়তে। তস্য বিষয়োপলব্ধিলক্ষণস্য বিজ্ঞানস্য শুদ্ধিরাহারশুদ্ধিঃ, রাগদ্বেষমোহদোষৈরসংস্পৃষ্টং বিষয়বিজ্ঞানমিত্যর্থঃ। তস্যামাহারশুদ্ধৌ সত্যাং তদ্বতোঽন্তঃকরণস্য সত্ত্বস্য শুদ্ধির্নৈর্মল্যং ভবতি; সত্ত্বশুদ্ধৌ চ সত্যাং যথাবগতে ভূমাত্মনি ধ্রুবাবিচ্ছিন্না স্মৃতিরবিস্মরণং ভবতি।—শাঙ্করভাষ্য, ছান্দোগ্য উপনিষৎ, ৭।২৬

তারপর 'বিমোক'। বিমোক অর্থে ইন্দ্রিয়গুলির বিষয়াভিমুখী গতি নিবারণ ও উহাদিগকে সংযত করিয়া নিজ ইচ্ছার অধীনে আনয়ন এবং ইহা সকল ধর্মসাধনেরই কেন্দ্রীয় ভাব।

তারপর 'অভ্যাস' অর্থাৎ আত্মসংযম ও আত্মত্যাগের অভ্যাস। কিন্তু সাধকের প্রাণপণ চেষ্টা ও প্রবল সংযমের অভ্যাস ব্যতীত ঈশ্বর ও আত্মবিষয়ক অনুভূতি কখনই সম্ভব নয়। মন যেন সর্বদাই সেই ঈশ্বরের চিন্তায় নিবিষ্ট থাকে। প্রথম প্রথম ইহা অতি কঠিন বোধ হয়, কিন্তু অধ্যবসায়-সহকারে চেষ্টা করিতে করিতে এরূপ চিন্তা করার শক্তি ক্রমশঃ বর্ধিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন, 'হে কৌন্তেয়, অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মন নিগৃহীত হইয়া থাকে।'[১]

তারপর 'ক্রিয়া' অর্থাৎ যজ্ঞ। পঞ্চ মহাযজ্ঞের নিয়মিতরূপ অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

'কল্যাণ' অর্থে পবিত্রতা, আর এই পবিত্রতারূপ একমাত্র ভিত্তির উপর ভক্তিপ্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত। বাহ্যশৌচ অথবা খাদ্যাখাদ্য-সম্বন্ধে বিচার—এ উভয়ই সহজ, কিন্তু অন্তঃশুদ্ধি ব্যতিরেকে উহাদের কোন মূল্য নাই। রামানুজ অন্তঃশুদ্ধিলাভের উপায়স্বরূপ নিম্নলিখিত গুণগুলির কথা বর্ণনা করিয়াছেন: সত্য, আর্জব—সরলতা, দয়া—নিঃস্বার্থ পরোপকার, দান, অহিংসা—কায়মনোবাক্যে অপরের হিংসা না করা, অনভিধ্যা—পরদ্রব্যে লোভ, বৃথা চিন্তা ও পরকৃত অনিষ্টাচরণের ক্রমাগত চিন্তা-পরিত্যাগ। এই তালিকার মধ্যে অহিংসা-গুণটির সম্বন্ধে বিশেষভাবে কিছু বলা আবশ্যক। ভক্তকে সকল প্রাণিসম্বন্ধে এই অহিংসাভাব অবলম্বন করিতেই হইবে। কেহ কেহ মনে করেন, মনুষ্যজাতির প্রতি অহিংসাভাব পোষণ করিলেই যথেষ্ট, অন্যান্য প্রাণিগণের প্রতি নির্দয় হইলে কোন ক্ষতি নাই; অহিংসা বাস্তবিক তাহা নয়। আবার কেহ কেহ যেমন কুকুর-বিড়ালকে লালন-পালন করেন বা পিপীলিকাকে চিনি খাওয়ান, কিন্তু মানুষ-ভ্রাতার গলা কাটিতে দ্বিধা বোধ করেন না, অহিংসা বলিতে তাহাও বুঝায় না। বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি মহৎ ভাবই শেষ পর্যন্ত

[১] অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে।—গীতা, ৬।৩৫

বিরক্তিকর হইয়া যাইতে পারে, ভাল রীতিনীতিও যদি অন্ধভাবে অনুষ্ঠান করা হয়, তবে শেষ পর্যন্ত সেগুলিও অকল্যাণের কারণ হইয়া দাঁড়ায় এবং দুঃখের বিষয়, অহিংসানীতিও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। কতকগুলি ধর্মসম্প্রদায়ের অপরিষ্কার সাধকেরা স্নান করে না, পাছে তাহাদের গায়ের পোকা মরিয়া যায়, কিন্তু সেজন্য তাহাদের মনুষ্য-ভ্রাতাগণকে যে যথেষ্ট অস্বস্তি ও অসুখ ভোগ করিতে হয়, সে দিকে তাহাদের মোটেই দৃষ্টি নাই। তবে এটুকু আনন্দের বিষয়, ইহারা বৈদিক ধর্মাবলম্বী নয়।

ঈর্ষা নাই দেখিলে বুঝিতে হইবে, সাধক অহিংসাভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। সাময়িক উত্তেজনায় অথবা কোনরূপ কুসংস্কার বা পুরোহিত-কুলের প্রেরণায় যে-কোন ব্যক্তি কোন সৎকর্ম করিতে পারে বা কিছু দান করিতে পারে; কিন্তু তিনিই যথার্থ মানবপ্রেমিক, যিনি কাহারও প্রতি ঈর্ষার ভাব পোষণ করেন না। সংসারে দেখা যায়, তথাকথিত বড় বড় লোকেরা সকলেই সামান্য নাম-যশ বা দু-এক টুকরা স্বর্ণখণ্ডের জন্য পরস্পরের প্রতি ঈর্ষান্বিত। যতদিন অন্তরে এই ঈর্ষাভাব থাকে, ততদিন অহিংসা বহুদূর; নিরামিষাশী হইলেও তিনি অহিংসা হইতে বহুদূর। গরু মাংস খায় না—নিরামিষভোজী, মেষও তাই; তবে কি তাহারা যোগী বা অহিংসাপরায়ণ? যে-কোন মূর্খ ইচ্ছা করিলেই মাংসাহার বর্জন করিতে পারে। শুধু এইজন্যই তাহাকে উদ্ভিদ্‌ভোজী জন্তুগণ অপেক্ষা বিশেষ উন্নত বলা যাইতে পারে না, খাদ্যবিশেষ ত্যাগ করিলেই কেহ জ্ঞানী হইয়া যায় না। যে ব্যক্তি নির্দয়ভাবে বিধবা ও অনাথ বালকবালিকাকে ঠকাইয়া অর্থ লইতে পারে, অর্থের জন্য যে-কোনরূপ অন্যায় কার্য করিতে যাহার দ্বিধা নাই, সে যদি কেবল তৃণভোজন করিয়াও জীবনধারণ করে, তথাপি সে পশুরও অধম। যাঁহার হৃদয়ে কখনও অপরের অনিষ্টচিন্তা পর্যন্ত উদিত হয় না, যিনি শুধু বন্ধুর নয়, পরম শত্রুরও সৌভাগ্যে আনন্দিত, সারা জীবন প্রতিদিন শূকরমাংস খাইলেও তিনিই প্রকৃত ভক্ত, তিনিই প্রকৃত যোগী, তিনিই সকলের গুরু। সুতরাং এইটি সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, বাহ্য রীতিনীতি কেবল অন্তঃশুদ্ধির সহায়কমাত্র; যেখানে বাহ্যবিষয়ে অত খুঁটিনাটি-বিচার করা অসম্ভব, সেখানে কেবল অন্তঃশৌচ-অবলম্বনই যথেষ্ট। সেই লোককে ধিক্, সেই জাতিকে ধিক্, যে লোক বা যে জাতি ধর্মের সার ভুলিয়া অভ্যাসবশে বাহ্য

অনুষ্ঠানগুলিকে মরণ-কামড়ে ধরিয়া থাকে, কোনমতে ছাড়িতে চায় না। যদি ঐ অনুষ্ঠানগুলি আধ্যাত্মিক জীবনের পরিচায়ক হয়, তবেই উহাদের উপযোগিতা আছে বলিতে হইবে। প্রাণশূন্য হইলে উহাদিগকে নির্দয়ভাবে উৎপাটন করিয়া ফেলা উচিত।

'অনবসাদ' বা বল ভক্তিলাভের পরবর্তী সাধন। শ্রুতি বলেন, 'বলহীন ব্যক্তি তাঁহাকে লাভ করিতে পারে না।'[১] এখানে শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার দৌর্বল্য লক্ষিত হইয়াছে। 'বলিষ্ঠ, দ্রঢ়িষ্ঠ'[২] ব্যক্তিই প্রকৃত শিষ্য হওয়ার উপযুক্ত। দুর্বল, শীর্ণকায়, জরাজীর্ণ ব্যক্তি কী সাধন করিবে? শরীর ও মনের মধ্যে যে অদ্ভুত শক্তিসমূহ লুকায়িত আছে, কোনরূপ যোগাভ্যাসের দ্বারা তাহারা কিঞ্চিৎ পরিমাণে জাগ্রত হইলেও দুর্বল ব্যক্তি একেবারে খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবে। যুবা, সুস্থকায়, সবল ব্যক্তিই সিদ্ধ হইতে পারেন। সুতরাং সিদ্ধিলাভের জন্য মানসিক বল যে পরিমাণে প্রয়োজন, শারীরিক বলও সেই পরিমাণে চাই। ইন্দ্রিয়সংযমের প্রতিক্রিয়া খুব সবল দেহই সহ্য করিতে পারে। অতএব ভক্ত হইতে যাঁহার সাধ, তাঁহাকে সবল ও সুস্থকায় হইতে হইবে। যাহারা দুর্বল, তাহারা যদি কোনরূপ যোগাভ্যাসের চেষ্টা করে, তবে হয় তাহারা কোন দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিগ্রস্ত হইবে, নতুবা মনকে ভয়ানক দুর্বল করিয়া ফেলিবে। ইচ্ছাপূর্বক শরীরকে দুর্বল করা ভক্তি- বা জ্ঞান-লাভের অনুকূল ব্যবস্থা নয়।

যাহার চিত্ত দুর্বল, সেও আত্মলাভে কৃতকার্য হয় না। যে ভক্ত হইতে ইচ্ছুক, সে সর্বদা প্রফুল্ল থাকিবে। পাশ্চাত্যে অনেকের কাছে ধার্মিকের লক্ষণ—সে কখনও হাসিবে না, তাহার মুখ সর্বদা বিষাদমেঘে আবৃত থাকিবে, তাহার চোয়াল বসা ও মুখ লম্বা হওয়া আবশ্যক। শুষ্কশরীর ও লম্বামুখ লোক ডাক্তারের তত্ত্বাবধানের যোগ্য বটে, কিন্তু তাহারা কখনও যোগী হইতে পারে না। প্রফুল্লচিত্ত ব্যক্তিই অধ্যবসায়শীল হইতে পারে। দৃঢ়চেতা ব্যক্তিই সহস্র বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে। মায়াজাল ছিন্ন করিয়া বাহিরে যাওয়া—যোগ সাধন করা মহা কঠিন কার্য, দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন বীরগণের দ্বারাই ইহা সম্ভব।

১ নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।—মুণ্ডক উপ., ৩।২।৪

২ আশিষ্ঠো দ্রঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠঃ।—তৈত্তি. উপ., ২।৮।১

প্রফুল্লতা প্রয়োজন, তাই বলিয়া অতিরিক্ত আমোদে মাতিলে চলিবে না (অনুদ্ধর্ষ)। অতিরিক্ত হাস্যকৌতুক আমাদিগকে গভীর চিন্তায় অক্ষম করিয়া ফেলে, উহাতে মানসিক শক্তিসমূহের বৃথা ক্ষয় হয়। ইচ্ছাশক্তি যত দৃঢ় হয়, নানাবিধ ভাবের বশে মন তত কম বিচলিত হয়। বিষাদপূর্ণ গম্ভীর ভাব যেমন সাধনার প্রতিকূল, অতিরিক্ত আমোদও সেইরূপ। মন যখন স্থির শান্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে, তখনই আধ্যাত্মিক অনুভূতি সম্ভব।

এই-সকল সাধন দ্বারা সাধক শিখিবে, কি ভাবে ভগবান্‌কে ভালবাসিতে হয়। এতক্ষণ যাহা বলা হইল, তাহা 'গৌণী ভক্তি'।

পরাভক্তি

ভক্তির প্রস্তুতি—ত্যাগ

গৌণী ভক্তির কথা সংক্ষেপে শেষ করিয়া আমরা পরাভক্তির আলোচনায় প্রবেশ করিতেছি। এখন এই পরাভক্তি-অভ্যাসের জন্য প্রস্তুত হইবার শেষ সাধনটির কথা বিবেচনা করা যাক্। সর্বপ্রকার সাধনের উদ্দেশ্য আত্মশুদ্ধি—নামসাধন, প্রতীক ও প্রতিমাদির উপাসনা এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান কেবল আত্ম-শুদ্ধির জন্য। কিন্তু শুদ্ধিকারক সমুদয় সাধনের মধ্যে ত্যাগই সর্বশ্রেষ্ঠ—উহা ব্যতীত কেহ এই পরাভক্তির রাজ্যে প্রবেশই করিতে পারে না। অনেকের পক্ষে এই ত্যাগ অতি ভয়াবহ ব্যাপার বোধ হইতে পারে, কিন্তু ত্যাগ ব্যতীত কোনরূপ আধ্যাত্মিক উন্নতিই সম্ভব নয়; সকল যোগেই এই ত্যাগ আবশ্যক। এই ত্যাগই ধর্মের সোপান—সমুদয় সাধনের অন্তরঙ্গ সাধন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে ত্যাগই প্রকৃত ধর্ম। যখন মানবাত্মা সংসারের সমুদয় বস্তু দূরে ফেলিয়া গভীর তত্ত্বসমূহ অনুসন্ধান করে, যখন চৈতন্যস্বরূপ মানব বুঝিতে পারে, দেহরূপ জড়ে বদ্ধ হইয়া জড় হইয়া যাইতেছি এবং ক্রমশঃ বিনাশের পথে অগ্রসর হইতেছি, তখন সে জড়পদার্থ হইতে আপনার দৃষ্টি সরাইয়া লয়, তখনই ত্যাগ আরম্ভ হয়, তখনই প্রকৃত আধ্যাত্মিক উন্নতি আরম্ভ হয়। কর্মযোগী সমুদয় কর্মফল ত্যাগ করেন, তিনি যে-সকল কর্ম করেন, তাহার ফলে তিনি আসক্ত হন না, তিনি ঐহিক বা পারত্রিক কোন লাভের জন্য আগ্রহান্বিত হন না। রাজযোগীর মতে সমুদয় প্রকৃতির লক্ষ্য—পুরুষ বা আত্মাকে বিচিত্র সুখদুঃখ ভোগ করানো। ইহার ফলে আত্মা বুঝিতে পারেন, প্রকৃতি হইতে তিনি নিত্য স্বতন্ত্র বা পৃথক্। মানবাত্মাকে জানিতে হইবে, তিনি চিরকাল চৈতন্যস্বরূপই ছিলেন, আর জড়ের সহিত তাঁহার সংযোগ কেবল সাময়িক, ক্ষণিকমাত্র। রাজযোগী প্রকৃতির সমুদয় সুখদুঃখ ভোগ করিয়া অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া বৈরাগ্যের শিক্ষা লাভ করেন। জ্ঞানযোগীর বৈরাগ্য সর্বাপেক্ষা কঠোর। কারণ তাঁহাকে প্রথম হইতেই এই বাস্তবরূপে দৃশ্যমান প্রকৃতিকে মিথ্যা মায়া বলিয়া জানিতে হয়। তাঁহাকে বুঝিতে হয়, প্রকৃতিতে যত কিছু শক্তির প্রকাশ দেখিতেছি, সবই আত্মার শক্তি, প্রকৃতির নয়। তাঁহাকে

প্রথম হইতেই জানিতে হয়, সর্বপ্রকার জ্ঞান—সর্বপ্রকার অভিজ্ঞতা আত্মাতেই অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, প্রকৃতিতে নাই। সুতরাং কেবল বিচার-জনিত ধারণার বলে তাঁহাকে একেবারে সমুদয় প্রাকৃতিক বন্ধন ছিন্ন করিতে হয়। প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সমুদয় পদার্থ ইন্দ্রজালের ন্যায় তাঁহার সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হয়, তিনি স্ব-মহিমায় বিরাজ করিতে চেষ্টা করেন।

সকল প্রকার বৈরাগ্য অপেক্ষা ভক্তিযোগীর বৈরাগ্য খুব স্বাভাবিক। ইহাতে কোন কঠোরতা নাই, জোর করিয়া কিছু ছাড়িতে হয় না। ভক্তের ত্যাগ অতি সহজ—চারিদিকের দৃশ্যের মতোই অতি স্বাভাবিক; এই ত্যাগেরই অন্ততঃ বিকৃতরূপ আমাদের চতুর্দিকে প্রতিদিন দেখিতে পাই। কোন পুরুষ কোন নারীকে ভালবাসিতে শুরু করিল; কিছুদিন বাদে সে আর একজনকে ভালবাসিল, প্রথমটিকে ছাড়িয়া দিল। ঐ প্রথম নারীটির চিন্তা ধীরে ধীরে শান্তভাবে তাহার মন হইতে চলিয়া গেল; সে আর ঐ নারীর অভাববোধ করিল না। এবার মনে কর, কোন নারী কোন পুরুষকে ভালবাসিতেছে। সে আবার যখন অপর এক পুরুষকে ভালবাসে, তখন এই প্রথম পুরুষটির কথা যেন তাহার মন হইতে সহজেই চলিয়া যায়। কোন লোক হয়তো নিজের শহরকে ভালবাসে। ক্রমশঃ সে নিজের দেশকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিল। তখন তাঁহার নিজের ক্ষুদ্র শহরের জন্য যে প্রগাঢ় ভালবাসা, তাহা স্বভাবতই চলিয়া গেল। আবার মনে কর, কোন লোক সমুদয় জগৎকে ভালবাসিতে শিখিল, তখন তাহার স্বদেশানুরাগ, নিজ দেশের জন্য প্রবল উন্মত্ত ভালবাসা চলিয়া যায়। তাহাতে তাহার কিছু কষ্ট হয় না। এ-ভাব তাড়াইবার জন্য তাহাকে কিছু জোর করিতে হয় না। অশিক্ষিত লোক ইন্দ্রিয়সুখে উন্মত্ত, শিক্ষিত হইতে থাকিলে সে বুদ্ধি-বৃত্তির চর্চায় অধিকতর সুখ পাইতে থাকে। তখন সে বিষয়ভোগে আর তত সুখ পায় না। কুকুর ও ব্যাঘ্র খাদ্য পাইলে যেরূপ স্ফূর্তির সহিত ভোজন করিতে থাকে, কোন মানুষের পক্ষে সেরূপ সম্ভব নয়। আবার মানুষ বুদ্ধিবলে নানা বিষয় জানিয়া ও নানা কার্য সম্পাদন করিয়া যে সুখ অনুভব করে, কুকুর কখনও তাহা অনুভব করিতে পারে না। প্রথমে ইন্দ্রিয় হইতে সুখানুভূতি হইয়া থাকে, কিন্তু যখনই কোন প্রাণী জীবনের উচ্চস্তরে উন্নীত হয়, তখনই এই নিম্নজাতীয় সুখের মূল্য তাহার কাছে কমিয়া যায়। মনুষ্যসমাজে

দেখা যায়, মানুষ যতই পশুর তুল্য হয়, সে ততই তীব্রভাবে ইন্দ্রিয়সুখ অনুভব করে। আর যতই তাহার শিক্ষাদির উন্নতি হয়, ততই বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা ও এরূপ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়ে তাহার সুখানুভূতি হইতে থাকে। এইরূপে মানুষ যখন বুদ্ধির বা মনোবৃত্তির অতীত ভূমিতে আরোহণ করে, যখন সে আধ্যাত্মিকতা ও দিব্যানুভূতির ভূমিতে আরোহণ করে, তখন সে এমন এক আনন্দের অবস্থা লাভ করে, যাহার তুলনায় ইন্দ্রিয়বৃত্তি- বা বুদ্ধিবৃত্তি-পরিচালন-জনিত সুখ শূন্য বলিয়া মনে হয়। এরূপ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। যখন চন্দ্র উজ্জ্বলভাবে শোভা পায়, তখন তারাগণ নিষ্প্রভ হইয়া যায়। আবার সূর্য উদিত হইলে চন্দ্রও নিষ্প্রভ ভাব ধারণ করে। ভক্তির জন্য যে বৈরাগ্যের প্রয়োজন, তাহা কোন কিছুকে নষ্ট করিয়া পাইতে হয় না। যেমন কোন ক্রমবর্ধমান আলোকের নিকট অল্পোজ্জ্বল আলোক স্বভাবতই ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হইতে হইতে শেষে একেবারে অন্তর্হিত হয়, সেইরূপ ভগবৎপ্রেমোন্মত্ততায় ইন্দ্রিয়বৃত্তি- ও বুদ্ধিবৃত্তি-জনিত সুখসমূহ স্বভাবতই নিষ্প্রভ হইয়া যায়।

এই ঈশ্বরপ্রেম ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়া এমন এক ভাব ধারণ করে, যাহাকে 'পরাভক্তি' বলে। যে সাধক ঈশ্বরের প্রতি এরূপ প্রেম লাভ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে অনুষ্ঠানের আর আবশ্যকতা থাকে না, শাস্ত্রের কোন প্রয়োজন থাকে না; প্রতিমা, মন্দির, ভজনালয়, বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়, দেশ, জাতি—এই-সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ ভাব ও বন্ধন আপনা হইতেই চলিয়া যায়। কিছুই আর তাঁহাকে বাঁধিতে পারে না, কিছুই তাঁহার স্বাধীনতা নষ্ট করিতে পারে না। জাহাজ হঠাৎ চুম্বকপ্রস্তরের পাহাড়ের নিকট আসিলে পেরেকগুলি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়া যায়, আর তক্তাগুলি জলের উপর ভাসিতে থাকে। ভগবৎকৃপা এইরূপে আত্মার বন্ধন অর্থাৎ তাহার স্বরূপ-প্রকাশের বিঘ্নসমূহ অপসারিত করিয়া দেয়, তখন উহা মুক্ত হইয়া যায়। সুতরাং ভক্তিলাভের উপায়-স্বরূপ এই বৈরাগ্য-সাধনে কোন কঠোরতা নাই, কোন কর্কশ বা শুষ্ক ভাব নাই, কোনরূপ সংগ্রাম নাই। ভক্তকে তাঁহার হৃদয়ের কোন ভাবই দমন করিতে হয় না, চাপিয়া রাখিতে হয় না, তাঁহাকে বরং সেই-সকল ভাব প্রবল করিয়া ভগবানের দিকে চালিত করিতে হয়।

ভক্তের বৈরাগ্য প্রেমপ্রসূত

প্রকৃতিতে আমরা সর্বত্রই প্রেমের বিকাশ দেখিতে পাই। সমাজের মধ্যে যাহা কিছু সুন্দর ও মহৎ সবই প্রেমপ্রসূত; আবার কুৎসিত এবং পৈশাচিক ব্যাপারগুলিও সেই একই প্রেমশক্তির বিকার মাত্র। যে চিত্তবৃত্তি হইতে পতিপত্নীর বিশুদ্ধ দাম্পত্যপ্রেম উদ্ভূত, অতি নীচ কামবৃত্তিও সেই একই খনি হইতে সঞ্জাত। ভাব সেই একই, তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উহার প্রকাশ বিভিন্ন। এই একই প্রেম কাহাকেও ভাল কাজে প্রেরণা দেয় এবং সে দরিদ্রকে সর্বস্ব অর্পণ করে, আবার কেহ বা ইহারই প্রভাবে নিজ ভ্রাতার গলা কাটিয়া তাহার যথাসর্বস্ব অপহরণ করে। শেষোক্ত ব্যক্তি নিজেকে যেমন ভালবাসে, প্রথমোক্ত ব্যক্তি অপরকে সেইরূপ ভালবাসে। তবে শেষোক্ত স্থলে প্রেম ভ্রান্ত পথে পরিচালিত; কিন্তু প্রথম ক্ষেত্রে উহা ঠিক পথে প্রযুক্ত। যে অগ্নিতে আমাদের খাদ্য প্রস্তুত হয়, তাহাই আবার একটি শিশুকে দগ্ধ করিতে পারে। ইহাতে অগ্নির কিছু দোষ নাই, ব্যবহারে ও ফলে তারতম্য হয়। অতএব যে প্রেমকে দুই ব্যক্তির প্রবল আসঙ্গস্পৃহা বলা যায়, তাহাই আবার অবশেষে উচ্চনীচ সর্বপ্রাণীর সেই এক স্বরূপে বিলীন হইবার ইচ্ছা-রূপে সর্বত্র প্রকাশিত।

ভক্তিযোগ প্রেমের এই উচ্চতম বিকাশের বিজ্ঞানস্বরূপ। উহা আমাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিবার, প্রেমকে যথার্থ পথে পরিচালনা করিবার, উহাকে একটি নূতন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবার এবং উহা হইতে শ্রেষ্ঠ ফল—আধ্যাত্মিক শান্তি ও আনন্দ লাভ করিবার উপায় প্রদর্শন করে। ভক্তিযোগ বলে না—ত্যাগ কর বা ছাড়িয়া দাও; শুধু বলে—ভালবাসো, সেই উচ্চতম আদর্শকে ভালবাসো। যাহার প্রেমের আস্পদ ঐরূপ, সর্বপ্রকার নীচভাব স্বভাবতই তাহার মন হইতে অন্তর্হিত হইবে।

'তোমার সম্বন্ধে আমি আর কিছু বলিতে পারি না, শুধু বলিতে পারি: তুমি আমার প্রেমাস্পদ। তুমি সুন্দর, আহা! অতি সুন্দর, তুমি স্বয়ং সৌন্দর্যস্বরূপ!'—হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে ভক্তেরা চিরকাল এইরূপ বলেন। ভক্তিযোগে আমাদের শুধু এইটুকু করিতে হইবে—সুন্দরের প্রতি আমাদের যে স্বাভাবিক

আকর্ষণ, তাহা ভগবানের দিকে চালিত করিতে হইবে। প্রাণের সহিত ভালবাসো। মানুষের মুখে, আকাশে, তারায় অথবা চন্দ্রে যে সৌন্দর্যের বিকাশ দেখা যায়, তাহা কোথা হইতে আসিল? উহা সেই ভগবানের সর্বব্যাপী সৌন্দর্যের আংশিক প্রকাশমাত্র। শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, 'তাঁহারই প্রকাশে সকলের প্রকাশ।'[1] ভক্তির এই উচ্চভূমিতে দণ্ডায়মান হও। উহা একেবারে তোমাদের ক্ষুদ্র আমিত্ব ভুলাইয়া দিবে। জগতের ক্ষুদ্র স্বার্থপর আসক্তিসমূহ ত্যাগ কর। কেবল মানুষকেই তোমার সাধারণ বা তদপেক্ষা উচ্চতর কার্যপ্রবৃত্তির একমাত্র লক্ষ্য মনে করিও না। সাক্ষিরূপে অবস্থিত হইয়া প্রকৃতির সমুদয় ব্যাপার পর্যবেক্ষণ কর। মানুষের প্রতি আসক্তিশূন্য হও। দেখ, জগতে এই প্রবল প্রেমের ভাব কিরূপে কার্য করিতেছে। কখন কখন হয়তো একটা ধাক্কা আসিল। উহাও সেই পরমপ্রেমলাভের চেষ্টার আনুষঙ্গিক ব্যাপার মাত্র। হয়তো কোথাও একটু দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষ ঘটিল, হয়তো কাহারও পদস্খলন হইল, এ-সবই সেই প্রকৃত উচ্চতর প্রেমে আরোহণ করিবার সোপানমাত্র। সাক্ষিস্বরূপ একটু দূরে দাঁড়াইয়া দেখ, কি ভাবে এই দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ মানুষকে প্রকৃত প্রেমের পথে আগাইয়া দেয়। যখন কেহ এই সংসার-প্রবাহের মধ্যে থাকে, তখনই সে ঐ সংঘর্ষগুলি অনুভব করে। কিন্তু যখনই উহার বাহিরে আসিয়া কেবল সাক্ষিরূপে পর্যবেক্ষণ করিবে, তখন দেখিবে অনন্ত প্রণালীর মধ্য দিয়া ভগবান্ নিজেকে প্রেমরূপে প্রকাশিত করিতেছেন।

'যেখানেই একটু আনন্দ দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে সেই অনন্ত আনন্দস্বরূপ স্বয়ং ভগবানের অংশ রহিয়াছে, বুঝিতে হইবে।'[2] অতি নীচতম আসক্তিতেও ভগবৎপ্রেমের বীজ অন্তর্নিহিত আছে। সংস্কৃত ভাষায় ভগবানের একটি নাম 'হরি'। ইহার অর্থ এই—তিনি সকলকেই নিজের কাছে আ-হরণ করিতেছেন বা আকর্ষণ করিতেছেন। বাস্তবিক তিনিই আমাদের ভালবাসার একমাত্র উপযুক্ত পাত্র। এই যে আমরা নানাদিকে আকৃষ্ট হইতেছি, কিন্তু আমাদিগকে টানিতেছে কে? তিনিই আমাদিগকে তাঁহার দিকে ক্রমাগত টানিতেছেন। প্রাণহীন জড়—সে কি কখন চৈতন্যবান্ আত্মাকে

---

১ তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বম্।
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।—কঠ উপ., ২।২।১৫

২ এতস্যৈবানন্দস্য···ইত্যাদি—বৃহ. উপ., ৪।৩।৩২

টানিতে পারে? কখনই পারে না, কখন পারিবেও না। একখানি সুন্দর মুখ দেখিয়া একজন উন্মত্ত হইল। গোটাকতক জড় পরমাণু কি তাহাকে পাগল করিল? কখনই নয়। ঐ জড়-পরমাণুসমূহের অন্তরালে নিশ্চয়ই ঐশ্বরিক শক্তি ও ঐশ্বরিক প্রেমের লীলা বিদ্যমান। অজ্ঞ লোকে উহা জানে না, তথাপি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সে উহা দ্বারাই—কেবল উহা দ্বারাই আকৃষ্ট হইতেছে। সুতরাং দেখা গেল, অতি নিম্নতম আসক্তিও ঈশ্বর হইতে শক্তি সংগ্রহ করে।—'হে প্রিয়তমে, পতির জন্য পতিকে কেহ ভালবাসে না, আত্মার জন্যই লোকে পতিকে ভালবাসে।'[১] প্রেমিকা পত্নীগণ ইহা জানিতে পারে, না জানিতেও পারে, তথাপি তত্ত্বটি সত্য। 'হে প্রিয়তমে, পত্নীর জন্য পত্নীকে কেহ ভালবাসে না, আত্মার জন্যই পত্নী প্রিয়া হয়।'[১]

এইরূপ কেহই নিজ সন্তানকে অথবা আর কাহাকেও তাহাদেরই জন্য ভালবাসে না, আত্মার জন্যই ভালবাসিয়া থাকে। ভগবান যেন একটি বৃহৎ চুম্বক-প্রস্তর, আমরা যেন লৌহচূর্ণের ন্যায়। আমরা সকলেই সদাসর্বদা তাঁহার দ্বারা আকৃষ্ট হইতেছি। আমরা সকলেই তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি। জগতে এই যে নানাবিধ চেষ্টা—এই-সকলের একমাত্র লক্ষ্য কেবল স্বার্থ হইতে পারে না। অজ্ঞ ব্যক্তিগণ জানে না, তাহারা কি করিতেছে। বাস্তবিক তাহারা জীবনের সকল চেষ্টার মধ্য দিয়া ক্রমাগত সেই পরমাত্মা-রূপ বৃহৎ চুম্বকের নিকটবর্তী হইতেছে। আমাদের এই কঠোর জীবন-সংগ্রামের লক্ষ্য—তাঁহার নিকট যাওয়া এবং শেষপর্যন্ত তাঁহার সহিত একীভূত হওয়া।

ভক্তিযোগীই এই জীবন-সংগ্রামের অর্থ জানেন ও ইহার উদ্দেশ্য বুঝেন, তিনি এই সংগ্রাম অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন; সুতরাং তিনি জানেন, ইহার লক্ষ্য কি, এই জন্য তিনি সর্বান্তঃকরণে এগুলি হইতে মুক্তি পাইতে ইচ্ছা করেন। এ-সকল এড়াইয়া তিনি সকল আকর্ষণের মূলকারণ হরির নিকট একেবারে যাইতে চান। ইহাই ভক্তের ত্যাগ—ভগবানের প্রতি এই প্রবল আকর্ষণ তাঁহার আর সকল আসক্তিকে নাশ করিয়া দেয়। এই অনন্ত

১ ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি।
ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি।
—বৃহ. উপ., ২।৪।৫

প্রেম তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করে, অন্যান্য আসক্তির আর সেখানে স্থান হয় না। ইহা ছাড়া আর কি হইতে পারে? ঈশ্বর-রূপ প্রেমসমুদ্রের জলে ভক্তি তখন ভক্তের হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া দেয়। সেখানে ছোটখাট ভালবাসার স্থান আর নাই। ইহাই ভক্তের ত্যাগ বা বৈরাগ্য। তাৎপর্য এই: ভগবান্ ভিন্ন সমুদয় বিষয়ে ভক্তের যে বৈরাগ্য, তাহা ভগবানের প্রতি পরম অনুরাগ হইতে উৎপন্ন।

পরাভক্তি-লাভের জন্য এইভাবে প্রস্তুত হওয়াই আবশ্যক। এই বৈরাগ্য-লাভ হইলে পরাভক্তির উচ্চতম শিখরে উঠিবার দ্বার যেন খুলিয়া যায়। তখনই আমরা বুঝিতে আরম্ভ করি, পরাভক্তি কি। আর যিনি পরাভক্তির রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, একমাত্র তাঁহারই বলিবার অধিকার আছে, ধর্মানুভূতির জন্য তাঁহার পক্ষে প্রতিমাপূজা বা অনুষ্ঠানাদি নিষ্প্রয়োজন। তিনিই কেবল সেই পরম প্রেমাবস্থা লাভ করিয়াছেন, যেখানে সকল মানবের ভ্রাতৃত্ব অনুভব করা সম্ভব। অপরে কেবল ইহা লইয়া বৃথা বাক্যব্যয় করে। তিনি তখন আর কোন ভেদ দেখিতে পান না; মহান্ প্রেমসমুদ্র তাঁহার অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে; তখন তিনি আমাদের মতো মানুষ পশু তরু লতা সূর্য চন্দ্র তারা দেখেন না, তিনি সর্বত্র সব-কিছুর মধ্যে তাঁহার প্রিয়তমকে দেখিতে পান। যাহার মুখের দিকে তিনি তাকান, তাহারই ভিতর তিনি হরির প্রকাশ দেখিতে পান। সূর্য বা চন্দ্রের আলোক তাঁহারই প্রকাশমাত্র। যেখানেই তিনি কোন সৌন্দর্য বা মহত্ত্ব দেখিতে পান, সেখানেই তিনি অনুভব করেন—সবই সেই ভগবানের। এরূপ ভক্ত জগতে এখনও আছেন, জগৎ কখনই এরূপ ভক্ত-বিরহিত হয় না। এরূপ ভক্ত সর্পদষ্ট হইলে বলে, আমার প্রিয়তমের নিকট হইতে দূত আসিয়াছিল। এইরূপ ব্যক্তিরই কেবল বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব সম্বন্ধে কিছু বলিবার অধিকার আছে। তাঁহার হৃদয়ে কখন ক্রোধ বা ক্ষোভের সঞ্চার হয় না। বাহ্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ তাঁহার নিকট হইতে চিরকালের জন্য অন্তর্হিত। কি করিয়া তিনি ক্রুদ্ধ হইবেন, যখন প্রেমবলে অতীন্দ্রিয় সত্যকে তিনি সর্বদা দেখিতে পান?

ভক্তিযোগের স্বাভাবিকতা ও উহার রহস্য

অর্জুন শ্রীভগবানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'যাঁহারা সর্বদা অবহিত হইয়া তোমার উপাসনা করেন, আর যাঁহারা অব্যক্ত নির্গুণের উপাসক, ইহাদের মধ্যে কাহারা শ্রেষ্ঠ যোগী?' শ্রীভগবান বলেন, 'যাঁহারা আমাতে মন সংলগ্ন করিয়া নিত্যযুক্ত হইয়া পরম শ্রদ্ধার সহিত আমার উপাসনা করেন, তাঁহারাই আমার শ্রেষ্ঠ উপাসক, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ যোগী। যাঁহারা নির্গুণ, অনির্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্বব্যাপী, অচিন্ত্য, নির্বিকার, অচল নিত্যস্বরূপকে ইন্দ্রিয়সংযম ও বিষয়ে সমবুদ্ধি অবলম্বন করিয়া উপাসনা করেন, সেই সর্বভূতহিতে রত ব্যক্তিগণও আমাকে লাভ করেন। কিন্তু যাঁহাদের মন অব্যক্তে আসক্ত, তাঁহাদের অধিকতর কষ্ট হইয়া থাকে; কারণ দেহাভিমানী ব্যক্তি অতি কষ্টে এই নির্গুণ ব্রহ্মে নিষ্ঠা লাভ করিতে পারে। কিন্তু যাঁহারা সমুদয় কার্য আমাতে সমর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া আমার ধ্যান ও উপাসনা করেন, আমি তাঁহাদিগকে শীঘ্রই পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুরূপ মহাসমুদ্র হইতে উদ্ধার করি, কারণ তাঁহাদের মন সর্বদাই আমার প্রতি সম্পূর্ণরূপে আসক্ত।'[১] এখানে জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ উভয়কেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। এমন কি, উদ্ধৃতাংশে উভয়েরই লক্ষণ প্রকাশ করা হইয়াছে, বলা যাইতে পারে। জ্ঞানযোগ অবশ্য অতি মহান্; উহা তত্ত্ববিচারের দ্বারা পরব্রহ্মকে অনুভব করিবার পথ। আর আশ্চর্যের বিষয় প্রত্যেকেই ভাবে—তত্ত্ববিচারের দ্বারা সে সব কিছু করিতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক জ্ঞানযোগ অনুসারে জীবন-যাপন বড় কঠিন ব্যাপার, উহাতে অনেক বিপদাশঙ্কা আছে।

জগতে দুই প্রকার লোক দেখিতে পাওয়া যায়। একদল আসুর-প্রকৃতি—তাহারা এই শরীরটাকে সুখস্বাচ্ছন্দ্যে রাখাই জীবনের চরম উদ্দেশ্য মনে করে। আর যাঁহারা দেবপ্রকৃতি, তাঁহারা এই শরীরকে কেবল কোন বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের উপায় মনে করেন। তাঁহারা মনে করেন, উহা যেন আত্মার উন্নতিসাধনের যন্ত্রবিশেষ। কথিত আছে, শয়তান নিজ উদ্দেশ্য-

---

১ গীতা, ১২।১-৭

সিদ্ধির জন্য শাস্ত্র উদ্ধৃত করিতে পারে, করিয়াও থাকে। সুতরাং জ্ঞানমার্গ যেমন সাধুব্যক্তির উচ্চতম আদর্শলাভের প্রবল উৎসাহদাতা, সেইরূপ অসাধু ব্যক্তিরও কার্যের সমর্থক বলিয়া মনে হয়। জ্ঞানযোগে ইহাই মহা বিপদাশঙ্কা। কিন্তু ভক্তিযোগ অতি স্বাভাবিক ও মধুর। ভক্ত জ্ঞানযোগীর মতো অত উচ্চ স্তরে উঠেন না, সুতরাং তাঁহার গভীর পতনের আশঙ্কাও নাই। এইটুকু বুঝিতে হইবে যে, সাধক যে পথই অবলম্বন করুন না কেন, যতদিন না সমুদয় বন্ধনমোচন হইতেছে, ততদিন তিনি কখনই মুক্ত হইতে পারেন না। প্রশ্ন করা যাইতে পারে, ভক্ত এই সহজ পথ বাছিয়া লইয়া কিভাবে মুক্তিলাভ করিবেন?

এই কয়েকটি শ্লোকে দেখা যায়, প্রগাঢ় ভক্তি দ্বারা কিরূপে জনৈকা ভাগ্যবতী গোপীর জীবাত্মার পাপপুণ্যরূপ বন্ধন চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। 'ভগবানের চিন্তাজনিত পরমাহ্লাদে তাঁহার সমুদয় পুণ্যকর্মজনিত বন্ধন ক্ষয়প্রাপ্ত হইল, আর ভগবানকে কাছে না পাওয়ার মহাদুঃখে তাঁহার সমুদয় পাপ ধৌত হইয়া গেল। তখন কোন বন্ধন না থাকায় সেই গোপকন্যা মুক্তিলাভ করিলেন।'[১] এই শাস্ত্রবাক্য হইতে বেশ বুঝা যায়, ভক্তিযোগের গুহ্য রহস্য এই যে, মনুষ্যহৃদয়ের যত প্রকার বাসনা বা ভাব আছে, উহার কোনটিই স্বরূপতঃ মন্দ নয়; উহাদিগকে ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রিত করিয়া ক্রমশঃ উচ্চাভিমুখী করিতে হইবে, যতদিন না ঐগুলি চরমোৎকর্ষ লাভ করে। উহাদের সর্বোচ্চ গতি ভগবান, এবং অন্যান্য সকল গতিই নিম্নাভিমুখী। ফল অনুসারে আমাদের সমুদয় মনোভাবকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—সুখ ও দুঃখ; শেষোক্ত মনোভাবকে কি করিয়া উচ্চাভিমুখী করা যায়, তাহা ভাবিয়া সাধক দিশেহারা হন। কিন্তু ভক্তিযোগ শিক্ষা দেয়—ইহা সত্যসত্যই সম্ভব। দুঃখের প্রয়োজনীয়তা আছে। বিষয় বা ধন লাভ করিতে না পারিয়া যখন কেহ দুঃখ পায়, তখন দুঃখবৃত্তিকে ভুল পথে চালিত করা হইতেছে। 'কেন আমি সেই পরম পুরুষকে লাভ করতে পারিলাম না? কেন আমি ভগবানকে পাইলাম না?'—এই

১ তচ্চিন্তাবিপুলাহ্লাদক্ষীণপুণ্যচয়া তথা।
তদপ্রাপ্তিমহাদুঃখবিলীনাশেষপাতকা॥
চিন্তয়ন্তী জগৎসূতিং পরব্রহ্মস্বরূপিণম্।
নিরুচ্ছ্বাসতয়া মুক্তিং গতান্যা গোপকন্যকা॥—বিষ্ণুপুরাণ, ৫।১৩।২১-২২

বলিয়া যদি কেহ যন্ত্রণায় অস্থির হয়, তবে সেই যন্ত্রণা তাহার মুক্তির কারণ হইবে। কয়েকটি মুদ্রা পাইলে যখন তোমার আহ্লাদ হয়, তখন বুঝিতে হইবে তুমি তোমার আহ্লাদ-বৃত্তিকে ভুল পথে চালাইতেছ। উহাকে উচ্চতর বিষয়ে প্রেরণ করিতে হইবে, আমাদের সর্বোচ্চ লক্ষ্য ভগবানের চিন্তায় আনন্দ বোধ করিতে হইবে। অন্যান্য ভাব সম্বন্ধেও এই একই কথা। ভক্ত বলেন, উহাদের কোনটিই মন্দ নয়; সুতরাং তিনি ঐ ভাবগুলি বশীভূত করিয়া নিশ্চিতভাবে ঈশ্বরাভিমুখী করেন।

ভক্তির প্রকাশভেদ

ভগবানে ভক্তি যতভাবে প্রকাশিত হয়, এখানে তাহার কয়েকটি আলোচিত হইতেছে।[১] প্রথম—'শ্রদ্ধা'। লোকে মন্দির ও তীর্থস্থানসমূহের প্রতি এত শ্রদ্ধাসম্পন্ন কেন? এই-সকল স্থানে ঈশ্বরের পূজা হয় বলিয়া, এই-সকল স্থানে গেলে ঈশ্বরের ভাবের উদ্দীপনা হয় বলিয়া এই-সকল স্থানের সহিত ঈশ্বরের সত্তা জড়িত। সকল দেশেই লোকে ধর্মাচার্যগণের প্রতি এত শ্রদ্ধাসম্পন্ন কেন? তাঁহারা সকলেই সেই এক ভগবানের মহিমাই প্রচার করেন; তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। এই শ্রদ্ধার মূল ভালবাসা। যাহাকে আমরা ভালবাসি না, তাহার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইতে পারি না।

তারপর 'প্রীতি'—ভগবচ্চিন্তায় সুখ বা আনন্দানুভব। বিষয়ে মানুষ কি তীব্র আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে! ইন্দ্রিয়সুখকর দ্রব্য লাভ করিতে মানুষ সর্বত্র ছুটিয়া যায়, মহা বিপদেরও সম্মুখীন হয়। ভক্তের চাই ঠিক এই প্রকার ভালবাসা। ভগবানের দিকে এই ভালবাসার মোড় ফিরাইতে হইবে।

তারপর মধুরতম যন্ত্রণা 'বিরহ'—প্রেমাস্পদের অভাবজনিত মহাদুঃখ। এই দুঃখ জগতে সকল দুঃখের মধ্যে মধুর—অতি মধুর। 'ভগবানকে লাভ করিতে পারিলাম না, জীবনে একমাত্র প্রাপ্তব্য বস্তু পাইলাম না' বলিয়া মানুষ যখন অতিশয় ব্যাকুল হয় এবং সেজন্য যন্ত্রণায় অস্থির ও উন্মত্ত হইয়া উঠে, তখনই বুঝিতে হইবে ভক্তের বিরহ-অবস্থা। মনের এই অবস্থা হইলে প্রেমাস্পদ ব্যতীত আর কিছু ভাল লাগে না (ইতর-বিচিকিৎসা)। পার্থিব প্রেমেও মাঝে মাঝে উন্মত্ত প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে এই বিরহ দেখা যায়। নরনারীর পরস্পর-মধ্যে প্রগাঢ় প্রণয় হইলে তাহারা যাহাদিগকে ভালবাসে না, তাহাদের সান্নিধ্যে স্বভাবতই একটু বিরক্তি বোধ করে। এইরূপে যখন পরাভক্তি হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে, তখন যে বস্তু, বিষয় বা ব্যক্তি সাধক ভালবাসেন না, সেগুলি সহ্য করিতে পারেন না। তখন ভগবান ব্যতীত অন্য বিষয়ে কথা বলাও ভক্তের পক্ষে বিরক্তিকর হইয়া

---

১ সম্মান-বহুমানপ্রীতিবিরহেতর-বিচিকিৎসা-মহিমখ্যাতিতদর্থপ্রাণস্থান-তদীয়তাসর্বতদ্ভাবাপ্রাতিকূল্যাদীনি চ স্মরণেভ্যো বাহুল্যাৎ।—শাণ্ডিল্যসূত্র, (২।১)৪৪

পড়ে। 'তাঁহার বিষয়ে, কেবল তাঁহার বিষয়ে চিন্তা কর, অন্য সকল কথা ত্যাগ কর।'[1] যাঁহারা শুধু ঈশ্বর সম্বন্ধে কথা বলেন, ভক্ত তাঁহাদিগকেই বন্ধু বলিয়া মনে করেন; কিন্তু যাঁহারা অন্য বিষয়ে কথা বলেন, তাঁহাদিগকে শত্রু বলিয়া মনে হয়।

আরও এক উচ্চ অবস্থা আসে, যখন এই জীবনধারণও শুধু তাঁহার জন্য। উহা ব্যতীত এক মুহূর্তের জন্যও জীবনধারণ করা ভক্তের পক্ষে অসম্ভব বোধ হয়। এই অবস্থার শাস্ত্রীয় নাম 'তদর্থপ্রাণস্থান'। আর সেই প্রিয়তমের চিন্তা হৃদয়ে বর্তমান থাকে বলিয়াই এই জীবনধারণে সুখবোধ হয়। সংক্ষেপে —প্রিয়তমের চিন্তা আছে বলিয়াই জীবন তখন মধুর বলিয়া মনে হয়।

তদীয়তা—তাঁহার হইয়া যাওয়া; ভক্তিমতে সাধক যখন সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হন, তখন এই 'তদীয়তা' আসে। যখন তিনি ভগবানের পাদ স্পর্শ করিয়া ধন্য হন, তখন তাঁহার প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া যায়, বিশুদ্ধ হইয়া যায়; তখন তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইয়া যায়। তথাপি অনেক ভক্ত কেবল ঈশ্বরের উপাসনার জন্যই জীবনধারণ করেন। এই জীবনে ইহাই তাঁহাদের একমাত্র সুখ—এটি তাঁহারা ছাড়িতে চান না। 'হে রাজন্, হরির এতাদৃশ মনোহর গুণরাশি যে, যাঁহারা আত্মায় পরম তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন, যাঁহাদের হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে, তাঁহারাও ভগবানকে নিষ্কাম ভক্তি করিয়া থাকেন।'[2] 'এই ভগবানকে দেবগণ, মুমুক্ষু ও ব্রহ্মবাদীরাও উপাসনা করিয়া থাকেন।'[3] যখন মানুষ নিজেকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে তখনই এই 'তদীয়তা'-অবস্থা লাভ হয়। সাধারণ ভালবাসাতেও যেমন প্রেমাস্পদের সকল জিনিসই প্রেমিকের চক্ষে অমূল্য বলিয়া বোধ হয়, তেমনি ভক্তের নিকট সকলই পবিত্র বলিয়া বোধ হয়, কারণ সবই যে তাঁহার প্রেমাস্পদের। প্রিয়তমের এক টুকরা বস্ত্রও সে ভালবাসে; এরূপে যে ভগবানকে ভালবাসে, সে সমুদয় জগৎকেও ভালবাসে; কারণ সমুদয় জগৎ যে তাঁহার।

১ তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষঃ সেতুঃ।—মুণ্ডক উপ., ২।২।৫

২ আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিম্ ইত্থম্ভূতগুণো হরিঃ।—শ্রীমদ্ভাগবত, ১।৭।১০

৩ যং সর্বে দেবা নমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চ।
—নৃসিংহপূর্বতাপনী উপ., ২।৪

বিশ্বপ্রেম ও আত্মসমর্পণ

প্রথমে সমষ্টিকে ভালবাসিতে না শিখিলে কিরূপে ব্যষ্টিকে ভালবাসা যায়? ঈশ্বরই সমষ্টি। সমগ্র জগৎটাকে যদি এক অখণ্ডস্বরূপে চিন্তা করা যায়, তাহাই ঈশ্বর; আর দৃশ্যমান জগৎ যখন পৃথক্ পৃথক্ রূপে দেখা যায়, তখনই উহা ব্যষ্টি। সমষ্টিকে—সেই সর্বব্যাপীকে—যে এক অখণ্ড বস্তুর মধ্যে ক্ষুদ্রতর অখণ্ড বস্তুসমূহ (unities) অবস্থিত, তাঁহাকে ভালবাসিলেই সমগ্র জগৎকে ভালবাসা সম্ভব। ভারতীয় দার্শনিকগণ বিশেষ (particular) লইয়াই ক্ষান্ত নন, তাঁহারা ব্যষ্টির দিকে ক্ষিপ্রভাবে দৃষ্টিপাত করেন এবং তারপরেই ব্যষ্টি বা বিশেষ ভাবগুলি যে সামান্য ভাবের অন্তর্গত, তাহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন। সর্বভূতের মধ্যে এই সামান্য (universal) ভাবের অন্বেষণই ভারতীয় দর্শন ও ধর্মের লক্ষ্য। জ্ঞানীর লক্ষ্য—যাঁহাকে জানিলে সমুদয় জানা যায়, সেই সমষ্টিভূত, এক, নিরপেক্ষ, সর্বভূতের মধ্যগত সামান্যভাবস্বরূপ পুরুষকে জানা। ভক্ত চান, যাঁহাকে ভালবাসিলে এই চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি ভালবাসা জন্মে, সেই সর্বগত পুরুষপ্রধানকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে; যোগীর আকাঙ্ক্ষা সেই সকলের মূলীভূত শক্তিকে জয় করা—যাহাকে জয় করিলে সমুদয় জগৎকে জয় করা যায়। ভারতবাসীর মনের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করিলে জানা যায়, কি জড়বিজ্ঞান, কি মনোবিজ্ঞান, কি ভক্তিতত্ত্ব, কি দর্শন—সর্ব বিভাগেই উহা চিরকাল এই বহুর মধ্যে এক সর্বগত তত্ত্বের অপূর্ব অনুসন্ধানে নিয়োজিত।

ভক্ত ক্রমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, যদি একজনের পর আর একজনকে ভালবাসিতে থাকো, তবে তুমি অনন্তকালের জন্য উত্তরোত্তর অধিকসংখ্যক ব্যক্তিকে ভালবাসিয়া যাইতে পারো, কিন্তু সমগ্র জগৎকে মোটেই ভালবাসিতে সমর্থ হইবে না। কিন্তু অবশেষে যখন এই মূল সত্য অবগত হওয়া যায় যে, ঈশ্বর সমুদয় প্রেমের সমষ্টিস্বরূপ, মুক্ত মুমুক্ষু বদ্ধ—জগতের সকল জীবাত্মার সকল আকাঙ্ক্ষার সমষ্টিই ঈশ্বর, তখনই তাঁহার পক্ষে সর্বজনীন প্রেম সম্ভব হইতে পারে। ভক্ত বলেন: ভগবান্ সমষ্টি এবং সেই পরিদৃশ্যমান জগৎ ভগবানের পরিচ্ছিন্ন ভাব—ভগবানের অভিব্যক্তি

মাত্র। সমষ্টিকে ভালবাসিলেই সমুদয় জগৎকেই ভালবাসা হইল। তখনই জগতের প্রতি ভালবাসা ও জগতের হিতসাধন—সবই সহজ হইবে। প্রথমে ভগবৎপ্রেমের দ্বারা আমাদিগকে এই শক্তিলাভ করিতে হইবে, নতুবা জগতের হিতসাধন সম্ভব হইবে না। ভক্ত বলেন: সবই তাঁহার, তিনি আমার প্রিয়তম, আমি তাঁহাকে ভালবাসি। এইরূপ ভক্তের নিকট ক্রমশঃ সবই পবিত্র বলিয়া বোধ হয়, কারণ সবই তাঁহার। সকলেই তাঁহার সন্তান, তাঁহার অঙ্গস্বরূপ, তাঁহারই প্রকাশ। তখন কি ভাবে অপরকে আঘাত করিতে পারি? কিরূপেই বা অপরকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারি? ভগবৎপ্রেম আসিলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিশ্চিত ফলস্বরূপ সর্বভূতে প্রেম আসিবে। আমরা যতই ভগবানের দিকে অগ্রসর হই, ততই সমুদয় বস্তুকে তাঁহার ভিতর দেখিতে পাই। যখন সাধক এই পরাভক্তিলাভে সমর্থ হন, তখন ঈশ্বরকে সর্বভূতে দর্শন করিতে আরম্ভ করেন, এইরূপে আমাদের হৃদয় প্রেমের এক অনন্ত প্রস্রবণ হইয়া দাঁড়ায়। যখন আমরা এই প্রেমের আরও উচ্চস্তরে উপনীত হই, তখন এই জগতের সকল পদার্থের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তাহা একেবারে দূরীভূত হয়। মানুষকে তখন আর মানুষ বলিয়া বোধ হয় না, ভগবান্ বলিয়াই বোধ হয়; অপরাপর জীবজন্তুও আর জীবজন্তু বলিয়া বোধ হয় না, ঈশ্বর বলিয়াই বোধ হয়। এমন কি, ব্যাঘ্রকেও ব্যাঘ্র বলিয়া বোধ হইবে না, ভগবানেরই এক প্রকাশ বলিয়া বোধ হইবে। 'এইরূপে এই প্রগাঢ় ভক্তির অবস্থায় সর্বপ্রাণীই আমাদের উপাস্য হইয়া পড়ে। সর্বভূতে হরিকে অবস্থিত জানিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি সকলকে অবিচলিত ভাবে ভালবাসেন।'[১]

এইরূপ প্রগাঢ় সর্বব্যাপক প্রেমের ফল পূর্ণ আত্মনিবেদন ও 'অপ্রাতিকূল্য'; এ অবস্থায় দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, সংসারে যাহা কিছু ঘটে, তাহার কিছুই আমাদের অনিষ্টকর নয়। তখনই সেই প্রেমিক পুরুষ—দুঃখ আসিলে বলিতে পারেন, 'স্বাগত দুঃখ'; কষ্ট আসিলে বলিতে পারেন, 'এস কষ্ট, তুমিও আমার প্রিয়তমের নিকট হইতে আসিতেছ।' সর্প আসিলে সর্পকেও তিনি স্বাগত সম্ভাষণ করিতে পারেন। মৃত্যু আসিলে এরূপ ভক্ত মৃত্যুকে সহাস্যে অভিনন্দন

---

১ এবং সর্বেষু ভূতেষু ভক্তিরব্যভিচারিণী।
কর্তব্যা পণ্ডিতৈর্জ্ঞাত্বা সর্বভূতময়ং হরিম্॥

করিতে পারেন। 'ধন্য আমি, আমার নিকট ইহারা আসিতেছে, সকলেই স্বাগত। ভগবান্ ও যাহা কিছু তাঁহার—সেই সকলের প্রতি প্রগাঢ় প্রেম হইতে প্রসূত এই পূর্ণ নির্ভরতার অবস্থায় ভক্তের নিকট সুখ ও দুঃখের বিশেষ প্রভেদ থাকে না। তিনি তখন দুঃখকষ্টের জন্য আর অভিযোগ করেন না। আর প্রেমস্বরূপ ভগবানের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা অবশ্যই মহাবীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপজনিত যশোরাশি অপেক্ষা অধিকতর বাঞ্ছনীয়।

অধিকাংশ মানুষের কাছে দেহই সর্বস্ব। দেহই তাহাদের চক্ষে সমগ্র বিশ্ব, দেহের সুখই তাহাদের চরম লক্ষ্য। এই দেহ ও আসুরিক ভাব, দৈহিক ভোগ্য বস্তুকে উপাসনা করা-রূপ আসুরিক ভাব আমাদের সকলের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। আমরা খুব লম্বা-চওড়া কথা বলিতে পারি, যুক্তির স্তরে খুব উচ্চে উড়িতে পারি, তথাপি আমরা শকুনির মতো; যতই উচ্চে উঠিয়াছি মনে করি না কেন, আমাদের মন ভাগাড়ে গলিত শবের মাংসখণ্ডের প্রতি আকৃষ্ট। জিজ্ঞাসা করি, আমাদের শরীরকে ব্যাঘ্রের কবল হইতে রক্ষা করিতে হইবে কেন? ব্যাঘ্রের ক্ষুধা নিবারণের জন্য আমরা এই শরীর তাহাকে দিতে পারি না কেন? উহাতে তো ব্যাঘ্রের তৃপ্তি হইবে, এই কার্যের সহিত আত্মোৎসর্গ ও উপাসনার কি খুব বেশী প্রভেদ? অহংকে সম্পূর্ণরূপে নাশ করিতে পার না কি? প্রেমধর্মের ইহা অতি উচ্চ চূড়া, আর অতি অল্প লোকই এই অবস্থা লাভ করিয়াছে। কিন্তু যতদিন না মানুষ সর্বদা এইরূপ আত্মত্যাগের জন্য সর্বান্তঃকরণে প্রস্তুত হয়, ততদিন সে পূর্ণ ভক্ত হইতে পারে না। আমরা সকলেই কমবেশী কিছু কালের জন্য শরীরটাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারি এবং অল্পাধিক স্বাস্থ্যসম্ভোগও করিতে পারি, কিন্তু তাহাতে কি হইল? আমরা শরীরের যতই যত্ন লই না কেন, শরীর তো একদিন যাইবেই। ইহার কোন স্থায়িত্ব নাই। ধন্য তাহারা, যাহাদের শরীর অপরের সেবায় নষ্ট হয়। 'সাধু ব্যক্তি কেবল অপরের সেবার জন্য ধন, এমন কি প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করিতে সদা প্রস্তুত হইয়া থাকেন। এই জগতে মৃত্যুই একমাত্র সত্য—এখানে যদি আমাদের দেহ কোন মন্দ কাজে না গিয়া ভাল কাজে যায়, তবে তাহা খুব ভাল বলিতে হইবে।'[১] আমরা কোনরূপে পঞ্চাশ—জোর

---

১ ধনানি জীবিতঞ্চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ।
সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি।—হিতোপদেশ

এক-শ বছর বাঁচিতে পারি, কিন্তু তার পর?—মৃত্যু। যে-কোন বস্তু মিশ্রণে উৎপন্ন, তাহাই বিশ্লিষ্ট হইয়া বিনষ্ট হইয়া যায়। এমন সময় আসিবে, যখন উহা বিশ্লিষ্ট হইবেই হইবে। ঈশা, বুদ্ধ, মহম্মদ, জগতের বড় বড় মহাপুরুষ এবং আচার্যেরা সকলেই এই পথে গিয়াছেন।

ভক্ত বলেন, এই ক্ষণস্থায়ী জগতে, যেখানে সবই ক্রমশঃ ক্ষয় পাইতেছে, এখানে আমরা যতটুকু সময় পাই, সেটুকুরই সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। আর বাস্তবিক জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্যবহার—জীবনকে সর্বভূতের সেবায় নিযুক্ত করা। এই ভয়ানক দেহবুদ্ধিই জগতে সর্বপ্রকার স্বার্থপরতার মূল। আমাদের মহাভ্রম: এই শরীরটি আমি, যে কোন প্রকারে হউক, উহাকে রক্ষা করিতে হইবে ও উহার স্বচ্ছন্দতা বিধান করিতে হইবে। এই ভাবই আমাদের পরার্থে জীবন উৎসর্গ করিতে দেয় না। যদি নিশ্চিত ভাবে জানো যে, তুমি শরীর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, তবে এই জগতে এমন কিছুই নাই, যাহার সহিত তোমার বিরোধ উপস্থিত হইবে; তখন তুমি সর্বপ্রকার স্বার্থপরতার অতীত হইয়া গেলে। এই জন্য ভক্ত বলেন, 'আমাদিগকে জগতের সকল পদার্থ সম্বন্ধে মৃতবৎ থাকিতে হইবে,' এবং ইহাই বাস্তবিক আত্মসমর্পণ—শরণাগতি। 'তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক'—এই বাক্যের অর্থই ঐ আত্মসমর্পণ বা শরণাগতি। স্বার্থের জন্য সংগ্রাম করা এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে করা—ভগবানের ইচ্ছাতেই আমাদের দুর্বলতা ও সাংসারিক আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়া থাকে, ইহা নির্ভরতা নয়। হইতে পারে, আমাদের স্বার্থপূর্ণ কার্যাদি হইতেও ভবিষ্যতে আমাদের মঙ্গল হয়, কিন্তু সে বিষয় ভগবান দেখিবেন, তাহাতে তোমার আমার কিছু করিবার নাই। প্রকৃত ভক্ত নিজের জন্য কখন কিছু ইচ্ছা করেন না বা কোন কার্য করেন না। 'প্রভু, লোকে তোমার নামে বড় বড় মন্দির নির্মাণ করে, তোমার নামে কত দান করে; আমি দরিদ্র, আমার কিছু নাই, তাই আমার এই দেহ তোমার পাদপদ্মে সমর্পণ করিলাম। প্রভু, আমায় ত্যাগ করিও না।' ইহাই ভক্তহৃদয়ের গভীর প্রদেশ হইতে উত্থিত প্রার্থনা। যিনি একবার এই অবস্থার আস্বাদ পাইয়াছেন, তাঁহার নিকট এই প্রিয়তম প্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ—জগতের সমুদয় ধন, প্রভুত্ব, এমন কি মানুষ যতদূর মান যশ ও ভোগসুখের আশা করিতে পারে, তাহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীত হয়। ভগবানে নির্ভরজনিত 'এই শান্তি আমাদের বুদ্ধির অতীত' ও অমূল্য। আত্মসমর্পণ

হইতে এই অপ্রাতিকূল্য-অবস্থা লাভ হইলে সাধকের আর কোনরূপ স্বার্থ থাকে না ; আর স্বার্থই যখন নাই, তখন আর তাঁহার স্বার্থহানিকর বস্তু জগতে কি থাকিতে পারে ? এই পরম নির্ভরের অবস্থায় সর্বপ্রকার আসক্তি সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হয়, কেবল সেই সর্বভূতের অন্তরাত্মা ও আধারস্বরূপ ভগবানের প্রতি সর্বাবগাহী ভালবাসা অবশিষ্ট থাকে। ভগবানের প্রতি এই আসক্তি জীবাত্মার বন্ধনের কারণ নয়, বরং উহা নিঃশেষে তাহার সর্ববন্ধন মোচন করে।

পরাবিদ্যা ও পরাভক্তি এক

উপনিষদ্ পরা ও অপরা নামক দুইটি বিদ্যা পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। আর ভক্তের নিকটে এই পরাবিদ্যা ও পরাভক্তিতে বাস্তবিক কিছু প্রভেদ নাই। মুণ্ডক উপনিষদে কথিত আছে, 'ব্রহ্মজ্ঞানীরা বলেন, জানিবার যোগ্য দুই প্রকার বিদ্যা—পরা ও অপরা। উহার মধ্যে অপরা বিদ্যা—ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা অর্থাৎ উচ্চারণ যতি ইত্যাদির বিদ্যা, কল্প অর্থাৎ যজ্ঞপদ্ধতি, ব্যাকরণ, নিরুক্ত অর্থাৎ বৈদিক শব্দসমূহের ব্যুৎপত্তি ও তাহাদের অর্থ যে শাস্ত্রের দ্বারা জানা যায়, এবং ছন্দঃ ও জ্যোতিষ। আর পরাবিদ্যা তাহাই, যাহা দ্বারা সেই অক্ষরকে জানিতে পারা যায়।'[1]

সুতরাং স্পষ্ট দেখা গেল যে, এই পরাবিদ্যাই ব্রহ্মজ্ঞান। দেবীভাগবতে পরাভক্তির এই লক্ষণগুলি পাই: তৈল যেমন এক পাত্র হইতে পাত্রান্তরে ঢালিবার সময় অবিচ্ছিন্ন ধারায় পতিত হয়, তেমনি মন যখন অবিচ্ছিন্ন-ভাবে ভগবানকে স্মরণ করিতে থাকে, তখনই পরাভক্তির উদয় হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।[2] অবিচ্ছিন্ন অনুরাগের সহিত ভগবানের দিকে হৃদয় ও মনের এরূপ অবিরত ও নিত্য স্থিরতাই মানব-হৃদয়ে সর্বোচ্চ ভগবৎ-প্রেমের প্রকাশ। আর সকল প্রকার ভক্তি কেবল এই পরাভক্তির—'রাগানুগা' ভক্তির সোপানমাত্র। (যখন সাধকের হৃদয়ে পরানুরাগের উদয় হয়, তখন তাঁহার মন সর্বদাই ভগবানের চিন্তা করিবে, আর কিছুই তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইবে না। তিনি নিজ মনে তখন ভগবানের চিন্তা ছাড়া অন্য কোন চিন্তাকে স্থান দিবেন না। তাঁহার আত্মা সম্পূর্ণ পবিত্র হইয়া মনোজগতের ও জড়জগতের স্থূল সূক্ষ্ম সর্বপ্রকার বন্ধন অতিক্রম করিয়া শান্ত ও মুক্ত ভাব ধারণ করিবে। এরূপ লোকই কেবল ভগবানকে নিজ হৃদয়ে উপাসনা করিতে সক্ষম। তাঁহার নিকট অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, প্রতীক ও প্রতিমা, শাস্ত্রাদি

---

১ দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।—মুণ্ডক উপ., ১।১।৪-৫

২ চেতসো বর্তনঞ্চৈব তৈলধারাসমং সদা।—দেবীভাগবত, ৭।৩৭।১২

ও মতামত সবই অনাবশ্যক হইয়া পড়ে—উহাদের দ্বারা তাঁহার আর কোন উপকার হয় না। ভগবান্‌কে এরূপভাবে ভালবাসা বড় সহজ নয়।

সাধারণ মানবীয় ভালবাসা—যেখানে প্রতিদান পায়, সেখানেই বৃদ্ধি পায়; যেখানে প্রতিদান না পায়, সেখানে উদাসীনতা আসিয়া ভালবাসার স্থান অধিকার করে। নিতান্ত অল্প ক্ষেত্রেই কিন্তু কোনরূপ প্রতিদান না পাইলেও প্রেমের বিকাশ দেখা যায়। একটি দৃষ্টান্ত দিবার জন্য আমরা অগ্নির প্রতি পতঙ্গের ভালবাসার সহিত ইহার তুলনা করিতে পারি। পতঙ্গ আগুনকে ভালবাসে, আর উহাতে আত্মসমর্পণ করিয়া প্রাণত্যাগ করে। পতঙ্গের স্বভাবই এই ভাবে অগ্নিকে ভালবাসা। জগতে যত প্রকার প্রেম দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে কেবল প্রেমের জন্যই যে প্রেম, তাহাই সর্বোচ্চ ও পূর্ণ নিঃস্বার্থ প্রেম। এইরূপ প্রেম আধ্যাত্মিকতার ভূমিতে কার্য করিতে আরম্ভ করিলেই পরাভক্তিতে লইয়া যায়।

প্রেম ত্রিকোণাত্মক

প্রেমকে আমরা একটি ত্রিকোণ-রূপে প্রকাশ করিতে পারি, উহার কোণগুলিই যেন উহার তিনটি অবিভাজ্য বৈশিষ্ট্যের প্রকাশক। তিনটি কোণ ব্যতীত একটি ত্রিকোণ বা ত্রিভুজ সম্ভব নয়, আর এই তিনটি লক্ষণ ব্যতীত প্রকৃত প্রেমও সম্ভব নয়। প্রেম-রূপ এই ত্রিকোণের একটি কোণ : প্রেমে কোন দর-কষাকষি বা কেনা-বেচার ভাব নাই। যেখানে কোন প্রতিদানের আশা থাকে, সেখানে প্রকৃত প্রেম সম্ভব নয়; সে-ক্ষেত্রে উহা কেবল দোকানদারিতে পরিণত হয়। যতদিন পর্যন্ত আমাদের ভগবানের প্রতি ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা ও আনুগত্য পালনের জন্য তাঁহার নিকট কোন না কোন অনুগ্রহ-প্রাপ্তির ভাব থাকে, ততদিন আমাদের হৃদয়ে প্রকৃত প্রেম থাকিতে পারে না। ভগবানের নিকট কিছু প্রাপ্তির আশায় যাহারা উপাসনা করে, তাহারা ঐ অনুগ্রহ-প্রাপ্তির আশা না থাকিলে তাঁহাকে উপাসনা করিবে না। ভক্ত ভগবানকে ভালবাসেন তিনি প্রেমাস্পদ বলিয়া, প্রকৃত ভক্তের এই দিব্য ভাবাবেগের আর কোন হেতু নাই।

কথিত আছে, কোন সময়ে এক বনে এক রাজার সহিত জনৈক সাধুর সাক্ষাৎ হয়। তিনি সাধুর সহিত কিয়ৎক্ষণ আলাপ করিয়াই তাঁহার পবিত্রতা ও জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। পরিশেষে তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, 'আমাকে কৃতার্থ করিবার জন্য আমার নিকট কিছু গ্রহণ করিতে হইবে।' সাধু কিছু গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন ও বলিলেন, 'বনের ফল আমার প্রচুর আহার, পর্বত-নিঃসৃত পবিত্র সরিৎ আমার পর্যাপ্ত পানীয়, বৃক্ষত্বক্ আমার পর্যাপ্ত পরিধেয় এবং গিরিগুহা আমার যথেষ্ট বাসস্থান। কেন আমি তোমার কিংবা অপরের নিকট কোন কিছু লইব?' রাজা বলিলেন, 'আমাকে অনুগৃহীত করিবার জন্য আমার সহিত রাজধানীতে রাজপ্রাসাদে চলুন এবং আমার নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করুন।' অনেক অনুনয়ের পর তিনি অবশেষে রাজার সহিত যাইতে স্বীকার করিলেন এবং তাঁহার সহিত প্রাসাদে গেলেন। দান করিবার পূর্বে রাজা পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন : হে ভগবান্, আমাকে আরও সন্তান-সন্ততি দাও, আরও ধন দাও, আরও রাজ্য

দাও, আমার শরীর নীরোগ কর, ইত্যাদি। রাজার প্রার্থনা শেষ হইবার পূর্বেই সাধু নীরবে ঘরের বাহিরে চলিয়া গেলেন। ইহা দেখিয়া রাজা হতবুদ্ধি হইয়া তাঁহার পশ্চাদ্‌গমন করিতে করিতে ডাকিয়া বলিতে লাগলেন, 'প্রভু, আমার দান গ্রহণ না করিয়াই চলিয়া গেলেন?' সাধু তাঁহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'ভিক্ষুকের কাছে আমি ভিক্ষা করি না। তুমি নিজে তো একজন ভিক্ষুক; তুমি আবার কিভাবে আমাকে কিছু দিতে পারো? আমি এত মূর্খ নই যে, ভিক্ষুকের নিকট দান গ্রহণ করিব। যাও, আমার অনুসরণ করিও না।'

এই গল্পটিতে ধর্মরাজ্যে ভিক্ষুক আর ভগবানের প্রকৃত ভক্তদের ভিতর বেশ প্রভেদ দেখানো হইয়াছে। (কোন বরলাভের জন্য, এমন কি মুক্তিলাভের জন্যও ভগবানের উপাসনা করা অধম উপাসনা। প্রেম কোন পুরস্কার চায় না, প্রেম সর্বদা প্রেমেরই জন্য। ভক্ত ভগবান্‌কে ভালবাসেন, কারণ তিনি না ভালবাসিয়া থাকিতে পারেন না। দৃষ্টান্ত: তুমি একটি সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া উহা ভালবাসিয়া ফেলিলে। তুমি ঐ দৃশ্যের নিকট হইতে কোনরূপ অনুগ্রহ ভিক্ষা কর না, আর সেই দৃশ্যও তোমার নিকট কিছুই প্রার্থনা করে না। তথাপি উহা দর্শন করিয়া তোমার মনে আনন্দের উদয় হয়—উহা তোমার মনের অশান্তি দূর করিয়া দেয়, উহা তোমাকে শান্ত করিয়া দেয়, তোমাকে ক্ষণকালের জন্য একরূপ মর্ত্য স্বভাবের ঊর্ধ্বে লইয়া যায় এবং এক স্বর্গীয় আনন্দে মনকে শান্ত করিয়া দেয়। ইহাই প্রকৃত প্রেমের ভাব, এবং এই বৈশিষ্ট্যই উক্ত ত্রিকোণাত্মক প্রেমের একটি কোণ। অতএব প্রেমের পরিবর্তে কিছু চাহিও না, সর্বদা দাতার আসন গ্রহণ কর। ভগবানকে তোমার প্রেম নিবেদন কর, পরিবর্তে তাঁহার নিকট কিছু চাহিও না।)

(প্রেমরূপ ত্রিকোণের দ্বিতীয় কোণ: প্রেমে কোনরূপ ভয় নাই। যাহারা ভয়ে ভগবানকে ভালবাসে, তাহারা মনুষ্যাধম; তাহাদের মনুষ্যভাব এখনও পূর্ণ বিকশিত হয় নাই। তাহারা শাস্তির ভয়ে ভগবানকে উপাসনা করে। তাহারা মনে করে, ভগবান্ এক বিরাট পুরুষ, তাঁহার এক হস্তে দণ্ড, এক হস্তে চাবুক; তাঁহার আজ্ঞাপালন না করিলে তাহারা দণ্ডিত হইবে। ভগবান্‌কে দণ্ডের ভয়ে উপাসনা করা অতি নিম্নশ্রেণীর উপাসনা। এইরূপ উপাসনাকে যদি উপাসনাই বলিতে হয়, তবে উহা অতি অপরিণত ভাবেরই উপাসনা। যতদিন হৃদয়ে কোনরূপ ভয় থাকে, ততদিন সেখানে ভালবাসাও থাকিবে কি করিয়া?

প্রেম স্বভাবতই সমুদয় ভয়কে জয় করিয়া ফেলে। কল্পনা কর, এক তরুণী জননী পথে চলিয়াছেন; একটি কুকুর ডাকিলেই তিনি ভয় পাইয়া তাড়াতাড়ি নিকটতম কোন গৃহে প্রবেশ করেন। কিন্তু যদি তাঁহার শিশু তাঁহার সঙ্গে থাকে এবং যদি একটি সিংহ শিশুটির উপর লাফাইয়া পড়ে, তখন সেই জননী কোথায় থাকিবেন?—সিংহের মুখে। শিশুটিকে বাঁচাইবার জন্য অবশ্যই তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিবেন। ভালবাসা সর্ববিধ ভয়কে জয় করে। আমি জগৎ হইতে পৃথক্—এই প্রকার একটি স্বার্থপর ভাব হইতেই ভয় জন্মে। মনকে সঙ্কীর্ণ করিয়া আমি নিজেকে যত স্বার্থপর করিয়া ফেলিব, আমার ভয়ও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। যদি কেহ মনে করে, সে কোন কাজের নয়, নিশ্চয়ই সে ভয়ে অভিভূত হইবে। আর নিজেকে যতই তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র বলিয়া না ভাবিবে, ততই তোমার ভয় কমিয়া যাইবে। যতদিন তোমার একবিন্দু ভয় আছে, ততদিন তোমার মধ্যে প্রেম থাকিতে পারে না। প্রেম ও ভয় দুইটি একত্র থাকিতে পারে না। যাঁহারা ভগবান্‌কে ভালবাসেন, তাঁহারা কখনই তাঁহাকে ভয় করিবেন না। 'ভগবানের নাম বৃথা লইও না'—এই আদেশ শুনিয়া প্রকৃত ভগবৎপ্রেমিক হাসিয়া উঠেন। প্রেমের ধর্মে ভগবন্নিন্দা কোথায়? যেরূপেই হউক, প্রভুর নাম যত লইতে পারো, ততই মঙ্গল। প্রকৃত ভক্ত তাঁহাকে ভালবাসে, তাই তো তাঁহার নাম করে।

প্রেমরূপ ত্রিকোণের তৃতীয় কোণঃ প্রেমে প্রতিদ্বন্দ্বীর স্থান নাই। প্রেমিকের আর দ্বিতীয় ভালবাসার পাত্র থাকিবে না, কারণ প্রেমেই প্রেমিকের সর্বোচ্চ আদর্শ রূপায়িত। যতদিন না ভালবাসার পাত্র আমাদের সর্বোচ্চ আদর্শ হইয়া দাঁড়ায়, ততদিন প্রকৃত প্রেম সম্ভব নয়। হইতে পারে, অনেক স্থলে মানুষের ভালবাসা ভুল পথে চালিত হয়, অপাত্রে অর্পিত হয়, কিন্তু প্রেমিকের পক্ষে তাহার প্রিয় সর্বদা তাহার সর্বোচ্চ আদর্শ। একজন হয়তো জঘন্যতম ব্যক্তিকে ভালবাসিতেছে, আর একজন—মহত্তম এক ব্যক্তিকে ভালবাসিতেছে, তা সত্ত্বেও উভয়ত্র নিজ আদর্শকেই ভালবাসা হইতেছে। প্রত্যেক ব্যক্তির উচ্চতম আদর্শকেই ঈশ্বর বলা হয়। অজ্ঞ বা জ্ঞানী, সাধু বা পাপী, নর বা নারী, শিক্ষিত বা অশিক্ষিত—সকলেরই উচ্চতম আদর্শ ঈশ্বর। সমুদয় সৌন্দর্য, মহত্ত্ব ও শক্তির উচ্চতম আদর্শসমূহ সমন্বিত করিলেই প্রেমময় ও প্রেমাস্পদ ভগবানের পূর্ণতম ভাব পাওয়া যায়।

এই আদর্শগুলি প্রত্যেক ব্যক্তির মনে কোন না কোনরূপে স্বভাবতই বর্তমান। উহারা যেন আমাদেরই মনের অঙ্গ বা অংশবিশেষ। মানবপ্রকৃতিতে যে-সকল ক্রিয়ার বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, ঐগুলি সবই আদর্শকে ব্যাবহারিক জীবনে পরিণত করিবার চেষ্টা। আমরা আমাদের চতুর্দিকে সমাজে যে নানাবিধ কর্মের প্রকাশ ও আন্দোলন দেখিতে পাই, তাহা ভিন্ন ভিন্ন আত্মার বিভিন্ন আদর্শকে কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টার ফলমাত্র। ভিতরে যাহা আছে, তাহাই বাহিরে আসিবার চেষ্টা করিতেছে। মানবহৃদয়ে আদর্শের এই চিরপ্রবল প্রভাবই একমাত্র প্রেরণাশক্তি, যাহা মানবজাতির মধ্যে সতত ক্রিয়াশীল। হইতে পারে, শত শত জন্মের পর, সহস্র সহস্র বৎসর চেষ্টার পর মানুষ বুঝিতে পারে আমাদের অন্তরের আদর্শ অনুযায়ী বাহিরকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা বা বাহিরের অবস্থাসমূহের সহিত ভিতরের আদর্শকে সম্পূর্ণ খাপ খাওয়াইবার চেষ্টা বৃথা। এইটি বুঝিতে পারিলে সাধক বহির্জগতে নিজের আদর্শ প্রক্ষেপ করিবার চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া সেই উচ্চতম প্রেমের ভূমি হইতে আদর্শকেই আদর্শরূপে উপাসনা করে। সমুদয় নিম্নস্তরের আদর্শগুলি এই পূর্ণ আদর্শের অন্তর্গত।

সকলেই এ কথার সত্যতা স্বীকার করেন যে, কুরূপার মধ্যেও প্রেমিক হেলেনের সৌন্দর্য দেখিয়া থাকেন। বাহিরের লোক বলিতে পারে, প্রেম অপাত্রে প্রদত্ত হইতেছে, কিন্তু প্রেমিক কুরূপা দেখেন না, তিনি তাঁহার হেলেনকেই দেখিয়া থাকেন। সুন্দর বা কুৎসিত যাহাই হউক, প্রেমের আধার প্রকৃতপক্ষে যেন একটি কেন্দ্র, তাহার চারিদিকে আমাদের আদর্শগুলি রূপায়িত হয়। সাধারণতঃ মানুষ কিসের উপাসনা করে?—অবশ্য শ্রেষ্ঠ ভক্ত প্রেমিকের সর্বাবগাহী পূর্ণ ভাবাদর্শ নয়। নরনারীগণ সাধারণতঃ নিজ নিজ অন্তরের আদর্শকেই উপাসনা করে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ আদর্শকে বাহিরে আনিয়া তাহারই সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করে। তাই তো আমরা দেখিতে পাই, যাহারা নিজেরা নিষ্ঠুর ও রক্তপিপাসু, তাহারা এক রক্তপিপাসু ঈশ্বর কল্পনা করে, কারণ তাহারা কেবল নিজ নিজ ভাবের উচ্চতম আদর্শকেই ভালবাসিতে পারে। এই জন্যই সদ্ভাবাপন্ন ব্যক্তির ঈশ্বরের আদর্শ অতি উচ্চ, তাঁহার আদর্শ অপর ব্যক্তির আদর্শ হইতে অত্যন্ত পৃথক্।

প্রেমের ভগবানের প্রমাণ তিনিই

যে প্রেমিক ব্যক্তি স্বার্থপরতা, লাভের আকাঙ্ক্ষা ও পরিবর্ত-ভাবের ঊর্ধ্বে উঠিয়াছেন এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে যাঁহার কোন ভয় নাই, তাঁহার আদর্শ কি? মহামোহময় ঈশ্বরকেও তিনি বলিবেন—আমি তোমাকে আমার সর্বস্ব দিয়াছি, আমার নিজের বলিতে আর কিছুই নাই, তথাপি তোমার নিকট হইতে আমি কিছুই চাই না। বাস্তবিক এমন কিছুই নাই, যাহা আমি 'আমার' বলিতে পারি। যখন সাধক এই দৃঢ় বিশ্বাস লাভ করেন, তখন তাঁহার আদর্শ প্রেমজনিত পূর্ণ নির্ভীকতার আদর্শে পরিণত হয়। এই প্রকার সাধকের সর্বোচ্চ আদর্শে কোন প্রকার বিশেষত্বরূপ সঙ্কীর্ণতা থাকে না। উহা সার্বভৌম প্রেম, অনন্ত ও অসীম প্রেম, উহাই প্রেমস্বরূপ। প্রেমের এই মহান্ আদর্শকে তখন সেই সাধক কোনরূপ প্রতীক বা প্রতিমার সহায়তা না লইয়াই উপাসনা করেন। এই সর্বাবগাহী প্রেমকে 'ইষ্ট' বলিয়া উপাসনা করাই পরাভক্তি। অন্য সকলপ্রকার ভক্তি কেবল উহা লাভের সোপানমাত্র।

এই প্রেমধর্ম অনুসরণ করিতে করিতে আমরা যে সফলতা বা বিফলতার সম্মুখীন হই, সে-সব এই আদর্শলাভের পথেই ঘটে। অন্তরে একটির পর একটি বস্তু গৃহীত হয় এবং আমাদের আদর্শ উহার উপর একে একে প্রক্ষিপ্ত হইতে থাকে। ক্রমশঃ এই সমুদয় বাহ্যবস্তুই ক্রমবিস্তারশীল সেই আভ্যন্তরীণ আদর্শকে প্রকাশ করিতে অক্ষম হয়, এবং ভক্ত স্বভাবতই একটির পর একটি আদর্শ পরিত্যাগ করেন। অবশেষে সাধক বুঝিতে থাকেন, বাহ্যবস্তুতে আদর্শ উপলব্ধি করিবার চেষ্টা বৃথা, আদর্শের সহিত তুলনায় সকল বাহ্যবস্তুই অতি তুচ্ছ। কালক্রমে তিনি সেই সর্বোচ্চ ও সম্পূর্ণ প্রেম লাভ করেন। উহা তাঁহার অন্তরে জীবন্ত ও সত্যস্বরূপে অনুভূত হয়। যখন ভক্ত এই অবস্থায় উপনীত হন, তখন 'ভগবান্‌কে প্রমাণ করা যায় কি না? ভগবান্ সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্ কি না?'—এই সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহার আর ইচ্ছাই হয় না। তাঁহার নিকট ভগবান্ প্রেমময়, প্রেমের সর্বোচ্চ আদর্শ এবং এই ভাবই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট। প্রেমরূপ বলিয়া ঈশ্বর স্বতঃসিদ্ধ, অন্যপ্রমাণ-নিরপেক্ষ। প্রেমিকের নিকট প্রেমময়ের অস্তিত্ব-প্রমাণের কিছুমাত্র আবশ্যকতা

নাই। অন্যান্য ধর্মের শাসক ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে অনেক যুক্তি আবশ্যক হয় বটে, কিন্তু এ অবস্থায় ভক্ত এরূপ ঈশ্বর ধারণা করিতে পারেন না। তাঁহার নিকট এখন ভগবান্ কেবল প্রেমস্বরূপে বর্তমান। সকলের অন্তর্যামিরূপে তাঁহাকে অনুভব করিয়া ভক্ত আনন্দে বলিয়া উঠেন, 'কেহই পতির জন্য পতিকে ভালবাসে না, পতির অন্তর্যামী আত্মার জন্যই পতিকে ভালবাসে। কেহই পত্নীর জন্য পত্নীকে ভালবাসে না, পত্নীর অন্তর্যামী আত্মার জন্যই পত্নীকে ভালবাসে।'

কেহ কেহ বলেন, স্বার্থপরতাই মানুষের সর্বপ্রকার কর্মের মূল। উহাও প্রেম, তবে (কোন বস্তু বা ব্যক্তিতে সীমাবদ্ধ হইয়া) 'বিশেষ'-ভাবাপন্ন হওয়ায় উহা নিম্নস্তরে নামিয়া গিয়াছে মাত্র। যখন আমি নিজেকে জগতের সকল বস্তুতে অবস্থিত ভাবি, তখন আমার প্রেম বিশ্বব্যাপী হয় এবং আমাতে স্বার্থপরতা থাকিতে পারে না। কিন্তু যখন আমি ভ্রমবশতঃ নিজেকে বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র প্রাণী মনে করি, তখন আমার প্রেম সঙ্কীর্ণ ও বিশেষ ভাব ধারণ করে। প্রেমের বিষয়কে সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ করায় আমাদের ভ্রম দৃঢ় হইয়া যায়। এই জগতের সকল বস্তুই ভগবৎ-প্রসূত, সুতরাং ভালবাসার যোগ্য। কিন্তু ইহা সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, সমষ্টিকে ভালবাসিলে অংশগুলিকেও ভালবাসা হইল। এই সমষ্টিই প্রেমের সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত ভক্তগণের ভগবান। ঈশ্বর-বিষয়ক অন্যান্য ভাব যথা—স্বর্গস্থ পিতা, শাস্তা, স্রষ্টা—নানাবিধ মতামত, শাস্ত্র প্রভৃতি এরূপ ভক্তের নিকট নিরর্থক, তাঁহাদের নিকট এ-সবের কোন প্রয়োজনীয়তা নাই; কারণ পরাভক্তির প্রভাবে তাঁহারা একেবারে এই সকলের ঊর্ধ্বে উঠিয়া গিয়াছেন।

যখন অন্তর শুদ্ধ, পবিত্র এবং ঐশ্বরিক প্রেমামৃতে পরিপূর্ণ হয়, তখন 'ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ'—এই ভাব ব্যতীত ঈশ্বরের অন্য সর্বপ্রকার ধারণা বালকোচিত ও অসম্পূর্ণ বা অনুপযুক্ত বলিয়া পরিত্যক্ত হয়। বাস্তবিক পরাভক্তির প্রভাবই এইরূপ। তখন সেই সিদ্ধ ভক্ত তাঁহার ভগবানকে মন্দিরাদিতে বা গির্জায় দর্শন করিতে যান না; তিনি এমন স্থানই দেখিতে পান না—যেখানে ভগবান্ নাই। তিনি তাঁহাকে মন্দিরের ভিতরে দেখিতে পান, বাহিরেও দেখিতে পান, সাধুর সাধুতায় দেখিতে পান, পাপীর পাপেও দেখিতে পান, কারণ তিনি যে পূর্বেই তাঁহাকে নিত্যদীপ্তিমান্ ও নিত্যবর্তমান এক সর্বশক্তিমান্ অনির্বাণ প্রেমজ্যোতিরূপে নিজ হৃদয়ে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

মানবীয় ভাষায় ভগবৎ-প্রেমের বর্ণনা

মানবীয় ভাষায় প্রেমের এই সর্বোচ্চ আদর্শ প্রকাশ করা অসম্ভব। উচ্চতম মানবকল্পনাও উহার অনন্ত পূর্ণতা ও সৌন্দর্য অনুভব করিতে অক্ষম। তথাপি সর্বদেশের নিম্ন ও উচ্চ ভাবের প্রেমধর্মের সাধকগণকে তাঁহাদের প্রেমের আদর্শ বুঝিতে ও বুঝাইতে চিরকালই এই অনুপযোগী মানবীয় ভাষা ব্যবহার করিতে হইয়াছে। শুধু উহাই নয়, বিভিন্ন প্রকারের মানবীয় প্রেমই এই অব্যক্ত ভগবৎ-প্রেমের প্রতীকরূপে গৃহীত হইয়াছে। মানব ঐশ্বরিক বিষয়-সমূহ নিজের মানবীয় ভাবেই চিন্তা করিতে পারে, এবং সেই পূর্ণ কেবল আমাদের আপেক্ষিক ভাষাতেই আমাদের নিকট প্রকাশিত হইতে পারে। সমুদয় জগৎ আমাদের নিকট যেন সীমার ভাষায় লেখা অসীমের কথা। এই কারণেই ভক্তেরা ভগবান্ ও তাঁহার উপাসনা-বিষয়ে লৌকিক প্রেমের লৌকিক ভাষা ও শব্দসমূহ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

পরাভক্তির কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা এই দিব্য প্রেম বিভিন্ন উপায়ে বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে সর্বনিম্ন অবস্থাকে 'শান্ত ভক্তি' বলে। যখন মানুষের হৃদয়ে প্রেমাগ্নি প্রজ্বলিত হয় নাই, বাহ্য ক্রিয়াকলাপও ভক্তি অপেক্ষা একটু উন্নততর সাধারণ ভালবাসার উদয় হইয়াছে মাত্র, উহাতে তীব্রবেগসম্পন্ন প্রেমের উন্মত্ততা মোটেই নাই, এভাবে ভগবানের উপাসনাকে 'শান্ত ভক্তি' বা 'শান্ত প্রেম' বলে। দেখিতে পাই, জগতে কতক লোক আছেন, তাঁহারা ধীরে ধীরে সাধনপথে অগ্রসর হইতে ভালবাসেন, আর কিছু লোক আছেন, তাঁহারা ঝড়ের মতো বেগে চলিয়া যান। শান্ত-ভক্ত ধীর শান্ত নম্র। তদপেক্ষা একটু উচ্চতর ভাব—দাস্য। এ অবস্থায় মানুষ নিজেকে ঈশ্বরের দাস ভাবে। বিশ্বাসী ভৃত্যের প্রভুভক্তিই তাঁহার আদর্শ।

তার পর 'সখ্য-প্রেম'—এই সখ্য-প্রেমের সাধক ভগবানকে সম্বোধন করিয়া থাকেন, 'তুমি আমার প্রিয় বন্ধু।'[১] এরূপ ভক্ত ভগবানের কাছে হৃদয় উন্মুক্ত

---

১ ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।—পাণ্ডবগীতা

করে, যেমন মানুষ বন্ধুর নিকট নিজের হৃদয় খোলে, এবং জানে বন্ধু তাহার দোষের জন্য তাহাকে কখনই তিরস্কার করিবে না, বরং সর্বদাই সাহায্য করিতে চেষ্টা করিবে। বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে যেমন একটা সমান সমান ভাব থাকে, সেইরূপ সখ্যপ্রেমের সাধক ও তাঁহার সখারূপ ভগবানের মধ্যে একটা সমভাবের আদানপ্রদান চলিতে থাকে। সুতরাং ভগবান আমাদের হৃদয়ের অতি সন্নিহিত বন্ধু হইলেন—সেই বন্ধুর নিকট আমরা আমাদের জীবনের সব কথা খুলিয়া বলিতে পারি, আমাদের অন্তরের গভীরতম প্রদেশের গুপ্তভাবগুলি তাঁহার নিকট জানাইতে পারি। সম্পূর্ণ ভরসা আছে যে, তিনি যাহাতে আমাদের মঙ্গল হয়, তাহাই করিবেন। এই ভাবিয়া আমরা একেবারে নিশ্চিন্ত হইতে পারি। এ অবস্থায় ভক্ত ভগবানকে তাঁহার সমান মনে করেন। ভগবান যেন আমাদের খেলার সাথী, আমরা সকলে যেন এই জগতে খেলা করিতেছি। যেমন ছেলেরা খেলা করে, যেমন মহামহিমান্বিত রাজা-মহারাজগণও নিজ নিজ খেলা খেলিয়া যান, সেইরূপ প্রেমময় ভগবান্‌ও নিজে জগতের সহিত খেলা করিতেছেন। তিনি পূর্ণ, তাঁহার কিছুরই অভাব নাই। তাঁহার সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন কি? আমরা কার্য করি, তাহার উদ্দেশ্য কোন অভাবপূরণ, আর অভাব বলিতেই অসম্পূর্ণতা বুঝায়। ভগবান্ পূর্ণ, তাঁহার কোন অভাব নাই। কেন তিনি এই নিয়ত কর্মময় সৃষ্টি লইয়া ব্যস্ত থাকেন? তাঁহার উদ্দেশ্য কি? ভগবানের সৃষ্টির উদ্দেশ্য-বিষয়ে আমরা যে-সকল উপন্যাস কল্পনা করি, সে-গুলি গল্পহিসাবে সুন্দর হইতে পারে, কিন্তু উহাদের অন্য কোন মূল্য নাই। বাস্তবিক সবই তাঁহার লীলা বা খেলা। এই জগৎ তাঁহার খেলা—ক্রমাগত এই খেলা চলিতেছে। তাঁহার পক্ষে সমুদয় জগৎ নিশ্চয়ই শেষ পর্যন্ত একটি মজার খেলামাত্র। যদি তুমি দরিদ্র হও, তবে ঐ অবস্থাকেই একটি কৌতুক বলিয়া উপভোগ কর—যদি ধনী হও তো ঐ অবস্থাও আর একটি তামাসারূপে সম্ভোগ কর। বিপদ আসে তো বেশ মজা, আবার সুখ পাইলে মনে করিতে হইবে, এ আরও ভাল মজা। সংসার একটি ক্রীড়াক্ষেত্র—আমরা এখানে বেশ নানারূপ কৌতুক উপভোগ করিতেছি—যেন খেলা হইতেছে, আর ভগবান আমাদের সহিত সর্বদাই খেলা করিতেছেন, আমরাও তাঁহার সহিত খেলিতেছি। ভগবান্ আমাদের অনন্তকালের খেলার সাথী, কেমন সুন্দর খেলা খেলিতেছেন! খেলা সাঙ্গ

হইল—এক যুগ শেষ হইল। তারপর অল্পাধিক সময়ের জন্য বিশ্রাম—তার পর আবার খেলা আরম্ভ—আবার জগতের সৃষ্টি কেবল যখন ভুলিয়া যাও সবই খেলা, আর তুমিও এ খেলার সহায়ক, তখনই—কেবল তখনই দুঃখকষ্ট আসিয়া উপস্থিত হয়; তখনই হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়, আর সংসার তোমার উপর প্রচণ্ড শক্তিতে চাপিয়া বসে। কিন্তু যখনই তুমি এই দু-দণ্ড জীবনের পরিবর্তনশীল ঘটনাবলীতে সত্যবুদ্ধি ত্যাগ কর, আর যখন সংসারকে লীলাভূমি ও নিজদিগকে তাঁহার লীলাসহায়ক বলিয়া মনে কর, তখনই তোমার দুঃখ চলিয়া যাইবে। প্রতি অণুতে তিনি খেলা করিতেছেন। তিনি খেলা করিতে করিতে পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতি নির্মাণ করিতেছেন। তিনি মনুষ্য-হৃদয়, প্রাণী ও উদ্ভিদ্‌সমূহের সহিত খেলা করিতেছেন। আমরা যেন তাঁহার হাতে দাবাবোড়ের ঘুঁটি, একটি ছকে বসাইয়া তিনি যেন সেগুলি চালিতেছেন। তিনি আমাদিগকে প্রথমে একদিকে, পরে অপর দিকে সাজাইতেছেন—আমরাও জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাঁহারই খেলার সহায়ক। কি আনন্দ! আমরা তাঁহার খেলার সহায়ক।

পরবর্তী ভাবকে 'বাৎসল্য' বলে। উহাতে ভগবানকে পিতা না ভাবিয়া সন্তান ভাবিতে হয়। এটি কিছু নূতন রকমের বোধ হইতে পারে, কিন্তু উহার উদ্দেশ্য ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের ধারণা হইতে ঐশ্বর্যের ভাবগুলি দূর করা। ঐশ্বর্য-ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই ভয় আসে। ভালবাসায় কিন্তু ভয় থাকা ঠিক নয়। চরিত্র-গঠনের জন্য ভক্তি ও আজ্ঞাবহতা অভ্যাস করা আবশ্যক বটে, কিন্তু একবার চরিত্র গঠিত হইয়া গেলে প্রেমিক যখন শান্ত-প্রেমের একটু আস্বাদ পান, আবার প্রেমের তীব্র উন্মত্ততাও কিছু আস্বাদ করেন, তখন তাঁহার আর নীতিশাস্ত্র, বিধিনিয়ম প্রভৃতির কিছুমাত্র প্রয়োজন থাকে না। ভক্ত বলেন, আমি ভগবানকে মহামহিম, ঐশ্বর্যশালী, জগদীশ্বর দেবদেবরূপে ভাবিতে চাই না। ভগবানের ধারণা হইতে এই ভয়োৎপাদক ঐশ্বর্যভাব দূর করিবার জন্য তিনি ভগবানকে নিজ শিশুসন্তানরূপে ভালবাসেন। মাতাপিতা সন্তানকে ভয় করেন না, তাহার প্রতি তাঁহাদের ভক্তিও হয় না। সন্তানের কাছে তাঁহাদের প্রার্থনা করিবারও কিছু থাকে না। সন্তান সর্বদাই গ্রহীতা, সন্তানের প্রতি ভালবাসার জন্য মাতাপিতা শত শতবার শরীরত্যাগ করিতে প্রস্তুত। তাঁহাদের একটি সন্তানের জন্য তাঁহারা সহস্র জীবন উৎসর্গ

করিতে প্রস্তুত। এই ভাব হইতে ভগবান্‌কে বাৎসল্যভাবে ভালবাসা হয়। যে-সকল ধর্মসম্প্রদায় বিশ্বাস করেন, ভগবান্ অবতীর্ণ হন, তাঁহাদের মধ্যেই এই বাৎসল্যভাবে উপাসনা স্বাভাবিক। মুসলমানদের পক্ষে ভগবান্‌কে বাৎসল্যভাবে উপাসনা করা অসম্ভব, তাঁহারা ভয়ে এ-ভাব হইতে দূরে সরিয়া যাইবেন। কিন্তু খ্রীষ্টান ও হিন্দু সহজেই ইহা বুঝিতে পারেন, কারণ তাঁহাদের মাতৃক্রোড়ে যীশু ও কৃষ্ণের শিশুমূর্তি রহিয়াছে। ভারতীয় নারীগণ অনেক সময় নিজদিগকে শ্রীকৃষ্ণের মাতা বলিয়া চিন্তা করেন; খ্রীষ্টান জননীগণও নিজদিগকে খ্রীষ্টের মাতা বলিয়া চিন্তা করিতে পারেন। ইহা হইতে পাশ্চাত্য দেশে ঈশ্বরের মাতৃভাবের জ্ঞান আসিবে; আর ইহা তাঁহাদের বিশেষ প্রয়োজন। ভগবানের প্রতি ভয়ভক্তিরূপ কুসংস্কার আমাদের অন্তরের অন্তস্তলে দৃঢ়মূল হইয়া আছে। এই ভয়মিশ্রিত ভক্তি ও ঐশ্বর্যমহিমার ভাব প্রেমে একেবারে নিমজ্জিত করিয়া দিতে অনেক দিন লাগে।

মানবীয় ভাবের আর একটি রূপে ভগবৎ-প্রেমের আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছে। উহার নাম 'মধুর'-ভাব, সর্বপ্রকার ভাবের মধ্যে উহাই শ্রেষ্ঠ। এ সংসারে প্রকাশিত সর্বোচ্চ প্রেমের উপর উহার ভিত্তি—আর মানবীয় অভিজ্ঞতায় যতপ্রকার প্রেম আছে, তাহার মধ্যে উহাই উচ্চতম ও প্রবলতম। স্ত্রী-পুরুষের প্রেম যেরূপ মানুষের সমুদয় প্রকৃতিকে ওলট-পালট করিয়া দেয়, আর কোন্ প্রেম সেরূপ করিতে পারে? কোন্ প্রেম মানুষের প্রতিটি পরমাণুর মধ্য দিয়া সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে পাগল করিয়া তুলে?—তাহার নিজের প্রকৃতি ভুলাইয়া দেয়? মানুষকে হয় দেবতা, নয় পশু করিয়া ফেলে? দিব্য প্রেমের এই মধুর-ভাবে ভগবান্ আমাদের পতি। আমরা সকলে স্ত্রী, জগতে পুরুষ আর কেহ নাই। একমাত্র পুরুষ আছেন—তিনিই, আমাদের সেই প্রেমাস্পদই একমাত্র পুরুষ। পুরুষ স্ত্রীকে এবং স্ত্রী পুরুষকে যে ভালবাসা দিয়া থাকে, সেই ভালবাসা ভগবান্‌কে অর্পণ করিতে হইবে।

আমরা জগতে যত প্রকার প্রেম দেখিতে পাই, যাহা লইয়া আমরা অল্পাধিক পরিমাণে খেলাই করিতেছি, ভগবান্‌ই সেগুলির একমাত্র লক্ষ্য। তবে দুঃখের বিষয়, যে অনন্ত সমুদ্রে প্রেমের প্রবল স্রোতস্বতী অবিরতভাবে প্রবাহিত হইতেছে, মানব তাহা জানে না; সুতরাং নির্বোধের ন্যায় সে মানুষরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুতুলের প্রতি উহা প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করে। মানবপ্রকৃতিতে

সন্তানের প্রতি যে প্রবল স্নেহ দেখা যায়, তাহা কেবল একটি সন্তানরূপ ক্ষুদ্র পুতুলের জন্য নয়; যদি তুমি অন্ধভাবে ঐ একটিমাত্র সন্তানের উপরই উহা প্রয়োগ কর, তবে সেজন্য তোমাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে। কিন্তু ঐ কষ্টভোগ হইতেই তোমার এই বোধ আসিবে, তোমার ভিতরে যে-প্রেম আছে, তাহা যদি কোন মনুষ্যে প্রয়োগ কর, তবে শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক, মনে দুঃখ ও বেদনা পাইবে। অতএব আমাদের প্রেম সেই পুরুষোত্তমকেই দিতে হইবে—যাঁহার বিনাশ নাই, যাঁহার কখন কোন পরিবর্তন নাই, যাঁহার প্রেমসমুদ্রে জোয়ার-ভাঁটা নাই। প্রেম যেন তাহার প্রকৃত লক্ষ্যে উপনীত হয়, যেন উহা ভগবানের নিকট পৌঁছায়—যিনি প্রকৃতপক্ষে প্রেমের অনন্ত সমুদ্রস্বরূপ, প্রেম যেন তাঁহারই নিকট পৌঁছায়। সকল নদীই সমুদ্রে গিয়া পড়ে, একটি জলবিন্দুও পর্বতগাত্র হইতে পতিত হইয়া নদীতে থামিতে পারে না, ঐ নদী যত বড়ই হউক না কেন! অবশেষে সেই জলবিন্দু কোন না কোনরূপে সমুদ্রে যাইবার পথ করিয়া লয়। ভগবান্‌ই আমাদের সর্বপ্রকার ভাবাবেগের একমাত্র লক্ষ্য। যদি রাগ করিতে চাও, ভগবানের উপর রাগ কর। তোমার প্রেমাস্পদকে তিরস্কার কর, বন্ধুকে ভর্ৎসনা কর; আর কাহাকে তুমি নির্ভয়ে তিরস্কার করিতে পারো? মর্ত্য-জীব তোমার রাগ সহ্য করিবে না; প্রতিক্রিয়া আসিবেই। যদি তুমি আমার উপর ক্রুদ্ধ হও, আমিও অবশ্যই সঙ্গে সঙ্গে তোমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিব, কারণ আমি তোমার ক্রোধ সহ্য করিতে পারিব না। তোমার প্রেমাস্পদকে বলো, 'তুমি আমার কাছে কেন আসিতেছ না? কেন তুমি আমাকে এভাবে একা ফেলিয়া রাখিয়াছ?' ভগবান্ ছাড়া আর কিসে আনন্দ আছে? ছোট ছোট মাটির ঢিপিতে আর কি সুখ? অনন্ত আনন্দের ঘনীভূত ভাবকেই অন্বেষণ করিতে হইবে—ভগবান্‌ই এই আনন্দের ঘনীভূত ভাব। আমাদের সকল ভাবাবেগ যেন তাঁহারই সমীপে উন্নীত হয়। ঐগুলি তাঁহারই জন্য অভিপ্রেত; লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলে ঐগুলি নীচভাবে পরিণত হয়; সোজা লক্ষ্যস্থলে অর্থাৎ ঈশ্বরের নিকট পৌঁছিলে অতি নিম্নতম বৃত্তি পর্যন্ত রূপান্তরিত হয়। মানুষের শরীর ও মনের সমুদয় শক্তি যে ভাবেই প্রকাশিত হউক না কেন, ভগবান্‌ই উহাদের একমাত্র লক্ষ্য—'একায়ন'। মনুষ্যহৃদয়ের সব ভালবাসা—সব প্রবৃত্তি যেন ভগবানের দিকেই যায়; তিনিই একমাত্র প্রেমাস্পদ। এই হৃদয় আর

কাহাকে ভালবাসিবে? তিনিই পরম সুন্দর, পরম মহৎ, সৌন্দর্যস্বরূপ, মহত্ত্বস্বরূপ। তাঁহা অপেক্ষা সুন্দর জগতে আর কে আছে? তিনি ব্যতীত স্বামী হইবার উপযুক্ত জগতে আর কে আছে? জগতে ভালবাসার উপযুক্ত পাত্র আর কে আছে? অতএব তিনিই যেন আমাদের স্বামী হন, তিনিই যেন আমাদের প্রেমাস্পদ হন।

অনেক সময় দেখা যায়, দিব্যপ্রেমে মাতোয়ারা ভক্তগণ এই ভগবৎপ্রেম বর্ণনা করিতে গিয়া সর্বপ্রকার মানবীয় প্রেমের ভাষাই ব্যবহার করিয়া থাকেন, উহাকেই যথেষ্ট উপযোগী মনে করেন। মূর্খেরা ইহা বুঝে না—তাহারা কখন ইহা বুঝিবে না। তাহারা উহা কেবল জড়দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে। তাহারা এই আধ্যাত্মিক প্রেমোন্মত্ততা বুঝিতে পারে না। কেমন করিয়া বুঝিবে? 'হে প্রিয়তম, তোমার অধরের একটিমাত্র চুম্বন! যাহাকে তুমি একবার চুম্বন করিয়াছ, তোমার জন্য তাহার পিপাসা বর্ধিত হইয়া থাকে। তাহার সকল দুঃখ চলিয়া যায়। সে তোমা ব্যতীত আর সব ভুলিয়া যায়।'[১] প্রিয়তমের সেই চুম্বন—তাঁহার অধরের সহিত সেই স্পর্শের জন্য ব্যাকুল হও—যাহা ভক্তকে পাগল করিয়া দেয়, যাহা মানুষকে দেবতা করিয়া তুলে। ভগবান্ যাঁহাকে একবার তাঁহার অধরামৃত দিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন, তাঁহার সমুদয় প্রকৃতিই পরিবর্তিত হইয়া যায়। তাঁহার পক্ষে জগৎ অন্তর্হিত হয়—তাঁহার পক্ষে সূর্য-চন্দ্রের আর অস্তিত্ব থাকে না, সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চই সেই এক অনন্ত প্রেমের সমুদ্রে বিগলিত হইয়া যায়। ইহাই প্রেমোন্মত্ততার চরম অবস্থা।

প্রকৃত ভগবৎপ্রেমিক আবার ইহাতেও সন্তুষ্ট নন। স্বামি-স্ত্রীর প্রেমও তাঁহার নিকট তত উন্মাদক নয়। ভক্তেরা অবৈধ (পরকীয়) প্রেমের ভাব গ্রহণ করিয়া থাকেন, কারণ উহা অতিশয় প্রবল। উহার অবৈধতা তাঁহাদের লক্ষ্য নয়। এই প্রেমের প্রকৃতি এই যে, যতই উহা বাধা পায়, ততই উগ্রভাব ধারণ করে। স্বামি-স্ত্রীর ভালবাসা সহজ স্বচ্ছন্দ—উহাতে কোন বাধাবিঘ্ন নাই। সেই জন্য ভক্তেরা কল্পনা করেন, যেন কোন নারী তাঁহার

১ সুরতবর্ধনং শোকনাশনং স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতম্।
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্ ॥—শ্রীমদ্ভাগবত, ১০।৩১।১৪

প্রিয়তম পুরুষে আসক্ত, এবং তাঁহার পিতা, মাতা বা স্বামী ঐ প্রেমের বিরোধী। যতই ঐ প্রেম বাধাপ্রাপ্ত হয়, ততই উহা প্রবল ভাব ধারণ করিতে থাকে। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে কিরূপ লীলা করিতেন, কিরূপে সকলে উন্মত্ত হইয়া তাঁহাকে ভালবাসিত, কিরূপে তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র গোপীরা—সেই ভাগ্যবতী গোপীরা সবকিছু ভুলিয়া—জগৎ ভুলিয়া, জগতের সকল বন্ধন, সাংসারিক কর্তব্য, সংসারের সুখদুঃখ ভুলিয়া—তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত, মানবীয় ভাষা তাহা প্রকাশ করিতে অক্ষম। মানুষ—মানুষ, তুমি ভগবৎ-প্রেমের কথা বলো, আবার জগতের সব অসার বিষয়ে নিযুক্ত থাকিতেও পারো; তোমার কি মন মুখ এক? 'যেখানে রাম আছেন, সেখানে কাম থাকিতে পারে না। যেখানে কাম, সেখানে রাম থাকিতে পারেন না; এই দুইটি কখন একত্র থাকে না। আলো এবং অন্ধকার (রবি ও রজনী) কখন একসঙ্গে থাকে না।'[১]

১ জহাঁ রাম তহাঁ কাম নহীঁ, জহাঁ কাম তহাঁ নহীঁ রাম।
দুঁহু মিলত নহীঁ রব রজনী নহীঁ মিলত একঠাম।—দোহা, তুলসীদাস

উপসংহার

যখন প্রেমের এই উচ্চতম আদর্শে উপনীত হওয়া যায়, তখন দর্শনশাস্ত্র ফেলিয়া দিতে হয়, কে আর তখন ঐগুলির জন্য ব্যস্ত হইবে? মুক্তি, উদ্ধার, নির্বাণ—এ-সবই তখন কোথায় চলিয়া যায়! এই ঈশ্বর-প্রেম সম্ভোগ করিতে পাইলে কে মুক্ত হইতে চায়? 'ভগবন্, আমি ধন জন সৌন্দর্য বিদ্যা—এমন কি মুক্তি পর্যন্ত চাই না। জন্মে জন্মে তোমাতে যেন আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে।'[1] ভক্ত বলেন, 'চিনি হওয়া ভাল নয়, চিনি খেতে ভালবাসি।' তখন কে মুক্ত হইবার ইচ্ছা করিবে? কে ভগবানের সহিত এক হইয়া যাইবার আকাঙ্ক্ষা করিবে? ভক্ত বলেন, 'আমি জানি—তিনি ও আমি এক, তথাপি আমি তাঁহা হইতে নিজেকে পৃথক্ রাখিয়া প্রিয়তমকে সম্ভোগ করিব।'

প্রেমের জন্য প্রেম—ইহাই ভক্তের সর্বোচ্চ সুখ। প্রিয়তমকে সম্ভোগ করিবার জন্য কে না সহস্রবার বদ্ধ হইবে? কোন ভক্তই প্রেম ব্যতীত অন্য কিছু কামনা করেন না; তিনি স্বয়ং ভালবাসিতে চান, আর চান ভগবান যেন তাঁহাকে ভালবাসেন। তাঁহার নিষ্কাম প্রেম—যেন উজান বাহিয়া যাওয়া। প্রেমিক যেন নদীর উৎপত্তিস্থানের দিকে—স্রোতের বিপরীত দিকে যান। জগৎ তাঁহাকে পাগল বলে। আমি একজনকে জানি, লোকে তাঁহাকে পাগল বলিত। তিনি উত্তর দিতেন, 'বন্ধুগণ, সমুদয় জগৎ তো একটা বাতুলালয়। কেহ সাংসারিক প্রেম লইয়া উন্মত্ত, কেহ নামের জন্য, কেহ যশের জন্য, কেহ অর্থের জন্য, আবার কেহ বা স্বর্গলাভের জন্য পাগল। এই বিরাট বাতুলালয়ে আমিও পাগল, আমি ভগবানের জন্য পাগল। তুমি টাকার জন্য পাগল, আমি ঈশ্বরের জন্য পাগল। তুমিও পাগল, আমিও পাগল। আমার বোধ হয়, শেষ পর্যন্ত আমার পাগলামিই সব চেয়ে ভাল।' প্রকৃত ভক্তের প্রেম এই প্রকার তীব্র উন্মত্ততা, উহার কাছে আর সব আকর্ষণই অন্তর্হিত হয়। সমুদয় জগৎ তাঁহার নিকট কেবল প্রেমে পূর্ণ—প্রেমিকের চক্ষে এইরূপই বোধ হয়।

১ ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাম্ বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।—শিক্ষাষ্টকম্, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

মানুষের হৃদয়ে যখন এই প্রেম আবির্ভূত হয়, তখন তিনি অনন্তকালের জন্য সুখী, চিরকালের জন্য মুক্ত হইয়া যান। ভগবৎ-প্রেমের এই পবিত্র উন্মত্ততাই কেবল আমাদের সংসার-ব্যাধি চিরকালের জন্য আরোগ্য করিতে পারে।

দ্বৈতভাব লইয়াই আমাদিগকে প্রেমের ধর্ম আরম্ভ করিতে হয়। আমাদের মনে হয়, ভগবান্ আমাদের হইতে পৃথক, আর আমরাও নিজদিগকে তাঁহা হইতে ভিন্ন বোধ করি। উভয়ের মধ্যে প্রেম আসিয়া মিলন সম্পাদন করে। তখন মানুষ ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, আর ভগবান্‌ও ক্রমশঃ মানুষের নিকটতর হইতে থাকেন। মানুষ সংসারের সব সম্বন্ধ—যেমন পিতা, মাতা, পুত্র, সখা, প্রভু, প্রণয়ী প্রভৃতির ভাব লইয়া তাহার প্রেমের আদর্শ ভগবানের প্রতি আরোপ করিতে থাকে। তাহার নিকট ভগবানই সর্বরূপে বিরাজিত। আর তখনই সাধক উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হন, যখন তিনি নিজ উপাস্য দেবতায় সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হইয়া যান। প্রথম অবস্থায় আমরা সকলেই নিজেদের ভালবাসি। এই ক্ষুদ্র অহং-এর অসঙ্গত দাবি ভালবাসাকেও স্বার্থপর করিয়া তুলে। অবশেষে কিন্তু পূর্ণ জ্ঞানজ্যোতির বিকাশ হয়, তখন দেখা যায়—এই ক্ষুদ্র 'অহং' সেই অনন্তের সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছে, মানুষ স্বয়ং এই প্রেমজ্যোতির সম্মুখে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া যায়। পূর্বে অল্লাধিক পরিমাণে তাঁহার যে-সকল মলিনতা ও বাসনা ছিল, তখন তাহা সব চলিয়া যায়। অবশেষে তিনি এই সুন্দর প্রাণস্পর্শী সত্য অনুভব করেন, প্রেম প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ একই।

ভক্তি-রহস্য

উদ্বোধন হইতে প্রকাশিত 'Religion of Love' পুস্তকের

(ইংরেজী) চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা হইতে

স্বামী বিবেকানন্দ Religion of Love'[১] বা 'ভক্তি-রহস্য' সম্বন্ধে —কিছু ইংলণ্ডে এবং কিছু যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকায়—যে-সকল বক্তৃতা দিয়াছিলেন, সেগুলিরই কয়েকটি এই বক্তৃতা-সংগ্রহে নিবদ্ধ হইয়াছে।...

এই বক্তৃতা-সংগ্রহ স্বামীজীর 'ভক্তিযোগ' সম্বন্ধে বক্তৃতামালা হইতে স্বতন্ত্র ধরনের—বিষয়বস্তু উভয়ত্র এক হইলেও এখানে আলোচনা ও বিশ্লেষণ গভীর অথচ অধিকতর সহজবোধ্য হইয়াছে।

সেপ্টেম্বর, ১৯২২ — প্রকাশক

১ ইংরেজী Complete Works-এ এগুলি 'Addresses on Bhakti Yoga' নামে প্রকাশিত।

চিকাগোতে স্বামীজী, ১৮৯৩

ভক্তির সাধন

যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু ॥[১]

—বিবেকহীন ব্যক্তিগণের ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহের প্রতি যেরূপ প্রগাঢ় প্রীতি, তোমার জন্য ব্যাকুল আমার এই হৃদয় হইতে সেইরূপ প্রীতি যেন কখনও দূর না হয়।

প্রহ্লাদের এই উক্তিটিই ভক্তির সর্বোৎকৃষ্ট সংজ্ঞা বলিয়া মনে হয়

আমরা দেখিতে পাই, যাহারা উচ্চতর কিছু জানে না, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে—টাকাকড়ি, বেশভূষা, স্ত্রীপুত্র, বন্ধুবান্ধব ও সম্পত্তিতে—তাহাদের কি দারুণ প্রীতি, কি প্রচণ্ড আসক্তি! তাই ভক্তরাজ প্রহ্লাদ পূর্বোক্ত শ্লোকে বলিতেছেন, 'আমি কেবল তোমার প্রতি ঐরূপ প্রবলভাবে অনুরক্ত হইব, কেবল তোমাকে ঐরূপ প্রাণের সহিত ভালবাসিব, আর কাহাকেও নয়।' এই প্রীতি, এই আসক্তি ঈশ্বরে প্রযুক্ত হইলেই তাহা 'ভক্তি' আখ্যা লাভ করে। ভক্তিতে কিছুই ধ্বংস করিতে হয় না। ভক্তিযোগে বলা হয়, আমাদের কোন প্রবৃত্তিই বৃথা নয়, বরং ঐগুলির সাহায্যেই আমরা স্বাভাবিক উপায়ে মুক্তিলাভ করিয়া থাকি। ভক্তি কোন প্রবৃত্তিকে জোর করিয়া নষ্ট করে না, —ভক্তি প্রকৃতির বিরোধী হয় না, শুধু মোড় ফিরাইয়া উহাকে উচ্চতর পথে বেগে চালিত করিয়া দেয়।

আমরা কত স্বাভাবিকভাবে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়গুলি ভালবাসি, ঐগুলিকে না ভালবাসিয়া আমরা থাকিতে পারি না, কারণ ঐগুলি আমাদের নিকট পরম সত্য বলিয়া প্রতীত হয়। আমরা সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় অপেক্ষা উচ্চতর বস্তুর সত্যতা বুঝিতে পারি না। যখন মানুষ ইন্দ্রিয়াতীত—পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বাহিরে অবস্থিত—কোন সত্য অনুভব করে, তখনও তাহার আসক্তি থাকিতে পারে, তবে উহাকে বিষয়ে আবদ্ধ না রাখিয়া সেই ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু—ঈশ্বরের প্রতি প্রয়োগ করিতে হইবে। আর পূর্বে

[১] বিষ্ণুপুরাণ, ১।২০।১৯

ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে যে প্রীতি বা অনুরাগ ছিল, তাহা যখন ঈশ্বরের প্রতি প্রযুক্ত হয়, তখন তাহাকেই 'ভক্তি' বলে। রামানুজাচার্যের মতে এই প্রবল অনুরাগ বা ভক্তিলাভের জন্য নিম্নলিখিত সাধন-প্রণালী অর্থাৎ উপায়গুলি অনুষ্ঠান করিতে হয়।

প্রথমতঃ 'বিবেক'। এই বিবেক-সাধনটি বিশেষতঃ পাশ্চাত্যবাসীদের নিকট একটি অদ্ভুত জিনিস। রামানুজের মতে ইহার অর্থ 'খাদ্যাখাদ্যের বিচার।' যে-সকল উপাদানে দেহ ও মনের বিভিন্ন শক্তি গঠিত হয়, খাদ্যের মধ্যে সেইগুলি বর্তমান; আমি এখন যেরূপ শক্তি প্রকাশ করিতেছি, তাহার সবই আমার ভুক্ত খাদ্যের মধ্যে ছিল; আমার দেহমনের ভিতর উহা পরিবর্তিত, সঞ্চিত ও নূতনদিকে চালিত হইয়াছে মাত্র, কিন্তু ভুক্ত খাদ্যদ্রব্যের সহিত আমার দেহমনের স্বরূপতঃ কোন প্রভেদ নাই। বহির্জগতের জড়বস্তু ও শক্তি আমাদের ভিতর দেহ ও মনের আকার ধারণ করে, দেহ মন এবং খাদ্যের মধ্যে প্রভেদ কেবল প্রকাশের তারতম্যে। তাই যদি হইল, অর্থাৎ যদি আমাদের খাদ্যের জড়কণাগুলি হইতে আমরা চিন্তাশক্তির যন্ত্র প্রস্তুত করি, আর ঐ কণাগুলির মধ্যবর্তী সূক্ষ্মতর শক্তিসমূহ হইতে আমরা চিন্তাও উৎপন্ন করি, তবে ইহাও সহজেই প্রমাণিত হইবে যে, এই চিন্তাশক্তি ও তাহার যন্ত্র উভয়ই আমাদের ভুক্ত খাদ্যদ্রব্যের দ্বারা প্রভাবিত হইবে, বিশেষ প্রকার খাদ্য মনে বিশেষ প্রকার পরিবর্তন উৎপাদন করিবে; প্রতিদিনই আমরা ইহা দেখিয়া থাকি। আরও কত প্রকার খাদ্য আছে, সেগুলি শরীরে পরিবর্তন সাধন করে, পরিণামে মনকেও প্রবলভাবে প্রভাবিত করে। ইহা একটি বিশেষ শিক্ষণীয় তত্ত্ব; আমরা যত দুঃখভোগ করিয়া থাকি, তাহার অধিকাংশই আমাদের আহার হইতে জাত। আপনারা দেখিয়াছেন, অতিরিক্ত ও গুরুপাক ভোজনের পর মনকে সংযত করা বড়ই কঠিন, তখন মন অবিরত ছুটিতে থাকে! কতকগুলি খাদ্য উত্তেজক—সেইগুলি খাইলে দেখিবেন, মনকে সংযত করিতে পারিতেছেন না। অধিক পরিমাণে সুরা বা অন্যান্য মাদকদ্রব্য পান করিলে মানুষ বুঝিতে পারে, মনকে আর সংযত রাখা যাইবে না। মন তাহার আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যায়।

রামানুজাচার্যের মতে খাদ্যসম্বন্ধীয় ত্রিবিধ দোষ পরিহার করা কর্তব্য। প্রথমতঃ জাতিদোষ। জাতিদোষ অর্থে সেই খাদ্যবিশেষের প্রকৃতিগত দোষ

বুঝায়। সর্বপ্রকার উত্তেজক খাদ্য পরিত্যাগ করিতে হইবে—যথা, মাংস। মাংসাহার ত্যাগ করিতে হইবে, কারণ উহা স্বভাবতই অপবিত্র। অন্যের প্রাণনাশ করিয়া তবে মাংস পাইতে পারি। মাংস খাইয়া আমরা ক্ষণিক সুখ পাই, আর আমাদের সেইটুকু সুখের জন্য একটি প্রাণীকে তাহার প্রাণ দিতে হয়। শুধু তাই নয়, এজন্য আমরা মানুষেরও অবনতির কারণ হইয়া থাকি। মাংসাশী প্রত্যেক ব্যক্তি যদি নিজে সেই প্রাণীটি হত্যা করিত, তাহা হইলে বরং ভাল হইত। তাহা না করিয়া সমাজ একদল লোক সৃষ্টি করিয়া তাহাদের দ্বারা এই কাজ করাইয়া লয়, আবার সেই হত্যাকার্যের জন্য সমাজ তাহাদিগকে ঘৃণা করে। এখানকার আইন জানি না, কিন্তু ইংলণ্ডে কসাই কখনও জুরির আসন গ্রহণ করিতে পারে না—ভাবটা এই যে, কসাই স্বভাবতঃ নিষ্ঠুর। তাহাকে নিষ্ঠুর করিয়াছে কে ?—সমাজ। আমরা যদি মাংস ভক্ষণ না করিতাম, তবে কেহ কখনই কসাই হইত না। মাংসভক্ষণ কেবল তাহারাই করিতে পারে, যাহাদের হাড়ভাঙা পরিশ্রম করিতে হয়, এবং যাহারা ভক্তিযোগ-সাধনে প্রবৃত্ত হইতেছে না। কিন্তু ভক্ত হইতে গেলে মাংসভোজন পরিত্যাগ করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য উত্তেজক খাদ্য যথা—পেঁয়াজ, রসুন, সাওয়ারক্রট (Sauerkraut)[১] প্রভৃতি দুর্গন্ধ খাদ্য ত্যাগ করিতে হইবে। আরও পূতি, পর্যুষিত এবং যাহার স্বাভাবিক রস প্রায় শুকাইয়া গিয়াছে, এরূপ খাদ্যও বর্জন করিতে হইবে।[২]

খাদ্য সম্বন্ধে দ্বিতীয় দোষের নাম 'আশ্রয়দোষ'। পাশ্চাত্যগণের পক্ষে এটি বুঝা আরও কঠিন। 'আশ্রয়দোষ' অর্থে বুঝিতে হইবে, যে ব্যক্তির নিকট হইতে খাদ্য আসিতেছে, তাহার সংস্পর্শে খাদ্যে যে দোষ জন্মে। এটি হিন্দুদের একটি রহস্যপূর্ণ মতবাদ। ইহার তাৎপর্য এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তির দেহের চতুর্দিকে এক প্রকার জ্যোতি রহিয়াছে। ঐ ব্যক্তি যাহা কিছু স্পর্শ করে, তাহাতেই যেন তাহার প্রভাব, তাহার মনের—তাহার চরিত্রের বা ভাবের কিছু অংশ লাগিয়া থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তির দেহ হইতে তাহার শক্তির মতো চরিত্র-বৈশিষ্ট্যও যেন বহির্গত হইতেছে, আর ঐ ব্যক্তি যাহা কিছু স্পর্শ করে, তাহাই

১ ইহা এক প্রকার জার্মানদেশীয় চাটনি—লবণজল সহযোগে বাঁধাকপি হইতে প্রস্তুত।

২ গীতা, ১৭।১০

তাহা দ্বারা প্রভাবিত হয়। অতএব রন্ধনের সময় কে আমাদের খাদ্য স্পর্শ করিল, সে-দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কোন দুশ্চরিত্র বা মন্দ ব্যক্তি যেন উহা স্পর্শ না করে। যিনি ভক্ত হইতে চান, তিনি যাহাদিগকে অসচ্চরিত্র বলিয়া জানেন, তাহাদের সহিত একসঙ্গে খাইতে বসিবেন না, কারণ খাদ্যের মধ্য দিয়া তাঁহার ভিতর অসদ্ভাব সংক্রমিত হইবে।

তৃতীয় 'নিমিত্তদোষ'। এটি বুঝা খুব সহজ। খাদ্যে ধূলি প্রভৃতির সংস্পর্শ যেন কখনও না হয়। বাজার হইতে রাজ্যের ধূলিযুক্ত খাবার আনিয়া, উত্তমরূপে পরিষ্কার না করিয়া টেবিলের উপর রাখা ঠিক নয়। থুতু, লালা প্রভৃতি হইতেও সাবধান হইতে হইবে। ঈশ্বর আমাদিগকে সব জিনিস ধুইবার জন্য যথেষ্ট জল দিয়াছেন! অতএব ঠোঁটে আঙুল ঠেকাইয়া লালা দ্বারা সব জিনিস স্পর্শ করার মতো কদর্য অভ্যাস আর কিছু নাই। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী (mucous membrane) শরীরের মধ্যে অতি কোমলাংশ, এগুলি হইতে নিঃসৃত লালা দ্বারা অতি সহজে সমুদয় ভাব সংক্রমিত হয়। কোন দ্রব্যে লালার স্পর্শ—শুধু দোষাবহ নয়, বিপজ্জনক। তারপর একজন যে জিনিসের আধখানা কামড়াইয়া খাইয়াছে, তাহা খাওয়া উচিত নয়; যথা, একজন একটা আপেল এক কামড় খাইয়া বাকিটা খাইতে দেয়, এরূপ করা উচিত নয়। খাদ্য সম্বন্ধে পূর্বোক্ত দোষগুলি বর্জন করিলে খাদ্য শুদ্ধ হয়। আহারশুদ্ধি হইলে মনও শুদ্ধ হয়, মন শুদ্ধ হইলে সেই শুদ্ধ মনে সর্বদা ঈশ্বরের স্মৃতি অব্যাহত থাকে।—'আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ।'[১]

রামানুজাচার্য উপনিষদের ঐ শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আর একজন ভাষ্যকার—শঙ্করাচার্য ঐ বাক্যের অন্য প্রকার অর্থ করিয়াছেন। 'আহ্রিয়তে ইতি আহারঃ'—যাহা কিছু গ্রহণ করা হয়, তাহাই আহার, সুতরাং তাঁহার মতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহই আহার। তিনি কিভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন? 'আহারশুদ্ধি'র প্রকৃত অর্থ—ইন্দ্রিয়-বিষয়ে আসক্ত না হওয়ার জন্য আমাদের এই দোষগুলি বর্জন করিতে হইবে: প্রথমতঃ আসক্তিরূপ দোষ ত্যাগ করিতে হইবে; ঈশ্বর ব্যতীত আর কোন বিষয়ে প্রবল আসক্তি থাকিবে না। সব দেখুন, সব কিছু করুন, সব স্পর্শ করুন, কিন্তু আসক্ত

[১] ছান্দোগ্য উপ., ৭।২৬।২

হইবেন না। যখনই মানুষের কোন বিষয়ে তীব্র আসক্তি হয়, তখনই সে নিজেকে হারাইয়া ফেলে, নিজের উপর তাহার কোন প্রভুত্ব থাকে না, সে দাস হইয়া যায়। যদি কোন নারী কোন পুরুষের প্রতি প্রবলভাবে আসক্ত হয়, তবে সে ঐ পুরুষের দাসী হইয়া পড়ে; পুরুষও তেমনি নারীর প্রতি আসক্ত হইলে তাহার দাসবৎ হইয়া যায়। কিন্তু দাস হইবার তো কোন প্রয়োজন নাই। একজনের দাস হওয়া অপেক্ষা এই জগতে অনেক বড় বড় কাজ করিবার আছে। সকলকেই ভালবাসুন, সকলেরই কল্যাণ সাধন করুন, কিন্তু কাহারও দাস হইবেন না। প্রথমতঃ উহা তো আমাদিগকে অধঃপতিত করিয়া দেয়; দ্বিতীয়তঃ উহাতে অপরের প্রতি ব্যবহারে আমাদিগকে ঘোর স্বার্থপর করিয়া তুলে। এই দুর্বলতার দরুন আমরা যাহাদিগকে ভালবাসি, তাহাদের ভাল করিবার জন্য অপরের অনিষ্ট সাধন করিতে চাই। জগতে যত কিছু অন্যায় কার্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহার অধিকাংশ প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিবিশেষের প্রতি আসক্তিবশতঃ ঘটিয়া থাকে। অতএব এইরূপ সমুদয় আসক্তি ত্যাগ করিতে হইবে, কেবল সৎকর্মে আসক্তি রাখিতে হইবে, এবং সকলকেই ভালবাসিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ কোন ইন্দ্রিয়-বিষয় লইয়া যেন আমাদের দ্বেষ উৎপন্ন না হয়। ঈর্ষা বা দ্বেষ সমুদয় অনিষ্টের মূল, আর উহাকে জয় করা বড়ই কঠিন। তৃতীয়তঃ মোহ। আমরা সর্বদাই এক বস্তুকে অন্য বস্তু বলিয়া ভ্রম করিতেছি ও তদনুসারে কার্য করিতেছি, আর তাহার ফল এই হইতেছে যে, আমরা নিজেদের দুঃখকষ্ট নিজেরাই সৃষ্টি করিতেছি। আমরা মন্দকে ভাল বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। যাহা কিছু ক্ষণকালের জন্য আমাদের স্নায়ুমণ্ডলীকে উত্তেজিত করে, তাহাকেই সর্বোত্তম বস্তু মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা লইয়া মাতিয়া যাইতেছি; কিছু পরেই দেখিলাম, তাহা হইতে একটা খুব আঘাত পাইয়াছি, কিন্তু তখন আর ফিরিবার পথ নাই। প্রতিদিনই আমরা এই ভ্রমে পড়িতেছি, এবং অনেক সময় সারা জীবনটাই আমরা ঐ ভুল লইয়া থাকি। শঙ্করাচার্যের মতে এই পূর্বোক্ত রাগদ্বেষমোহরূপ ত্রিবিধদোষ-বর্জিত হইয়া ইন্দ্রিয়-বিষয়সমূহ গ্রহণ করাকেই 'আহারশুদ্ধি' বলে। এই আহারশুদ্ধি হইলেই সত্ত্বশুদ্ধি হয়, অর্থাৎ তখন মন ইন্দ্রিয়বিষয়সমূহ গ্রহণ করিয়া রাগদ্বেষমোহ-বর্জিত হইয়া চিন্তা করিতে পারে। এইরূপে সত্ত্বশুদ্ধি হইলে সেই শুদ্ধ মনে সর্বদা ঈশ্বরের স্মরণ-মনন চলিতে থাকে।

স্বভাবতই আপনারা সকলে বলিবেন যে, শঙ্করাচার্যকৃত এই ব্যাখ্যাই উৎকৃষ্ট। তাহা হইলেও বলিতেছি, রামানুজকৃত ব্যাখ্যাটিকে অবহেলা করিলে চলিবে না। স্থূল খাদ্য শুদ্ধ হইলে বাকীগুলিও শুদ্ধ হইবে। ইহা অতি সত্য কথা যে, মনই সকলের মূল, কিন্তু আমাদের মধ্যে খুব অল্প লোকই আছেন, যাঁহারা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বদ্ধ নন। জড়পদার্থের শক্তি দ্বারা আমরা সকলেই চালিত হই, এবং যতদিন আমরা এইভাবে চালিত হইব, ততদিন আমাদিগকে জড়ের সাহায্য লইতেই হইবে; তারপর যখন আমরা যথেষ্ট শক্তি অর্জন করিব, তখন যাহা খুশী পানাহার করিতে পারি। আমাদিগকে রামানুজের মত অনুসরণ করিয়া পানাহার সম্বন্ধে সাবধান হইতে হইবে, আবার সঙ্গে সঙ্গে 'মানসিক আহার'-এর দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। শরীরের স্থূলখাদ্য সম্বন্ধে সাবধান হওয়া তো অতি সহজ, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মানসিক ব্যাপারের দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে; তাহা হইলে আমাদের আত্মচেতনা ক্রমশঃ সবলতর হইতে থাকিবে, এবং শরীরচেতনার দাবি ক্রমশঃ কমিয়া যাইবে। তখন আর কোন খাদ্যই আমাদের কিছু অনিষ্ট করিতে পারিবে না। সকলেই এক লাফে উচ্চতম আদর্শ ধরিতে চায়, কিন্তু লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া তো কিছু হইবে না! তাহাতে পড়িয়া গিয়া শেষ পর্যন্ত পা খোঁড়া হইয়া যাইবে। আমরা এখানে বদ্ধ অবস্থায় রহিয়াছি, আমাদিগকে ধীরে ধীরে শিকল ভাঙিতে হইবে। রামানুজের মতে এই 'বিবেক' অর্থাৎ খাদ্যাখাদ্য-বিচারই ভক্তির প্রথম সাধন।

ভক্তির দ্বিতীয় সাধনের নাম 'বিমোক'। বিমোক-শব্দের অর্থ বাসনার দাসত্ব-মোচন। যিনি ভগবৎপ্রেম লাভ করিতে চান, তাঁহাকে সর্বপ্রকার প্রবল বাসনা ত্যাগ করিতে হইবে। ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই কামনা করিও না। এই জগৎ আমাদিগকে সেই উচ্চতর জীবনে লইয়া যাইবার জন্য যতটুকু সাহায্য করে, ততটুকুই ভাল। ইন্দ্রিয়-বিষয়সকল উচ্চতর উদ্দেশ্যলাভে যতটুকু সাহায্য করে, ততটুকুই ভাল। আমরা সর্বদাই ভুলিয়া যাই যে, এই জগৎ আমাদের উদ্দেশ্য নয়, একটি উদ্দেশ্য-লাভের উপায় মাত্র। যদি এই জগৎ আমাদের চরম লক্ষ্য হইত, তবে আমরা এই স্থূলদেহেই অমরত্বলাভ করিতাম, আমরা কখনই মরিতাম না। কিন্তু দেখিতেছি, প্রতি মুহূর্তে আমাদের চতুর্দিকে লোক মরিতেছে, তথাপি মূর্খতাবশতঃ ভাবিতেছি,

আমরা কখনও মরিব না।[1] ঐ ধারণা হইতেই আমরা ভাবিয়া থাকি, এই জীবন আমাদের চরম লক্ষ্য—আমাদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জনের এই অবস্থা। এই ভাব এখনই পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই জগৎ যতক্ষণ আমাদের পূর্ণতা লাভের উপায়স্বরূপ হয়, ততক্ষণই ভাল; আর যখন ইহা দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, তখন ইহা মন্দ—মন্দ বই আর কিছুই নয়। এইরূপে স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, টাকা-কড়ি বা বিদ্যা আমাদের ভগবৎপথে উন্নতির সহায়ক হইলে ভাল, কিন্তু যখনই তাহা না হয়, তখন সেগুলি মন্দ বই আর কিছুই নয়। স্ত্রী যদি ঈশ্বরলাভে সহায়তা করে, তবেই তাহাকে সাধ্বী স্ত্রী বলা যায়,—এইরূপ পতিপুত্রাদি সম্বন্ধেও। অর্থ যদি মানুষকে অপরের কল্যাণ-সাধনে সহায়তা করে, তবেই তাহার মূল্য আছে বলিয়া স্বীকার করা যায়। নতুবা উহা কেবল অনিষ্টের মূল, আর যত শীঘ্র আমরা অর্থের সংস্রব হইতে নিষ্কৃতি পাই, ততই মঙ্গল।

পরবর্তী সাধন 'অভ্যাস'। আমাদের কর্তব্য—মন যেন সর্বদাই ঈশ্বরাভিমুখে গমন করে, অন্য কোন বস্তুর আমাদের মনকে বাধা দিবার কোন অধিকার নাই। মন যেন সর্বদা অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় ঈশ্বরচিন্তা করে। ইহা বড় কঠিন কাজ, কিন্তু বারংবার অভ্যাসের দ্বারা ইহা সম্ভব। আমরা এখন যাহা হইয়াছি, তাহা অতীত অভ্যাসের ফলস্বরূপ। আবার এখন যেরূপ অভ্যাস করিব, ভবিষ্যতে সেইরূপ হইব। অতএব আপনাদের যেরূপ অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, তাহার বিপরীত অভ্যাস করুন। একদিকে মোড় ফিরিয়া আমাদের অবস্থা এই দাঁড়াইয়াছে, অন্যদিকে ফিরুন এবং যত শীঘ্র পারেন, ইহার বাহিরে চলিয়া যান। ইন্দ্রিয়বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে আমরা এমন এক অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছি যে, আমরা এই মুহূর্তে হাসিতেছি, পরক্ষণেই কাঁদিতেছি, সামান্য বায়ুপ্রবাহেই আমরা বিচলিত হইতেছি—সামান্য একটা বাক্যের দাস, সামান্য এক টুকরা খাদ্যের দাস হইয়াছি। ইহা অতি লজ্জার বিষয়—ইহার উপর আমরা আবার নিজদিগকে 'আত্মা' বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি এবং অনেক বড় বড় বাজে কথা বলিয়া থাকি। আমরা সংসারের দাস—ইন্দ্রিয়াভিমুখে ধাবিত হইয়া নিজেদের এই

১ 'শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি'…মহাভারত, বনপর্ব

অবস্থায় আনিয়াছি। এখন বিপরীত দিকে চল, ঈশ্বরের চিন্তা কর—মন কোন শারীরিক বা মানসিক ভোগের চিন্তা না করিয়া যেন শুধু ঈশ্বরের চিন্তা করে। যখন মন অন্য কোন বিষয়ের চিন্তা করিতে উদ্যত হইবে, তখন উহাকে এমন ধাক্কা দাও, যেন উহা ফিরিয়া আসিয়া ঈশ্বরের চিন্তায় প্রবৃত্ত হয়। 'যেমন তৈল এক পাত্র হইতে অপর পাত্রে অবিচ্ছিন্ন ধারায় পড়িতে থাকে, যেমন দূরে ঘণ্টাধ্বনি হইলে উহার শব্দ কর্ণে এক অবিচ্ছিন্ন ধারায় আসিতে থাকে, সেইরূপ এই মনও এক অবিচ্ছিন্ন ধারায় যেন ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হয়।' এই অভ্যাস আবার শুধু মনের দ্বারা করিলেই হইবে না, ইন্দ্রিয়গুলিকেও এই অভ্যাসে নিযুক্ত করিতে হইবে। বাজে কথা না শুনিয়া আমাদিগকে ঈশ্বরের কথা শুনিতে হইবে; বাজে কথা না বলিয়া ঈশ্বরবিষয়ক কথা বলিতে হইবে; বাজে পুস্তক না পড়িয়া ঈশ্বরবিষয়ক সদ্‌গ্রন্থ পড়িতে হইবে।

ঈশ্বরকে স্মৃতিপথে রাখিবার এই 'অভ্যাসে'র সর্বোৎকৃষ্ট সহায়ক সম্ভবতঃ—সঙ্গীত। ভক্তির শ্রেষ্ঠ আচার্য নারদকে ভগবান্ বলিতেছেন:

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥

—হে নারদ, আমি বৈকুণ্ঠে বাস করি না, যোগীদিগের হৃদয়েও বাস করি না, যেখানে আমার ভক্তগণ ভজন গান করে, আমি সেখানেই অবস্থান করি।

মনুষ্যমনের উপর সঙ্গীতের প্রচণ্ড প্রভাব—উহা মুহূর্তে মনকে একাগ্র করিয়া দেয়। দেখিবেন, অতিশয় তামসিক জড়প্রকৃতি ব্যক্তিগণ—যাহারা এক মুহূর্তও মন স্থির করিতে পারে না, তাহারাও উত্তম সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়া যায়, একাগ্র হইয়া যায়। এমন কি কুকুর, বিড়াল, সর্প, সিংহ প্রভৃতি জন্তুগণও সঙ্গীত-শ্রবণে মোহিত হইয়া থাকে।

পরবর্তী সাধন 'ক্রিয়া'—পরের হিতসাধন। স্বার্থপর ব্যক্তির হৃদয়ে ঈশ্বর-চিন্তা আসিবে না। যতই আমরা পরের কল্যাণ সাধনে চেষ্টা করিব, ততই আমাদের হৃদয় শুদ্ধ হইবে, এবং সেই হৃদয়ে ঈশ্বর বাস করিবেন। আমাদের শাস্ত্রমতে ক্রিয়া পঞ্চবিধ—উহাদিগকে 'পঞ্চ-মহাযজ্ঞ' বলে। প্রথম: ব্রহ্মযজ্ঞ অর্থাৎ স্বাধ্যায়—প্রত্যহ শুভ ও পবিত্র ভাবোদ্দীপক কিছু কিছু পাঠ করিতে হইবে। দ্বিতীয়: দেবযজ্ঞ—ঈশ্বর, দেবতা বা সাধুগণের পূজা বা উপাসনা। তৃতীয়: পিতৃযজ্ঞ—আমাদের পূর্বপুরুষগণ সম্বন্ধে আমাদের কর্তব্য।

চতুর্থ : নৃযজ্ঞ—মনুষ্যজাতির প্রতি আমাদের কর্তব্য। মানুষ যদি দরিদ্র বা অভাবগ্রস্তদের জন্য গৃহ নির্মাণ না করে, তবে তাহার নিজের গৃহে বাস করিবার অধিকার নাই। যে কেহ দরিদ্র ও দুঃখী, তাহারই জন্য যেন গৃহীর গৃহ উন্মুক্ত থাকে, তবেই সে যথার্থ গৃহী। যদি কেহ কেবল নিজের ও নিজের স্ত্রীর ভোগের জন্য গৃহ নির্মাণ করে, তবে উহা অতি ঘোর স্বার্থপর কাজ। এরূপ ব্যক্তি কখনও ভগবদ্ভক্ত হইতে পারিবে না। কোন ব্যক্তির নিজের জন্য কিছু রন্ধন করিবার অধিকার নাই, পরের জন্যই তাহাকে রন্ধন করিতে হইবে—পরের সেবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাতেই তাহার অধিকার।[১] ভারতে সাধারণতঃ এইরূপই ঘটিয়া থাকে যে, যখন বাজারে নূতন নূতন জিনিস, যথা—আম, কুল প্রভৃতি উঠে, তখন কোন ব্যক্তি কিছু কিনিয়া উহা গরীবদের মধ্যে বিলাইয়া দেন। তারপর তিনি নিজে খাইয়া থাকেন। আর এদেশে (আমেরিকায়) অনুসরণ করিবার পক্ষে এটি একটি খুবই ভাল দৃষ্টান্ত। এইরূপ ভাবে জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে থাকিলে মানুষ ক্রমশঃ নিঃস্বার্থ হইবে, আবার স্ত্রীপুত্রাদিও ইহা হইতে শিক্ষা লাভ করিবে। প্রাচীনকালে হিব্রুরা প্রথমজাত ফল ভগবানকে নিবেদন করিত, কিন্তু আজকাল আর বোধ হয় তাহা করে না। সকল বস্তুর অগ্রভাগ দরিদ্রগণের প্রাপ্য—অবশিষ্ট অংশে আমাদের অধিকার। দরিদ্রগণ ঈশ্বরের প্রতিনিধি—যাহারাই কোনরূপ দুঃখকষ্ট পাইতেছে, তাহারাই ঈশ্বরের প্রতিনিধি। পরকে না দিয়া যে ব্যক্তি নিজ রসনার তৃপ্তিসাধন করে, সে পাপ ভোজন করে।[২]

পঞ্চম : ভূতযজ্ঞ অর্থাৎ নিম্নতর প্রাণীদের প্রতি আমাদের কর্তব্য। এই-সকল প্রাণীকে মানুষ মারিয়া ফেলিবে, তাহাদিগকে লইয়া যাহা খুশী করিবে, এই জন্যই তাহাদের সৃষ্টি হইয়াছে—এ-কথা বলা মহাপাপ। যে শাস্ত্রে এই কথা বলে, তাহা শয়তানের শাস্ত্র, ঈশ্বরের নয়। শরীরের কোন অংশে স্নায়ুবিশেষ নড়িতেছে কিনা দেখিবার জন্য একটি প্রাণীকে কাটিয়া দেখা—কি বীভৎস ব্যাপার ভাবুন দেখি! এমন সময় আসিবে, যখন সকল দেশেই—যে ব্যক্তি এরূপ করিবে, সে দণ্ডনীয় হইবে। আমাদের দেশে বৈদেশিক সরকার

---

১ গীতা, ৩।১৩

২ ঐ, ঐ

এরূপ কার্যে যতই উৎসাহ দিক না কেন, হিন্দুরা যে এ-বিষয়ে সহানুভূতি করেন না, তাহাতে আমি খুশী। যাহা হউক, গৃহে রান্না-করা আহারের একভাগ পশুগণেরও প্রাপ্য। তাহাদিগকে প্রত্যহ খাদ্য দিতে হইবে। এদেশের প্রত্যেক শহরে অন্ধ খঞ্জ বা আতুর ঘোড়া, গরু, কুকুর, বিড়ালের জন্যও হাসপাতাল থাকা প্রয়োজন—তাহাদিগকে খাওয়াইতে হইবে এবং যত্ন করিতে হইবে।

তারপর 'কল্যাণ' অর্থাৎ পবিত্রতা। নিম্নলিখিত গুণগুলি কল্যাণ-শব্দবাচ্য : ১ম, সত্য ; যিনি সত্যনিষ্ঠ, তাঁহার নিকট সত্যের ঈশ্বর প্রকাশিত হন —কায়মনোবাক্যে সম্পূর্ণরূপে সত্যসাধন করিতে হইবে। ২য়, আর্জব—অকপটভাব, সরলতা—হৃদয়ের মধ্যে কোনরূপ কুটিলতা থাকিবে না, মন মুখ এক করিতে হইবে ; যদিও একটু কর্কশ ব্যবহার করিতে হয়, তথাপি কুটিলতা ছাড়িয়া সরল সহজ পথে চলা উচিত। ৩য়, দয়া। ৪র্থ, অহিংসা অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে কোন প্রাণীর অনিষ্টাচরণ না করা। ৫ম, দান। দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠধর্ম আর নাই। সে-ই হীনতম ব্যক্তি, যে নিজের দিকে হাত ফিরাইয়া আছে ; সে প্রতিগ্রহ করিতে—পরের নিকট দান লইতে ব্যস্ত। আর সে-ই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, যাহার হাত পরের দিকে ফিরানো রহিয়াছে—যে পরকে দিতেই ব্যাপৃত। হস্ত নির্মিত হইয়াছে—কেবল দিবার জন্য। উপবাসে মরিতে হয় তাহাও শ্রেয়ঃ, রুটির শেষ টুকরাটি পর্যন্ত দান করুন ; পরকে খাদ্য দিতে গিয়া যদি আপনার অনাহারে মৃত্যু হয়, তবে আপনি এক মুহূর্তেই মুক্ত হইয়া যাইবেন, তৎক্ষণাৎ আপনি পূর্ণ হইয়া যাইবেন, তৎক্ষণাৎ আপনি ঈশ্বর হইয়া যাইবেন। যাহাদের সন্তান-সন্ততি আছে, তাহারা তো পূর্ব হইতেই বদ্ধ। তাহারা সব দান করিয়া দিতে পারে না। তাহারা সন্তানগুলিকে উপভোগ করিতে চায়, তাহাদিগকে সেই ভোগের মূল্য দিতে হইবে। জগতে কি যথেষ্ট ছেলেমেয়ে নাই ? স্বার্থপরতাবশেই লোকে বলিয়া থাকে, আমার নিজের একটি সন্তান চাই। ৬ষ্ঠ, অনভিধ্যা—পরের দ্রব্যে লোভ পরিত্যাগ বা নিষ্ফল চিন্তা পরিত্যাগ বা পরকৃত অপরাধ সম্বন্ধে চিন্তা পরিত্যাগ।

পরবর্তী সাধন 'অনবসাদ', ইহার ঠিক অর্থ—চুপ করিয়া বসিয়া না থাকা, নৈরাশ্যগ্রস্ত না হওয়া, অর্থাৎ প্রফুল্লতা ; নৈরাশ্য আর যাহাই হউক, ধর্ম নয়।

সর্বদা হাসিমুখে প্রফুল্ল থাকিলে কোন স্তবস্তুতি বা প্রার্থনা অপেক্ষা শীঘ্র ঈশ্বরের নিকট যাওয়া যায়। যাহাদের মন সর্বদা বিষণ্ণ ও তমোভাবে আচ্ছন্ন, তাহারা আবার ভালবাসিবে কি করিয়া? তাহারা যদি ভালবাসার কথা বলে, তবে জানিবেন, উহা মিথ্যা; তাহারা প্রকৃতপক্ষে অপরকে আঘাত করিতে চায়। গোঁড়াদের বিষয় ভাবিয়া দেখুন, তাহাদের মুখ সর্বদা ভার হইয়াই আছে—তাহাদের সমুদয় ধর্মটাই যেন বাক্যে ও কার্যে পরের বিরোধিতা করা। অতীতে তাহারা কি করিয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখুন এবং অবাধে কিছু করিবার সুযোগ পাইলে এখনও কী করিতে পারে, তাহাও ভাবুন। ক্ষমতা করায়ত্ত হইবে জানিলে তাহারা আগামী কালই সমগ্র জগৎকে রক্তস্রোতে প্লাবিত করিতে পারে, কারণ বিষণ্ণভাবই তাহাদের ঈশ্বর। ক্ষমতাপন্ন এক ভয়ঙ্কর ঈশ্বরকে উপাসনা করিয়া, সর্বদা বিষণ্ণ থাকিয়া তাহাদের হৃদয়ে আর ভালবাসার লেশমাত্র থাকে না, কাহারও প্রতি তাহাদের এক বিন্দু দয়া থাকে না। অতএব যে ব্যক্তি সর্বদাই নিজেকে দুঃখিত বোধ করে, সে কখনও ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারে না। 'আমি বড় দুঃখী!'—এরূপ বলা ধার্মিকের লক্ষণ নয়, ইহা শয়তানি। প্রত্যেককেই নিজ নিজ দুঃখের বোঝা বহন করিতে হয়। বাস্তবিকই যদি আপনার দুঃখ থাকে, সুখী হইবার চেষ্টা করুন, দুঃখকে জয় করিবার চেষ্টা করুন। দুর্বল ব্যক্তি কখনই ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারে না।—অতএব দুর্বল হইবেন না। আপনাকে শক্ত সবল হইতে হইবে—অনন্ত শক্তি আপনার ভিতরে। নতুবা কোন কিছু জয় করিবেন কিরূপে? ঈশ্বরলাভ করিবেন কিরূপে?

সঙ্গে সঙ্গে আবার 'অনুদ্ধর্ষ' সাধন করিতে হইবে। উদ্ধর্ষ-শব্দের অর্থ অতিরিক্ত আমোদ-প্রমোদ, উহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। কারণ ঐ অবস্থায় মন কখনই শান্ত হয় না, চঞ্চল হইয়া থাকে, আর পরিণামে সর্বদা দুঃখই আসিয়া থাকে। কথায় বলে, 'যত হাসি, তত কান্না'। মানুষ একবার একদিকে ঝুঁকিয়া আবার তাহার চূড়ান্ত বিপরীত দিকে গিয়া থাকে। মনকে প্রফুল্ল অথচ শান্ত রাখিতে হইবে। মন যেন কখন কোন কিছুর বাড়াবাড়ি না করে, কারণ বাড়াবাড়ি করিলেই পরিণামে তাহার প্রতিক্রিয়া হইবে।

রামানুজের মতে এইগুলিই ভক্তির সাধন।

ভক্তির প্রথম সোপান—তীব্র ব্যাকুলতা

ভক্তিযোগের আচার্যগণ নির্ণয় করিয়াছেন—ভক্তি ঈশ্বরে পরম অনুরক্তি। কিন্তু 'মানুষ ঈশ্বরকে ভালবাসিবে কেন?'—এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা ইহা বুঝিতেছি, ততক্ষণ ভক্তিতত্ত্বের কিছুই ধারণা করিতে পারিব না। জীবনের সম্পূর্ণ পৃথক্ দুই প্রকার আদর্শ দেখা যায়। যে-কোন দেশের মানুষ, যে কিছুটা ধর্ম মানে, সেই বোধ করিয়া থাকে—মানুষ দেহ ও আত্মা দুই-ই। কিন্তু মানবজীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনেক মতভেদ দেখা যায়।

পাশ্চাত্য দেশে মানুষ সাধারণতঃ দেহের দিকেই বেশী ঝোঁক দেয়—ভারতীয় ভক্তিতত্ত্বের আচার্যগণ কিন্তু মানুষের আধ্যাত্মিক দিক্‌টার উপর অধিক জোর দিয়া থাকেন, আর ইহাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জাতিগুলির মধ্যে সর্বপ্রকার ভেদের মূল বলিয়া বোধ হয়। এমন কি, সাধারণের ব্যবহৃত ভাষায় পর্যন্ত এই ভেদ স্পষ্ট লক্ষিত হয়। ইংলণ্ডে লোকে মৃত্যু সম্বন্ধে বলিতে গিয়া বলে, 'অমুক তাহার আত্মা পরিত্যাগ করিল' (gave up the ghost); ভারতে মৃত্যুর কথা বলিতে গেলে লোকে বলিয়া থাকে, 'অমুক দেহ-ত্যাগ করিল'; পাশ্চাত্যদের ভাব—মানুষ একটা দেহ, তাহার আত্মা আছে; প্রাচ্যভাব—মানুষ আত্মাস্বরূপ, তাহার দেহ আছে। এই পার্থক্য হইতে অনেক জটিল সমস্যা আসিয়া পড়ে। ইহা সহজেই বুঝা যায়, যে-আদর্শ অনুসারে মানুষ দেহ এবং তাহার একটি আত্মা আছে, সেই আদর্শে দেহের উপরে সম্পূর্ণ ঝোঁকটা পড়িয়াছে। যদি জিজ্ঞাসা কর—মানুষ কি জন্য জীবনধারণ করে, ঐ আদর্শের অনুগামী বলিবে ইন্দ্রিয়সুখভোগের জন্য; দেখিব, শুনিব, বুঝিব, ভোজনপান করিব, অনেক বিষয়—ধন-দৌলতের অধিকারী হইব; বাপ-মা আত্মীয়স্বজন সব থাকিবে, তাঁহাদের সহিত আনন্দ করিব—ইহাই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। ইহার অধিক আর সে যাইতে পারে না; ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুর কথা বলিলেও সে উহা কল্পনা করিতে পারে না। তাহার পরলোকের ধারণা এই যে, এখন যে-সকল ইন্দ্রিয়সুখভোগ হইতেছে, সেইগুলিই চলিতে থাকিবে। ইহলোকে সে চিরকাল এই সুখভোগ করিতে পারিবে না—

এজন্য সে বড়ই দুঃখিত, তাহাকে এখান হইতে চলিয়া যাইতে হইবে। সে মনে করে, যে-কোন ভাবে হউক সে এমন এক স্থানে যাইবে, যেখানে এ-সবই নূতনভাবে চলিতে থাকিবে। তাহার এইসব ইন্দ্রিয়ই থাকিবে, এইসব সুখভোগই থাকিবে—কেবল সুখের তীব্রতা ও মাত্রা বাড়িবে। সে যে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে চায়, তাহার কারণ—ঈশ্বর তাহার এই উদ্দেশ্য-লাভের উপায়। তাহার জীবনের লক্ষ্য—বিষয়সম্ভোগ। সে কাহারও নিকট হইতে জানিয়াছে, একজন পুরুষ আছেন—যিনি তাহাকে দীর্ঘকাল ধরিয়া এইসব সুখ দিতে পারেন, তাই সে ঈশ্বরের উপাসনা করে।

পক্ষান্তরে ভারতীয় ভাব এই যে, ঈশ্বরই আমাদের জীবনের লক্ষ্য। ঈশ্বরের ঊর্ধ্বে আর কিছু নাই, এইসব ইন্দ্রিয়সুখভোগের ভিতর দিয়া আমরা উচ্চতর বস্তু লাভের জন্য অগ্রসর হইতেছি মাত্র। শুধু তাই নয়; যদি ইন্দ্রিয়সুখ ছাড়া আর কিছু না থাকিত, তবে ভয়ানক ব্যাপার হইত। আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে দেখিতে পাই, যে ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সুখভোগ যত অল্প, তাহার জীবন তত উন্নত। কুকুরটা যখন খায়, তাহার দিকে চাহিয়া দেখ, কোন মানুষ অত তৃপ্তির সহিত খাইতে পারে না। শূকর-শাবকটার ব্যবহার লক্ষ্য করিও—সে খাইতে খাইতে কি আনন্দসূচক ধ্বনি করে! সে যেন স্বর্গ-সুখ পাইতেছে, যদি কোন শ্রেষ্ঠ দেবতা আসিয়া তাহার দিকে তাকান, সে তাঁহাকে লক্ষ্যই করিবে না; ভোজনেই তাহার সমগ্র জীবন। এমন কোন মানুষ জন্মায় নাই, যে ঐভাবে খাইতে পারে। ভাবিয়া দেখ, নিম্নতর প্রাণীদের দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি প্রভৃতি কত তীক্ষ্ণ—তাহাদের ইন্দ্রিয়গুলি অত্যন্ত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। মানুষের ইন্দ্রিয়শক্তি কখন ঐরূপ হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়সুখেই পশুগণের চরম আনন্দ—তাহারা ঐ আনন্দে একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠে। আর যে যত অনুন্নত, ইন্দ্রিয়সুখে সে তত অধিক আনন্দ পাইয়া থাকে। যতই উচ্চতর অবস্থায় উঠিতে থাকিবেন, ততই যুক্তিবিচার ও প্রেম আপনাদের লক্ষ্য হইবে। দেখিবেন, আপনাদের বিচারশক্তি ও প্রেমের যতই বিকাশ হইবে, ততই আপনাদের ইন্দ্রিয়-সুখভোগের শক্তি কমিয়া যাইবে।

বিষয়টি আমি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছি। যদি আমরা স্বীকার করি যে, প্রত্যেক মানুষকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি দেওয়া আছে, সেই শক্তিটা হয়

দেহের উপর, নয় মনের উপর, নয় আত্মার উপর প্রয়োগ করা যাইতে পারে, তবে যদি উহাদের একটির উপর সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করা যায়, তবে অন্যগুলির উপর প্রয়োগ করিবার শক্তি ততটুকু কম পড়িয়া যাইবে। সভ্য জাতিদিগের অপেক্ষা অজ্ঞ বা অসভ্য জাতিদের ইন্দ্রিয়শক্তি তীক্ষ্ণতর। আর বাস্তবিকপক্ষে ইতিহাস হইতে আমরা এই একটি শিক্ষা পাইতে পারি যে, কোন জাতি যতই সভ্য হয়, ততই তাহার স্নায়ু সূক্ষ্মতর হইতে থাকে এবং শরীর দুর্বলতর হইয়া যায়। কোন অসভ্য জাতিকে সভ্য করুন—দেখিবেন, ঠিক এই ব্যাপারটি ঘটিতেছে। তখন অন্য কোন অসভ্য জাতি আসিয়া আবার তাহাকে জয় করিবে। দেখা যায়, বর্বর জাতিই প্রায় সর্বদা জয়লাভ করে। অতএব আমরা দেখিতেছি, যদি আমাদের সর্বদা শুধু ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করিবার বাসনা হয়, তবে বুঝিতে হইবে, আমরা অসম্ভব কিছু চাহিতেছি—কারণ তাহা হইলে আমরা পশু হইয়া যাইব। মানুষ যখন বলে, সে এমন এক স্থানে যাইবে, যেখানে তাহার ইন্দ্রিয়সুখভোগ তীব্রতর হইবে, তখন সে জানে না, সে কি চাহিতেছে; মনুষ্যজন্ম ঘুচিয়া পশুজন্ম হইলে তবেই তাহার পক্ষে এরূপ সুখভোগ সম্ভব। শূকর কখন মনে করে না, সে অশুচি বস্তু ভোজন করিতেছে। উহাই তাহার স্বর্গ, শ্রেষ্ঠ দেবতাগণ তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেও সে তাঁহাদের দিকে ফিরিয়া চাহিবে না; ভোজনেই তাহার সমগ্র সত্তা নিয়োজিত।

মানুষের সম্বন্ধেও তেমনি। তাহারা শূকর-শাবকের মতো ইন্দ্রিয়-বিষয়রূপ পঙ্কে গড়াগড়ি দিতেছে—উহার বাহিরে কি আছে, তাহা দেখিতে পায় না। তাহারা ইন্দ্রিয়সুখভোগই চায়, আর উহা না পাইলে তাহারা যেন স্বর্গ হইতে চ্যুত হয়। 'ভক্ত'-শব্দটির শ্রেষ্ঠ অর্থ ধরিলে এইরূপ ব্যক্তিগণ কখনও 'ভক্ত' হইতে পারে না—তাহারা কখন প্রকৃত ভগবৎ-প্রেমিক হইতে পারে না। আবার ইহাও ঠিক যে, এই নিম্নতর আদর্শ অনুসরণ করিলে কালে এই ভাব পরিবর্তিত হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তিই বুঝিবে, ইহা অপেক্ষা উচ্চতর এমন কিছু আছে, যাহার সম্বন্ধে জানিতাম না; জানিলে জীবনের উপর এবং ইন্দ্রিয়-বিষয়ের উপর প্রবল আসক্তি ধীরে ধীরে চলিয়া যাইবে। ছেলেবেলা যখন স্কুলে পড়িতাম, তখন এক সহপাঠীর সঙ্গে কি একটা খাবার লইয়া কাড়াকাড়ি হইয়াছিল; তাহার গায়ে আমার চেয়ে বেশী জোর

ছিল, কাজেকাজেই সে ঐ খাবারটা আমার হাত হইতে ছিনাইয়া লইল। তখন আমার যে ভাব হইয়াছিল, তাহা এখনও মনে আছে। আমার মনে হইল, তাহার মতো দুষ্ট ছেলে জগতে আর জন্মায় নাই, আমি যখন বড় হইব, আমার গায়ে জোর হইবে, তখন তাহাকে জব্দ করিব। মনে হইতে লাগিল—সে এত দুষ্ট যে, কোন শাস্তিই তাহার পক্ষে যথেষ্ট হইবে না, তাহাকে ফাঁসি দেওয়া উচিত, তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলা উচিত। এখন আমরা উভয়েই বড় হইয়াছি, উভয়ের মধ্যে এখন নিবিড় বন্ধুত্ব। এইরূপে এই সমগ্র জগৎ শিশুতুল্য জনগণে পূর্ণ—খাওয়া এবং উপাদেয় খাবারই তাহাদের সর্বস্ব, যদি এতটুকু এদিক্ ওদিক্ হয়, তবেই সর্বনাশ! তাহারা কেবল ভাল ভাল খাবারের স্বপ্ন দেখিতেছে, আর তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে ধারণা—সর্বদা সর্বত্র প্রচুর খাবার আছে। আমেরিকান ইণ্ডিয়ানগণের ধারণা—স্বর্গ একটি বেশ ভাল মৃগয়ার স্থান। আমাদের সকলেরই স্বর্গের ধারণা—নিজ নিজ বাসনার অনুরূপ; কিন্তু কালে আমাদের বয়স যতই বাড়িতে থাকে এবং যতই উচ্চতর বস্তু দেখিতে পাই, ততই আমরা সময়ে সময়ে এই সকলের অতীত উচ্চতর বস্তুর চকিত আভাস পাইতে থাকি। আধুনিক কালে সাধারণতঃ যেমন সকল বিষয়ে অবিশ্বাস করিয়া (ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে) এইসব ধারণা অতিক্রম করা হয়, আমরা যেন সেভাবে এই-সকল ধারণা পরিত্যাগ না করি, তাহাতে উড়াইয়া দেওয়া হইল—ভাবগুলি নষ্ট করিয়া ফেলা হইল; যে নাস্তিক এইরূপে সব উড়াইয়া দেয়, সে ভ্রান্ত; কিন্তু যিনি ভক্ত, তিনি উহা অপেক্ষা উচ্চতর তত্ত্ব দর্শন করিয়া থাকেন। নাস্তিক স্বর্গে যাইতে চায় না, কারণ তাহার মতে স্বর্গ ই নাই; আর ভগবদ্ভক্ত স্বর্গে যাইতে চান না, কারণ তিনি উহাকে ছেলেখেলা বলিয়া মনে করেন। তিনি চান কেবল ঈশ্বরকে।

ঈশ্বর ব্যতীত জীবনের শ্রেষ্ঠতর লক্ষ্য আর কি হইতে পারে? ঈশ্বর স্বয়ংই মানুষের সর্বোচ্চ লক্ষ্য—তাঁহাকে দর্শন কর, তাঁহাকে সম্ভোগ কর। ঈশ্বর অপেক্ষা উচ্চতর বস্তু আমরা ধারণাই করিতে পারি না, কারণ ঈশ্বর পূর্ণস্বরূপ। প্রেম হইতে কোন উচ্চতর সুখ আমরা ধারণা করিতে পারি না, কিন্তু এই শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রেম-শব্দ দ্বারা সংসারের সাধারণ স্বার্থপর ভালবাসা বুঝায় না—উহাকে 'প্রেম' নামে অভিহিত করা

ঈশ্বরনিন্দার সমান। আমাদের পুত্রকলত্রাদির প্রতি ভালবাসা জীবজন্তুর ভালবাসার মতো। যে ভালবাসা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ, তাহাই একমাত্র 'প্রেম'-শব্দবাচ্য এবং তাহা কেবল ঈশ্বরের সম্বন্ধেই সম্ভব। এই প্রেম লাভ করা বড় কঠিন ব্যাপার। আমরা পিতামাতা, পুত্রকন্যা ও অন্যান্য সকলকে ভালবাসিতেছি—এই-সকল বিভিন্ন প্রকার ভালবাসা বা আসক্তির ভিতর দিয়া চলিতেছি। আমরা ধীরে ধীরে প্রীতিবৃত্তির অনুশীলন করিতেছি, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা ঐ বৃত্তির পরিচালনা হইতে কিছুই শিখিতে পারি না—একটি সোপানে আরোহণ করিয়া উহাতেই আমরা আবদ্ধ হইয়া যাই, আমরা একটি ব্যক্তিতে আসক্ত হইয়া পড়ি। কখন কখন মানুষ এই বন্ধন অতিক্রম করিয়া বাহিরে আসিয়া থাকে। মানুষ এই জগতে চিরকাল স্ত্রী-পুত্র ধন-মান এইসবের দিকে ছুটিতেছে—সময়ে সময়ে তাহারা বিশেষ ধাক্কা খাইয়া সংসারের যথার্থ রূপ বুঝিতে পারে। এই জগতে কেহই ঈশ্বর ব্যতীত প্রকৃতপক্ষে আর কাহাকেও ভালবাসিতে পারে না। মানুষ দেখিতে পায়, মানুষের ভালবাসা সব শূন্য। মানুষ ভালবাসিতেই পারে না—শুধু কথা বলে। 'আহা! প্রাণনাথ, আমি তোমায় বড় ভালবাসি' বলিয়া পত্নী পতিকে চুম্বন করিয়া অবিরলধারে অশ্রু বিসর্জন করিয়া পতিপ্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকে, কিন্তু স্বামীর যেই মৃত্যু হয়, অমনি সে সন্ধান করে, ব্যাঙ্কে তাঁহার কত টাকা আছে; আর কাল তাহার কি গতি হইবে, এই ভাবিয়া আকুল হয়। স্বামীও স্ত্রীকে খুব ভালবাসিয়া থাকেন, কিন্তু স্ত্রী অসুস্থ হইলে, রূপ-যৌবন হারাইয়া কুৎসিত হইলে, অথবা সামান্য দোষ করিলে তাহার দিকে আর চাহিয়াও দেখেন না। জগতের সব ভালবাসা অন্তঃসারশূন্য ও কপটতাপূর্ণ।

সান্ত জীব কখন ভালবাসিতে পারে না, অথবা সান্ত জীব ভালবাসার যোগ্যও হইতে পারে না। প্রতি মুহূর্তেই যখন ভালবাসার পাত্রের দেহের এবং সঙ্গে সঙ্গে মনেরও পরিবর্তন হইতেছে, তখন এই জগতে অনন্ত প্রেমের কি আর আশা করা যাইতে পারে? ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কাহারও প্রতি প্রকৃত প্রেম সম্ভব নয়। তবে এ-সব ভালবাসাবাসি কেন? এগুলি কেবল ভ্রমমাত্র—প্রেমের বিভিন্ন অবস্থামাত্র। মহাশক্তি আমাদের পিছন হইতে আমাদিগকে ভালবাসিবার জন্য প্রেরণা দিতেছেন—আমরা জানি না কোথায় সেই প্রেমাস্পদকে খুঁজিব, কিন্তু এই প্রেমই আমাদিগকে উহার অনুসন্ধানে

সম্মুখে অগ্রসর করিয়া দিতেছে। বারংবার আমাদের ভ্রম ধরা পড়িতেছে। আমরা একটা জিনিস ধরিলাম—উহা আমাদের হাত ফসকাইয়া গেল, তখন আমরা আর কিছুর জন্য হাত বাড়াইলাম। এইভাবে আমরা আগাইয়া চলি, শেষ পর্যন্ত আলোক আসিয়া থাকে, তখন আমরা ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হই—একমাত্র তিনিই আমাদিগকে যথার্থ ভালবাসিয়া থাকেন। তাঁহার ভালবাসার কোন পরিবর্তন নাই, তিনি সর্বদাই আমাদিগকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। আমি অনিষ্ট করিতে থাকিলে আপনাদের মধ্যে কেই বা কতক্ষণ আমার অত্যাচার সহ্য করিবেন? যাহার মনে ক্রোধ ঘৃণা বা ঈর্ষা নাই, যাহার সাম্যভাব কখন নষ্ট হয় না, যাহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, তিনি ঈশ্বর ব্যতীত আর কি হইতে পারেন? তবে ঈশ্বরকে লাভ করা বড় কঠিন এবং তাঁহার নিকট যাইতে হইলে বহু দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে হয়—অতি অল্প লোকই তাঁহাকে লাভ করিয়া থাকে। আমরা শিশুর মতো হাত-পা ছুঁড়িতেছি মাত্র। লক্ষ লক্ষ লোক ধর্মের দোকানদারি করে, সকলেই ধর্মের কথা বলে, খুব কম লোকই প্রকৃত ধর্ম লাভ করিয়া থাকে। এক শতাব্দীর মধ্যে অতি অল্প লোকই সেই ঈশ্বরপ্রেম লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু যেমন এক সূর্যের উদয়ে সমগ্র অন্ধকার তিরোহিত হয়, তেমনি এই অল্পসংখ্যক যথার্থ ধার্মিক ও ভগবদ্ভক্ত পুরুষের অভ্যুদয়ে সমগ্র দেশ ধন্য ও পবিত্র হইয়া যায়। এরূপ ঈশ্বর-পুত্রের আবির্ভাবে সমগ্র দেশ ধন্য হইয়া যায়। এক শতাব্দীর মধ্যে সমগ্র জগতে এরূপ মহাপুরুষ খুব কমই জন্মগ্রহণ করেন; কিন্তু আমাদের সকলেরই ঐরূপ হইবার চেষ্টা করিতে হইবে, আপনি বা আমিই যে সেই অল্প কয়েকজনের মধ্যে হইব না, তাহা কে বলিল? অতএব আমাদিগকে ভক্তি-লাভের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা বলিয়া থাকি, স্ত্রী তাহার স্বামীকে ভালবাসে; স্ত্রীও ভাবে—আমি স্বামিগতপ্রাণা। কিন্তু যেই একটি সন্তান হইল, অমনি অর্ধেক বা তাহারও অধিক ভালবাসা সন্তানের প্রতি গেল। সে নিজেই টের পাইবে যে, স্বামীর প্রতি তাহার আর পূর্বের মতো ভালবাসা নাই। আমরা সর্বদাই দেখিতে পাই, অধিকতর ভালবাসার পাত্র আমাদের নিকট উপস্থিত হইলে পূর্বের ভালবাসা ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হয়। যখন আপনারা স্কুলে পড়িতেন, তখন কয়েকজন সহপাঠীকেই আপনারা জীবনের প্রিয়তম বন্ধু মনে করিতেন অথবা মাতাপিতাকে ঐরূপ ভালবাসিতেন,

তারপর বিবাহ হইল, তখন স্বামী ও স্ত্রীই পরস্পর প্রীতির আস্পদ হইল—পূর্বের ভাব চলিয়া গেল—নূতন প্রেম প্রবলতম হইয়া উঠিল। আকাশে একটি তারা উঠিয়াছে, তারপর তদপেক্ষা একটি বৃহত্তর নক্ষত্র উঠিল, তারপর তদপেক্ষা আর একটি বৃহত্তর নক্ষত্রের উদয় হইল, অবশেষে সূর্য উঠিল—তখন সূর্যের প্রকাশে ক্ষুদ্রতর জ্যোতিগুলি ম্লান হইয়া গেল। সূর্যই সেই ঈশ্বর। এই তারাগুলি আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাংসারিক ভালবাসা। আর যখন ঐ সূর্যের উদয় হয়, তখন মানুষ উন্মাদ হইয়া যায়—ঐরূপ ব্যক্তিকে এমার্সন 'ভগবৎপ্রেমোন্মত্ত মানব' (a God-intoxicated man) বলিয়াছেন; তখন তাহার নিকট মানুষ জীবজন্তু সব রূপান্তরিত হইয়া গিয়া ঈশ্বররূপে পরিণত হয়—সবই সেই এক প্রেমসমুদ্রে ডুবিয়া যায়। সাধারণ প্রেম কেবল জৈব আকর্ষণমাত্র। তাহা না হইলে প্রেমে স্ত্রী-পুরুষ-ভেদের কি প্রয়োজন? কোন মূর্তির সম্মুখে নতজানু হইয়া প্রার্থনা করিলে তাহা ভয়ানক পৌত্তলিকতা, কিন্তু স্বামীর বা স্ত্রীর সামনে ঐরূপে নতজানু হওয়া যাইতে পারে—তাহাতে কোন দোষ নাই!

এইসবের ভিতর দিয়া আমাদিগকে যাইতে হইবে। সংসারে আমরা ভালবাসার বহু স্তরের সম্মুখীন হই। প্রথমে আমাদের জমি পরিষ্কার করিতে হইবে। জীবনটাকে আমরা যে দৃষ্টিতে দেখি, ভালবাসার সমগ্র তত্ত্ব তাহারই উপর নির্ভর করিবে। এই সংসারই জীবনের চরম লক্ষ্য—এইরূপ মনে করা পশুজনোচিত ও মানুষের ঘোর অবনতির কারণ। যে এই ধারণা লইয়া জীবন-সংগ্রামে অগ্রসর হয়, সে-ই ক্রমে হীন হইয়া যায়; সে আর কখনও উচ্চতর স্তরে উঠিতে পারিবে না,—জগতের অন্তরালে অবস্থিত তত্ত্বের চকিত আভাসও কখন পাইবে না, সে সর্বদাই ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া থাকিবে। সে কেবল টাকার চেষ্টা করিবে—যাহাতে ভাল ভাল খাবার খাইতে পায়। এরূপ জীবন অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। সংসারের দাস, ইন্দ্রিয়ের দাস মানুষ, নিজেকে জাগাও, উচ্চতর তত্ত্ব আরও কিছু আছে। আপনারা কি মনে করেন, চক্ষু কর্ণ ঘ্রাণেন্দ্রিয়াদির দাস হইয়া থাকিবার জন্যই এই মানুষের—এই অনন্ত আত্মার—দেহধারণ? আমাদের পিছনে অনন্ত সর্বজ্ঞ আত্মা রহিয়াছেন, তিনি সব করিতে পারেন, সব বন্ধন ছেদন করিতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে আপনিই সেই আত্মা, আর প্রেমবলেই আপনার ঐ

শক্তির উদয় হইতে পারে। আপনাদের স্মরণ রাখা উচিত—ইহাই আমাদের আদর্শ। একদিনেই এই অবস্থা লাভ করা যায় না। আমরা কল্পনা করিতে পারি, আমরা ঐ অবস্থা লাভ করিয়াছি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত উহা কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়—ঐ অবস্থা এখনও বহু বহু দূরে। যে যে-অবস্থায় রহিয়াছে, যদি সম্ভব হয়, সেই অবস্থা হইতে উচ্চতর অবস্থায় উপনীত হইবার জন্য তাহাকে সাহায্য করিতে হইবে। মানুষ জড়বাদের উপরই দণ্ডায়মান। তুমি আমি সকলেই জড়বাদী। ঈশ্বর সম্বন্ধে—আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা যা-কিছু বলিয়া থাকি, তা বেশ ভাল, কিন্তু বুঝিতে হইবে, সেগুলি আমাদের সমাজে প্রচলিত কতকগুলি কথা মাত্র; আমরা তোতাপাখির মতো সেগুলি শিখিয়াছি এবং মাঝে মাঝে আওড়াইয়া থাকি। অতএব আমরা যে-অবস্থায় আছি অর্থাৎ আমরা এখন যে জড়বাদী —সেই অবস্থা হইতে আরম্ভ করিতে হইবে; এবং আমাদিগকে জড়ের সাহায্য অবশ্যই লইতে হইবে। এইরূপে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আমরা প্রকৃত আত্মবাদী বা চৈতন্যবাদী হইব—নিজদিগকে আত্মা বলিয়া বুঝিব, আত্মা বা চৈতন্য যে কি বস্তু, তাহা বুঝিব; তখন দেখিব—এই যে-জগৎকে আমরা অনন্ত বলিয়া থাকি, তাহা অন্তরালে অবস্থিত সূক্ষ্ম জগতের একটি স্থূল বাহ্যরূপ মাত্র।

ইহা ছাড়া আমাদের আরও কিছু প্রয়োজন আছে। আপনারা বাইবেলে যীশুখ্রীষ্টের 'শৈলোপদেশে' (Sermon on the Mount) পাঠ করিয়াছেন: 'চাও, তবেই তোমাদিগকে দেওয়া হইবে; আঘাত কর, তবেই দ্বার খুলিয়া যাইবে; খোঁজ, তবেই পাইবে।' মুশকিল এই যে—চায় কে, খোঁজে কে? আমরা সকলেই বলি, আমরা ঈশ্বরকে জানি। ঈশ্বরের নাস্তিত্ব প্রতিপাদনের জন্য কেহ এক বৃহৎ পুস্তক লিখিলেন, আর একজন তাঁহার অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য আরও বড় একখানি বই লিখিলেন। একজন সারা জীবন ধরিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করাই নিজের কর্তব্য মনে করিলেন, আর একজন তাঁহার অস্তিত্ব খণ্ডন করাই নিজ কর্তব্য মনে করেন, ও প্রচার করিয়া বেড়ান—ঈশ্বর বলিয়া কেহ নাই। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ বা অপ্রমাণ করিবার জন্য গ্রন্থ লিখিবার কি প্রয়োজন? ঈশ্বর থাকুন বা না-ই থাকুন, অনেকের পক্ষেই তাহাতে কি আসে যায়? এই শহরে অধিকাংশ ব্যক্তি প্রাতঃকালে উঠিয়াই প্রাতরাশ

সম্পন্ন করে—ঈশ্বর আসিয়া তাহার পোশাক পরিবার বা আহারের ব্যাপারে কোন সাহায্য করেন না। তারপর তাহারা কাজে যায় ও সারাদিন কাজ করিয়া টাকা রোজগার করে। ঐ টাকা ব্যাঙ্কে রাখিয়া তাহারা বাড়ি আসে, তারপর উত্তমরূপে ভোজন করিয়া শয়ন করে—এ-সব কাজই তাঁহারা যন্ত্রবৎ করিয়া থাকে, ঈশ্বরের চিন্তা মোটেই করে না, ঈশ্বরের কোন প্রয়োজনই বোধ করে না। মানুষের চারিটি নিত্যকর্তব্য আছে—আহার, পান, নিদ্রা ও বংশবৃদ্ধি। তারপর একদিন মৃত্যু আসিয়া বলে, 'সময় হইয়াছে—চল।' তখন মানুষ বলিয়া থাকে—'মুহূর্তকাল অপেক্ষা করুন, আমি আর একটু সময় চাই, আমার ছেলেটি একটু বড় হোক।' কিন্তু মৃত্যু বলে—'এখনই চল, তোমাকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছি।' জগৎ এইরূপেই চলিয়াছে। এইরূপেই সাধারণ মানুষের জীবন কাটিয়া যায়। সে বেচারাকে আমরা আর কি বলিব? সে ঈশ্বরকে সর্বোচ্চ তত্ত্ব বলিয়া বুঝিবার কোন সুযোগই পায় নাই। হয়তো পূর্বজন্মে সে একটি শূকরছানা ছিল—মানুষ হইয়া তদপেক্ষা সে অনেক ভাল হইয়াছে। কিন্তু সমগ্র জগৎ তো আর ঐরূপ নয়—কতক লোক আছেন, যাঁহাদের কিছুটা চৈতন্য হইয়াছে। হয়তো কিছু দুঃখকষ্ট আসিল—যাহাকে আমরা খুব ভালবাসি, সে মরিয়া গেল। যাহার উপর মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলাম—যাহার জন্য সমুদয় জগৎকে, এমন কি নিজ ভাইকে পর্যন্ত ঠকাইতে পশ্চাৎপদ হই নাই, যাহার জন্য সর্বপ্রকার ভয়ানক কার্য করিয়াছি, সে মরিয়া গেল, তখন হৃদয়ে একটা আঘাত লাগিল, হয়তো অন্তরাত্মার বাণী শোনা গেল—'তারপর কি?' যে ছেলের জন্য মানুষ সকলকে প্রতারণা করিল, নিজেও কখন ভাল করিয়া খাইল না, সে হয়তো মারা গেল,—সেই আঘাতে মানুষ জাগিয়া উঠে। যে-স্ত্রীকে লাভ করিবার জন্য মানুষ উন্মত্ত বৃষের মতো সকলের সহিত লড়াই করিয়াছিল, যাহার নূতন নূতন বস্ত্র ও অলঙ্কারের জন্য সে টাকা জমাইতেছিল, সেই স্ত্রী একদিন হঠাৎ মরিয়া গেল, তারপর? কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য মৃত্যুতে কোন আঘাত বোধ হয় না; কিন্তু খুব অল্প ক্ষেত্রেই এরূপ ঘটিয়া থাকে। আমাদের অধিকাংশের পক্ষেই যখন কোন জিনিস হাত ফসকাইয়া চলিয়া যায়, তখন আমরা বলিয়া থাকি—এর পর কি? ইন্দ্রিয়ের প্রতি আমাদের এমনই দারুণ আসক্তি! ইহারই জন্য আমরা কষ্ট পাই। আপনারা শুনিয়াছেন—

জনৈক ব্যক্তি জলে ডুবিতেছিল, সম্মুখে আর কিছু না পাইয়া সে একটা খড়ের কুটা ধরিয়াছিল। সাধারণ মানুষও প্রথমে ঐরূপ সামনে যাহা পায় তাহাই ধরিয়া থাকে; আর যখন ব্যর্থ হয়, তখনই বলিয়া থাকে—কে আছ, আমায় রক্ষা কর, সাহায্য কর। তথাপি উচ্চতর অবস্থা লাভ করিবার পূর্বে মানুষকে অনেক দুঃখ ভোগ করিতে হয়।

কিন্তু এই ভক্তিযোগ একটি ধর্ম-সাধনা। আর ইহা বহুর জন্য নয়; তাহা হওয়াই অসম্ভব। নতজানু হওয়া, ওঠ-বস-করা—এ-সব কসরৎ সর্বসাধারণের জন্য হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম অতি অল্প লোকের জন্য। সকল দেশেই হয়তো মাত্র কয়েক শত লোক যথার্থ ধার্মিক হইতে পারে বা হইবে। অপরে ধর্ম করিতে পারে না, কারণ তাহারা জাগরিত হইবে না—তাহারা ধর্ম চায়ই না। প্রধান কথা হইতেছে—ভগবান্‌কে চাওয়া। আমরা ভগবান্ ছাড়া আর সব কিছুই চাই; কারণ আমাদের সাধারণ অভাবগুলি বাহ্য জগৎ হইতেই পূর্ণ হইয়া যায়। কেবল যখন বাহ্য জগৎ দ্বারা আমাদের অভাব কোনমতে পূর্ণ হয় না, তখনই আমরা অন্তর্জগৎ হইতে—ঈশ্বর হইতে আমাদের অভাব পূরণ করিতে চাই। যতদিন আমাদের প্রয়োজন এই জড় জগতের সঙ্কীর্ণ গণ্ডির ভিতর সীমাবদ্ধ থাকে, ততদিন ঈশ্বরের কোন প্রয়োজন আমাদের থাকিতে পারে না। কেবল যখনই আমরা এখানকার বিষয়সমূহ ভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত, এবং এতদতিরিক্ত কিছু চাই, তখনই আমরা ঐ অভাবপূরণের জন্য ইন্দ্রিয়-জগতের বাহিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি। যখনই আমাদের প্রয়োজন হয়, কেবল তখনই ইহা মিটাইবার তাগিদ হয়। যত শীঘ্র পারো, এই সংসারের ছেলে-খেলা শেষ করিয়া ফেলো,—তখনই এই জগদতীত কিছুর প্রয়োজন বোধ করিবে, তখনই ধর্মের প্রথম সোপান আরম্ভ হইবে।

এক-রকম ধর্ম আছে—উহা ফ্যাশান বলিয়াই প্রচলিত। আমার বন্ধুর বৈঠকখানায় হয়তো যথেষ্ট আসবাব আছে; এখনকার ফ্যাশান—একটি জাপানী পাত্র (vase) রাখা, অতএব হাজার টাকা দাম হইলেও একটি অবশ্যই চাই। এইরূপ অল্পস্বল্প ধর্মও চাই—একটা সম্প্রদায়েও যোগ দেওয়া চাই। ভক্তি এরূপ লোকের জন্য নয়। ইহাকে প্রকৃত 'ব্যাকুলতা' বলে না। তাহাকেই বলে ব্যাকুলতা, যাহা ব্যতীত মানুষ বাঁচিতেই পারে না। বায়ু চাই, খাদ্য চাই, কাপড় চাই; এগুলি ব্যতীত আমরা জীবনধারণ করিতে

পারি না। মানুষ যখন কোন নারীকে ভালবাসে, তখন সময় সময় সে এরূপ বোধ করে যে, তাহাকে ছাড়িয়া সে বাঁচিতে পারে না, যদিও ইহা তাহার ভ্রম। স্বামী মরিয়া গেলে কিছুক্ষণের জন্য স্ত্রী মনে করে—স্বামীকে ছাড়িয়া সে বাঁচিতে পারিবে না, কিন্তু দেখা যায়—সে তো ঠিক বাঁচিয়াই থাকে। আত্মীয়গণের মৃত্যু হইলে অনেক সময় আমিও ভাবিয়াছি, আর বাঁচিব না, কিন্তু তবু তো ঠিক বাঁচিয়া আছি; প্রকৃত প্রয়োজনের ইহাই রহস্য—যাহা ব্যতীত আমরা বাঁচিতে পারি না, তাহাকেই আমাদের যথার্থ প্রয়োজন বা অভাব বলা যায়; হয় আমাদের উহা পাইতে হইবে, নতুবা মরিব। যখন এমন সময় আসিবে যে, আমরা ভগবানেরও ঐরূপ প্রয়োজন বা অভাব বোধ করিব, অন্য কথায় যখন আমরা এই জগতের —সমুদয় জড়শক্তির অতীত কিছুর অভাব বোধ করিব, তখন আমরা ভক্ত হইতে পারিব। যখন আমাদের হৃদয়াকাশ হইতে ক্ষণকালের জন্য অজ্ঞানমেঘ সরিয়া যায়, আমরা সেই সর্বাতীত সত্তার একবার মাত্র চকিত দর্শন লাভ করি, সেই মুহূর্তের জন্য সকল নীচ বাসনা যেন সিন্ধুতে বিন্দুর ন্যায় বোধ হয়, তখন আমাদের ক্ষুদ্র জীবনের মূল্য কতটুকু? তখনই আত্মার বিকাশ হয়, ভগবানের অভাব অনুভূত হয়; তখন এমন বোধ হয় যে, তাঁহাকে পাইতেই হইবে।

সুতরাং ভক্ত হইবার প্রথম সোপান এই জিজ্ঞাসা—আমরা কি চাই? প্রত্যহ নিজ মনকে প্রশ্ন করিতে হইবে—আমরা কি ঈশ্বরকে চাই? আপনারা জগতের সব গ্রন্থ পড়িতে পারেন, কিন্তু বক্তৃতাশক্তি, উচ্চতম মেধা বা নানাবিধ বিজ্ঞান অধ্যয়নের দ্বারা এই প্রেম লাভ করা যায় না। তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন, সেই তাঁহাকে লাভ করে। তাহার নিকটই ভগবান্ আত্মপ্রকাশ করেন।[১] ভালবাসা সর্বদাই পারস্পরিক, প্রতিবিম্বের মতো; আপনি আমাকে ঘৃণা করিতে পারেন এবং আমি আপনাকে ভালবাসিতে গেলে আপনি আমাকে দূরে সরাইয়া দিতে পারেন, কিন্তু তবু যদি আমি আপনাকে ভালবাসিতে যাই, তবে এক মাসে হউক, এক বৎসরে হউক, আপনি আমাকে ভালবাসিতে বাধ্য হইবেন। মনোজগতে ইহা

১ কঠ উপ., ১।২।২৩

একটি সর্বজনবিদিত ঘটনা। ভগবান্ যাহাকে ভালবাসেন, সেও ভগবান্‌কে ভালবাসে, সে সর্বান্তঃকরণে তাঁহাকে আঁকড়াইয়া ধরে। প্রেমিকা স্ত্রী যেভাবে তাহার মৃত পতিকে চিন্তা করে, পুত্রগণকে আমরা যেভাবে ভালবাসিয়া থাকি, ঠিক সেইভাবে আমাদিগকে ভগবানের জন্য ব্যাকুল হইতে হইবে। তবেই আমরা ভগবান্‌কে লাভ করিব। এই-সব বই, এই-সব বিজ্ঞান—আমাদিগকে কিছুই শিখাইতে পারিবে না। বই পড়িয়া আমরা তোতাপাখি হই, বই পড়িয়া কেহ পণ্ডিত হয় না। যে ব্যক্তি প্রেমের একটি অক্ষর পাঠ করিয়াছে, সে-ই প্রকৃত পণ্ডিত। অতএব প্রথমেই আমাদের চাই সেই আকাঙ্ক্ষা বা ব্যাকুলতা।

প্রত্যহ নিজের মনকে প্রশ্ন করিতে হইবে—আমরা কি ভগবান্‌কে চাই? যখন আমরা ধর্মের সম্বন্ধে কথা বলিতে আরম্ভ করি, বিশেষতঃ যখন আমরা উচ্চাসনে বসিয়া অপরকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করি, তখন নিজ নিজ মনকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। আমি অনেক সময় দেখিতে পাই, আমি ভগবান্‌কে চাই না, বরং তদপেক্ষা খাদ্যদ্রব্যই ভালবাসি। এক টুকরা রুটি না পাইলে আমি পাগল হইয়া যাইতে পারি; অনেক সম্ভ্রান্ত মহিলা একটা হীরার পিন না পাইলে পাগল হইয়া যাইবেন! ভগবানের জন্য তাঁহাদের সে ব্যাকুলতা নাই। এই বিশ্বজগতে যিনি একমাত্র সত্য বস্তু, তাঁহাকে তাঁহারা জানেন না। আমাদের দেশে চলিত কথায় বলে—'মারি তো গণ্ডার, লুটি তো ভাণ্ডার।' গরীবের ঘর লুট করিয়া অথবা পিঁপড়ে মারিয়া কি হইবে? অতএব যদি ভালবাসিতে চান, ভগবানকে ভালবাসুন। সংসারের এ-সব জিনিস ভালবাসিয়া কি হইবে? আমি স্পষ্টবাদী মানুষ—তবে আমার উদ্দেশ্য ভাল, আমি সত্য কথা বলিতে চাই, আমি আপনাদের তোষামোদ করিতে চাই না, ঐরূপ করা আমার কাজ নয়। ঐরূপ করা যদি আমার উদ্দেশ্য হইত, তবে আমি শহরের ভাল জায়গায় শৌখিন লোকের উপযোগী একটা চার্চ খুলিয়া বসিতাম। তোমরা আমার সন্তানের মতো—আমি তোমাদিগকে সত্য কথা বলিতে চাই: এই জগৎ সম্পূর্ণ মিথ্যা, জগতের শ্রেষ্ঠ আচার্যগণ সকলেই তাহা বুঝিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বর ব্যতীত এই সংসারের বাহিরে যাওয়ার আর উপায় নাই। তিনি আমাদের জীবনের চরম লক্ষ্য। এই জগৎই জীবনের চরম লক্ষ্য—এরূপ ধারণাও অত্যন্ত ক্ষতিকর। এই জগতের

—এই দেহের নিজস্ব মূল্য একটা আছে, এবং উহা গৌণ। এগুলি উদ্দেশ্যের উপায়স্বরূপ হইতে পারে, কিন্তু এই জগৎ যেন আমাদের চরম লক্ষ্য না হয়। দুঃখের বিষয়, আমরা অনেক সময় এই জগৎকেই উদ্দেশ্য করিয়া ঈশ্বরকে সংসার-সুখলাভের উপায়স্বরূপ করিয়া থাকি। আমরা দেখিতে পাই, লোকে উপাসনা-স্থলে গিয়া প্রার্থনা করিতেছে—ভগবান্, আমার রোগ সারাইয়া দাও; ভগবান্, আমায় ইহা দাও, উহা দাও। তাহারা সুন্দর সুস্থ দেহ চায়, এবং যেহেতু তাহারা শুনিয়াছে যে, একজন কেহ কোন স্থানে বসিয়া আছেন, তিনি ইচ্ছা করিলেই তাহাদের ঐ কামনা পূর্ণ করিয়া দিতে পারেন, সেই হেতু তাহারা তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকে। ধর্মের এইরূপ ধারণা অপেক্ষা নাস্তিক হওয়া ভাল। আমি তো পূর্বেই বলিয়াছি, এই ভক্তিই সর্বোচ্চ আদর্শ। লক্ষ লক্ষ বৎসর সাধনা করিয়াও আমরা এই আদর্শে উপনীত হইতে পারিব কি না জানি না, কিন্তু ইহাকেই সর্বোচ্চ আদর্শ করিতে হইবে—আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকেও উচ্চতম বস্তু লাভের চেষ্টায় নিযুক্ত করিতে হইবে। যদি একেবারে শেষ প্রান্তে পৌঁছানো না যায়, অন্ততঃ কিছুদূর পর্যন্ত তো যাওয়া যাইবে। ঈশ্বরের নিকট পৌঁছিবার জন্য আমাদিগকে ধীরে ধীরে এই জগৎ ও ইন্দ্রিয়গুলির মধ্য দিয়াই কাজ করিতে হইবে।

ভক্তির আচার্য—সিদ্ধগুরু ও অবতারগণ

সকল আত্মাই বিধাতার নিয়মে পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইবে—চরমে সকল প্রাণীই সেই পূর্ণাবস্থা লাভ করিবে। অতীতে আমরা যেভাবে জীবন যাপন করিয়াছি অথবা যেরূপ চিন্তা করিয়াছি, আমাদের বর্তমান অবস্থা তাহারই ফলস্বরূপ, আর এখন যেরূপ কার্য বা চিন্তা করিতেছি, তদনুসারে আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন গঠিত হইবে। এই কঠোর কর্মবাদ সত্য হইলেও ইহার মর্ম এই নয় যে, আত্মোন্নতি-সাধনে অপর কাহারও সাহায্য লইতে হইবে না। আত্মার মধ্যে যে শক্তির স্ফুরণের সম্ভাবনা রহিয়াছে, সকল সময়েই অপর আত্মা হইতে শক্তিসঞ্চার দ্বারাই তাহা জাগ্রত হইয়া থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরূপ বাহিরের সহায়তা একান্তই প্রয়োজন। বাহির হইতে প্রেরণাশক্তি আসিয়া যখন আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তির উপর কার্য করিতে থাকে, তখনই আত্মোন্নতির সূত্রপাত হয়, মানুষের ধর্মজীবন আরম্ভ হয়, চরমে মানুষ পরমশুদ্ধ ও পূর্ণ হইয়া যায়।

বাহির হইতে যে শক্তি আসার কথা বলা হইল, উহা গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায় না। এক আত্মা অপর আত্মা হইতেই শক্তি লাভ করিতে পারে, অন্য কিছু হইতে নয়। আমরা সারা জীবন বই পড়িতে পারি, খুব বুদ্ধিমান্ হইয়া উঠিতে পারি, কিন্তু পরিণামে দেখিব—আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি কিছুমাত্র হয় নাই। বুদ্ধি খুব উন্নত ও বিকশিত হইলেই যে সঙ্গে সঙ্গে তদনুযায়ী আধ্যাত্মিক উন্নতিও হইবে, তাহার কোন যুক্তি নাই ; বরং আমরা প্রায় প্রত্যহই দেখিতে পাই, বুদ্ধির যতটা উন্নতি হইয়াছে, আত্মার সেই পরিমাণে অবনতি ঘটিয়াছে।

বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশে গ্রন্থ হইতে অনেক সাহায্য পাওয়া যায় বটে, কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতে গেলে গ্রন্থ হইতে কোন সাহায্যই পাওয়া যায় না বলিলেই হয়। গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে কখন কখন ভ্রমবশতঃ আমরা মনে করি, উহা হইতে আধ্যাত্মিক সহায়তা পাইতেছি, কিন্তু যদি অন্তর বিশ্লেষণ করিয়া দেখি, তবে বুঝিব—উহাতে আমাদের বুদ্ধিই কিছুটা সহায়তা পাইয়াছে মাত্র, আত্মার কিছুই হয় নাই। এই জন্যই আমরা প্রায় সকলেই

ধর্মসম্বন্ধে সুন্দর সুন্দর বক্তৃতা দিতে পারি, অথচ ধর্মানুযায়ী জীবনযাপনের সময় অনুভব করি—আমাদের শোচনীয় অক্ষমতা। ইহার কারণ—আধ্যাত্মিক উদ্দীপনার জন্য বাহির হইতে যে শক্তি প্রয়োজন, পুস্তক হইতে তাহা পাওয়া যায় না। আত্মাকে জাগ্রত করিতে হইলে অপর এক আত্মা হইতেই শক্তি সঞ্চারিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

যে আত্মা হইতে শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাঁহাকে 'গুরু' বলে, এবং যাহাতে সঞ্চারিত হয়, তাহাকে 'শিষ্য' বলে। এই শক্তিসঞ্চার করিতে হইলে প্রথমতঃ যাঁহার নিকট হইতে শক্তি আসিবে, তাঁহার সঞ্চার করিবার মতো শক্তি থাকা আবশ্যক; দ্বিতীয়তঃ যাহাতে সঞ্চারিত হইবে, তাহারও উহা গ্রহণ করিবার শক্তি থাকা আবশ্যক। বীজ সজীব হওয়া আবশ্যক, ক্ষেত্রও সুকৃষ্ট হওয়া চাই, এবং যেখানে এই দুইটি শর্ত পূর্ণ হইয়াছে, সেখানেই ধর্মের অপূর্ব বিকাশ হইয়া থাকে। 'আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা'—ধর্মের বক্তাও অলৌকিক গুণ-সম্পন্ন, আর শ্রোতাও তদ্রূপ।[১] আর যখন প্রকৃতপক্ষে উভয়েই অলৌকিক-গুণসম্পন্ন অসাধারণ-প্রকৃতির হন, তখনই চমৎকার আধ্যাত্মিক বিকাশ দেখা যায়, নতুবা নয়। এইরূপ ব্যক্তিই যথার্থ গুরু এবং ঐরূপ ব্যক্তিই যথার্থ শিষ্য—অপরে ধর্ম লইয়া ছেলেখেলা করিতেছে মাত্র। তাহাদের ধর্মসম্বন্ধে একটু জানিবার চেষ্টা—একটু সামান্য কৌতূহল হইয়াছে মাত্র; কিন্তু তাহারা এখনও ধর্মের বহিঃসীমায় দাঁড়াইয়া আছে। অবশ্য ইহারও কিছু মূল্য আছে। সময়ে সবই হইয়া থাকে। কালে এই-সকল ব্যক্তির হৃদয়ে যথার্থ ধর্মপিপাসা জাগ্রত হইতে পারে। আর প্রকৃতির ইহা অতি রহস্যময় নিয়ম যে, ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলে বীজ আসিবেই আসিবে, জীবাত্মার যখনই ধর্মের প্রয়োজন হইবে, তখনই ধর্মশক্তিসঞ্চারক গুরুও অবশ্যই আসিবেন। কথায় বলে—'যে পাপী পরিত্রাতাকে খুঁজিতেছে, পরিত্রাতাও খুঁজিয়া গিয়া সেই পাপীকে উদ্ধার করেন।' গ্রহীতা আত্মার আকর্ষণীশক্তি যখন পূর্ণ ও পরিপক্ব হয়, তখন উহা যে শক্তিকে খুঁজিতেছে, তাহা অবশ্য আসিবে।

তবে পথে বড় বড় বিপদ আছে। গ্রহীতার সাময়িক ভাবোচ্ছ্বাসকে যথার্থ ধর্মপিপাসা বলিয়া ভ্রম হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। আমরা অনেক

---

১ কঠ উপ, ১।২।৭

সময় আমাদের জীবনে ইহা দেখিতে পাই। আমরা কোন ব্যক্তিকে ভালবাসি; সে মরিয়া গেল, মুহূর্তের জন্য আঘাত পাইলাম। বোধ হইল—সমুদয় জগৎটা জলের মতো আঙুল দিয়া গলিয়া যাইতেছে। তখন আমরা ভাবি, এই অনিত্য সংসার হইতে উচ্চতর বস্তুর সন্ধান করিতে হইবে, আর মনে করি—আমরা ধার্মিক হইতেছি। কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের মন হইতে সেই ভাবতরঙ্গ চলিয়া গেল; আমরা যেখানে ছিলাম, সেইখানেই পড়িয়া রহিলাম। আমরা অনেক সময় এইরূপ সাময়িক ভাবোচ্ছ্বাসকে যথার্থ ধর্মপিপাসা বলিয়া ভুল করি। কিন্তু যতদিন আমরা এইরূপ ভুল করিব, ততদিন সেই অহরহব্যাপী, প্রকৃত আধ্যাত্মিক প্রয়োজন-বোধ আসিবে না এবং আমরা শক্তিসঞ্চারকের সাক্ষাৎ লাভও করিতে পারিব না।

অতএব যখন আমরা বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলি যে, আমরা সত্যলাভের জন্য এত ব্যাকুল অথচ উহা লাভ হইতেছে না, তখন ঐরূপ বিরক্তিপ্রকাশের পরিবর্তে আমাদের প্রথম কর্তব্য—নিজ নিজ অন্তরাত্মায় অনুসন্ধান করিয়া দেখা, আমরা যথার্থই সত্যবস্তু চাই কি না। তাহা হইলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখিব—আমরাই ধর্মলাভের উপযুক্ত নই, আমরা উহা চাই না; অধ্যাত্মতত্ত্ব-লাভের জন্য এখনও আমাদের পিপাসা জাগে নাই। শক্তি-সঞ্চারকের সম্বন্ধে আরও অনেক বাধাবিঘ্ন।

এমন অনেক লোক আছে, তাহারা যদিও স্বয়ং অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন, তথাপি অহঙ্কারবশতঃ নিজেদের সবজান্তা মনে করে, আর শুধু ইহাতেই ক্ষান্ত হয় না, তাহারা অপরকে ঘাড়ে করিয়া লইয়া যাইতে চায়। এইরূপে 'অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধের ন্যায় উভয়েই খানায় গিয়া পড়ে'।[১] পৃথিবী এইরূপ মানুষেই পূর্ণ; সকলেই গুরু হইতে চায়। এ যেন ভিখারীর লক্ষমুদ্রা-দানের প্রস্তাবের ন্যায়। এই ভিক্ষুক যেমন হাস্যাস্পদ হয়, ঐ গুরুরাও তেমনি।

তবে গুরুকে চিনিব কিরূপে? প্রথমতঃ সূর্যকে দেখিবার জন্য মশালের প্রয়োজন হয় না—বাতি জ্বালিতে হয় না। সূর্য উঠিলে আমরা স্বভাবতই জানিতে পারি যে, সূর্য উঠিয়াছে, আমাদের কল্যাণার্থে যখন কোন লোকগুরুর

১ কঠ. উপ., ১।২।৫

আবির্ভাব হয়, তখন আত্মা স্বভাবতই জানিতে পারে, সত্যবস্তুর সাক্ষাৎ পাইয়াছি। সত্য স্বতঃসিদ্ধ—উহার সত্যতা সিদ্ধ করিবার জন্য অন্য কোন প্রমাণের আবশ্যক হয় না—উহা স্বপ্রকাশ, উহা আমাদের প্রকৃতির অন্তরতম দেশে পর্যন্ত প্রবেশ করে এবং সমগ্র প্রাকৃতিক জগৎ উহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া উহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে।

অবশ্য এ কথাগুলি অতি শ্রেষ্ঠ আচার্যগণের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, কিন্তু আমরা অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্তরের আচার্যগণের নিকটও সাহায্য পাইতে পারি। আর যেহেতু আমরাও সকলে এতটা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন নই যে, আমরা যাঁহার নিকট শক্তিলাভের জন্য যাইতেছি, তাঁহার সম্বন্ধে ঠিক ঠিক বিচার করিতে পারিব—সেইজন্য কতকগুলি পরীক্ষা প্রয়োজন। শিষ্যের কতকগুলি গুণ থাকা চাই, তেমনি গুরুরও লক্ষণ আছে।

শিষ্যের থাকা চাই—পবিত্রতা, যথার্থ জ্ঞানপিপাসা ও অধ্যবসায়। অপবিত্র ব্যক্তি কখনও ধার্মিক হইতে পারে না। পবিত্রতাই শিষ্যের একটি প্রধান প্রয়োজনীয় গুণ। সর্বপ্রকারে পবিত্রতা একান্ত আবশ্যক। দ্বিতীয় প্রয়োজন—যথার্থ জ্ঞানপিপাসা। ধর্ম চায় কে? এই তো প্রশ্ন। সনাতন বিধানই এই, আমরা যাহা চাহিব তাহাই পাইব। যে চায়—সে পায়। ধর্মের জন্য যথার্থ ব্যাকুলতা বড় কঠিন জিনিস; আমরা সাধারণতঃ উহাকে যত সহজ মনে করি, উহা তত সহজ নয়। তারপর আমরা তো সর্বদাই ভুলিয়া যাই যে, ধর্মের কথা শুনিলেই বা ধর্মগ্রন্থ পড়িলেই ধর্ম হয় না; যতদিন না সম্পূর্ণ জয়লাভ হইতেছে, ততদিন অবিশ্রান্ত চেষ্টা—নিজ প্রকৃতির সহিত অবিরাম সংগ্রামই ধর্ম। এ দু-এক দিনের বা কয়েক বৎসর বা কয়েক জন্মেরও কথা নয়, হয়তো প্রকৃত ধর্মলাভ করিতে শত শত জন্ম লাগিবে। ইহার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। এই মুহূর্তেই আমাদের প্রকৃত ধর্ম লাভ হইতে পারে, অথবা শত শত জন্মেও লাভ না হইতে পারে, তথাপি আমাদিগকে উহার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। যে শিষ্য এইরূপ হৃদয়ের ভাব লইয়া ধর্মসাধনে অগ্রসর হয়, সে-ই কৃতকার্য হয়।

গুরুর সম্বন্ধে আমাদিগকে প্রথমে দেখিতে হইবে, তিনি যেন শাস্ত্রের মর্মজ্ঞ হন। সমগ্র জগৎ বেদ, বাইবেল, কোরান ও অন্যান্য শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া থাকে—কিন্তু ওগুলি তো কেবল শব্দরাশি, বাহ্য পদ্ধতি, ব্যাকরণ,

শব্দতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, ধর্মের শুষ্ক কাঠামো মাত্র। ধর্মাচার্য হয়তো গ্রন্থবিশেষের রচনাকাল নিরূপণ করিতে পারেন, কিন্তু শব্দ তো ভাবের বাহ্য আকৃতি বই আর কিছুই নয়। যাহারা শব্দ লইয়া বেশী নাড়াচাড়া করে এবং মনকে সর্বদা শব্দের শক্তি অনুযায়ী পরিচালিত হইতে দেয়, তাহারা ভাব হারাইয়া ফেলে। অতএব গুরুর পক্ষে শাস্ত্রের মর্মজ্ঞান থাকা বিশেষ প্রয়োজন। শব্দজাল মহা অরণ্যস্বরূপ—চিত্তভ্রমণের কারণ, মন ঐ শব্দজালের মধ্যে দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া বাহিরে যাইবার পথ দেখিতে পায় না।[১] বিভিন্ন প্রকারে শব্দযোজনার কৌশল, সুন্দর ভাষা, কথা বলিবার বিভিন্ন উপায়, শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিবার নানা উপায়, এ শুধু পণ্ডিতদের ভোগের জন্য, তাহাতে কখনও মুক্তিলাভ হয় না।[২] তাহারা কেবল নিজেদের পাণ্ডিত্য দেখাইবার জন্য উৎসুক—যাহাতে সকলে তাহাদিগকে খুব পণ্ডিত বলিয়া প্রশংসা করে। আপনারা দেখিবেন, জগতের কোন শ্রেষ্ঠ আচার্যই এইরূপ শাস্ত্রের শ্লোকের বিবিধ ব্যাখ্যার চেষ্টা করেন নাই, তাঁহারা শাস্ত্রের বিকৃত অর্থ করিবার চেষ্টা করেন নাই, তাঁহারা বলেন নাই, এই শব্দের এই অর্থ আর এই শব্দ ও ঐ শব্দের এইরূপ সম্বন্ধ ইত্যাদি। আপনারা জগতের শ্রেষ্ঠ আচার্যগণের জীবন ও বাণী পাঠ করুন, দেখিবেন—তাঁহাদের মধ্যে কেহই ঐরূপ করেন নাই। তথাপি তাঁহারাই যথার্থ শিক্ষা দিয়াছেন। আর যাঁহাদের কিছুই শিখাইবার নাই, তাঁহারা একটি শব্দ লইয়া সেই শব্দের কোথা হইতে উৎপত্তি, কোন্ ব্যক্তি উহা প্রথম ব্যবহার করিয়াছিল, সে কি খাইত, কিরূপে ঘুমাইত, এই সম্বন্ধে তিনখণ্ড এক গ্রন্থ লিখিলেন।

আমার গুরুদেব একটি গল্প বলিতেন: কয়েকজন লোক এক আমবাগানে গিয়াছিল; তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই গনিতে লাগিল কটা আমগাছ, কোন্ গাছে কত আম, এক একটা ডালে কত পাতা, পাতার কি রঙ, ডালগুলি কত বড়, কত শাখা-প্রশাখা ইত্যাদি। এ-সব লিখিয়া লইয়া নানারকম আশ্চর্য আলোচনা করিতে লাগিল। আর একজন—সেই বেশী বুদ্ধিমান্—বাগানের মালিকের সঙ্গে আলাপ করিয়া আম পাড়িয়া খাইতে লাগিল।

১ শব্দজালং মহারণ্যং চিত্তভ্রমণকারণং।—বিবেকচূড়ামণি, ৬২

২ বাগ্বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলম্।
বৈদুষ্যং বিদুষাং তদ্বদ্ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে।—ঐ, ৬০

অতএব এই ডালপালা ও পাতা গোনা ছাড়িয়া দাও। অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে এ-সব কর্মের উপযোগিতা আছে, কিন্তু এখানে—এই আধ্যাত্মিক রাজ্যে নয়। ঐরূপ কার্যের দ্বারা কেহ কখন আধ্যাত্মিক হইতে পারে না। এই সব 'পাতাগোনা' দলের ভিতর কি আপনারা কখন একজনও ধর্মবীরকে দেখিয়াছেন? ধর্মই মানবজীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য, উহাই মানব-জীবনের সর্বোচ্চ গৌরব; উহা আবার সর্বাপেক্ষা সহজ—উহাতে পাতাগোনা বা হিসাব করার মতো ঝামেলার কোন প্রয়োজন হয় না। যদি আপনি খ্রীষ্টান হইতে চান, তবে কোথায় খ্রীষ্টের জন্ম হয়—বেথলিহেমে বা জেরুজালেমে, তিনি কি করিতেন, অথবা ঠিক কোন্ তারিখে 'শৈলোপদেশ' (Sermon on the Mount) দিয়াছিলেন, তাহা জানিবার কোন প্রয়োজন নাই। আপনি যদি কেবল ঐ উপদেশগুলি প্রাণে প্রাণে অনুভব করেন, তবেই যথেষ্ট। কখন ঐ উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে দুই হাজার শব্দের একটি প্রবন্ধ পড়িবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। এ-সব পণ্ডিতদের আমাদের জন্য—তাঁহারা উহা লইয়া আনন্দ করুন। তাঁহাদের কথায় 'শান্তিঃ শান্তিঃ' বলিয়া আসুন—আমরা 'আম খাই'।

দ্বিতীয়তঃ গুরুর সম্পূর্ণ নিষ্পাপ হওয়া আবশ্যক। ইংলণ্ডে জনৈক বন্ধু একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'গুরুর ব্যক্তিগত চরিত্র—তিনি কি করেন না করেন, দেখিবার প্রয়োজন কি? তিনি যাহা বলেন, তাহা লইয়া কাজ করিলেই হইল।' এ-কথা ঠিক নয়। যদি কোন ব্যক্তি আমাকে গতিবিজ্ঞান, রসায়ন বা অন্য কোন জড়বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু শিখাইতে ইচ্ছা করে, সে যে চরিত্রের লোক হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই; সে অনায়াসে উহা শিক্ষা দিতে পারে। ইহা সম্পূর্ণ সত্য—কারণ জড়বিজ্ঞান শিখাইতে যে জ্ঞানের প্রয়োজন, তাহা কেবল বুদ্ধিবিষয়ক বলিয়া বুদ্ধিজাত শক্তির উপর নির্ভর করে; এরূপ ক্ষেত্রে আত্মার কিছুমাত্র বিকাশ না থাকিলেও একজনের দারুণ বুদ্ধিশক্তি থাকিতে পারে। কিন্তু অধ্যাত্মবিজ্ঞানে যে ব্যক্তি অশুদ্ধচিত্ত, তাঁহার হৃদয়ে কোনপ্রকার আধ্যাত্মিক আলোক প্রতিভাত হওয়া অসম্ভব। তিনি কি শিক্ষা দিবেন? তিনি তো নিজেই কিছু জানেন না। চিত্তের শুদ্ধিই আধ্যাত্মিক সত্য। 'পবিত্রাত্মারা ধন্য, কারণ তাঁহারা ঈশ্বরকে দর্শন করিবেন।' এই একটি বাক্যের মধ্যেই ধর্মের সমুদয় সারতত্ত্ব নিহিত।

যদি আপনি এই একটি কথা শিখিয়া থাকেন, তবে অতীতকালে ধর্মসম্বন্ধে যাহা কিছু উক্ত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে যাহা কিছু কথিত হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহা আপনি জানিয়াছেন। আপনার আর কিছু জানিবার প্রয়োজন নাই, কারণ আপনার যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহা ঐ একটি বাক্যের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। সমুদয় শাস্ত্র নষ্ট হইয়া গেলেও ঐ একটিমাত্র বাক্যই সমগ্র জগৎকে উদ্ধার করিতে সমর্থ। যতক্ষণ না জীবাত্মা শুদ্ধস্বভাব হইতেছে, ততক্ষণ ঈশ্বরদর্শন বা সেই সর্বাতীত তত্ত্বের চকিত দর্শন অসম্ভব। অতএব গুরুর পবিত্রতারূপ এই একটি গুণ থাকিবেই, প্রথমে দেখিতে হইবে—তিনি কি প্রকারের মানুষ ; তারপর শুনিতে হইবে তিনি কি বলেন। লৌকিক বিদ্যার শিক্ষকগণের সম্বন্ধে অবশ্য এ-কথা খাটে না। তাঁহারা কি চরিত্রের লোক, ইহা জানা অপেক্ষা তাঁহারা কি বলেন, এইটি জানা আমাদের বেশী প্রয়োজন। ধর্মাচার্য সম্বন্ধে আমাদিগকে সর্বপ্রথমেই দেখিতে হইবে, তিনি কিরূপ চরিত্রের মানুষ, তবেই তাহার কথার একটা মূল্য হইবে ; তিনি যে শক্তি-সঞ্চারক। যদি তাঁহার মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি না থাকে, তবে তিনি কী সঞ্চার করিবেন ? গুরুর মনে এক প্রকার স্পন্দন রহিয়াছে, শিষ্যের মনে তিনি উহা সঞ্চার করিয়া দেন। একটি উপমা দেওয়া যাক। যদি এই আধারে অগ্নি থাকে, তবেই উহা তাপ সঞ্চার করিতে পারে, নতুবা পারে না। ইহা একজন হইতে আর একজনের মধ্যে সঞ্চারের কথা—কেবল আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে উত্তেজিত করা নয়। গুরুর নিকট হইতে একটা প্রত্যক্ষ কিছু শিষ্যের মধ্যে প্রবেশ করে—উহা প্রথমে বীজরূপে আসিয়া বৃহৎ বৃক্ষাকারে ক্রমশঃ বর্ধিত হইতে থাকে। অতএব গুরুর নিষ্পাপ ও অকপট হওয়া আবশ্যক।

তৃতীয়তঃ দেখিতে হইবে—গুরুর উদ্দেশ্য কি। দেখিতে হইবে—তিনি যেন নাম যশ বা অন্য কোন উদ্দেশ্য লইয়া শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত না হন ; কেবল ভালবাসা—শিষ্যের প্রতি অকপট ভালবাসার জন্যই যেন তিনি শিষ্যকে শিক্ষা দেন। গুরু হইতে শিষ্যে যে আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাহা কেবল ভালবাসার মাধ্যমেই সঞ্চারিত হইতে পারে। অপর কোন মাধ্যমের দ্বারা উহা সঞ্চার করা যাইতে পারে না। কোন প্রকার লাভ বা নামযশের আকাঙ্ক্ষারূপ অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকিলে তৎক্ষণাৎ ঐ শক্তিসঞ্চারক মাধ্যম

নষ্ট হইয়া যাইবে। অতএব ভালবাসার মধ্য দিয়াই সব কিছু করিতে হইবে। যিনি ঈশ্বরকে জানিয়াছেন, তিনিই গুরু হইতে পারেন।

যখন দেখিবে—গুরুর এই গুণগুলি আছে, তখন আর কোন চিন্তা নাই। কিন্তু এগুলি না থাকিলে তাঁহার নিকট শিক্ষা গ্রহণ করায় বিপদ আছে। যদি তিনি সদ্ভাব সঞ্চার করিতে না পারেন, তবে সময় সময় কুভাব সঞ্চারিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। ইহা হইতে সাবধান হইতে হইবে। অতএব স্বভাবতই বোধ হইতেছে, যে-কোন ব্যক্তির নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিতে পার না। নদী ও প্রস্তরাদি হইতে উপদেশ শ্রবণ[১] অলঙ্কার-হিসাবে সুন্দর কথা হইতে পারে; কিন্তু নিজের ভিতরে সত্য না থাকিলে কেহ সত্যের এক কণাও প্রচার করিতে পারে না। নদীর উপদেশ শুনিতে পায় কে?—প্রকৃত গুরুর জ্ঞানালোকে যাহার জীবন পূর্বেই বিকশিত হইয়াছে; হৃৎপদ্ম একবার প্রস্ফুটিত হইলে নদী-প্রস্তর চন্দ্র-তারকা প্রভৃতি হইতে শিক্ষা গ্রহণ করা যাইতে পারে—ইহাদের সকলের নিকট হইতেই কিছু না কিছু আধ্যাত্মিক শিক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু যাহার হৃৎপদ্ম এখনও প্রস্ফুটিত হয় নাই, সে শুধু নদী ও প্রস্তরই দেখিবে। একজন অন্ধ চিত্রশালায় যাইতে পারে, কিন্তু তাহার যাওয়া বৃথা; আগে তাহাকে দৃষ্টি দিতে হইবে, তবেই সে ঐ স্থান হইতে কিছু শিক্ষা পাইবে। গুরুই আধ্যাত্মিক জীবনের নয়ন-উন্মীলনকারী। অতএব পূর্বপুরুষ ও বংশধরগণের মধ্যে যে সম্বন্ধ, গুরুর সহিত আমাদের সেই সম্বন্ধ। গুরুই আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্বপুরুষ এবং শিষ্য তাঁহার আধ্যাত্মিক সন্তান বা উত্তরাধিকারী। স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য ও এরূপ কথা বলা বেশ ভাল বটে, কিন্তু নম্রতা বিনয় আজ্ঞাবহতা শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ব্যতীত কোন প্রকার ধর্ম হইতে পারে না। ইহা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ যে, সেখানে গুরুশিষ্যের মধ্যে এরূপ সম্বন্ধ এখনও বর্তমান, কেবল সেখানেই বড় বড় ধর্মবীরের জীবন বিকশিত হয়, কিন্তু যে সমাজে এইরূপ সম্বন্ধ বিসর্জিত হইয়াছে, সেখানে ধর্ম চিত্ত-বিনোদনের একটি উপায়ে পরিণত হইয়াছে। যে-সকল জাতি ও ধর্ম-সম্প্রদায়ের ভিতর, গুরুশিষ্যের মধ্যে এরূপ সম্বন্ধ রক্ষিত হয় না, ধর্ম সেখানে অজ্ঞাত বলিলেই হয়। গুরুশিষ্যের ভিতর ঐরূপ ভাব ব্যতীত ধর্ম আসিতেই

১ 'Books in running brooks, sermons in stones' : *Shakespeare*

পারে না। প্রথমতঃ শক্তি সঞ্চার করিবার কেহ নাই; দ্বিতীয়তঃ যাহার ভিতর সঞ্চারিত হইবে এমনও কেহ নাই—কারণ সকলেই যে স্বাধীন! কাহার নিকট হইতে তাহারা শিখিবে? আর কেহ শিখিতে আসিলেও সে জ্ঞান ক্রয় করিতে আসে। আমাকে এক টাকার ধর্ম দাও। আমরা কি আর এজন্য এক টাকা খরচ করিতে পারি না? এভাবে ধর্মলাভ করা যায় না।

জ্ঞান অপেক্ষা উচ্চতর ও পবিত্রতর আর কিছু নাই[১]; গুরুর মাধ্যমে উহা মানবাত্মায় আবির্ভূত হইয়া থাকে। সিদ্ধ যোগী হইলে ঐ জ্ঞান আপনা আপনি আসিয়া থাকে, গ্রন্থ হইতে উহা লাভ করা যায় না! যতদিন না গুরুলাভ করিতেছ, ততদিন পৃথিবীর চার কোণে মাথা খুঁড়িয়া আসিতে পারো, অথবা হিমালয়, আল্পস্ বা ককেসস্ পর্বত অথবা গোবি বা সাহারা মরুভূমিতে বা সাগরের তলদেশেও যাইতে পারো, কিছুতেই এই জ্ঞান আসিবে না। গুরুলাভ কর; সন্তান যেমন পিতার সেবা করে, সেইভাবে তাঁহার সেবা কর, তাঁহার নিকট হৃদয় উন্মুক্ত কর, তাঁহার মধ্যে ঈশ্বরের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ কর। গুরু আমাদের পক্ষে ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি—এই বলিয়া প্রথম তাঁহার প্রতি চিত্ত সংলগ্ন করিতে হইবে, তারপর ধ্যান যতই প্রগাঢ় হয়, ততই গুরুর ছবি মিলাইয়া যায়, তাঁহার বাহ্যরূপ আর দেখা যায় না, তখন সেখানে কেবল যথার্থ ঈশ্বরই বিরাজমান। যাঁহারা এইরূপ শ্রদ্ধা ও ভালবাসার ভাব লইয়া সত্যানুসন্ধানে অগ্রসর হন, সত্যের ভগবান্ তাঁহাদের নিকট অতি অদ্ভুত তত্ত্বসমূহ প্রকাশ করেন। পা হইতে 'জুতা খুলিয়া ফেল, কারণ যেখানে তুমি দাঁড়াইয়া আছ, তাহা পবিত্র ভূমি।'[২] যেখানেই তাঁহার নাম উচ্চারিত হয়, সেই স্থানই পবিত্র! যিনি তাঁহার নাম উচ্চারণ করেন, তিনি কতদূর পবিত্র! আর যাঁহার নিকট হইতে আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ লাভ হয়, কত গভীর শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার সমীপে যাওয়া উচিত! এই ভাব লইয়া আমাদিগকে গুরুর নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে। এই জগতে এরূপ গুরু যে সংখ্যায় অতি অল্প, তাহাতে কোন সংশয় নাই, কিন্তু পৃথিবীতে এরূপ গুরু একটিও থাকেন না—এমন কখনও হয় না। যে মুহূর্তে পৃথিবী

---

১ নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে। গীতা, ৪।৩৮

২ *'Take thy shoes from off thy feet, for the place whereon thou standest is holy ground'. Bible*

সম্পূর্ণরূপে এইরূপ গুরু-বিরহিত হইবে, সেই মুহূর্তেই ইহা ভয়ানক নরককুণ্ডে পরিণত হইবে, ধ্বংস হইয়া যাইবে। এই গুরুগণই মানবজীবনের সুন্দরতম বিকাশ—তাঁহারা আছেন বলিয়াই জগৎ চলিতেছে। তাঁহাদের শক্তিতেই সমাজ-বন্ধন অব্যাহত রহিয়াছে।

ইঁহারা ব্যতীত আর এক শ্রেণীর গুরু আছেন—এই পৃথিবীর খ্রীষ্টতুল্য ব্যক্তিগণ। তাঁহারা গুরুরও গুরু—স্বয়ং ঈশ্বর মানবরূপে অবতীর্ণ। তাঁহারা পূর্বোক্ত গুরুগণ অপেক্ষা অনেক উচ্চে। তাঁহারা স্পর্শ দ্বারা, এমন কি শুধু ইচ্ছামাত্র অপরের ভিতর ধর্মশক্তি সঞ্চারিত করিতে পারেন। তাঁহাদের শক্তিতে হীনতম অধম ব্যক্তিগণও মুহূর্তের মধ্যে সাধুতে পরিণত হয়। তাঁহারা কিরূপে ইহা করিতেন, তাহা কি তোমরা পড় নাই? আমি যে-সকল গুরুর কথা বলিতেছিলাম, এই গুরুগণ তাঁহাদের মতো নন, ইঁহারা ঐ-সকল গুরুরও গুরু—মানুষের নিকট ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। তাঁহাদের মধ্য দিয়া ব্যতীত অন্য কোনরূপে আমরা ঈশ্বরের দেখা পাইতে পারি না। তাঁহাদিগকে পূজা না করিয়া আমরা থাকিতে পারি না, একমাত্র তাঁহাদিগকেই আমরা পূজা করিতে বাধ্য।

অবতারের মধ্যে ঈশ্বর যেভাবে প্রকাশিত, সেভাবে ব্যতীত অন্যরূপে তাঁহাকে কেহ দেখে নাই। আমরা ঈশ্বরের দর্শন লাভ করিতে পারি না। যদি আমরা তাঁহাকে দেখিতে চেষ্টা করি, তবে তাঁহার এক ভয়ানক বিকৃত রূপই গড়িয়া থাকি। ভারতে চলিত কথায় বলে, এক মূর্খ শিব গড়িতে গিয়া অনেক চেষ্টায় একটি বানর গড়িয়াছিল। যখনই ঈশ্বরের মূর্তি গড়িবার চেষ্টা করি, তখনই আমরা তাঁহাকে বিকৃত করিয়া তুলি, কারণ যতক্ষণ আমরা মানব, ততক্ষণ আমরা তাঁহাকে মানব অপেক্ষা উচ্চতর আর কিছুই ভাবিতে পারি না। অবশ্য এমন সময় আসিবে, যখন আমরা মানবপ্রকৃতি অতিক্রম করিব এবং তাঁহার যথার্থ স্বরূপ অবগত হইব। কিন্তু যতদিন আমরা মানুষ, ততদিন তাঁহাকে মনুষ্যরূপেই উপাসনা করিতে হইবে। যাহাই বলো না কেন, যতই চেষ্টা কর না কেন, ঈশ্বরকে মানব ব্যতীত অন্যরূপে দেখিতে পাইবে না। আমরা খুব পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা দিতে পারি, খুব যুক্তিবাদী হইতে পারি, প্রমাণ করিতে পারি যে, ঈশ্বর-সম্বন্ধে এই-সকল পৌরাণিক গল্প একেবারে অর্থহীন, কিন্তু একবার সহজবুদ্ধি দিয়া বিচার করিয়া দেখা যাক—ঐ অসাধারণ

বুদ্ধির পশ্চাতে কি আছে? উহা শূন্য, খানিকটা বুদ্বুদ মাত্র। অতঃপর যখনই দেখিবে, কোন ব্যক্তি এইরূপে ঈশ্বর-পূজার বিরুদ্ধে খুব জোর পাণ্ডিত্য-পূর্ণ বক্তৃতা দিতেছে, তখন সেই বক্তাকে ধরিয়া জিজ্ঞাসা কর: ঈশ্বর-সম্বন্ধে আপনার কী অনুভূতি? 'সর্বশক্তিমত্তা', 'সর্বব্যাপিতা', 'সর্বব্যাপী প্রেম' ইত্যাদি শব্দদ্বারা ঐগুলির বানান ছাড়া আর বেশী কি বোঝেন? সে কিছুই বোঝে না, সে ঐ শব্দগুলির দ্বারা নির্দিষ্ট কোন ভাবই বোঝে না। রাস্তায় যে লোকটি একখানি বইও পড়ে নাই, তাহা অপেক্ষা সে কোন অংশে উন্নত নয়। তবে রাস্তার লোকটি নিরীহ ও শান্তপ্রকৃতি—সে সংসারের শান্তিভঙ্গ করে না, কিন্তু অপর ব্যক্তির তর্কের জ্বালায় সকলে ব্যতিব্যস্ত। তাহার কোনরূপ প্রত্যক্ষ ধর্মানুভূতি নাই, উভয়ে এক ভূমিতেই অবস্থিত।

প্রত্যক্ষানুভূতিই ধর্ম; শুধু কথা ও প্রত্যক্ষানুভূতির মধ্যে বিশেষ প্রভেদ করিতে হইবে। আত্মাতে যাহা অনুভূত হয়, তাহাই প্রত্যক্ষানুভূতি। সর্বব্যাপী পুরুষ বলিতে কি বোঝায়? মানুষের তো নিরাকার আত্মা সম্বন্ধে কোন ধারণা নাই—তাহার সম্মুখে যে-সব আকৃতিমান্ বস্তু সে দেখে, সেইগুলি দিয়াই তাহাকে আত্মা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হয়। তাহাকে নীল আকাশ বা বিস্তীর্ণ প্রান্তর, সমুদ্র বা একটা বিরাট কিছুর চিন্তা করিতে হয়। তা-ছাড়া সে আর কিরূপে ঈশ্বরচিন্তা করিবে? তুমিই বা কি করিতেছ? তুমি সর্বব্যাপিতার কথা বলিতেছ, অথচ সমুদ্রের বিষয় ভাবিতেছ। ঈশ্বর কি সমুদ্র? অতএব সংসারের এই-সব বৃথা তর্কযুক্তি কিছুক্ষণের জন্য শান্ত হউক—আমরা সহজ সাধারণ জ্ঞান চাই। আর এই সাধারণ জ্ঞানের মতো দুর্লভ বস্তু জগতে আর কিছুই নাই। এ পৃথিবীতে বড় বেশী কথা ও আলোচনা।

আমাদের বর্তমান গঠন ও প্রকৃতি অনুসারে আমরা সীমাবদ্ধ, আমরা ভগবানকে মানবভাবে দেখিতে বাধ্য। মহিষেরা যদি ঈশ্বরের উপাসনা করিতে ইচ্ছা করে, তবে তাহারা ঈশ্বরকে এক বৃহদাকার মহিষরূপে দেখিবে। মৎস্য যদি ভগবানের উপাসনা করিতে ইচ্ছা করে, তবে তাহাকে এক বৃহৎ মৎস্যরূপেই ভগবানের ধারণা করিতে হইবে, মানুষ যদি ভগবান্‌কে উপাসনা করিতে চায়, তবে তাহাকে মানুষরূপেই তাঁহার চিন্তা করিতে হইবে, আর এগুলি শূন্য কল্পনা নয়। তুমি, আমি, মহিষ, মৎস্য—ইহাদের প্রত্যেকে যেন

এক একটি ভিন্ন ভিন্ন পাত্র। এগুলি নিজ নিজ আকৃতির পরিমাণে জলে পূর্ণ হইবার জন্য সমুদ্রে গেল; মানবরূপ পাত্রে ঐ জল মানবাকার, মহিষপাত্রে মহিষাকার ও মৎস্যপাত্রে মৎস্যাকার ধারণ করিল। প্রত্যেকটি পাত্রে জল ছাড়া আর কিছুই নাই। যে ঈশ্বর সকলের মধ্যে আছেন, তাঁহার সম্বন্ধেও ঐ কথা। ঈশ্বরকে মানুষ মানুষরূপেই দর্শন করে, পশুগণ পশুরূপেই দেখে। যে যার নিজ আদর্শ অনুযায়ী তাঁহাকে দেখিয়া থাকে। কেবল এইভাবেই তাঁহাকে দর্শন করা যাইতে পারে। আপনাকে মানুষরূপী ঈশ্বরের উপাসনাই করিতে হইবে, কারণ ইহা ছাড়া আর পথ নাই।

দুই প্রকার ব্যক্তি ভগবান্‌কে মানুষভাবে উপাসনা করে না, পশুপ্রকৃতির মানব, যাহার কোন ধর্মই নাই, আর পরমহংস—সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী, যিনি মানবভাবের ঊর্ধ্বে উঠিয়া গিয়াছেন, দেহ-মনের বোধ দূরে ফেলিয়া দিয়াছেন, প্রকৃতির সীমার বাহিরে গিয়াছেন। সমগ্র প্রকৃতিই তাঁহার আত্মস্বরূপ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার মনও নাই, শরীরবোধও নাই—তিনিই যীশু ও বুদ্ধের মতো ঈশ্বরকে ঈশ্বররূপেই উপাসনা করিতে সমর্থ, তাঁহারা ঈশ্বরকে মানবভাবে উপাসনা করেন না। আর এক প্রান্তে পশুভাবাপন্ন মানব। আপনারা জানেন, দুই বিপরীত প্রান্ত চরমে কেমন একরূপ দেখায়। চূড়ান্ত অজ্ঞান ও চূড়ান্ত জ্ঞানের সম্বন্ধেও সেইরূপ। এই দুই অবস্থায় কেহ কাহারও উপাসনা করে না। চূড়ান্ত অজ্ঞানীরা ঈশ্বরের উপাসনা করে না, মন বুদ্ধি যতটা বিকশিত হইলে উপাসনা করিবার প্রয়োজন অনুভূত হয়, ততটা তাহাদের হয় নাই; জ্ঞানীরা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার করিয়া ঈশ্বরের সহিত এক হইয়া গিয়াছেন; তাঁহারাও উপাসনা করেন না। তাহারা আর কাহার উপাসনা করিবেন? ঈশ্বর কখনও ঈশ্বরের উপাসনা করেন না। এই দুই প্রান্তীয় অবস্থার মধ্যে থাকিয়া যদি কেহ বলে, সে মনুষ্যরূপে ভগবানের উপাসনা করিবে না, তাহা হইলে তাহার সম্বন্ধে সাবধান থাকিবেন। সে যে কি বলিতেছে, তাহার মর্ম সে নিজেই জানে না; সে ভ্রান্ত, তাহার ধর্ম অসার চিন্তা, শুধু বৃথা বুদ্ধির কারসাজি।

অতএব ঈশ্বরকে মানবরূপে উপাসনা করা একান্ত আবশ্যক। আর যে-সকল জাতির উপাস্য এইরূপ মানবরূপধারী ঈশ্বর, তাঁহারা ধন্য। খ্রীষ্টান-দের পক্ষে খ্রীষ্ট এইরূপ মানবদেহধারী ঈশ্বর। অতএব তাঁহারা খ্রীষ্টকে

দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকুন—তাঁহারা যেন কখনই খ্রীষ্টকে না ছাড়েন। ভগবদ্দর্শনের স্বাভাবিক উপায়—মানুষে ঈশ্বরদর্শন। আমাদের ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় সমুদয় ধারণাই এরূপ দেব-মানবে বর্তমান। খ্রীষ্টানদের এটি বিশেষ ত্রুটি যে, তাঁহারা খ্রীষ্ট ব্যতীত ভগবানের অন্যান্য অবতার মানেন না। খ্রীষ্ট ভগবানের বিকাশ ছিলেন, বুদ্ধও তাই ছিলেন, এরূপ আরও শত শত হইবেন। ঈশ্বরের কোথাও 'ইতি' করিবেন না, ঈশ্বরকে যে ভক্তি নিবেদন করা উচিত মনে করেন, খ্রীষ্টকেই তাহা নিবেদন করুন। তাঁহাদের পক্ষে এইরূপ উপাসনাই একমাত্র সম্ভব। ঈশ্বরকে সাক্ষাৎভাবে উপাসনা করা যাইতে পারে না, তিনি সর্বব্যাপী হইয়া সমগ্র জগতে বিরাজিত আছেন। মানবরূপে প্রকাশিত তাঁহার অবতারের নিকটই আমরা প্রার্থনা করিতে পারি। খ্রীষ্টানরা যে প্রার্থনা করিবার সময় 'খ্রীষ্টের নামে' বলিয়া প্রার্থনা আরম্ভ করেন, ইহা খুব ভাল; ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা না করিয়া কেবল খ্রীষ্টের নিকট প্রার্থনা করার প্রথা প্রচলিত হইলে আরও ভাল। ঈশ্বর মানবের দুর্বলতা বুঝেন এবং মানবের কল্যাণের জন্য মানবরূপ ধারণ করেন। 'যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি মানুষকে সাহায্য করিবার জন্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকি।'[১]

'জগতের সর্বশক্তিমান্ ও সর্বব্যাপী ঈশ্বর আমি যে মানবাকার ধারণ করিয়াছি, তাহা না জানিয়া মূঢ় ব্যক্তিগণ আমাকে অবজ্ঞা করে ও মনে করে, ভগবান্ আবার কিরূপে মানব-রূপ ধরিবেন।'[২] তাহাদের মন আসুরিক, অজ্ঞানমেঘে আবৃত বলিয়া তাহারা তাঁহাকে জগতের ঈশ্বর বলিয়া জানিতে পারে না। এই মহান্ ঈশ্বরাবতারগণকে উপাসনা করিতে হইবে। শুধু তাই নয়, তাঁহারাই একমাত্র উপাসনার যোগ্য এবং তাঁহাদের আবির্ভাব বা তিরোভাবের দিনে তাঁহাদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন করা উচিত। খ্রীষ্টের উপাসনা করিতে হইলে তিনি যেরূপে ঈশ্বরোপাসনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে সেইভাবে উপাসনা করিব। তাঁহার জন্মদিনে আমি ভোজের আনন্দ না করিয়া বরং উপবাস ও প্রার্থনা করিয়া কাটাইব। যখন আমরা এই মহাত্মাগণের চিন্তা করি, তখন তাঁহারা আমাদের আত্মার

১ গীতা, ৪।৭ ২ গীতা, ৯।১১

মধ্যে প্রকাশিত হন এবং আমাদিগকে তাঁহাদের সদৃশ করিয়া লন। আমাদের সমগ্র প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়, তাঁহাদের মতো হইয়া যায়।

কিন্তু আপনারা যেন খ্রীষ্ট বা বুদ্ধকে শূন্যে বিচরণকারী ভূত-প্রেতাদির সহিত এক করিয়া ফেলিবেন না। কি অন্যায়! খ্রীষ্ট ভূত-প্রেত-নামানোর দলে আসিয়া নাচিতেছেন! আমি এই দেশে (আমেরিকায়) এ-সব বুজরুকি দেখিয়াছি। ভগবানের অবতারগণ এইভাবে আসেন না, তাঁহাদের স্পর্শের ফল মানুষের মধ্যে অন্যভাবে প্রকটিত হইবে। খ্রীষ্টের স্পর্শে মানুষের সমগ্র আত্মাই পরিবর্তিত হইয়া যাইবে, সেই ব্যক্তি খ্রীষ্টভাবেই রূপান্তরিত হইয়া যাইবে। তাহার সমগ্র জীবন আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ হইয়া যাইবে—তাহার শরীরের প্রত্যেক লোমকূপ দিয়া আধ্যাত্মিক শক্তি বাহির হইবে। রোগ-আরোগ্যকরণে বা অন্যান্য অলৌকিক কার্যে খ্রীষ্টের কতটুকু শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে? তিনি নিম্নাধিকারী জনগণের মধ্যে ছিলেন বলিয়া ঐ ছোটখাট বিস্ময়ের কার্যগুলি না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। এ-সকল অদ্ভুত কার্য কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?—ইহুদীদের মধ্যে; আর তাহারা তাঁহাকে গ্রহণ করিল না। আর কোথায় ঐগুলি অনুষ্ঠিত হয় নাই?—ইওরোপে! ঐসব অদ্ভুত কার্য ইহুদীদের ভিতর অনুষ্ঠিত হইল—আর তাহারা খ্রীষ্টকে ত্যাগ করিল। এবং তাঁহার 'শৈলোপদেশ' (Sermon on the Mount) ইওরোপে প্রচারিত হইল, সেখানে উহা গৃহীত হইল। মানুষ চিন্তাশীল—যাহা সত্য তাহা গ্রহণ করিল এবং যাহা মিথ্যা তাহা ত্যাগ করিল। রোগ আরোগ্য বা অন্যান্য অদ্ভুত কার্যে খ্রীষ্টের মহত্ত্ব নয়—একটা মহা মূর্খও তাহা করিতে পারে। তাহারাও অপরকে আরোগ্য করিতে পারে, পিশাচপ্রকৃতি ব্যক্তিগণও অপরের রোগ সারাইতে পারে। আমি দেখিয়াছি—অতি ভয়ানক অসুরপ্রকৃতি ব্যক্তিগণও অদ্ভুত অদ্ভুত অলৌকিক কার্য করিয়াছে, তাহারা মাটি হইতে ফল করিয়া দিবে। আমি দেখিয়াছি, অনেক মূর্খ ও পিশাচপ্রকৃতি ব্যক্তি ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান ঠিক ঠিক বলিয়া দিতে পারে। আমি দেখিয়াছি, অনেক মূর্খ একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করিয়া অতি ভয়ানক রোগ সারাইয়া দিয়াছে। অবশ্য এগুলি শক্তি বটে, কিন্তু অনেক সময়েই এগুলি পৈশাচিক শক্তি। খ্রীষ্টের শক্তি কিন্তু আধ্যাত্মিক; তাঁহার সর্বশক্তিমান্ বিরাট প্রেম ও তৎপ্রচারিত সত্যসমূহ চিরকাল রহিয়াছে,

চিরকাল থাকিবে। লোকের দিকে চাহিয়াই তিনি তাহাদিগকে নীরোগ করিতেন—এ-কথা লোকে ভুলিয়া যাইতে পারে ; কিন্তু তিনি যে বলিয়াছিলেন, 'পবিত্রাত্মারা ধন্য—' এ-কথা মানুষ ভুলিতে পারে না, এ কথা আজও জীবন্ত রহিয়াছে। যতদিন মানুষের মন থাকিবে, ততদিন ঐ বাক্যগুলি অফুরন্ত মহাশক্তির ভাণ্ডার হইয়া থাকিবে। যতদিন মানুষ ঈশ্বরের নাম না ভুলিয়া যায়, ততদিন ঐ বাক্যগুলি থাকিবে—ঐগুলির শক্তিতরঙ্গ প্রবাহিত হইয়া চলিবে, কখনই থামিবে না। যীশু এই শক্তিলাভেরই উপদেশ দিয়াছিলেন, এই শক্তি তাঁহার ছিল—ইহা পবিত্রতার শক্তি—আর বাস্তবিকই ইহা যথার্থ শক্তি। অতএব খ্রীষ্টকে উপাসনা করিবার সময়, তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিবার সময় সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে, আমরা কি চাহিতেছি। অজ্ঞানজনোচিত অলৌকিক শক্তির বিকাশ নয়, আত্মার অদ্ভুত শক্তি আমাদের চাহিতে হইবে—যাহা মানুষকে মুক্ত করিয়া দেয়, সমগ্র প্রকৃতির উপর তাহার ক্ষমতা বিস্তার করে, তাহার দাসত্বতিলক দূর করে এবং তাহাকে ঈশ্বর দর্শন করায়।

প্রতীকের ও বৈধী ভক্তির প্রয়োজনীয়তা

ভক্তি দুই প্রকার—প্রথমটি বৈধী বা আনুষ্ঠানিক ভক্তি, অপরটি মুখ্যা বা পরা ভক্তি। 'ভক্তি' শব্দে অতি নিম্নতম হইতে উচ্চতম উপাসনা পর্যন্ত বুঝায়। পৃথিবীতে যে-কোন দেশে বা যে-কোন ধর্মে যত প্রকার উপাসনা দেখিতে পাওয়া যায়, সকলের মূলে ভালবাসা। অবশ্য ধর্মের ভিতর অনেকটাই কেবল অনুষ্ঠান; আবার অনেক কিছু আছে, সেগুলি অনুষ্ঠানও নয়, ভালবাসাও নয়—তদপেক্ষা নিম্নতর অবস্থা। যাহা হউক, ঐ অনুষ্ঠানগুলির আবশ্যকতা আছে। আত্মার উন্নতিপথে সাহায্য করিবার জন্য এই বৈধী বা বাহ্য ভক্তি একান্ত আবশ্যক। মানুষ এই একটা মস্ত ভুল করিয়া থাকে—মনে করে, একেবারে লাফাইয়া সে উচ্চতম অবস্থায় পৌঁছিতে পারে। শিশু যদি মনে করে, সে একদিনেই বড় হইয়া যাইবে, তবে সে ভ্রান্ত। আমি আশা করি, আপনারা সর্বদাই এইটি মনে রাখিবেন যে, বই পড়িলেই ধর্ম হয় না, তর্কবিচার করিতে পারিলেই ধর্ম হয় না, অথবা কতকগুলি মতবাদে সম্মতি প্রকাশ করিলেই ধর্ম হয় না। তর্কযুক্তি, মতামত, শাস্ত্রাদি বা অনুষ্ঠান—এগুলি সবই ধর্মলাভের সহায় মাত্র, ধর্ম কিন্তু অপরোক্ষানুভূতি। আমরা সকলেই বলি, একজন ঈশ্বর আছেন। জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন? কেহ বা বলিয়া থাকে, ঈশ্বর স্বর্গে আছেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন, সে ঈশ্বর দেখিয়াছে কি না? যদি সে বলে 'দেখিয়াছি'—আপনারা হাসিয়া উঠিবেন ও তাহাকে পাগল বলিবেন। অনেকের কাছেই ধর্ম একটা বুদ্ধিগত বিশ্বাস মাত্র—শুধু কতকগুলি মত মানিয়া লওয়া। ইহার বেশী আর তাহারা উঠিতে পারে না। আমি আমার জীবনে কখনও এরূপ ধর্ম প্রচার করি নাই, এবং উহাকে আমি ধর্ম নামই দিতে পারি না। ঐ প্রকার ধর্ম স্বীকার করা অপেক্ষা বরং নাস্তিক হওয়া ভাল। কোনরূপ মতামতে বিশ্বাস করা না করার উপর ধর্ম নির্ভর করে না। আপনারা বলিয়া থাকেন, আত্মা আছেন। আত্মাকে কখন দেখিয়াছেন কি? আমাদের সকলেরই আত্মা আছে, অথচ আমরা তাহাকে দেখিতে পাই না—ইহা কেমন কথা? আপনাদিগকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে এবং আত্মদর্শনের কোন উপায় বাহির করিতে হইবে। নতুবা ধর্ম-

সম্বন্ধে কথা বলা বৃথা। যদি কোন ধর্ম সত্য হয়, তবে উহা অবশ্যই আমাদিগকে নিজ নিজ হৃদয়ে আত্মা, ঈশ্বর ও সত্য দর্শন করাইতে সমর্থ করিবে। এই-সব মতামত বা বিশ্বাসের কোন একটি লইয়া যদি আপনি ও আমি অনন্তকাল তর্ক করি, তথাপি আমরা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিব না। মানুষ তো যুগযুগান্ত ধরিয়া এরূপ তর্ক-যুদ্ধ করিতেছে, কিন্তু তাহার ফল কি হইয়াছে? বুদ্ধি তো সেখানে মোটেই পৌছিতে পারে না। আমাদিগকে বুদ্ধির পারে যাইতে হইবে। অপরোক্ষানুভূতিই ধর্মের প্রমাণ। এই দেয়ালটা যে আছে, তাহার প্রমাণ এই যে, আমরা উহা দেখিতেছি। যদি এক জায়গায় বসিয়া শত শত যুগ ধরিয়া ঐ দেয়ালের অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব সম্বন্ধে বিচার করিতে থাকেন, তথাপি কোন কালে উহার মীমাংসা করিতে পারিবেন না। কিন্তু যখনই দেয়ালটি দেখিবেন, অমনি সব বিবাদ মিটিয়া যাইবে। তখন যদি পৃথিবীর সব লোক আপনাকে বলে, ঐ দেয়াল নাই, আপনি তাহাদিগের কথা কখনই বিশ্বাস করিবেন না; কারণ আপনি জানেন যে, আপনার নিজের চক্ষুর সাক্ষ্য জগতের সমুদয় মতামত ও গ্রন্থরাশি অপেক্ষা বেশী।

আপনারা সকলেই সম্ভবতঃ বিজ্ঞানবাদ (Idealism) সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ পড়িয়াছেন। এই মতবাদ অনুসারে এই জগতের অস্তিত্ব নাই, আপনাদেরও অস্তিত্ব নাই। এরূপ কথা যাহারা বলে, আপনারা তাহাদের কথা বিশ্বাস করেন না, কারণ তাহারা নিজেরাই নিজেদের কথা বিশ্বাস করে না। তাহারা জানে যে, ইন্দ্রিয়গণের সাক্ষ্য এইরূপ সহস্র সহস্র বৃথা বাগাড়ম্বর হইতে বলবান্। ধার্মিক হইতে গেলে আপনাদিগকে প্রথমেই গ্রন্থাদি ফেলিয়া দিতে হইবে। বই যত কম পড়েন, ততই ভাল।

এক একবারে একটা করিয়া কাজ করুন। বর্তমান কালে পাশ্চাত্যে অনেকের একটা ঝোঁক দেখা যায়—তাহারা মাথার ভিতর নানাপ্রকার ভাব লইয়া খিচুড়ি পাকাইতেছে, সর্বপ্রকার ভাবের বদ্‌হজম মাথার ভিতর তাল পাকাইয়া একটা এলোমেলো অসম্বদ্ধ গোলমাল সৃষ্টি করে; সেগুলি যে স্থির হইয়া একটা সুনির্দিষ্ট আকার ধারণ করিবে, তাহারও সুযোগ পায় না। অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ নানাবিধ ভাবগ্রহণ একপ্রকার রোগ হইয়া দাঁড়ায়—কিন্তু ইহাকে আদৌ ধর্ম বলিতে পারা যায় না।

(কেহ কেহ চায় খানিকটা স্নায়বীয় উত্তেজনা। তাহাদিগকে ভূতের কথা বলুন, কিম্বা উত্তরমেরু বা অন্য কোন দূরদেশনিবাসী পক্ষদ্বয়যুক্ত বা অন্য কোন অদ্ভুত আকারধারী মানুষের কথা বলুন, যাহারা অদৃশ্যভাবে বর্তমান থাকিয়া তাহাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিতেছে, আর যাহাদের কথা মনে হইলেই তাহাদের গা ছমছম করিয়া উঠে। এই-সব বলিলেই তাহারা খুশী হইয়া বাড়ি যাইবে, কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা পার হইতে না হইতেই তাহারা আবার নূতন উত্তেজনা খুঁজিবে। কেহ কেহ ইহাকেই ধর্ম বলিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা বাতুলালয় গমনের পথ—ধর্মলাভের নয়। এক শতাব্দী ধরিয়া এইরূপ ভাবের স্রোত চলিতে থাকিলে এই দেশ একটা বিরাট বাতুলালয়ে পরিণত হইবে। দুর্বল ব্যক্তি কখন ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারে না, আর এইসব রোমাঞ্চকর ব্যাপার মানুষকে দুর্বল করিয়া দেয়। অতএব ও-সব দিকেই যাইবেন না। ওগুলি কেবল মানুষকে দুর্বল করিয়া দেয়, মস্তিষ্কে তালগোল পাকাইয়া দেয়, মনকে দুর্বল করিয়া অন্তরাত্মাকে নীতিভ্রষ্ট করে; ফলে মানুষ একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া যায়।)

আপনারা মনে রাখিবেন, শুধু কথা বলায় ধর্ম নাই, ধর্ম মতামতে নাই বা গ্রন্থের মধ্যেও নাই—ধর্ম অপরোক্ষানুভূতি। ধর্ম কোনরূপ বিদ্যা অর্জন নয়, ধর্ম আদর্শস্বরূপ হইয়া যাওয়া। 'চুরি করিও না'—এই উপদেশ সকলেই জানে। কিন্তু তাহাতে কি হইল? যে ব্যক্তি চুরি করে না, সেই ইহার তত্ত্ব জানিয়াছে। 'অপরকে হিংসা করিও না'—এই উপদেশ সকলেই জানে। কিন্তু তাহার মূল্য কি? যাহারা হিংসা করে না, তাহারাই অহিংসাতত্ত্ব জানিয়াছে, এবং ঐ আদর্শের উপর নিজেদের চরিত্র গঠিত করিয়াছে।

(অতএব আমাদিগকে ধর্ম উপলব্ধি করিতে হইবে, আর এই ধর্ম উপলব্ধি করা একটি সুদীর্ঘ সাধনার ব্যাপার। জগতের প্রত্যেক পুরুষই মনে করে—তাহার মতো সুন্দর, তাহার মতো বিদ্বান্, তাহার মতো শক্তিমান্, তাহার মতো অদ্ভুত আর কেহ নাই। প্রত্যেক নারীও তেমনি নিজেকে জগতের মধ্যে পরমা সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী জ্ঞান করে। আমি তো এমন একটি শিশুও দেখি নাই যে অসাধারণ নয়। সকল জননীই আমাকে বলিয়া থাকেন, 'আমার ছেলেটি কি অসাধারণ!' মানুষের প্রকৃতিই এইরূপ। মানুষ যখন কোন অতি উচ্চ অনুভূতি বা অদ্ভুত বিষয়ের কথা শোনে, তখন মনে

করে, অনায়াসেই উহা লাভ করিবে, কিন্তু মুহূর্তের জন্যও স্থির হইয়া ভাবে না যে, অনেক কঠোর চেষ্টা করিয়া উহা লাভ করিতে হইবে। সকলে এক লাফে সেখানে উঠিতে চায়। উহা সর্বাপেক্ষা ভাল, অতএব উহা আমাদের চাই-ই। আমরা কখন স্থির হইয়া চিন্তা করি না যে, উহা লাভ করিবার শক্তি আমাদের আছে কি না, ফলে আমরা কিছুই করিয়া উঠিতে পারি না। আপনারা কোন ব্যক্তিকে বাঁশ দিয়া ঠেলিয়া উপরে উঠাইতে পারেন না—আমাদের সকলকেই ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে হয়। অতএব ধর্মের প্রথম সোপান এই বৈধী ভক্তি বা নিম্নস্তরের উপাসনা।

নিম্নস্তরের উপাসনা কি কি? এই উপাসনা কি ও কতপ্রকার তাহা বুঝাইবার পূর্বে আমি আপনাদিগকে একটি প্রশ্ন করিতে চাই। আপনারা সকলেই বলিয়া থাকেন, একজন ঈশ্বর আছেন, আর তিনি সর্বব্যাপী। কিন্তু 'সর্বব্যাপী' বলিতে কি বোঝেন? একবার চোখ বুজিয়া ভাবুন—সর্বব্যাপিতা কি প্রকার! চোখ বুজিয়া আপনি কি দেখেন? হয় সমুদ্রের কথা, না হয় আকাশের কথা, অথবা একটি বিস্তৃত প্রান্তরের কথা বা নিজেদের জীবনে অন্য যে-সব জিনিস দেখিয়াছেন, সেগুলির কথাই আপনি চিন্তা করেন। যদি তাই হয়, তবে 'সর্বব্যাপী ভগবান্' এই কথা বলিয়া আপনি কোন ভাবই ব্যক্ত করেন না। আপনার নিকট ঐ বাক্যের কোন অর্থই নাই। ভগবানের অন্যান্য গুণাবলী সম্বন্ধেও এইরূপ। সর্বশক্তিমত্তা, সর্বজ্ঞতা প্রভৃতি সম্বন্ধেই বা আমাদের কি ধারণা?—কিছুই নয়। ধর্ম অর্থে উপলব্ধি বা অপরোক্ষানুভূতি; আর যখন আপনি ভগবদ্ভাব উপলব্ধি করিতে পারিবেন, তখনই আপনাকে ঈশ্বরের উপাসক বলিয়া স্বীকার করিব। তার পূর্বে ঐ শব্দের বানানটুকুই আপনি জানেন, আর কিছুই জানেন না। অতএব শিশুরা যেমন প্রথমে স্থূল কিছু অবলম্বন করিয়া শেখে, পরে ধীরে ধীরে তাহাদের সূক্ষ্মের ধারণা হয়, সেইরূপ উচ্চতম অনুভূতির অবস্থা লাভ করিতে হইলেও আমাদিগকে প্রথমে স্থূল অবলম্বনে অগ্রসর হইতে হইবে। 'পাঁচ দুগুণে দশ' বলিলে একটি ছোট ছেলে কিছু বুঝিবে না, কিন্তু যদি পাঁচটি করিয়া জিনিস দুইবার লইয়া দেখানো যায়—মোট দশটি জিনিস হইয়াছে, তাহা হইলে সে বুঝিবে। এই সূক্ষ্মের ধারণা অতি ধীরে ধীরে দীর্ঘকালে লাভ হইয়া থাকে। এখানে 'আমরা সকলেই শিশুতুল্য;

বয়সে বড় হইতে পারি এবং জগতের সব বই পড়িয়া ফেলিতে পারি, কিন্তু ধর্মরাজ্যে আমরা শিশুমাত্র। এই প্রত্যক্ষানুভূতির শক্তিই ধর্ম। বিভিন্ন মতামত, দর্শন বা নৈতিক মতবাদ লইয়া মস্তিষ্ক যতই পূর্ণ কর না কেন, তাহাতে ধর্মজীবনে বড় কিছু আসে যায় না ; নিজে কি হইলে, প্রত্যক্ষ উপলব্ধি কতটা হইল, এইটির উপরেই ধর্মজীবন নির্ভর করে। আমরা মতামত ও শাস্ত্রাদি শিখিয়াছি বটে, কিন্তু জীবনে কিছুই উপলব্ধি করি নাই। আমাদিগকে এখন নূতন করিয়া আবার স্থূল বস্তুর মাধ্যমে সাধন আরম্ভ করিতে হইবে—আমাদিগকে মন্ত্র, স্তবস্তুতি, অনুষ্ঠানাদির সহায়তা লইতে হইবে ; এবং এইরূপ বাহ্য ক্রিয়াকলাপ সহস্র প্রকারের হইতে পারে।

সকলের পক্ষে এক প্রকার উপাসনা-প্রণালীর কোন প্রয়োজন নাই। কতক লোক মূর্তিপূজায় উপকৃত হইতে পারে, কতক লোক না-ও হইতে পারে। কতক লোকের পক্ষে মূর্তির বাহ্যপূজার প্রয়োজন হইতে পারে, কাহারও বা শুধু মনের মধ্যেই ঐরূপ মূর্তির চিন্তার প্রয়োজন। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজ মনের ভিতর মূর্তির উপাসনা করে, সে বলে : 'আমি মূর্তিপূজক অপেক্ষা উন্নত ; মূর্তিচিন্তা যখন অন্তরে করা হয়, তখনই ঠিক ঠিক উপাসনা হয়। বাহিরে মূর্তিপূজা করাই পৌত্তলিকতা, এরূপ ধর্মের বিরোধিতা করিব।' যখন কেহ মন্দির বা গির্জারূপ একটা সাকার বস্তু খাড়া করে, সে উহাকে পবিত্র মনে করে, কিন্তু মূর্তিটি মনুষ্যাকৃতি হইলেই সে উহা অতি ভয়াবহ মনে করে। অতএব স্থূলের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইবার নানাবিধ সাধনপ্রণালী আছে, এইগুলির মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আমরা শেষে সূক্ষ্মানুভূতি লাভ করিব। আবার একইপ্রকার সাধনপ্রণালী সকলের জন্য নয়। একপ্রকার সাধনপ্রণালী হয়তো আপনার পক্ষে উপযোগী, অন্য আর একজনের পক্ষে হয়তো অন্যপ্রকার সাধনপ্রণালী প্রয়োজন। প্রত্যেকটি সাধনপ্রণালী যদিও চরমে একই লক্ষ্যে লইয়া যায়, তথাপি সবগুলি সকলের উপযোগী নয়। আমরা সাধারণতঃ এই আর একটি ভুল করিয়া থাকি। আমার আদর্শ আপনার উপযোগী নয়, তবে আমি কেন জোর করিয়া উহা আপনার উপর চাপাইয়া দিবার চেষ্টা করিব? আমার মন্দির-নির্মাণ-প্রণালী বা স্তব পাঠ করার রীতি আপনার ঠিক ভাল লাগে না, তবে আমি কেন জোর করিয়া উহা আপনার উপর চাপাইতে যাইব? পৃথিবী

ঘুরিয়া আসুন, দেখিবেন—বহু নির্বোধ ব্যক্তিই আপনাকে বলিবে, তাহার সাধনপ্রণালীই একমাত্র সত্য আর অন্যান্য প্রণালীগুলি শয়তানি, এবং জগতের মধ্যে ভগবানের মনোনীত পুরুষ একমাত্র তিনিই জন্মিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে এই-সকল সাধনপ্রণালীর সবগুলিই ভাল এবং ধর্মলাভে আমাদিগকে সাহায্য করে; আর মনুষ্যপ্রকৃতি যখন নানাবিধ, তখন ধর্মসাধনের বিভিন্নপ্রকার প্রণালীও প্রয়োজন। এইরূপ বিভিন্ন সাধনপ্রণালী যত প্রচলিত হয়, ততই জগতের পক্ষে মঙ্গল। পৃথিবীতে যদি কুড়িটি ধর্মপ্রণালী থাকে, তবে খুব ভাল; যদি চার শত ধর্মপ্রণালী থাকে, তবে আরও ভাল; কারণ তাহা হইলে অনেকগুলির ভিতর যেটি ইচ্ছা বাছিয়া লইতে পারা যাইবে। অতএব যখন ধর্ম ও ধর্মভাবসমূহের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তখন আমাদের বরং আনন্দ প্রকাশ করা উচিত, কারণ তাহা হইলে প্রত্যেকটি মানুষ ধর্মজীবনের অন্তর্ভুক্ত হইবে, ক্রমশঃ অধিকসংখ্যক মানুষ ধর্মপথে সাহায্য লাভ করিবে। আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, ধর্মের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাক—যতদিন না প্রত্যেকটি মানুষ অপর সকল ব্যক্তি হইতে পৃথক্ নিজস্ব একটি ধর্ম লাভ করে। ভক্তিযোগের ইহাই ভাব।

এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত এই যে, আমার ধর্ম আপনার বা আপনার ধর্ম আমার হইতে পারে না। যদিও সকলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক, তথাপি মনের রুচি অনুসারে প্রত্যেককেই ভিন্ন পথ দিয়া যাইতে হয়, আর যদিও পথ অনেক, তথাপি সব পথই সত্য; কারণ পথগুলি একই চরম লক্ষ্যে লইয়া যায়। একটি সত্য, অন্যগুলি মিথ্যা—তাহা হইতে পারে না। এই নিজ নিজ নির্বাচিত পথকে ভক্তিযোগীর ভাষায় 'ইষ্ট' বলে।

অতঃপর শব্দ- বা মন্ত্র-শক্তির কথা উল্লেখ করা উচিত। আপনারা সকলেই শব্দশক্তির কথা শুনিয়াছেন। এই শব্দগুলি কি অদ্ভুত! প্রত্যেক ধর্মগ্রন্থে—বেদ, বাইবেল, কোরানে—শব্দশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কতকগুলি শব্দ আছে—মানবজাতির উপর ঐগুলির আশ্চর্য প্রভাব!

তারপর আবার ভক্তিলাভের বাহ্যসহায়রূপ প্রতীক বস্তু আছে। এইগুলিরও মানবমনের উপর প্রবল প্রভাব। ধর্মের প্রধান প্রতীক বস্তুগুলি কিন্তু ইচ্ছামত বা খেয়ালমত রচিত হয় নাই। সেগুলি ভাবের স্বাভাবিক প্রকাশ মাত্র। আমরা সর্বদাই রূপক-সহায়ে চিন্তা করিয়া থাকি; আমাদের

সকল শব্দই বস্তুতঃ চিন্তার রূপক মাত্র, বিভিন্ন জাতি প্রকৃত কারণ না জানিয়াও বিভিন্ন প্রতীক ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ঐ কারণ মনের অন্তরালে, ঐ প্রতীকগুলি চিন্তার সহিত জড়িত; যেমন চিন্তা বা ভাব হইতে প্রতীক বস্তু বাহিরে রূপগ্রহণ করে, তেমনি ঐ প্রতীক আবার ভিতরে ভাবের উদ্রেক করিতে পারে। এইজন্য ভক্তিযোগের এই অংশে এই-সব ভাবোদ্দীপক প্রতীক বস্তু, শব্দ বা মন্ত্রশক্তি, প্রার্থনা বা স্তবস্তুতির কথা আছে।

সকল ধর্মেই প্রার্থনা আছে, তবে এইটুকু আপনাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ধনসম্পদ বা স্বাস্থ্যলাভের জন্য প্রার্থনাকে ভক্তি বলা যায় না, এগুলি পুণ্যকর্ম। স্বর্গাদি গমনের বা কোন প্রকার বাহ্য বস্তু লাভের জন্য প্রার্থনা কর্মমাত্র। যিনি ভগবান্‌কে ভালবাসিতে চান, যিনি ভক্ত হইতে চান, তাঁহাকে ঐ-সকল প্রার্থনা ত্যাগ করিতে হইবে। যিনি আলোর রাজ্যে প্রবেশ করিতে চান, তাঁহাকে কেনা-বেচার দোকানদারী ধর্মভাব পুঁটুলি বাঁধিয়া বাহিরে ফেলিয়া আসিতে হইবে, তবেই তিনি ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের অধিকার পাইবেন। আমি এ-কথা বলিতেছি না যে, যাহা প্রার্থনা করা যায়, তাহা পাওয়া যায় না; যাহা চাওয়া যায়, সবই পাওয়া যায়। তবে উহা অতি হীনবুদ্ধির, নিম্নাধিকারীর—ভিখারীর ধর্ম। —মূর্খ সে, যে গঙ্গাতীরে বাস করিয়া জলের জন্য কূপ খনন করে![1] সেই মূর্খ—যে হীরকখনিতে আসিয়া কাচখণ্ড অন্বেষণ করে! ভগবান্ হীরকখনি-স্বরূপ, তাঁহার কাছে কাচখণ্ডবৎ স্বাস্থ্য খাদ্য বস্ত্র ভিক্ষা করিতে হইবে!—কি দুর্ভাগ্য! এই দেহ এক দিন মরিবেই; তবে আর বার বার দেহের স্বাস্থ্যের জন্য প্রার্থনা করা কেন? স্বাস্থ্য ও ঐশ্বর্যে কি আছে? শ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তিও নিজ ধনের অতি অল্প অংশই নিজে ব্যবহার করিতে পারেন। তিনি তো দিনে চার-পাঁচ বার ভোজ খাইতে পারেন না, অধিক বস্ত্রও ব্যবহার করিতে পারেন না, একজন লোক যতটা বায়ু শ্বাসযোগে গ্রহণ করিতে পারে, তাহার অধিক লইতে পারেন না, তাঁহার নিজের দেহের জন্য যতটা জায়গা প্রয়োজন, তাহা অপেক্ষা অধিক স্থানে তিনি শুইতে পারেন না। আমরা

১ উষিত্বা জাহ্নবীতীরে কূপং খনতি দুর্মতিঃ।

এই জগতের সকল বস্তু কখনই একা পাইতে পারি না। যদি না পাই, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? এই দেহ একদিন যাইবে—এ-সব কে গ্রাহ্য করে? যদি ভাল ভাল জিনিস আসে, আসুক; যদি সেগুলি চলিয়া যায়—যাক্, তাহাও ভাল। আসিলেও ভাল, না আসিলেও ভাল। আমরা ভগবান্‌কে লাভ করিতে চলিয়াছি। ভগবানের নিকট গিয়া এ-জিনিস ও-জিনিস চাওয়া ভক্তি নয়। এগুলি ধর্মের নিম্নতম সোপান, অতি নিম্নাঙ্গের কর্মমাত্র। আমরা সেই রাজরাজেশ্বরের সামীপ্যলাভের চেষ্টা করিতেছি। আমরা সেখানে ভিক্ষুকের বেশে যাইতে পারি না। যদি ঐ বেশে আমরা কোন সম্রাটের সমীপে উপস্থিত হইতে চাই, আমাদিগকে কি সেখানে যাইতে দেওয়া হইবে? কখনই নয়। আমাদিগকে তাড়াইয়া দিবে। ভগবান্ রাজার রাজা, সম্রাটের সম্রাট্; তাঁহার নিকট আমরা জীর্ণবস্ত্র পরিধান করিয়া যাইতে পারি না; দোকানদারের সেখানে প্রবেশাধিকার নাই। কেনাবেচা সেখানে একেবারেই চলিবে না। আপনারা বাইবেলে যেমন পড়িয়াছেন যে, যীশু যিহোবার মন্দির-প্রাঙ্গণ হইতে ক্রেতা-বিক্রেতাগণকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন।

তথাপি কেহ কেহ প্রার্থনা করে, 'হে প্রভু, আমি তোমাকে আমার এই ক্ষুদ্র প্রার্থনা উপহার দিতেছি, তুমি আমাকে একটি নূতন পোশাক দাও। হে ভগবান্, আজ আমার মাথাধরা সারাইয়া দাও, আমি কাল আরও দু-ঘণ্টা বেশী প্রার্থনা করিব।' এইরূপ প্রার্থনাকারী অপেক্ষা আপনারা নিজেদের একটু উচ্চতর মনোভাবাপন্ন মনে করিবেন। মনে করিবেন, আপনি এইরূপ ছোটখাট জিনিসের জন্য প্রার্থনা করার ঊর্ধ্বে। মানুষ যদি নিজের সমুদয় মনঃশক্তি শরীর-সুখের জন্য ঐভাবে প্রার্থনা করিয়া ব্যয় করে, তবে মানুষ ও পশুর মধ্যে প্রভেদ কি?

অতএব ইহা বলা বাহুল্য যে, ভক্ত হইতে গেলে প্রথমেই এই প্রকার সব বাসনা—এমন কি স্বর্গ-গমনের বাসনাও পরিত্যাগ করিতে হইবে। স্বর্গও এই-সব স্থানেরই মতো, তবে এখানকার অপেক্ষা কিছু ভাল হইতে পারে। এখানে আমাদের কিছু দুঃখ, কিছু সুখ ভোগ করিতে হয়। স্বর্গে না হয় দুঃখ কিছু কম হইবে, সুখ কিছু বেশী হইবে। জ্ঞানের আলো সেখানে এতটুকু বাড়িবে না, স্বর্গে শুধু আমাদের পুণ্যকর্মের ফলভোগ হইবে। খ্রীষ্টানদের স্বর্গের

ধারণা এই যে, উহা এমন এক স্থান, যেখানে ভোগসুখ তীব্রভাবে বর্ধিত হইবে। এইরূপ স্বর্গ কিরূপে আমাদের চরম লক্ষ্য হইতে পারে? সম্ভবতঃ আপনারা এরূপ স্থানে শত শত বার গিয়াছেন, আবার সেখান হইতে শত শত বার ফিরিয়া আসিয়াছেন।

এখন প্রশ্ন এই—কিরূপে এই-সকল বাসনা অতিক্রম করা যায়? কিসে মানুষকে দুঃখী ও দুর্দশাগ্রস্ত করিয়া থাকে? মানুষ প্রাকৃতিক নিয়মে বদ্ধ ক্রীতদাসের মতো, প্রকৃতির হাতে পুতুলের মতো; প্রকৃতি খেলনার মতো তাহাদিগকে কখন এদিকে, কখন ওদিকে নাড়িতেছে। অতি সামান্য আঘাতে যে দেহ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়, আমরা সর্বদা সেই দেহের যত্ন করিতেছি, এবং সেই জন্যই সর্বদা ভয়ব্যাকুলচিত্তে জীবন যাপন করিতেছি। সেদিন পড়িতেছিলাম—হরিণকে নাকি প্রাণের ভয়ে প্রত্যহ প্রায় ৬০।৭০ মাইল ছুটিতে হয়। হরিণ অনেক মাইল দৌড়াইয়া গেল, তারপর কিছু খাইল। আমাদের জানা উচিত—আমরা হরিণ অপেক্ষা অধিকতর দুর্দশাগ্রস্ত। হরিণ তবু খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিতে পায়, আমরা তাহাও পাই না। হরিণ যথেষ্ট পরিমাণে ঘাস পাইলেই তৃপ্ত হয়, আমরা কিন্তু ক্রমাগত আমাদের অভাব বাড়াইতেছি। ক্রমাগত আমাদের অভাব বাড়ানো আমাদের রোগবিশেষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা এমন বিপর্যস্ত ও অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়িয়াছি যে, কোন স্বাভাবিক বস্তুই আর আমাদের তৃপ্ত করিতে পারে না। সেইজন্য আমরা সর্বদাই বিকৃত বস্তু খুঁজিতেছি—অস্বাভাবিক উত্তেজনা, অস্বাভাবিক খাদ্যপানীয়, অস্বাভাবিক সঙ্গ ও তদনুরূপ জীবন খুঁজিতেছি। বায়ুকে বিষাক্ত করিয়া তবে আমরা শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করিতে পারি! ভয় সম্বন্ধে বক্তব্য এই—আমাদের সমগ্র জীবনটাই কতকগুলি ভয়ের সমষ্টি ছাড়া আর কি? হরিণের ভয় করিবার এক প্রকার জিনিসই আছে, অর্থাৎ ব্যাঘ্রাদি; আর মানুষের ভয় সমগ্র জগৎ হইতে।

এখন প্রশ্ন এই—আমরা কিরূপে এই ভয় হইতে মুক্ত হইব? হিতবাদিগণ (Utilitarians) বলেন, 'ঈশ্বর ও পরলোক সম্বন্ধে কোন কথা বলিও না। আমরা ও-সবের কিছু জানি না। এই জগতেই সুখে বাস করা যাক।' যদি সম্ভব হইত, তবে আমিই প্রথমে ঐরূপ করিতাম, কিন্তু জগৎ আমাদিগকে তো তাহা করিতে দিবে না। আপনারা যতদিন প্রকৃতির

দাস হইয়া রহিয়াছেন, ততদিন সুখভোগ করিবেন কিরূপে? যতই দুঃখ এড়াইবার চেষ্টা করিবেন, ততই আরও দুঃখ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইবেন। জানি না, কত বর্ষ ধরিয়া সুখী হইবার জন্য কত পরিকল্পনা করিতেছেন, কিন্তু প্রতিটি পরিকল্পনার শেষে অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইতে মন্দতর হইয়া থাকে। দুই শত বর্ষ পূর্বে 'পুরাতন' পৃথিবীতে (Old World) লোকের অভাব অতি অল্পই ছিল, কিন্তু যেমন তাহাদের জ্ঞান বাড়িতে লাগিল, অভাবও শতগুণ বাড়িয়া চলিল। আমরা ভাবি, অন্ততঃ যখন আমরা স্বর্গে গিয়া পরিত্রাণ পাইব, তখন আমাদের সব বাসনা পূর্ণ হইবে—তাই তো আমরা স্বর্গে যাইতে চাই। সেই অনন্ত অদম্য পিপাসা! সর্বদাই একটা কিছু চাওয়া! ভিক্ষুক অবস্থায় মানুষ চায় টাকা। টাকা হইলে আবার অন্যান্য জিনিস চায়, সমাজের সঙ্গে মিশিতে চায়, তারপর আবার অন্য কিছু চায়। এতটুকু বিশ্রাম নাই। কিভাবে আমাদের এই তৃষ্ণা মিটিবে? যদি আমরা স্বর্গে যাই, তাহাতে বাসনা আরও বাড়িয়া যাইবে। যদি দরিদ্র ব্যক্তি ধনী হয়, তাহাতে তাহার বাসনার নিবৃত্তি হয় না, বরং অগ্নিতে ঘৃত নিক্ষেপ করিলে অগ্নির তেজ যেমন আরও বাড়িতে থাকে, তেমনি তাহার বাসনাও বাড়িয়া যায়। স্বর্গে যাওয়ার অর্থ খুব ধনী হওয়া, এবং তাহা হইলে বাসনাও আরও বাড়িতে থাকিবে। পৃথিবীর বিভিন্ন পুরাণশাস্ত্রে পড়া যায়, স্বর্গেও দেবতারা মানুষের মতো অনেক আমোদপ্রমোদ ও ছলনা করিয়া থাকে, তাহারা সবাই যে খুব ভাল, তাহা নয়; তারপর এই স্বর্গে যাইবার ইচ্ছা কেবল একটা ভোগবাসনা মাত্র। এটি ত্যাগ করিতে হইবে। স্বর্গে যাওয়া তো অতি ছোট কথা, এরূপ চিন্তা করা অতি অমার্জিত মনোভাবের লক্ষণ। আমি লক্ষপতি হইব এবং লোকের উপর প্রভুত্ব করিব—এ ভাব যেমন, স্বর্গে যাইবার ইচ্ছাও তেমনি। এইরূপ স্বর্গ অনেক আছে, কিন্তু এগুলির মধ্য দিয়া গেলে ধর্ম ও ভক্তির দ্বারদেশে প্রবেশেরও অধিকার পাইবেন না।

প্রতীকের কয়েকটি দৃষ্টান্ত

‘প্রতীক’ ও ‘প্রতিমা’—দুইটি সংস্কৃত শব্দ। আমরা এখনে এই ‘প্রতীক’ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। ‘প্রতীক’ শব্দের অর্থ—অভিমুখী হওয়া, সমীপবর্তী হওয়া। সকল দেশে সকল ধর্মেই দেখিতে পাইবেন, উপাসনার নানাবিধ স্তর রহিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন, এই দেশে অনেক লোক আছেন, যাঁহারা সাধুগণের প্রতিমূর্তি পূজা করেন; এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা কতকগুলি রূপ ও প্রতীকের উপাসনা করেন। আবার কেহ কেহ আছেন, যাঁহারা মানুষ অপেক্ষা উচ্চতর কোন সত্তার উপাসনা করেন, এবং তাঁহাদের সংখ্যা দিন দিন দ্রুতবেগে বাড়িয়া যাইতেছে। আমি প্রেত-উপাসকদের কথা বলিতেছি। পুস্তকাদিতে পড়িয়াছি, এখানে প্রায় আশী লক্ষ প্রেতোপাসক আছেন। তারপর আবার কতক ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা আরও উচ্চতর সত্তা অর্থাৎ দেবাদির উপাসনা করেন। ভক্তিযোগ এই-সকল বিভিন্ন সোপানের কোনটিকেই নিন্দা করে না, কিন্তু এই-সকল উপাসনাকেই এক প্রতীকোপাসনার অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এই উপাসকগণ প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছেন না, কিন্তু প্রতীক অর্থাৎ ঈশ্বরের সন্নিহিত কোন বস্তুর উপাসনা করিতেছেন, এই-সকল বিভিন্ন বস্তুর সহায়ে তাঁহারা ঈশ্বরের নিকট পৌঁছিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই প্রতীকোপাসনায় আমাদের মুক্তিলাভ হয় না; আমরা যে যে বিশেষ বস্তুর কামনায় উহাদের উপাসনা করি, উহাদ্বারা সেই সেই বিশেষ বস্তুই লাভ হইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন, যদি কোন ব্যক্তি তাঁহার পরলোকগত পূর্বপুরুষ বা বন্ধুবান্ধবের উপাসনা করেন, সম্ভবতঃ তিনি তাঁহাদের নিকট হইতে কতকগুলি শক্তি বা বিশেষ বিশেষ সংবাদ লাভ করিতে পারেন। এই-সকল উপাস্য হইতে যে বিশেষ বস্তু লাভ হয়, তাহাকে ‘বিদ্যা’ অর্থাৎ ‘বিশেষ জ্ঞান’ বলে, কিন্তু আমাদের চরম লক্ষ্য মুক্তি সাক্ষাৎ ঈশ্বরের উপাসনা দ্বারাই লব্ধ হইয়া থাকে। বেদ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কোন কোন প্রাচ্যতত্ত্ববিৎ পাশ্চাত্য পণ্ডিত এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, স্বয়ং সগুণ ঈশ্বরও প্রতীক। সগুণ ঈশ্বরকে প্রতীকরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে, কিন্তু প্রতীক সগুণ বা নির্গুণ কোন প্রকার ঈশ্বর নয়।

ঐগুলিকে ঈশ্বররূপে উপাসনা করা যায় না। অতএব কেহ কেহ যদি মনে করে—দেবতা, পূর্বপুরুষ, মহাত্মা, সাধু বা প্রেতরূপ বিভিন্ন প্রতীকের উপাসনা দ্বারা তাহারা কখনও মুক্তিলাভ করিবে, তবে তাহাদের মহাভুল। বড়জোর উহা দ্বারা তাহারা কতকগুলি শক্তিলাভ করিতে পারে, কিন্তু কেবল ঈশ্বরই আমাদিগকে মুক্ত করিতে পারেন। কিন্তু তাই বলিয়া ঐ-সকল উপাসনার উপর দোষারোপ করিবার প্রয়োজন নাই, উহাদের প্রত্যেকটি হইতেই কিছু কিছু ফল লাভ হইয়া থাকে, এবং যে ব্যক্তি আর উচ্চতর কিছু বুঝে না, সে এই-সকল প্রতীকোপাসনা হইতে কিছু কিছু শক্তি ও সুখসম্ভোগ লাভ করিবে। তারপর দীর্ঘকাল ভোগ ও অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের পর যখন সে মুক্তিলাভের জন্য প্রস্তুত হইবে, তখন সে নিজেই এই-সব প্রতীকোপাসনা ত্যাগ করিবে।

এই-সকল বিভিন্ন প্রতীকোপাসনার মধ্যে পরলোকগত বন্ধুবান্ধব আত্মীয়গণের উপাসনাই সমাজে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত। ব্যক্তিগত ভালবাসা, প্রিয়জনের দেহের প্রতি ভালবাসা—এই মানবপ্রকৃতি আমাদের মধ্যে এতদূর প্রবল যে, তাঁহাদের মৃত্যু হইলেও আমরা সর্বদাই তাঁহাদিগের দেহ আবার দেখিতে চাই। আমরা তাঁহাদের দেহের প্রতিই আসক্ত! আমরা ভুলিয়া যাই যে, যখন তাঁহারা জীবিত ছিলেন, তখনই তাঁহাদের দেহ ক্রমাগত পরিবর্তিত হইতেছিল এবং মৃত্যু হইলেই আমরা ভাবি, তাঁহাদের দেহ অপরিবর্তনীয় হইয়া গিয়াছে, সুতরাং আমরা তাঁহাদিগকে পূর্বের মতোই দেখিব। শুধু তাই নয়, আমাদের কোন বন্ধু বা পুত্র জীবদ্দশায় অতিশয় দুষ্টস্বভাব থাকিলেও মৃত্যু হইবামাত্র আমরা মনে করিতে থাকি, তাহার মতো সাধু প্রকৃতির লোক আর জগতে কেহই নাই —সে আমাদের কাছে ঈশ্বরতুল্য হইয়া যায়। ভারতে এমন অনেক লোক আছে, যাহারা কোন শিশুর মৃত্যু হইলে তাহাকে দাহ করে না, মৃত্তিকার নিম্নে সমাধিস্থ করে ও তাহার সমাধিস্থানের উপর মন্দির নির্মাণ করে, এবং সেই শিশুটিই ঐ মন্দিরের দেবতা হইয়া যায়। সকল দেশেই এই প্রকারের ধর্ম খুব প্রচলিত, এবং এমন দার্শনিকেরও অভাব নাই, যাঁহাদের মতে ইহাই সকল ধর্মের মূল। অবশ্য তাঁহারা ইহা প্রমাণ করিতে পারেন না।

যাহা হউক স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই প্রতীক-পূজা আমাদিগকে কখনই মুক্তি দিতে পারে না; দ্বিতীয়তঃ ইহাতে বিশেষ বিপদাশঙ্কা আছে। বিপদ্ এই যে, প্রতীক বা সমীপকারী সোপান-পরম্পরা যতক্ষণ পর্যন্ত আর একটি অগ্রবর্তী সোপানে পৌঁছিবার সহায়তা করে, ততক্ষণ উহারা দোষাবহ নয় বরং উপকারী, কিন্তু আমাদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জন সারা জীবন প্রতীকোপাসনাতেই লাগিয়া থাকে। সম্প্রদায়-বিশেষের ভিতর জন্মানো ভাল, কিন্তু উহাতে নিবদ্ধ থাকিয়া মরা ভাল নয়। স্পষ্টতর করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয়, কোন সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিয়া তাহার মধ্যে প্রচলিত সাধনপ্রণালী অবলম্বন করা ভাল, ইহাদ্বারা আমাদের উচ্চতর ভাবসমূহ জাগরিত হয়; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা সেই ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণভাব অবলম্বন করিয়াই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাটাই, আমরা উহার বাহিরে আসিতে পারি না। নিজ ভাবের বিকাশসাধন করিতে পারি না। এই-সকল প্রতীকোপাসনায় ইহাই বড় বিপদ। লোকে মুখে বলিবে যে, এগুলি সোপান মাত্র—এই-সকল সোপানের মধ্য দিয়া তাহারা অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু বৃদ্ধ হইলেও দেখা যায়—তাহারা সেই-সকল সোপান অবলম্বন করিয়াই রহিয়াছে। যদি কোন যুবক চার্চে না যায়, তবে সে নিন্দার্হ, কিন্তু যদি বৃদ্ধ বয়সেও কেহ চার্চে যায়, সেও তেমনি নিন্দার্হ; তাহার আর এই ছেলেখেলায় কোন প্রয়োজন নাই, চার্চের সাহায্যে তাহার ইহা অপেক্ষা উচ্চতর অবস্থায় উপনীত হওয়া উচিত ছিল। এই বৃদ্ধ বয়সে তাহার আর এইসব প্রতীক, পদ্ধতি ও প্রাথমিক অনুষ্ঠানের কি প্রয়োজন?

প্রতীকোপাসনার আর একটি প্রবল, প্রবলতম ভাব—গ্রন্থ বা শাস্ত্রের উপাসনা। সকল দেশেই দেখিবেন, গ্রন্থ ঈশ্বরের স্থান অধিকার করিয়া বসে। আমার দেশে এমন অনেক সম্প্রদায় আছে, যাহারা বিশ্বাস করিয়া থাকে, ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া মানবরূপ পরিগ্রহ করেন; কিন্তু তাহাদের মতে মানবরূপে অবতীর্ণ হইলে ঈশ্বরকেও বেদানুযায়ী চলিতে হইবে এবং যদি তাঁহার উপদেশ বেদানুযায়ী না হয়, তবে তাহারা সেই উপদেশ গ্রহণ করিবে না। আমাদের দেশে সকল সম্প্রদায়ের লোকই বুদ্ধকে পূজা করে, কিন্তু যদি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমরা বুদ্ধের পূজা কর, কিন্তু তাঁহার উপদেশ অনুসরণ কর না কেন?' তাহারা বলিবে, 'যেহেতু বুদ্ধের উপদেশে বেদ

অস্বীকৃত হইয়া থাকে।' গ্রন্থোপাসনা বা শাস্ত্রোপাসনার তাৎপর্য এইরূপ। একখানি শাস্ত্রের দোহাই দিয়া যত খুশী মিথ্যা বলো না কেন, তাহাতে দোষ নাই। ভারতে যদি আমি কোন নূতন বিষয় শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করি এবং যদি অপর কোন গ্রন্থ বা ব্যক্তির দোহাই না দিয়া আমি যেরূপ বুঝিয়াছি, সেইভাবে ঐ সত্য প্রচার করিতে যাই, তাহা হইলে কেহই আমার কথা শুনিতে আসিবে না; কিন্তু আমি যদি বেদ হইতে কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া কারসাজি করিয়া উহার ভিতর হইতে খুব অসম্ভব অর্থ বাহির করিতে পারি, উহার যুক্তিসঙ্গত অর্থ বিনষ্ট করিয়া আমার নিজের কতকগুলি ধারণাকে বেদের অভিপ্রেত তত্ত্ব বলিয়া ব্যাখ্যা করি, তাহা হইলে মূর্খেরা দলে দলে আসিয়া আমার অনুসরণ করিবে। তারপর আবার কিছু লোক আছে, তাহারা এক অদ্ভুত রকমের খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করিয়া থাকে; তাহাদের মত শুনিয়া সাধারণ খ্রীষ্টানগণ হতবুদ্ধি হইয়া ভয় পাইবে, কিন্তু ঐ প্রচারকেরা বলে, আমরা যাহা বলিতেছি, যীশুখ্রীষ্টের মতও এইরূপই ছিল। যত সব আহাম্মকেরা তাহাদের দলে ভিড়িয়া যায়। যাহা বেদে বা বাইবেলে পাওয়া যায় না, তেমন সব নূতন জিনিস মানুষ লইতেই চায় না। স্নায়ুসমূহ যেভাবে অভ্যস্ত হইয়াছে, সেই দিকেই যাইতে চায়। যখন আপনারা কোন নূতন বিষয় শোনেন বা দেখেন, অমনি চমকিয়া উঠেন—ইহা মানুষের প্রকৃতিগত। অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে যদি ইহা সত্য হয়, চিন্তা ও ভাব সম্বন্ধে এ-কথা আরও বিশেষভাবে সত্য। মন প্রচলিত ভাবে চিন্তা করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে, সুতরাং কোন নূতন ভাব গ্রহণ করা তাহার পক্ষে অতি কঠিন; সুতরাং সেই ভাবটিকে প্রচলিত ভাবের খুব কাছাকাছি রাখিতে হয়, তবেই আমরা ধীরে ধীরে উহা গ্রহণ করিতে পারি। কৌশল হিসাবে এটি ভাল বটে, কিন্তু নীতি হিসাবে মন্দ। এই সংস্কারকগণ এবং যাঁহাদিগকে আপনারা উদার-মতাবলম্বী প্রচারক বলেন, তাঁহারা আজকাল রাশি রাশি অসামঞ্জস্যপূর্ণ কথা বলিতেছেন, তাহা ভাবিয়া দেখুন। তাঁহারা জানেন যে, তাঁহারা শাস্ত্রের যেরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন, সেরূপ অর্থ হয় না; কিন্তু তাঁহারা যদি ঐভাবে প্রচার না করেন, কেহই তাঁহাদের কথা শুনিতে আসিবে না। ক্রিশ্চিয়ান সায়ান্টিস্টদের (Christian Scientists) মতে যীশু একজন মস্ত রোগ-নিরাময়কারী, প্রেততত্ত্ববাদীদের (Spiritualists) মতে একজন মস্ত ভৌতিক (psychic)

এবং থিওজফিস্টদের মতে একজন 'মহাত্মা' ছিলেন। ধর্মগ্রন্থের একই বাক্য হইতে এই-সব বিভিন্ন অর্থ বাহির করিতে হইবে।

ছান্দোগ্য উপনিষদের 'সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্'—এই বাক্যের অন্তর্গত 'সৎ' শব্দের অর্থ বিভিন্ন মতবাদিগণ বিভিন্ন ভাবে করিয়াছেন। পরমাণুবাদিগণ বলেন, সৎ-শব্দের অর্থ পরমাণু, আর ঐ পরমাণু হইতেই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। প্রকৃতিবাদিগণ বলেন, উহার অর্থ প্রকৃতি, আর প্রকৃতি হইতেই সমুদয় উৎপন্ন হইয়াছে। শূন্যবাদীরা বলেন, সৎ-শব্দের অর্থ শূন্য, আর এই শূন্য হইতেই সমুদয় উৎপন্ন হইয়াছে। ঈশ্বরবাদিগণ বলেন, উহার অর্থ ঈশ্বর। অদ্বৈতবাদীরা বলেন, উহার অর্থ সেই পূর্ণ নিরপেক্ষ সত্তা। সকলেই ঐ এক শাস্ত্রীয় বাক্যকেই প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিতেছেন।

গ্রন্থোপাসনায় এই-সব দোষ আছে, তবে উহার একটি বড় গুণও আছে। উহা একটা শক্তি। যে-সকল ধর্মসম্প্রদায়ের এক একখানি গ্রন্থ আছে, সেইগুলি ব্যতীত জগতের অন্যান্য সকল ধর্মসম্প্রদায়ই লোপ পাইয়াছে। আপনাদের মধ্যে কেহ কেহ পারসীকদের কথা শুনিয়াছেন। ইহারা প্রাচীন পারস্যবাসী—এক সময় ইহাদের সংখ্যা প্রায় দশ কোটি ছিল। আরবীয়েরা ইহাদিগের অধিকাংশকে পরাজিত করিয়া মুসলমান করিল। অল্প কয়েকজন তাহাদের ধর্মগ্রন্থ[১] লইয়া পলায়ন করিল এবং সেই ধর্মগ্রন্থের বলেই তাহারা এখনও টিকিয়া আছে। ইহুদীদের কথা ভাবিয়া দেখুন। যদি তাহাদের একটি ধর্মগ্রন্থ না থাকিত, তাহারা জগতে কোথায় মিলাইয়া যাইত। কিন্তু ঐ গ্রন্থই তাহাদের জীবনীশক্তি রক্ষা করিয়াছে। অতি ভয়ানক অত্যাচার সত্ত্বেও তাহাদের ধর্মগ্রন্থ তালমুড (Talmud) তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছে। গ্রন্থের একটি বিশেষ সুবিধা এই যে, উহা সমুদয় ভাবগুলি পরিষ্কারভাবে হৃদয়গ্রাহী করিয়া লোকের সমক্ষে উপস্থিত করে, এবং উহা উপাস্য বস্তু। বেদীর উপর একখানি গ্রন্থ রাখুন—সকলেই উহা দেখিবে, একখানি ভাল গ্রন্থ হইলে সকলেই তাহা পড়িবে। কেহ কেহ বোধ হয় আমাকে পক্ষপাতী বলিয়া মনে করিতে পারেন, কিন্তু আমার মতে গ্রন্থ দ্বারা জগতে ভাল অপেক্ষা মন্দ অধিক হইয়াছে। এই যে নানা ক্ষতিকর মতবাদ দেখা যায়, সেগুলির

১ পারসীকদের ধর্মগ্রন্থ—জেন্দ আবেস্তা

জন্য এই-সকল গ্রন্থই দায়ী। মতামতগুলি সব গ্রন্থ হইতেই আসিয়াছে, আর গ্রন্থগুলিই জগতে যত প্রকার অত্যাচার ও গোঁড়ামির জন্য দায়ী। বর্তমানকালে গ্রন্থসমূহই সর্বত্র মিথ্যাবাদী সৃষ্টি করিতেছে। সকল দেশেই মিথ্যাবাদীর সংখ্যা বাড়িতেছে দেখিয়া আমি আশ্চর্য হই।

তারপর প্রতিমা বা মূর্তি ও তাহার উপযোগিতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে। সমগ্র জগতে আপনারা কোন না কোন আকারে প্রতিমার ব্যবহার দেখিতে পাইবেন। কেহ কেহ মানবাকার প্রতিমা অর্চনা করিয়া থাকে, আর আমি মনে করি, উহাই সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিমা। আমার যদি প্রতিমা-পূজার প্রয়োজন হয়, তবে আমি পশু, গৃহ বা অন্য কোন মূর্তি অপেক্ষা বরং মানবাকৃতি প্রতিমার উপাসনা করিব। এক সম্প্রদায় মনে করে, এই প্রতিমাটিই ঠিক ; অপরে মনে করে, উহা ঠিক নয়। খ্রীষ্টানরা মনে করেন : ঈশ্বর যে ঘুঘুর রূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছিলেন, উহাই ঠিক, কিন্তু হিন্দুদের মতানুসারে তিনি যে গো-রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, উহা সম্পূর্ণ ভ্রম ও কুসংস্কারাত্মক। ইহুদীরা মনে করেন, দুই দিকে দুই দেবদূত বসানো সিন্দুকের আকৃতি একটি মূর্তি নির্মাণ করিলে তাহাতে কোন দোষ নাই, কিন্তু নর বা নারীর আকারে যদি কোন মূর্তি গঠিত হয়, তবে উহা ঘোরতর ভয়াবহ। মুসলমানেরা মনে করেন, প্রার্থনার সময় যদি পশ্চিমদিকে মুখ করিয়া 'কাবা' নামক কৃষ্ণপ্রস্তরযুক্ত মন্দিরটির আকৃতি চিন্তা করিতে চেষ্টা করা যায়, তাহাতে কোন দোষ নাই, কিন্তু চার্চের আকৃতি ভাবিলেই উহা পৌত্তলিকতা। প্রতিমাপূজার ইহাই অপূর্ণতা বা দোষ, তথাপি এগুলি সবই প্রয়োজনীয় সোপান বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু শুধু একখানি গ্রন্থের দোহাই দিলেই চলিবে না। গ্রন্থ সম্বন্ধে বলিতে পারি, গ্রন্থের উপর অন্ধবিশ্বাস যত কম হয়, ততই আমাদের মঙ্গল। আপনি নিজে প্রত্যক্ষ কি অনুভব করিয়াছেন, তাহাই প্রশ্ন। ঈশা, মুশা, বুদ্ধ কি করিয়াছেন, বলিলে কি হইবে—তাহাতে আমাদের কিছুই হইবে না, যতদিন না আমরা নিজেরাও সেগুলি জীবনে পরিণত করিতেছি। আপনি যদি একটা ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া চিন্তা করেন, মুশা এই এই খাইয়াছিলেন, তাহাতে তো আপনার ক্ষুধা মিটিবে না, সেইরূপ মুশার এই প্রকার মত ছিল—জানিলেই আপনার উদ্ধার হইবে না। এ-সকল বিষয়ে আমার মত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কখন কখন মনে হয়, এই-সব

প্রাচীন আচার্যগণের সহিত যখন আমার মত মিলিতেছে, তখন আমার মত অবশ্যই সত্য; আবার কখন কখন ভাবি, আমার সঙ্গে যখন তাঁহাদের মত মিলিতেছে, তখন তাঁহাদের মত ঠিক। আমি স্বাধীন চিন্তা করায় বিশ্বাস করি। এই-সব পবিত্রস্বভাব আচার্যগণের প্রভাব হইতেও একেবারে মুক্ত থাকিতে হইবে। তাঁহাদিগকে পরিপূর্ণভাবে ভক্তি শ্রদ্ধা করুন, কিন্তু ধর্মকে একটা স্বাধীন গবেষণার বস্তু রূপে গ্রহণ করুন। তাঁহারা যেভাবে জ্ঞানালোক পাইয়াছিলেন, আমাদিগকেও তেমনি নিজের চেষ্টায় জ্ঞানালোক লাভ করিতে হইবে। তাঁহারা জ্ঞানালোক পাইয়াছিলেন বলিয়া আমাদের তৃপ্তি হইবে না। আপনাদিগকে বাইবেল হইতে হইবে, অনুসরণ করিতে হইবে না। বাইবেলকে শুধু পথের আলোক-রূপে, পথপ্রদর্শক স্তম্ভ বা নিদর্শনরূপে শ্রদ্ধা করিতে হইবে।

গ্রন্থের মূল্য ঐ পর্যন্ত; কিন্তু প্রতিমা প্রভৃতি একান্ত আবশ্যক। আপনারা মনকে স্থির করিবার সময় বা কোনরূপ চিন্তা করিবার সময় দেখিবেন, আপনারা স্বভাবতই মনে মনে মূর্তি গড়িবার প্রয়োজন অনুভব করেন, এইরূপ কল্পনা না করিয়া থাকিতে পারেন না। দুই প্রকার মানুষের রূপকল্পনার বা মূর্তির প্রয়োজন হয় না—নরপশুর, যে ধর্মের কোন ধার ধারে না; আর সিদ্ধপুরুষের, যিনি এই-সকল অবস্থার মধ্য দিয়া গিয়াছেন। আমরা এই দুই অবস্থার মধ্যে রহিয়াছি। ভিতরে ও বাহিরে আমাদের কোন না কোনরূপ আদর্শ বা মূর্তির প্রয়োজন। উহা কোন পরলোকগত মানুষের হইতে পারে অথবা কোন জীবিত নর বা নারীর হইতে পারে। ইহা ব্যক্তিত্বের উপাসনা—শরীর-কেন্দ্রিক, তবে ইহা খুব স্বাভাবিক। সূক্ষ্মকে স্থূলে পরিণত করার দিকে আমাদের ঝোঁক। সূক্ষ্ম হইতে যদি আমরা স্থূল না হইয়া থাকি, তবে কিভাবে এখানে আসিলাম? আমরা স্থূলভাবপ্রাপ্ত আত্মা, এইভাবেই আমরা এই পৃথিবীতে আসিয়াছি। সুতরাং মূর্তিভাব যেমন আমাদিগকে এখানে আনিয়াছে, তেমনি মূর্তির সাহায্যেই আমরা ইহার বাহিরে যাইব। ইহা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার সদৃশবিধানের[১] মতো—'বিষস্য বিষমৌষধম্'। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহের পিছনে ছুটিয়াই আমরা মানুষভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছি, আমরা সাকার ব্যক্তিভাবের উপাসনা করিতে বাধ্য; ইহার বিরুদ্ধে যাহাই বলি না কেন, ব্যক্তিরূপের বা সাকারের

১ *Similia similibus curantur*

উপর আসক্ত হইও না, ইহা বলা খুব সহজ বটে, কিন্তু যে এ-কথা বলে, সেই ব্যক্তিভাবের উপর অতিশয় আসক্ত, বিশেষ বিশেষ নরনারীর উপর তাহার তীব্র আসক্তি—মরিয়া গেলেও তাহাদের প্রতি তাহার আসক্তি যায় না, সুতরাং মৃত্যুর পরেও সে তাহাদের অনুসরণ করিতে চায়। ইহাই পুতুলপূজা। ইহাই পুতুলপূজার বীজ, মূল কারণ; আর কারণই যদি থাকে, তবে কোন না কোন আকারে পৌত্তলিকতা আবার প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। কোন সাধারণ নর বা নারীর উপর আসক্তি অপেক্ষা খ্রীষ্ট বা বুদ্ধের প্রতিমূর্তির উপর আসক্তি বা আকর্ষণ থাকা কি ভাল নয়? পাশ্চাত্যের লোকেরা বলিয়া থাকে, মূর্তির সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসা বড়ই খারাপ, কিন্তু তাহারা একটি নারীর সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তাহাকে অনায়াসে বলিতে পারে, 'তুমি আমার প্রাণ, তুমি আমার জীবনের আলো। তুমি আমার নয়নের মণি, তুমি আমার আত্মা'—এই-সব। তাহাদের যদি চারটি পা থাকিত, তবে তাহারা চার পায়েই হাঁটু গাড়িয়া বসিত! ইহা নিকৃষ্টতর পৌত্তলিকতা বা পৌত্তলিকতা অপেক্ষা নিকৃষ্ট। পশুরা ঐরূপে হাঁটু গাড়িয়া বসিবে। একটি নারীকে 'আমার প্রাণ, আমার আত্মা' বলার অর্থ কি? এ ভাব তো পাঁচ দিনের মধ্যেই উবিয়া যায়, এ কেবল ইন্দ্রিয়গত আসক্তি মাত্র। তাই যদি না হইবে, তবে পুরুষ পুরুষের নিকট ঐরূপে হাঁটু গাড়িয়া বসে না কেন? এই ভালবাসা স্বার্থপূর্ণ কামনা অথবা তাহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট,—কেবল একরাশ ফুলচাপা দেওয়া মাত্র। কবিরা উহার একটি সুন্দর নামকরণ করিয়া উহার উপর আতর গোলাপজল ছড়াইয়া দেন। তাহা হইলেও উহা স্বার্থপর কামনা ছাড়া আর কিছুই নয়। বুদ্ধ বা জিনের মূর্তির সমক্ষে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া 'তুমিই আমার জীবনস্বরূপ' বলা কি উহা অপেক্ষা ভাল নয়? আমি বরং শত শত বার এইরূপই করিব।

আর এক প্রকার প্রতীক আছে—পাশ্চাত্য দেশে ঐরূপ প্রতীকোপাসনার স্বীকৃতি নাই, কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে মনকে ঈশ্বররূপে উপাসনা করিতে বলা হইয়াছে, যে-কোন বস্তুকে ঈশ্বররূপে উপাসনা করা হয়, তাহাই ভগবৎ-প্রাপ্তির এক একটি সোপানস্বরূপ—প্রত্যেকটি আমাদিগকে ঈশ্বরের নিকটতর করিয়া দেয়। অরুন্ধতী একটি অতি ক্ষুদ্র নক্ষত্র। যদি কেহ ঐ নক্ষত্র দেখিতে চায়, প্রথমে তাহাকে উহার নিকটবর্তী একটি বড় নক্ষত্র দেখাইতে হয়।

তাহাতে লক্ষ্য স্থির হইলে তাহার নিকটস্থ একটি ক্ষুদ্রতর নক্ষত্র—তারপর তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর নক্ষত্রে লক্ষ্য স্থির হইলে অতি ক্ষুদ্রতর অরুন্ধতী নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এইরূপে এই-সকল বিভিন্ন প্রতীক ও প্রতিমা মানুষকে ক্রমে সেই সূক্ষ্ম ঈশ্বরের নিকট লইয়া যায়। বুদ্ধ ও খ্রীষ্টের উপাসনা—এ-সবই প্রতীকোপাসনা। ইহা মানবকে প্রকৃত ঈশ্বরোপাসনার সমীপে পৌঁছাইয়া দেয় মাত্র, কিন্তু বুদ্ধ ও খ্রীষ্টের উপাসনা কাহাকেও মুক্তি দিতে পারে না, এই ভাবও অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরের নিকট যাইতে হইবে। বুদ্ধ ও খ্রীষ্টের ভিতর ঈশ্বরই প্রকাশিত হইয়াছিলেন, কেবল ঈশ্বরই আমাদিগকে মুক্তি দিতে পারেন। অবশ্য কিছু দার্শনিক আছেন, যাঁহারা বলেন, ইঁহারা প্রতীক নন, ইঁহাদিগকেই ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করা কর্তব্য। যাহা হউক, আমরা এই-সকল প্রতীক বা সোপান অবলম্বন করিতে পারি, তাহাতে আমাদের কোন ক্ষতি হইবে না। কিন্তু যদি এই-সব প্রতীকোপাসনার সময় আমরা মনে করি, আমরা ঈশ্বরোপাসনা করিতেছি, তাহা হইলে আমরা ভ্রমে পড়িব। যদি কোন ব্যক্তি যীশুখ্রীষ্টের উপাসনা করে ও মনে করে, সে উহা দ্বারাই মুক্ত হইবে, সে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। যদি কেহ মনে করে যে, ভূত-প্রেতের উপাসনা করিয়া বা কোন মূর্তি পূজা করিয়া তাহার মুক্তি হইবে, তবে সে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। যে-কোন বস্তুর ভিতর ঈশ্বর দর্শন করিয়া তাঁহাকে উপাসনা করিতে পারেন। মূর্তি ভুলিয়া সেখানে ঈশ্বরকে দেখুন। ঈশ্বরে অন্য কিছু আরোপ করিবেন না, কিন্তু যে-কোন বস্তুতে ইচ্ছা ঈশ্বরভাব প্রবেশ করান। যে সাকার মূর্তি উপাসনা করেন, তাহার মধ্যে ঈশ্বরকে সীমাবদ্ধ করিবেন না। বরং যাহা কিছু উপাসনা করেন, সে সব কিছু ঈশ্বরভাবে পূর্ণ করিয়া দিন। এভাবে একটা বিড়ালের মধ্যেও আপনি ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারেন। বিড়ালকে ভুলিয়া সেখানে ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠিত করুন, তাহা হইলেই সব ঠিক হইয়া যাইবে, কারণ তাঁহা হইতেই সব কিছু আসিয়াছে। তিনিই সব কিছুতে। একখানি চিত্রকে ঈশ্বররূপে উপাসনা করা যায়, কিন্তু ঈশ্বরকে চিত্ররূপে উপাসনা করা ভুল। চিত্রে ঈশ্বরচিন্তা করা খুবই ঠিক, কিন্তু চিত্রকেই ঈশ্বর মনে করা ভুল। বিড়ালের মধ্যে ঈশ্বর দর্শন করা তো খুব ভাল কথা—তাহাতে কোন বিপদাশঙ্কা নাই। ঈশ্বরের প্রতিমা প্রতীক মাত্র। ইহাই ভগবানের যথার্থ উপাসনা।

অতঃপর ভক্তিযোগে প্রধান আলোচ্য বিষয়—শব্দশক্তি বা নামশক্তি। সমগ্র জগৎ নামরূপাত্মক। হয় জগৎ নাম ও রূপের সমষ্টি অথবা শুধু নাম, এবং উহার রূপ কেবল একটি মনোময় মূর্তি। সুতরাং ফলে এই দাঁড়াইতেছে যে, এমন কিছুই নাই, যাহা নামরূপাত্মক নয়। আমরা সকলেই বিশ্বাস করি, ঈশ্বর নিরাকার; কিন্তু যখনই আমরা তাঁহার চিন্তা করিতে যাই, তখনই তাঁহাকে নামরূপযুক্ত ভাবিতে হয়। চিত্ত যেন একটি স্থির হ্রদের তুল্য, চিন্তাসমূহ যেন ঐ চিত্তহ্রদের তরঙ্গ আর এই-সকল তরঙ্গের স্বাভাবিক আবির্ভাব-প্রণালীকেই 'নামরূপ' বলে। 'নামরূপ' ব্যতীত কোন তরঙ্গই উঠিতে পারে না। যাহা কিছু একরূপমাত্র, তাহা চিন্তা করিতে পারা যায় না। উহা অবশ্যই চিন্তার অতীত, কিন্তু যখনই উহা চিন্তা ও জড়পদার্থে পরিণত হয়, তখনই উহার নামরূপ চাই-ই চাই। আমরা উহাদিগকে পৃথক্ করিতে পারি না। অনেক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, 'শব্দ' হইতে ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। খ্রীষ্টানগণের একটা মত আছে—শব্দ হইতে জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় উহারই নাম 'শব্দব্রহ্মবাদ'। উহা একটি প্রাচীন ভারতীয় মত; ভারতীয় ধর্মপ্রচারকগণ কর্তৃক ঐ মত আলেকজান্দ্রিয়ায় নীত হয় এবং সেখানে ঐ ভাব রোপণ করা হয়। এইরূপে সেখানে শব্দব্রহ্মবাদ ও অবতারবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শব্দ হইতে ঈশ্বর সমুদয় সৃষ্টি করিয়াছিলেন —এ-কথার গভীর অর্থ আছে। ঈশ্বর যখন স্বয়ং নিরাকার, তখন সৃষ্টি ব্যাখ্যা করিবার ইহাই শ্রেষ্ঠ উপায়। সৃষ্টি শব্দের অর্থ—বাহিরে প্রক্ষেপ করা, বিস্তার করা। সুতরাং ঈশ্বর শূন্য হইতে জগৎ নির্মাণ করিলেন, এই প্রলাপের অর্থ কি? ঈশ্বর হইতে জগৎ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। তিনিই জগদ্রূপে পরিণত হন, আর সবই তাঁহাতে ফিরিয়া আসে, আবার বাহির হয়, আবার ফিরিয়া আসে। অনন্ত কাল ধরিয়া এইরূপ চলিবে। আমরা দেখিয়াছি, আমাদের মন হইতে যে-কোন ভাবের সৃষ্টি হয়, তাহা নামরূপ ব্যতীত হইতে পারে না। মনে করুন, আপনাদের মন সম্পূর্ণ স্থির রহিয়াছে, উহা একেবারে চিন্তাহীন হইয়াছে। যখনই চিন্তার আরম্ভ হইবে, উহা অমনি নাম ও রূপকে আশ্রয় করিতে থাকিবে। প্রত্যেক চিন্তা বা ভাবেরই একটি নির্দিষ্ট নাম ও একটি নির্দিষ্ট রূপ আছে। সুতরাং সৃষ্টি বা বিকাশের ব্যাপারটাই অনন্তকাল ধরিয়া নামরূপের সহিত জড়িত। অতএব আমরা দেখিতে পাই, মানুষের যত

প্রকার ভাব আছে অথবা থাকিতে পারে, তাহার প্রতিরূপ একটি নাম বা শব্দ অবশ্যই থাকিবে। তাই যদি হইল, তবে যেমন আপনার দেহ আপনার মনের বহির্মুখ বা স্থূল বিকাশ, তেমনি এই জগৎও মনেরই বিকাশ, ইহা সহজেই মনে করা যাইতে পারে। আর ইহা যদি সত্য হয় যে, সমগ্র জগৎ একই নিয়মে গঠিত, তাহা হইলে একটি পরমাণুর গঠনপ্রণালী জানিতে পারিলে আপনি সমগ্র জগতের গঠনপ্রণালীই জানিতে পারিবেন। আপনাদের শরীরের স্থূল ভাগ এই স্থূল দেহ, আর চিন্তা বা ভাব উহারই অভ্যন্তরে সূক্ষ্মতর ভাগ। এ-দুটি চিরদিন অবিচ্ছেদ্য। ইহা আপনারা প্রতিদিনই দেখিতে পান। কোন ব্যক্তির মস্তিষ্কে যখন বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, তাহার চিন্তা বা ভাবসমূহও অমনি বিশৃঙ্খল হইতে থাকে। কারণ ঐ দুইটি একই বস্তু—একই বস্তুর স্থূল ও সূক্ষ্মভাগ মাত্র। মন ও জড়বস্তু বলিয়া দুইটি পৃথক্ পদার্থ নাই। একটি উচ্চ বায়ুস্তম্ভে যেমন একই বায়ুর ঘন ও পাতলা স্তর পর পর পাওয়া যায়—এবং বায়ুমণ্ডলের যতই উর্ধ্বে যাওয়া যায়, ততই উহা সূক্ষ্মতর হইতে থাকে—এই দেহ সম্বন্ধেও সেইরূপ। বরাবর ইহা একই বস্তু—স্থূল হইতে সূক্ষ্ম—স্তরে স্তরে গ্রথিত রহিয়াছে। দেহটা যেন নখের মতো, নখ কাটিয়া ফেলুন, আবার নখ হইবে। বস্তু যতই সূক্ষ্মতর হয়, তাহা ততই অধিক স্থায়ী হয়, সর্বকালেই ইহার সত্যতা দেখা যায়; আবার যতই স্থূলতর হয়, ততই অস্থায়ী হইয়া থাকে। অতএব আমরা দেখিতেছি—রূপ স্থূলতর, নাম সূক্ষ্মতর। ভাব, নাম ও রূপ—এই তিনটি কিন্তু একই বস্তু; একে তিন, তিনে এক; একই বস্তুর ত্রিবিধ অবস্থা—সূক্ষ্মতর, কিঞ্চিৎ ঘনীভূত ও সম্পূর্ণ ঘনীভূত। একটি থাকিলে অপরগুলিও থাকিবেই। যেখানে নাম, সেখানেই রূপ ও ভাব বর্তমান। সুতরাং সহজেই ইহা প্রতীত হইতেছে যে, এই দেহ যে নিয়মে নির্মিত, এই ব্রহ্মাণ্ড যদি সেই একই নিয়মে নির্মিত হয়, তবে ইহাতেও নাম রূপ ও ভাব—এই তিনটি জিনিস অবশ্য থাকিবে। চিন্তা বা ভাবই ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ্মতম অংশ, উহাই জগতের প্রকৃত প্রেরণাশক্তি এবং উহাকেই ঈশ্বর বলে। আমাদের দেহের অন্তর্যামী ভাবকে 'আত্মা' এবং জগতের অন্তর্যামী ভাবকে 'ঈশ্বর' বলে। তারপর 'নাম', এবং সর্বশেষে 'রূপ'—যাহা আমরা দর্শন-স্পর্শন করিয়া থাকি। যেমন আপনি একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি, এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড, আপনার দেহের একটি নির্দিষ্ট রূপ আছে, আবার

তাহার শ্রীঅমুক বা শ্রীমতীঅমুক প্রভৃতি বিভিন্ন নাম আছে, তাহার পশ্চাতে আবার ভাব—অর্থাৎ যে চিন্তা বা ভাবসমষ্টির প্রকাশে এই দেহ নির্মিত—তাহা রহিয়াছে; সেইরূপ এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরালে নাম রহিয়াছে, আর সেই নাম হইতেই এই বহির্জগৎ সৃষ্ট বা বহির্গত হইয়াছে। সকল ধর্ম এই নামকে শব্দব্রহ্ম বলিয়া থাকে। বাইবেলে লিখিত আছে—'আদিতে শব্দ ছিল, সেই শব্দ ঈশ্বরের সহিত যুক্ত ছিল, সে শব্দই ঈশ্বর।' সেই নাম হইতে রূপের প্রকাশ হইয়াছে এবং সেই নামের পশ্চাতে ঈশ্বর আছেন। এই সর্বব্যাপী ভাব বা চেতনাকে সাংখ্যেরা 'মহৎ' আখ্যা প্রদান করেন। এই নাম কি? আমরা দেখিতে পাইতেছি, ভাবের সঙ্গে নাম অবশ্যই থাকিবে। সমগ্র জগৎ সমপ্রকৃতিক, আর আধুনিক বিজ্ঞান নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়াছে যে, সমগ্র জগৎ যে উপাদানে নির্মিত, প্রত্যেকটি পরমাণুও সেই উপাদানে নির্মিত। আপনারা যদি এক তাল মৃত্তিকাকে জানিতে পারেন, তবে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকেই জানিতে পারিবেন।[১] সমগ্র জগৎকে জানিতে হইলে কেবল একটু মাটি লইয়া উহাকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেই হইবে। যদি আপনারা একটি টেবিলকে সম্পূর্ণরূপে—সব দিক দিয়া উহাকে জানিতে পারেন, তাহা হইলে আপনারা সমগ্র জগৎকে জানিতে পারিবেন। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি—মানুষই স্বয়ং ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ। সুতরাং মানুষের মধ্যে আমরা রূপ দেখিতে পাই, তাহার পশ্চাতে নাম, তৎপশ্চাতে ভাব—অর্থাৎ মননকারী পুরুষ রহিয়াছেন। অতএব এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডও অবশ্যই সেই একই নিয়মে নির্মিত। প্রশ্ন এই—নাম কি? হিন্দুদের মতে এই নাম বা শব্দ—ওঁ। প্রাচীন মিশরবাসিগণও তাহাই বিশ্বাস করিত।

যাঁহাকে লাভ করিবার ইচ্ছা করিয়া সাধক ব্রহ্মচর্য পালন করেন, আমি সংক্ষেপে তাহাই বলিব—তাহা ওঁ।[২]

ইনিই অক্ষর অপরব্রহ্ম, ইনিই অক্ষর পরব্রহ্ম। এই অক্ষরের—ওঙ্কারের রহস্য জানিয়া যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তিনি তাহাই লাভ করিয়া থাকেন।[৩]

---

১ ছান্দোগ্য উপ., ৬।১।৪

২ যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ।—কঠ উপ.,

৩ এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ।—কঠ উপ.,

ওঙ্কার সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের প্রতীক, ঈশ্বরেরও প্রতীক! ইহা বহির্জগৎ ও ঈশ্বরের মধ্যবর্তী, উভয়েরই প্রতিভূ! এখন আমরা জগতের বিভিন্ন খণ্ড খণ্ড ভাবগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এই সমগ্র জগৎকে সমষ্টিভাবে না ধরিয়াও আমরা জগৎটাকে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়—যথা স্পর্শ, রূপ, রস ইত্যাদি অনুসারে এবং অন্যান্য নানা প্রকারে খণ্ড খণ্ড ভাবে গ্রহণ করিতে পারি। প্রত্যেক স্থলেই এই জগৎকেই বিভিন্ন দৃষ্টি হইতে লক্ষ লক্ষ জগৎ-রূপে দেখা যাইতে পারে, আর এইরূপ বিভিন্ন ভাবে দৃষ্ট জগতের প্রত্যেকটিই স্বয়ং এক একটি সম্পূর্ণ জগৎ হইবে এবং প্রত্যেকটিরই বিভিন্ন নামরূপ ও তাহাদের পশ্চাতে একটি ভাব থাকিবে। এই ভাবগুলিই প্রতীক। আর প্রত্যেক প্রতীকের এক একটি নাম আছে। এইরূপ পবিত্র নাম বা শব্দ অনেক আছে; ভক্তিযোগীরা বিভিন্ন নামের সাধন উপদেশ দিয়া থাকেন।

এই তো নামের দার্শনিক তত্ত্ব বিবৃত হইল—এখন উহার সাধনে কি ফল হয়, তাহাই বিচার্য। এই-সব নামের প্রায় অনন্ত শক্তি আছে। কেবল ঐ শব্দ বা মন্ত্রগুলি জপ করিয়াই আমরা সমুদয় বাঞ্ছিত বস্তু লাভ করিতে পারি, সিদ্ধ হইতে পারি। কিন্তু তাহা হইলেও দুইটি জিনিসের প্রয়োজন। 'আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা।'[১] গুরু অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন হইবেন এবং শিষ্যও সেইরূপ হইবে। এই নাম এমন ব্যক্তির নিকট হইতে পাওয়া চাই, যিনি উত্তরাধিকারসূত্রে উহা পাইয়াছেন। অতি প্রাচীনকাল হইতে গুরু হইতে শিষ্যে আধ্যাত্মিক শক্তিপ্রবাহ আসিতেছে, এবং গুরুপরম্পরাক্রমে আসিলেই নাম শক্তিসম্পন্ন হইয়া থাকে, এবং পুনঃ পুনঃ জপ করিলে নাম অনন্তশক্তিসম্পন্ন হয়। যে ব্যক্তির নিকট হইতে এরূপ শব্দ বা নাম পাওয়া যায় তাঁহাকে গুরু বলে, আর যিনি পান তাঁহাকে শিষ্য বলে। যদি বিধিপূর্বক এইরূপ মন্ত্র গ্রহণ করিয়া উহা পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করা হয়, তবে সাধক ভক্তিযোগের পথে অনেকখানি অগ্রসর হইয়া রহিল। কেবল ঐ মন্ত্রের বার বার উচ্চারণে ভক্তির উচ্চতর অবস্থা আসিবে।

---

১ কঠ উপ., ১।২।৭

'হে ভগবন্, আপনার কত নাম রহিয়াছে! আপনি জানেন, উহাদের প্রত্যেকের কি তাৎপর্য! সব নামগুলিই আপনার। প্রত্যেক নামেই আপনার অনন্তশক্তি রহিয়াছে। এই-সকল নাম উচ্চারণের কোন নির্দিষ্ট দেশকালও নাই, কারণ সব কালই শুদ্ধ ও সব স্থানই শুদ্ধ। আপনি এত সহজলভ্য, আপনি এত দয়াময়! আমি অতি দুর্ভাগা যে, আপনার প্রতি আমার অনুরাগ জন্মিল না।'[১]

১ নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ।—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইষ্ট

ইষ্ট সম্বন্ধে পূর্ব বক্তৃতায় কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছি—আশা করি, ঐ বিষয়টি আপনারা বিশেষ মনোযোগ সহকারে আলোচনা করিবেন; কারণ ইষ্টনিষ্ঠা সম্বন্ধে ঠিক ঠিক ধারণা হইলে আমরা জগতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের যথার্থ তাৎপর্য বুঝিতে পারিব। 'ইষ্ট' শব্দটি ইষ্-ধাতু হইতে সিদ্ধ হইয়াছে; উহার অর্থ—ইচ্ছা করা, মনোনীত করা। সকল ধর্মের, সকল সম্প্রদায়ের, সকল মানুষের চরম লক্ষ্য এক—মুক্তিলাভ ও সর্বদুঃখনিবৃত্তি। যেখানেই কোন প্রকার ধর্ম বিদ্যমান, সেখানেই এই দুইটির একটি না একটি আদর্শ কাজ করিতেছে। অবশ্য ধর্মের নিম্নস্তরে ঐ ভাবগুলি তত স্পষ্টরূপে দেখা যায় না বটে, কিন্তু সুস্পষ্ট হউক, আর অস্পষ্টই হউক—আমরা সকলেই ঐ চরম লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছি। আমরা সকলেই দুঃখ এড়াইতে চাই—প্রতিদিন আমরা যে দুঃখ ভোগ করিতেছি, তাহা হইতে মুক্তি চাই; আমরা সকলেই মুক্তিলাভের—দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতালাভের চেষ্টা করিতেছি। জগতের সকল কার্যের মূলেই ঐ দুঃখনিবৃত্তি ও মুক্তিলাভের চেষ্টা। সকলের লক্ষ্য এক, তথাপি সেখানে পৌঁছিবার উপায় ভিন্ন ভিন্ন এবং আমাদের প্রকৃতির বিভিন্নতা ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এই-সকল বিভিন্ন পথ বা উপায় নিরূপিত হইয়াছে। কাহারও প্রকৃতি ভাবপ্রধান, কাহারও জ্ঞানপ্রধান, কাহারও কর্মপ্রধান, কাহারও বা অন্যরূপ। একপ্রকার প্রকৃতির ভিতরেও আবার অবান্তর ভেদ থাকিতে পারে। এখন আমরা যে-বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা করিতেছি, সেই ভক্তি বা ভালবাসার কথাই ধরুন। একজনের প্রকৃতিতে সন্তানবাৎসল্য প্রবল, কাহারও বা স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা সমধিক, কাহারও মাতার প্রতি, কাহারও পিতার প্রতি, কাহারও বা বন্ধুর প্রতি অধিক ভালবাসা, কাহারও স্বদেশপ্রীতি অতিশয় প্রবল—আবার কিছু লোক জাতিধর্মদেশ-নির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতিকে ভালবাসিয়া থাকেন।

অবশ্য তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প। আর যদিও আমরা প্রত্যেকেই এমন ভাবে কথা বলি যেন মানবজাতির প্রতি নিঃস্বার্থ প্রেমই আমাদের প্রেরণাশক্তি, উহা দ্বারাই আমাদের জীবন চালিত হইতেছে, কিন্তু বর্তমান কালে সমগ্র

জগতের মধ্যে এরূপ ব্যক্তি একশতের বেশী আছেন বলিয়া বোধ হয় না। অল্প কয়েকজন মাত্র জ্ঞানীই এই মানবপ্রেম প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছেন। মানবজাতির মধ্যে অল্পসংখ্যক মহাত্মাই সর্বজনীন প্রেম প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া থাকেন, এবং আমার মতো লোক তাঁহাদের সেই ভাব লইয়া প্রচার করিয়া থাকে। জগতের সমুদয় মহৎ ভাবেরই পরিণাম এই। তবে আমরা আশা করি, জগৎ যেন কখন একেবারে এরূপ মহাপুরুষশূন্য না হয়।

যাহা হউক, পূর্ব প্রসঙ্গের অনুবৃত্তি করা যাক। আমরা দেখিতে পাই, একটি নির্দিষ্ট ভাবের চরমাবস্থায় যাইবার নানাবিধ উপায় আছে। সকল খ্রীষ্টানই খ্রীষ্টে বিশ্বাসী, কিন্তু বিভিন্ন সম্প্রদায় তাঁহার সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। প্রত্যেক চার্চ তাঁহাকে বিভিন্ন আলোকে বিভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে। প্রেসবিটেরিয়ানের দৃষ্টি খ্রীষ্টের জীবনের সেই অংশে নিবদ্ধ, যেখানে তিনি পোদ্দারদের মুদ্রা লেনদেন করিতে দেখিয়া 'তোমরা ভগবানের মন্দির কেন অপবিত্র করিতেছ?' বলিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। খ্রীষ্টকে তাঁহারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণকারিরূপে দেখিয়া থাকেন। কোয়েকারকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি হয়তো বলিবেন, 'খ্রীষ্ট শত্রুকে ক্ষমা করিয়াছিলেন।' কোয়েকার খ্রীষ্টের ঐ ভাবটি গ্রহণ করিয়া থাকেন। আবার যদি রোম্যান ক্যাথলিককে জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহার খ্রীষ্ট-জীবনের কোন্ অংশ খুব ভাল লাগে, তিনি হয়তো বলিবেন, 'যখন খ্রীষ্ট পিটরকে স্বর্গরাজ্যের চাবি দিয়াছিলেন।' প্রত্যেক সম্প্রদায়ই খ্রীষ্টকে নিজের ভাবে দেখিতে বাধ্য। অতএব দেখা যাইতেছে, একই বিষয়ে কত প্রকার বিভাগ ও অবান্তর বিভাগ আছে।

অজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই-সব অবান্তর বিভাগের একটিকে অবলম্বন করে এবং অপর সকল ব্যক্তির নিজ নিজ ধারণানুসারে জগৎ-সমস্যা ব্যাখ্যা করিবার অধিকার তাহারা শুধু যে অস্বীকার করে, তাহা নয়, আর সকলে একেবারে ভ্রান্ত এবং কেবল তাহারাই অভ্রান্ত, এই কথা বলিতেও তাহারা সাহস করে। যদি কেহ তাহাদের কথার প্রতিবাদ করে, অমনি তাহারা লড়াই করিতে অগ্রসর হয়। তাহারা বলে, যে কেহ আমাদের মত বিশ্বাস করিবে না, তাহাকেই মারিয়া ফেলিব। ইহারাই আবার মনে করে, আমরা অকপট, আর সকলেই ভ্রান্ত ও কপট।

কিন্তু আমরা এই ভক্তিযোগে কিরূপ দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করিব? অপরে ভ্রান্ত নয়, শুধু এইটুকু বলিয়াই আমরা ক্ষান্ত হইতে চাই না, আমরা সকলকেই বলিতে চাই, নিজ নিজ মনোমত পথে যাহারা চলিতেছে, তাহারা সকলেই ঠিক পথে চলিতেছে। নিজ প্রকৃতির একান্ত প্রয়োজনে আপনি যে পন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন, আপনার পক্ষে সেই পন্থাই ঠিক। আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই আমাদের অতীত অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি। হয় বলুন, উহা আমাদের পূর্বজন্মের কর্মফল, নয় বলুন পুরুষানুক্রমে আমরা ঐ প্রকৃতি পাইয়াছি। যে ভাবেই আপনারা উহা নির্দেশ করুন না কেন, এই অতীতের প্রভাব আমাদের মধ্যে যেরূপেই আসিয়া থাকুক না কেন, ইহা সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে, আমরা আমাদের অতীত অবস্থার ফলস্বরূপ। এই কারণেই আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে বিভিন্ন ভাব, প্রত্যেকের দেহমনের বিভিন্ন গতি দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং প্রত্যেককেই নিজ নিজ পথ বাছিয়া লইতে হইবে।

আমাদের প্রত্যেকেই যে বিশেষ পথের, যে বিশেষ সাধনপ্রণালীর উপযোগী, তাহাকেই 'ইষ্ট' বলে। ইহাই ইষ্টবিষয়ক মতবাদ, এবং আমাদের নিজস্ব সাধনপ্রণালীকে আমরা 'ইষ্ট' বলিয়া থাকি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোন ব্যক্তির ঈশ্বরসম্বন্ধীয় ধারণা—তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বশক্তিমান্ শাসনকর্তা। যাহার ঐরূপ ধারণা, তাহার স্বভাবই হয়তো ঐরূপ। হয়তো সে এক মহা অহঙ্কারী ব্যক্তি—সকলের উপর প্রভুত্ব করিতে চায়। সে যে ঈশ্বরকে একজন সর্বশক্তিমান্ শাসনকর্তা ভাবিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? আর একজন হয়তো বিদ্যালয়ের শিক্ষক—কঠোরপ্রকৃতি; সে ভগবান্‌কে ন্যায়পরায়ণ, শাস্তি-বিধাতা প্রভৃতি গুণান্বিত ছাড়া আর কিছু ভাবিতে পারে না। প্রত্যেকেই ঈশ্বরকে নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কল্পনা করে, এবং আমাদের প্রকৃতি অনুযায়ী আমরা ঈশ্বরকে যেরূপ দেখিয়া থাকি, তাহাকেই আমাদের 'ইষ্ট' বলি। আমরা নিজদিগকে এমন এক অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছি, যেখানে ঈশ্বরকে ঐরূপেই, কেবল ঐরূপেই দেখিতে পারি, অন্য কোনরূপে দেখিতে পারি না। আপনি যাঁহার নিকট শিক্ষা লাভ করেন, তাঁহার উপদেশকেই সর্বোৎকৃষ্ট ও উপযোগী বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু

আপনি হয়তো আপনার এক বন্ধুকে তাঁহার উপদেশ শুনিতে বলিবেন—সে শুনিয়া আসিয়া বলিল, উহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট উপদেশ সে আর কখন শুনে নাই। সে মিথ্যা বলে নাই, তাহার সহিত বিবাদ বৃথা। উপদেশ নির্ভুল ছিল, কিন্তু উহা সেই ব্যক্তির উপযোগী হয় নাই।

এই বিষয়টিই আর একটু বিস্তার করিয়া বলিলে বুঝা যাইবে—বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি হইতে কোন তত্ত্ব সত্য হইতে পারে, আবার একই কালে সত্য না হইতেও পারে। আপাততঃ এই কথা স্ববিরোধী বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে, শুধু নিরপেক্ষ সত্যই এক, কিন্তু আপেক্ষিক সত্য অবশ্যই নানাবিধ। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই জগতের কথাই ধরুন। এই জগদ্ব্রহ্মাণ্ড অখণ্ড নিরপেক্ষ সত্তা হিসাবে অপরিবর্তনীয়, অপরিবর্তিত, সর্বত্র সমভাবাপন্ন, কিন্তু আপনি, আমি—প্রত্যেকেই নিজ নিজ পৃথক্ জগৎ দেখি, শুনি ও অনুভব করি। অথবা সূর্যের কথা ধরুন। সূর্য এক, কিন্তু আপনি, আমি এবং অন্যান্য শত শত ব্যক্তি উহাকে বিভিন্ন স্থানে দাঁড়াইয়া বিভিন্ন অবস্থায় দেখি। একটু স্থানপরিবর্তন করিলে একই ব্যক্তি পূর্বে সূর্যকে যেরূপ দেখিয়াছিল, পরে আর এক রূপে দেখিবে। বায়ুমণ্ডলে সামান্য পরিবর্তন হইলে সূর্যকে আর এক রূপে দেখা যাইবে। সুতরাং বুঝা গেল, আপেক্ষিক সত্য সর্বদাই বিবিধরূপে প্রতীত হয়। নিরপেক্ষ সত্য কিন্তু এক ও অদ্বিতীয়। এইজন্য যখন দেখিবেন, ধর্মসম্বন্ধে কোন ব্যক্তি যাহা বলিতেছে, তাহার সহিত আপনার মত ঠিক মিলিতেছে না, তখন তাহার সহিত বিবাদ করিবার প্রয়োজন নাই। স্মরণ রাখিতে হইবে, আপাতবিরোধী বলিয়া মনে হইলেও উভয়ের মতই সত্য হইতে পারে। লক্ষ লক্ষ ব্যাসার্ধ এক সূর্যের কেন্দ্রাভিমুখে গিয়াছে। দুইটি ব্যাসার্ধ কেন্দ্র হইতে যত দূরে, তাহাদের দূরত্ব তত অধিক; কেন্দ্রের যত নিকটবর্তী হয়, তাহাদের দূরত্ব ততই কমিয়া যায়, সকল ব্যাসার্ধই কেন্দ্রে মিলিত হয়, তখন দূরত্ব একেবারে তিরোহিত হয়। এইরূপ একটি কেন্দ্রই মানবজাতির চরম লক্ষ্য। ঈশ্বরই ঐ কেন্দ্র এবং আমরা ব্যাসার্ধ। আমাদের প্রকৃতিগত বাধার মধ্য দিয়াই আমরা ভগবানের দর্শন পাইতে পারি। এই স্তরে দণ্ডায়মান হইয়া আমরা নিরপেক্ষ সত্যকে বিভিন্নভাবে দেখিতে বাধ্য। এই কারণে আমাদের সকলের দৃষ্টিভঙ্গিই সত্য, সুতরাং কাহারও সহিত বিবাদের প্রয়োজন নাই।

বিভিন্নতারূপ সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়—সেই কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হওয়া। আমাদের প্রত্যেকের মত বিভিন্ন। আমরা যদি তর্কযুক্তি বা বিবাদের দ্বারা আমাদের মতবিরোধের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে শত শত বর্ষেও আমরা কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইব না। ইতিহাসেই ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। ইহার একমাত্র সমাধান অগ্রসর হওয়া—আগাইয়া যত শীঘ্র উহা করিতে পারা যায়, তত শীঘ্র আমাদের বিরোধ বা বিভিন্নতা অন্তর্হিত হইবে।

অতএব ইষ্টনিষ্ঠার অর্থ প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজ নিজ ধর্ম নির্বাচন করিতে অধিকার দেওয়া। কেহই অপরকে তাহার নিজের উপাস্য পূজা করিতে বাধ্য করিবে না। আমি যাঁহার উপাসনা করি, আপনি তাঁহার উপাসনা করিতে পারেন না; অথবা আপনি যাঁহার উপাসনা করেন, আমি তাঁহার উপাসনা করিতে পারি না। ইহা অসম্ভব। সৈন্য, বলপ্রয়োগ বা যুক্তি দ্বারা মানুষকে দলবদ্ধ করিবার, বিশৃঙ্খলভাবে একই খোঁয়াড়ে পুরিবার এবং একই ভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে বাধ্য করার সকল চেষ্টা চিরকাল বিফল হইয়াছে ও হইবে। কারণ ইহা প্রকৃতির বিরুদ্ধে অসম্ভব চেষ্টা। শুধু তাই নয়, ইহাতে মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি ব্যাহত হইবার আশঙ্কা আছে। এমন নরনারী একটিও দেখিতে পাইবেন না, যে কোন এক প্রকার ধর্মের জন্য চেষ্টা না করিতেছে; কিন্তু কয়জন লোক তৃপ্ত হইয়াছে! অথবা খুব কম লোকই বাস্তবিক ধর্ম বলিয়া কিছু লাভ করিয়াছে! কেন?—কারণ অধিকাংশ লোক অসম্ভবকে সম্ভব করিবার চেষ্টা করিতেছে। অপরের হুকুমে জোর করিয়া তাহাকে একটা ধর্মপদ্ধতি অবলম্বন করানো হইয়াছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ: আমি যখন ছোট ছিলাম, আমার বাবা তখন একখানি ছোট বই আমার হাতে দিয়া বলিলেন—ঈশ্বর এই রকম, এই জিনিস এই রকম। আমার মনে ঐসব ভাব ঢুকাইয়া দিবার তাঁহার কি প্রয়োজন ছিল? আমি কি ভাবে উন্নতি লাভ করিব, তাহা তিনি কিরূপে জানিলেন? আমার প্রকৃতি অনুসারে আমি কিরূপে উন্নতি লাভ করিব; তাহার কিছু না জানিয়াই তিনি আমার মাথায় তাঁহার ভাবগুলি জোর করিয়া ঢুকাইয়া দিবার চেষ্টা করেন; আর তাহার ফল এই হয় যে, আমার উন্নতি বাধা প্রাপ্ত হয়। আপনারা একটি গাছকে উহার পক্ষে অনুপযোগী মৃত্তিকার উপর বসাইয়া কখন বড় করিতে

পারেন না। যে দিন আপনারা শূন্যের উপর বা প্রতিকূল মৃত্তিকায় গাছ জন্মাইতে সক্ষম হইবেন, সেই দিন আপনারা একটি ছেলের প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া জোর করিয়া তাহাকে আপনাদের ভাব শিখাইতে পারিবেন।

শিশু নিজে নিজেই শিখিয়া থাকে। তবে তাহাকে তাহার নিজের ভাবে উন্নতি করিতে আপনারা সাহায্য করিতে পারেন। সাক্ষাৎভাবে কিছু দিয়া আপনারা তাহাকে সাহায্য করিতে পারেন না, তাহার উন্নতির বিঘ্নগুলি দূর করিয়া পরোক্ষ ভাবে সাহায্য করিতে পারেন। নিজস্ব নিয়মানুসারেই জ্ঞান তাহার মধ্যে প্রকাশিত হইয়া থাকে। মাটিটা একটু খুঁড়িয়া দিন, যাহাতে অঙ্কুর সহজে বাহির হইতে পারে; চারিদিকে বেড়া দিয়া দিতে পারেন, যেন কোন জীব জন্তু চারাটি না খাইয়া ফেলে; এইটুকু দেখিতে পারেন যে, অতিরিক্ত হিমে বা বর্ষায় যেন উহা একেবারে নষ্ট হইয়া না যায়—ব্যস্, আপনার কাজ ঐখানেই শেষ। উহার বেশী আপনি আর কিছু করিতে পারেন না। বাকীটুকু অন্তর্নিহিত প্রকৃতির বহির্বিকাশ। শিশুর শিক্ষা সম্বন্ধেও এইরূপ। শিশু নিজে নিজেই শিক্ষা পায়। আপনারা আমার বক্তৃতা শুনিতে আসিয়াছেন; যাহা শিখিলেন, তাহা বাড়ি গিয়া নিজ মনের চিন্তা ও ভাবগুলির সহিত মিলাইয়া দেখুন; দেখিবেন, আপনারাও ঠিক সেই ভাবে চিন্তা করিয়াছেন; আমি সেইগুলি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছি মাত্র। আমি কোন কালে আপনাদিগকে কিছু শিখাইতে পারি না। আপনারা নিজেরাই নিজেদের শিখাইবেন—হয়তো আমি সেই চিন্তা, সেই ভাব স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়া আপনাদিগকে একটু সাহায্য করিতে পারি। ধর্ম-রাজ্যে এ-কথা আরও সত্য। নিজে নিজেই ধর্ম শিখিতে হইবে।

আমার মাথায় কতকগুলি বাজে ভাব ঢুকাইয়া দিবার কি অধিকার আমার পিতার আছে? শিক্ষকেরই বা এই-সব ভাব আমার মাথায় ঢুকাইয়া দিবার কি অধিকার আছে? এ-সব জিনিস আমার মাথায় ঢুকাইয়া দিবার কি অধিকার সমাজের আছে? হয়তো ওগুলি ভাল ভাব, কিন্তু ওগুলি আমার পথ না হইতে পারে। লক্ষ লক্ষ নিরীহ শিশুকে ভুলপথে শিক্ষা দিয়া নষ্ট করা হইতেছে—জগতে আজ কি ভয়াবহ অমঙ্গল রাজত্ব করিতেছে, ভাবুন দেখি! কত কত সুন্দর ভাব, যেগুলি অদ্ভুত আধ্যাত্মিক সত্য হইয়া দাঁড়াইত—সেগুলি বংশগত ধর্ম, সামাজিক ধর্ম, জাতীয় ধর্ম প্রভৃতি ভয়ানক

ধারণাগুলি যারা অঙ্কুরেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে! ভাবুন দেখি, এখনও আপনাদের মস্তিষ্কে আপনাদের শৈশবের ধর্ম, আপনাদের দেশের ধর্ম সম্বন্ধে কি রাশীকৃত কুসংস্কার রহিয়াছে! ভাবন দেখি, ঐ-সকল কুসংস্কার আপনাদের কত অনিষ্ট করিয়াছে! আপনারা আবার সেইগুলি দিয়া আপনাদের ছেলেমেয়েকে নষ্ট করিতে উদ্যত রহিয়াছেন। মানুষ অপরের কতটা অনিষ্ট করিয়া থাকে ও করিতে পারে, তাহা সে জানে না। জানে না—তা একরূপ ভালই বলিতে হইবে; কারণ একবার যদি সে তাহা বুঝিত, তবে তখনই আত্মহত্যা করিত। প্রত্যেক চিন্তা ও প্রত্যেক কাজের পিছনে কি প্রবল শক্তি রহিয়াছে, মানুষ তাহা জানে না। এ কথা অতি সত্য যে, 'দেবতারা যেখানে যাইতে সাহস করেন না, নির্বোধেরা সেদিকে বেগে আগাইয়া যায়।' গোড়া হইতেই এ-বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে। কিরূপে?—এই 'ইষ্টনিষ্ঠা' দ্বারা। নানাপ্রকার আদর্শ রহিয়াছে। আপনার কি আদর্শ হওয়া উচিত, এ সম্বন্ধে কিছু বলিবার কোন অধিকার আমার নাই—জোর করিয়া কোন আদর্শ আপনার উপর চাপাইয়া দিবার অধিকার আমার নাই। আমার কর্তব্য—আপনার সম্মুখে এই-সব আদর্শ তুলিয়া ধরা—যাহাতে আপনি বুঝিতে পারেন, কোন্‌টা আপনার ভাল লাগে, কোন্‌টা আপনার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী, এবং কোন্‌টা আপনার প্রকৃতিসঙ্গত। যেটি আপনার পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী, সেটি গ্রহণ করুন, এবং সেই আদর্শ লইয়া ধৈর্যের সহিত সাধন করুন। এটিই আপনার ইষ্ট, আপনার বিশেষ আদর্শ।

অতএব আমরা দেখিতেছি, দল বাঁধিয়া কখন ধর্ম হইতে পারে না ধর্মের প্রকৃত সাধনা প্রত্যেকের নিজের নিজের কাজ। আমার নিজের একটা ভাব আছে—পরম পবিত্র জ্ঞানে উহা আমাকে গোপন রাখিতে হইবে; কারণ আমি জানি, ওটি আপনার ভাব না হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ সকলকে আমার ভাব বলিয়া বেড়াইয়া তাহাদের অশান্তি উৎপাদন করিব কেন? তাহারা আসিয়া আমার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইবে। আমার ভাব তাহাদের নিকট প্রকাশ না করিলে তাহারা আমার সহিত বিবাদ করিতে পারিবে না, কিন্তু যদি আমার ভাব এইরূপে বলিয়া বেড়াই, তবে তাহারা সকলেই আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে। অতএব বলিয়া বেড়াইয়া ফল কি? এই ইষ্ট প্রত্যেকেরই

গোপন রাখা উচিত; উহা আপনি জানিবেন, এবং আপনার ভগবান্ জানিবেন। ধর্মের তাত্ত্বিক ভাব বা মতবাদগুলি সর্বসাধারণের নিকট প্রচার করা যাইতে পারে, সমবেত মণ্ডলীর নিকট প্রকাশ করা যাইতে পারে, কিন্তু উচ্চতর ধর্ম অর্থাৎ সাধন-রহস্য সর্বসাধারণের নিকট প্রচার করা যাইতে পারে না; কেহ বলা মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমি আমার ধর্মভাবগুলি জাগাইয়া তুলিতে পারি না।

সমবেতভাবে উপাসনারূপ এই হাস্যকর অনুষ্ঠানের ফলে হইতেছে কি? ইহা ধর্ম লইয়া উপহাস করা—ঘোরতম ঈশ্বরনিন্দা। আধুনিক গির্জাগুলিতে ইহার ফল প্রত্যক্ষ। মানবপ্রকৃতি কত আর এই নিয়মের ওঠ-বস সহ্য করিবে? এখনকার গির্জার ধর্ম সেনানিবাসে সৈন্যগণের কসরতের মতো হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বন্দুক কাঁধে তোল, হাঁটু গাড়ো, বই হাতে কর—সব ধরাবাঁধা। দু-মিনিট ভাব-ভক্তি, দু-মিনিট জ্ঞান-বিচার, দু-মিনিট প্রার্থনা—সব পূর্ব হইতেই ঠিক করা। এ অতি ভয়াবহ ব্যাপার—গোড়া হইতেই এ-বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে। এই-সব ধর্মের বিকৃত অনুকরণ ও হাস্যকর অনুষ্ঠান এখন আসল ধর্মকে বিতাড়িত করিয়া বসিয়া আছে; আর যদি কয়েক শতাব্দী ধরিয়া এইরূপ চলে, তবে ধর্ম একেবারে লোপ পাইবে। গির্জাগুলি যত খুশি মতামত, দার্শনিক তত্ত্ব প্রচার করুক, কিন্তু উপাসনার—আসল সাধনার সময় আসিলে যীশু যেমন বলিয়াছেন, সেরূপ করিতে হইবে। 'প্রার্থনার সময় তোমার নিভৃত কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ কর, এবং গোপনে বিরাজমান তোমার স্বর্গীয় পিতার নিকট প্রার্থনা কর।'

ইহাই ইষ্টনিষ্ঠা। প্রত্যেককে যদি নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী ধর্ম সাধন করিতে হয়, যদি অপরের সহিত বিবাদ এড়াইতে হয় এবং যদি আধ্যাত্মিক জীবনে যথার্থ উন্নতিলাভ করিতে হয়, তবে এই ইষ্টনিষ্ঠাই তাহার একমাত্র উপায়। কিন্তু আমি আপনাদের সাবধান করিয়া দিতেছি, আপনারা যেন আমার কথার এরূপ ভুল অর্থ বুঝিবেন না যে, আমি গুপ্তসমিতি-গঠন সমর্থন করিতেছি। যদি শয়তান কোথাও থাকে, তবে গুপ্তসমিতিগুলির ভিতরেই তাহাকে খুঁজিব। গুপ্তসমিতিগুলি পৈশাচিক পরিকল্পনা।

ইষ্ট পবিত্র ভাব, ইহা কিছু গুপ্ত ব্যাপার নয়; কিন্তু কি অর্থে? অন্যের নিকট নিজ ইষ্টের কথা কেন বলিব না? কারণ নিজের প্রাণের বস্তু বলিয়া

উহা পরম পবিত্র। উহার দ্বারা অপরের সাহায্য হইতে পারে, কিন্তু উহা দ্বারা যে অপরের অনিষ্ট হইবে না, তাহা জানিবে কি করিয়া? কোন ব্যক্তির প্রকৃতি এইরূপ হইতে পারে যে, সে ব্যক্তিভাবাপন্ন বা সগুণ ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারে না, সে কেবল নির্গুণ ঈশ্বরের—নিজ উচ্চতম স্বরূপের উপাসনা করিতে পারে। মনে করুন, আমি তাহাকে আপনাদের মধ্যে ছাড়িয়া দিলাম, এবং সে বলিতে লাগিল—একজন ব্যক্তিভাবাপন্ন বা সগুণ ঈশ্বর বলিয়া কিছু নাই, কিন্তু তুমি বা আমি সকলের মধ্যেই আত্মস্বরূপ একমাত্র ঈশ্বর আছেন। আপনারা ইহাতে প্রাণে আঘাত পাইবেন—চমকিয়া উঠিবেন। তাহার ঐ ভাব পরম পবিত্র বটে, কিন্তু উহা গোপন রহিল না।

কোন বড় ধর্ম বা শ্রেষ্ঠ আচার্য ঈশ্বরের সত্য প্রচারের জন্য কখনও গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠা করেন নাই। ভারতে এরূপ কোন গুপ্তসমিতি নাই, এগুলি পাশ্চাত্য ভাব—এখন ঐগুলি ভারতের উপর চাপাইবার চেষ্টা হইতেছে! আমরা এ-সব গুপ্তসমিতি সম্বন্ধে কোন কালে কিছু জানিতাম না, আর ভারতে এই গুপ্তসমিতি থাকিবার প্রয়োজনই বা কি? ইওরোপে কাহাকেও চার্চের মতের বিরোধী ধর্ম সম্বন্ধে একটি কথা বলিতে দেওয়া হইত না। সেই কারণে গরীব বেচারারা নিজেদের মনোমত উপাসনার জন্য পাহাড়ে জঙ্গলে লুকাইয়া গুপ্তসমিতি গঠন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ভারতে কিন্তু ধর্মবিষয়ে ভিন্ন মত অবলম্বন করার দরুন কখনও কাহার উপর অত্যাচার করা হয় নাই। কখনও গুপ্ত ধর্মসমিতি ছিল না, সুতরাং ঐরূপ কোন ধারণা আপনারা একেবারেই ছাড়িয়া দিবেন। ঐ-সব সমিতির ভিতর গলদ ঢুকিয়া অতি ভয়াবহ ব্যাপারে পরিণত হয়। এ পৃথিবীর যতটুকু আমি দেখিয়াছি, তাহাতে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে, তাহাতেই আমি জানি, এই-সব গুপ্তসমিতি কত অনিষ্টের মূল। কত সহজে এগুলি বাধাহীন প্রেমসমিতি ও ভুতুড়ে-সমিতি হইয়া দাঁড়ায়। অপর নরনারীর হাতের পুতুল হইয়া নিজেদের জীবনটা এবং ভবিষ্যতে তাহাদের মানসিক উন্নতির সম্ভাবনা একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে। এই-সব বলিতেছি বলিয়া আপনাদের মধ্যে কেহ কেহ আমার উপর অসন্তুষ্ট হইতে পারেন, কিন্তু আমাকে সত্য বলিতে হইবে। আমার সারা জীবনে হয়তো পাঁচ-সাত জন নরনারী আমার কথা শুনিয়া চলিবে—কিন্তু এই কয় জন যেন পবিত্র, অকপট ও খাঁটি হয়, আমি লোকের ভিড় চাই

না। কতকগুলি লোক জড়ো হইয়া কি করিবে? মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের দ্বারাই জগতের ইতিহাস রচিত হইয়াছে—অবশিষ্টগুলি তো উচ্ছৃঙ্খল জনতা। এই-সমস্ত গুপ্তসমিতি ও বুজরুকি নরনারীকে অপবিত্র, দুর্বল ও সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলে; এবং দুর্বল ব্যক্তিদের ইচ্ছাশক্তি নাই, সুতরাং তাহারা কখন কোন কাজ করিতে পারে না। অতএব গুপ্তসমিতিগুলির সংস্রবে থাকিবেন না। মনে ঐ-সব ভ্রান্ত রহস্যপ্রিয়তা উদিত হইবামাত্র একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিতে হইবে। যে এতটুকু অপবিত্র, সে কখনও ধার্মিক হইতে পারে না। একরাশ ফুল দিয়া পচা ঘাকে ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করিবেন না। আপনারা কি মনে করেন—ভগবান্‌কে ঠকাইতে পারিবেন? কেহই পারে না। আমি অকপট নরনারী চাই, ঈশ্বর আমাকে এই-সব ভূত, উড়ন্ত দেবদূত ও শয়তান হইতে রক্ষা করুন। সাদাসিদে সাধারণ মানুষ হউন।

অন্যান্য প্রাণীর মতো আমাদের ভিতরেও সহজাত সংস্কারগুলি—দেহের যে-সকল ক্রিয়া আমাদের অজ্ঞাতসারে আপনা-আপনি হইয়া যায়, সেইগুলি ইহার উদাহরণ। ইহা অপেক্ষা আরও এক উচ্চতর বৃত্তি আমাদের আছে—তাহাকে যুক্তি বা বিচারবুদ্ধি বলা যায়, এই বুদ্ধি নানা বিষয় গ্রহণ করিয়া সেইগুলি হইতেই একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। ইহা অপেক্ষা জ্ঞানের আর এক উচ্চতর অবস্থা আছে—তাহাকে প্রাতিভ-জ্ঞান বলে। উহাতে আর যুক্তিবিচারের প্রয়োজন হয় না, কিন্তু সহসা হৃদয়ে জ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে। ইহাই জ্ঞানের উচ্চতম অবস্থা। কিন্তু সহজাত সংস্কার হইতে ইহার প্রভেদ কিরূপে বুঝিতে পারা যায়? ইহাই মুশকিল। আজকাল প্রত্যেকেই আপনার নিকট আসিয়া বলিবে, আমি প্রাতিভ বা দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছি, এবং অতিলৌকিক দাবি উপস্থিত করে। তাহারা বলে, 'আমি দিব্যপ্রেরণা লাভ করিয়াছি—আমার জন্য একটা বেদী নির্মাণ করিয়া দাও, আমার কাছে আসিয়া সব জড়ো হও, আমার পূজা কর।'

দিব্যপ্রেরণা ও প্রতারণার মধ্যে পার্থক্য কিরূপে বুঝা যাইবে? প্রথমতঃ দিব্যজ্ঞান কখনও যুক্তিবিরোধী হইবে না। বৃদ্ধাবস্থা শৈশবের বিরোধী নয়, উহার বিকাশমাত্র। এইরূপে আমরা যাহাকে প্রাতিভ বা দিব্যজ্ঞান বলি, তাহা যুক্তিবিচারজনিত জ্ঞানের বিকাশমাত্র। যুক্তিবিচারের ভিতর দিয়াই দিব্যজ্ঞানে পৌছিতে হয়। দিব্যজ্ঞান কখনই যুক্তির বিরোধী হইবে না।

যদি হয়, তবে উহাকে টানিয়া দূরে ফেলিয়া দিন। আপনার অজ্ঞাতে দেহের স্বাভাবিক সহজাত গতিগুলি তো যুক্তির বিরোধিতা করে না। রাস্তা পার হইবার সময় যাহাতে গাড়ি চাপা না পড়িতে হয়, সেজন্য অজ্ঞাতসারে আপনার দেহের গতি কিরূপ হইয়া থাকে? আপনার মন কি বলে, দেহকে এরূপে রক্ষা করা নির্বোধের কাজ হইয়াছে? কখনই বলে না। প্রকৃত প্রেরণা কখনও যুক্তির বিরোধী হয় না। যদি হয়, তবে উহা প্রেরণা নয়, বুজরুকি। দ্বিতীয়তঃ এই দিব্যপ্রেরণা সকলের কল্যাণকর হওয়া চাই। নাম যশ বা ব্যক্তিগত লাভ যেন উহার উদ্দেশ্য না হয়। উহা দ্বারা সর্বদাই জগতের—সমগ্র মানবের কল্যাণই হইবে। দিব্যপ্রেরণা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হইবে। যদি এই লক্ষণগুলি মিলে, তবে অনায়াসে উহাকে প্রেরণা বা প্রাতিভ-জ্ঞান বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন। সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে, জগতের বর্তমান অবস্থায় দশ লক্ষের মধ্যে একজনেরও এই দিব্যজ্ঞান লাভ হয় কি না সন্দেহ। আমি আশা করি, এইরূপ লোকের সংখ্যা বর্ধিত হইবে, এবং আপনারা প্রত্যেকেই এইরূপ দিব্যপ্রেরণাসম্পন্ন হইবেন। এখন তো আমরা ধর্ম লইয়া ছেলেখেলা করিতেছি মাত্র, এই দিব্যপ্রেরণা হইলেই আমাদের যথার্থ ধর্ম আরম্ভ হইবে। সেন্ট পল যেমন বলিয়াছিলেন, 'এখন আমরা অস্বচ্ছ কাচের ভিতর দিয়া অস্পষ্টভাবে দেখিতেছি, কিন্তু তখন সামনা-সামনি দেখিব।' জগতের বর্তমান অবস্থায় এরূপ লোকের সংখ্যা অতি বিরল।)

কিন্তু এখন যেরূপ জগতে 'আমি দিব্যপ্রেরণা লাভ করিয়াছি' বলিয়া মিথ্যা দাবি শুনা যায়, এরূপ আর কখনই শুনা যায় নাই, এবং লোকে বলিয়া থাকে, মেয়েদের দিব্যপ্রেরণাশক্তি আছে এবং পুরুষেরা যুক্তিবিচারের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে উন্নত হয়। এ-সব বাজে কথায় বিশ্বাস করিবেন না। দিব্যপ্রেরণাসম্পন্না নারী যত আছে, ঐরূপ পুরুষও তত আছে। যদিও মেয়েদের এইটুকু বিশেষত্ব যে, তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ প্রকার মূর্ছা ও স্নায়ুরোগ বেশী। (জুয়াচোর ও ঠকের কাছে প্রতারিত হওয়া অপেক্ষা অবিশ্বাসী থাকিয়া মরাও ভাল।) ব্যবহার করিবার জন্য আপনাকে বিচারশক্তি দেওয়া হইয়াছে—দেখান, আপনি উহার যথার্থ ব্যবহার করিয়াছেন। ঐরূপ করিলে পর উহা অপেক্ষা উচ্চতর বিষয়ে হাত দিতে পারিবেন।

উহা সমগ্র জাতিকে হীনবীর্য করে, স্নায়ু ও মস্তিষ্ককে দুর্বল করে, সর্বদা একটা ভূত বা অদ্ভুত ব্যাপার দেখিবার পিপাসা বাড়াইয়া দেয়। এই-সব আজগুবি গল্প স্নায়ুমণ্ডলীকে অস্বাভাবিকভাবে বিকৃত করে। ইহাতে সমগ্র জাতি ধীরে অথচ নিশ্চিতরূপে হীনবীর্য হইয়া যায়।

আমাদিগকে সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ—তিনি এ-সব অদ্ভুত ব্যাপারের ভিতর নাই। 'উষিত্বা জাহ্নবীতীরে কূপং খনতি দুর্মতিঃ।'—সে মূর্খ, যে গঙ্গাতীরে বাস করিয়া জলের জন্য একটা কূপ খুঁড়িতে যায়। সে মূর্খ, যে হীরার খনির নিকট থাকিয়া কাচখণ্ডের অন্বেষণে জীবন অতিবাহিত করে। ঈশ্বরই সেই হীরক-খনি। আমরা ভূতের অথবা এইরূপ সমুদয় উড়ন্ত পরীর গল্পের প্রতি বৃথা আসক্ত হইয়া ভগবান্‌কে ত্যাগ করিতেছি—ইহা বাস্তবিক আমাদের মূর্খতা।

ঈশ্বর, পবিত্রতা, আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতি ছাড়িয়া এই-সব বৃথা বিষয়ের দিকে ধাবমান হওয়া অবনতির লক্ষণ! পরের মনের ভাব জানা! পাঁচ মিনিট করিয়া যদি আমাকে প্রত্যেকের মনের ভাব জানিতে হয়, তাহা হইলে তো আমি পাগল হইয়া যাইব। তেজস্বী হও, নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া প্রেমের ভগবান্‌কে অন্বেষণ কর। ইহাই শ্রেষ্ঠ শক্তি। পবিত্রতার শক্তি অপেক্ষা আর কোন্ শক্তি বড়? প্রেম ও পবিত্রতাই জগৎ শাসন করিতেছে। দুর্বল ব্যক্তি কখনও এই ভগবৎপ্রেম লাভ করিতে পারে না; অতএব শারীরিক, মানসিক, নৈতিক বা আধ্যাত্মিক—কোন দিক দিয়া দুর্বল হইবেন না। ঐসব ভুতুড়ে কাণ্ড কেবল আপনাকে দুর্বল করিয়া ফেলে; অতএব ঐগুলি পরিত্যাগ করিতে হইবে। ঈশ্বরই একমাত্র সত্য, আর সব অসত্য, অনিত্য। ঈশ্বরলাভের জন্য সমুদয় মিথ্যা ত্যাগ করিতে হইবে। 'অসার, অসার—সকলই অসার—শুধু ঈশ্বরকে ভালবাসা ও তাঁহার সেবা করা ছাড়া আর সবই বৃথা।'[১]

১ Imitation of Christ. Ch I.

গৌণী ও পরা ভক্তি*

দুই-একটি ছাড়া প্রায় সকল ধর্মেই ব্যক্তিভাবাপন্ন বা সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম ব্যতীত বোধ হয় জগতের সকল ধর্মেই সগুণ ঈশ্বরের ধারণা আছে এবং সগুণ ঈশ্বর মানিলেই সঙ্গে সঙ্গে ভক্তি ও উপাসনার ভাব আসিয়া থাকে। বৌদ্ধ ও জৈনেরা যদিও সগুণ ঈশ্বরের উপাসনা করে না, কিন্তু অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা যেভাবে সগুণ ঈশ্বরের উপাসনা করে, বৌদ্ধ ও জৈনেরাও ঠিক সেই ভাবে নিজ নিজ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতাগণের পূজা করিয়া থাকে। কোন উচ্চতর পুরুষকে ভালবাসিতে হয়, যিনি আবার মানুষকে ভালবাসিতে পারেন ; ভক্তি ও উপাসনা করিবার এই ভাব সর্বজনীন। নানাবিধ ধর্মের বিভিন্ন স্তরে এই ভক্তি ও উপাসনার ভাব বিভিন্ন পরিমাণে বিকশিত দেখিতে পাওয়া যায়। সাধনের নিম্নতম স্তর বাহ্য অনুষ্ঠান-বহুল—ঐ অবস্থায় সূক্ষ্ম ধারণা একরূপ অসম্ভব, সুতরাং মানুষ সূক্ষ্ম ভাবগুলিকে নিম্নতম স্তরে টানিয়া আনিয়া স্থূল আকারে পরিণত করিতে চায়। ঐ অবস্থাতেই নানাবিধ অনুষ্ঠান, ক্রিয়াপদ্ধতি এবং সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ প্রতীকও আসিয়া থাকে। জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় যে, মানুষ প্রতীক বা বিভিন্ন ভাবপ্রকাশক রূপের মাধ্যমে সূক্ষ্মকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। ধর্মের বাহ্য অঙ্গ ঘণ্টা, সঙ্গীত, শাস্ত্র, প্রতিমা, অনুষ্ঠান প্রভৃতি ঐ পর্যায়ভুক্ত। যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গুলির প্রীতিপ্রদ, যাহা কিছু অমূর্ত-ভাবকে মূর্ত করিবার সহায়তা করে, তাহাই মানুষ উপাসনার উদ্দেশ্যে কাজে লাগায়।

সময়ে সময়ে সকল ধর্মেই সংস্কারকগণ আবির্ভূত হইয়া সর্বপ্রকার অনুষ্ঠান ও প্রতীকের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে ; কারণ মানুষ যতদিন বর্তমান অবস্থায় থাকিবে, ততদিন অধিকাংশ মানবই এমন কিছু স্থূল মূর্ত বস্তু ধরিয়া থাকিতে চাহিবে, যাহা তাহাদের ভাবরাশির আধার হইতে পারে—এমন কিছু চাহিবে, যাহা তাহাদের অন্তরের

* নিউ ইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ার কনসার্ট হলে ১৮৯৬ খৃঃ ৯ই ফেব্রুআরি প্রদত্ত বক্তৃতা—Preparatory and Supreme Bhakti-র অনুবাদ।

ভাবময়ী মূর্তিগুলির কেন্দ্র হইবে। মুসলমান ও প্রোটেস্টাণ্টরা সর্বপ্রকার অনুষ্ঠানপদ্ধতি উঠাইয়া দিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহাদের প্রভূত চেষ্টা নিয়োজিত করিয়াছেন; কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, তাঁহাদের ভিতরেও অনুষ্ঠানপদ্ধতি ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়াছে। এগুলির প্রবেশ নিবারণ করা যায় না। অনুষ্ঠানপদ্ধতির বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রাম করিয়া জনসাধারণ একটি প্রতীকের পরিবর্তে অপর একটি গ্রহণ করে মাত্র। একজন মুসলমান অ-মুসলমানের ব্যবহৃত প্রতিটি অনুষ্ঠান, ক্রিয়াকলাপ ও মূর্তিকে পাপ বলিয়া মনে করে, কিন্তু তাহার নিজের কাবা-মন্দির সম্বন্ধে সে আর এ-কথা মনে করে না। প্রত্যেক ধার্মিক মুসলমানকে নমাজের সময় ভাবিতে হয় যে, সে কাবা-মন্দিরে রহিয়াছে; এবং সেখানে তীর্থ করিতে গেলে তাহাকে ঐ মন্দিরের দেয়ালে অবস্থিত 'কৃষ্ণপ্রস্তর'টিকে চুম্বন করিতে হয়। তাহার বিশ্বাস—ঐ কৃষ্ণপ্রস্তরে মুদ্রিত লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রীর চুম্বনচিহ্নগুলি বিশ্বাসিগণের কল্যাণের জন্য শেষ বিচারের দিনে সাক্ষ্য দিবে। তারপর আবার 'জিমজিম' কূপ রহিয়াছে। মুসলমানেরা বিশ্বাস করেন, ঐ কূপ হইতে যে-কেহ একটু জল তুলিবে, তাহারই পাপ ক্ষমা করা হইবে এবং সে পুনরুত্থানের পর নূতন দেহ পাইয়া অমর হইয়া থাকিবে।

অন্যান্য ধর্মে দেখিতে পাই, প্রতীক একটি গৃহের রূপ ধরিয়া প্রবেশ করিতেছে। প্রোটেস্টাণ্টদের মতে অন্যান্য স্থান অপেক্ষা গির্জা অধিকতর পবিত্র। তাহাদের পক্ষে এই গির্জা একটি প্রতীকমাত্র। তারপর আছে শাস্ত্রগ্রন্থ। অনেকের ধারণা অন্যান্য প্রতীক অপেক্ষা শাস্ত্র পবিত্রতর প্রতীক। ক্যাথলিকগণ যেমন সাধুগণের মূর্তি পূজা করে, প্রোটেস্টাণ্টরা তেমনি ক্রুশকে ভক্তি করে। প্রতীকোপাসনার বিরুদ্ধে প্রচার করা বৃথা, এবং কেনই বা আমরা উহার বিরুদ্ধে প্রচার করিব? মানুষ এই-সকল প্রতীকের উপাসনা করিতে পাইবে না, ইহার তো কোন যুক্তি নাই। প্রতীকের পিছনে উদ্দিষ্ট বস্তুর প্রতিনিধিরূপেই মানুষ ঐগুলি ব্যবহার করিয়া থাকে। এই বিশ্বই একটি প্রতীক—উহার মধ্য দিয়া, উহার সহায়তায় আমরা উহার অতীতে অবস্থিত—উহার দ্বারা লক্ষিত বস্তুকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছি। মানুষের নিম্নতর প্রকৃতিই এই—সে একেবারে জগৎকে অতিক্রম করিতে পারে না, সুতরাং তাহাকে বাধ্য হইয়া প্রতীক অবলম্বনের মাধ্যমে জগদতীত বস্তুকে ধরিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সত্য যে,

আমরা প্রতীকের লক্ষ্য বস্তুকে—জড়জগৎ অতিক্রম করিয়া সেই আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে ধরিবার জন্যই সর্বদা চেষ্টা করিতেছি। আমাদের চরম লক্ষ্য চৈতন্য—জড় নয়। ঘণ্টা, প্রদীপ, মূর্তি, শাস্ত্র, গির্জা, মন্দির, অনুষ্ঠান এবং অন্যান্য পবিত্র প্রতীক খুব ভাল বটে, ধর্মরূপ চারাগাছের বৃদ্ধির পক্ষে খুব সহায়ক বটে, কিন্তু ঐ পর্যন্ত; উহার বেশী আর কোন উপযোগিতা নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা দেখি, চারাগাছটি আর বড় হয় না! কোন একটি ধর্মসম্প্রদায়ের ভিতর জন্মানো ভাল, কিন্তু উহাতে সীমাবদ্ধ থাকিয়া মরা ভাল নয়। এমন সমাজে বা সম্প্রদায়ে জন্মানো ভাল, যাহার মধ্যে কতকগুলি নির্দিষ্ট সাধনপ্রণালী প্রচলিত; ঐগুলি ধর্মরূপ চারাগাছটিকে বড় হইতে সাহায্য করিবে। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি ঐ-সকল অনুষ্ঠানের মধ্যে নিবদ্ধ থাকিয়াই মরিয়া যায়, তবে নিশ্চয়ই প্রমাণিত হয় যে, তাহার উন্নতি হয় নাই, তাহার আত্মার বিকাশ হয় নাই।

অতএব যদি কেহ বলে, এই-সকল প্রতীক ও অনুষ্ঠান-পদ্ধতি চিরকালের জন্য রাখিতে হইবে, তবে সে ভ্রান্ত; কিন্তু যদি সে বলে, ঐগুলি সাধকের নিম্নতর অবস্থায় আত্মার উন্নতির সহায়ক, তবে সে ঠিক বলিতেছে। এখানে আমি আর একটি কথা বলিতে চাই যে, আত্মার উন্নতি বলিতে আপনারা যেন বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ বুঝিবেন না। কোন ব্যক্তির প্রভূত বুদ্ধি থাকিতে পারে, কিন্তু আধ্যাত্মিক বিষয়ে সে হয়তো শিশুমাত্র বা তদপেক্ষা নিকৃষ্ট। আপনারা এখনই ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। বুদ্ধির দিক দিয়া আপনারা সকলেই সর্বব্যাপী ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতে শিক্ষা পাইয়াছেন, কিন্তু 'সর্বব্যাপী' বলিতে কি বুঝায়, আপনাদের মধ্যে কয়জন ইহার সামান্য ধারণা করিতে পারেন? যদি খুব চেষ্টা করেন, তবে হয়তো আকাশ বা একটা বিরাট সবুজ প্রান্তর অথবা সমুদ্র বা মরুভূমির ভাব মনে আনিতে পারেন, অবশ্য যদি শেষের দুইটি আপনি দেখিয়া থাকেন। এগুলি সবই জড় প্রতিমূর্তি, এবং যত দিন না আপনারা সূক্ষ্মকে সূক্ষ্মরূপে, আদর্শকে আদর্শরূপে ভাবিতে পারেন, ততদিন এই-সকল জড়বস্তুর প্রতিমূর্তির সাহায্য আপনাদিগকে লইতেই হইবে। ঐ জড়মূর্তিগুলি আমাদের মনের ভিতরেই থাকুক অথবা বাহিরেই থাকুক, তাহাতে কিছু আসে যায় না। আপনারা সকলেই জন্মগতভাবে পৌত্তলিক; এবং পৌত্তলিকতা ভাল, কারণ উহা মানুষের প্রকৃতিগত। কে ইহা অতিক্রম করিতে পারে? কেবল সিদ্ধ ও দেব-মানবেরাই পারেন।

বাকী সকলেই পৌত্তলিক। যতদিন আপনারা এই বিভিন্ন রূপ ও আকার-বিশিষ্ট জগৎপ্রপঞ্চ দেখিতেছেন, ততদিন আপনারা পৌত্তলিক। আপনারা কি জগৎরূপ এই প্রকাণ্ড পুতুলের পূজা করিতেছেন না? যে বলে, আমি শরীর, সে তো জন্মগতভাবে পৌত্তলিক। আপনারা সকলেই আত্মা—নিরাকার আত্মস্বরূপ—অনন্ত চৈতন্যস্বরূপ; আপনারা কখনই জড় নন। অতএব যে-ব্যক্তি সূক্ষ্মধারণায় অসমর্থ, নিজেকে জড়বস্তু ও দেহ বলিয়া ভাবে, এবং সেরূপ না ভাবিয়া থাকিতে পারে না, যে নিজ স্বরূপচিন্তায় অসমর্থ, সেই পৌত্তলিক। তথাপি দেখুন, কেমন মানুষ পরস্পর বিবাদ করে, একজন আর একজনকে পৌত্তলিক বলিয়া গালি দেয়! অর্থাৎ প্রত্যেকে নিজ নিজ উপাস্য পুতুলকে ঠিক মনে করে এবং অপরের উপাস্য পুতুলকে ভ্রান্তমনে করে!

অতএব আমাদিগকে এই-সকল শিশুজনোচিত ধারণা হইতে নিজেদের মুক্ত করিতে হইবে, আমাদিগকে অজ্ঞজনোচিত বৃথা বাদানুবাদের উচ্চে উঠিতে হইবে। ইহাদের মতে ধর্ম কতকগুলি অসার কথার সমষ্টি মাত্র—কতকগুলি প্রণালীবদ্ধ মতবাদ, ইহাদের মতে ধর্ম কেবল কতকগুলি বিষয়ে বিচারবুদ্ধির সম্মতি বা অসম্মতি-প্রকাশ মাত্র, ইহাদের মতে ধর্ম পুরোহিতগণের কতকগুলি বাক্যে বিশ্বাস মাত্র, ইহাদের মতে ধর্ম পূর্বপুরুষগণের কয়েকটি বিশ্বাস-সমষ্টি, ইহাদের মতে ধর্ম কতকগুলি ধারণা ও কুসংস্কারের সমষ্টি—জাতীয় ও ধর্মীয় উত্তরাধিকার বলিয়াই তাহারা সেগুলি ধরিয়া আছে। আমাদিগকে এই-সব ভাবের ঊর্ধ্বে উঠিতে হইবে, দেখিতে হইবে—সমগ্র মানবজাতি যেন একটা প্রকাণ্ড প্রাণী, ধীরে ধীরে আলোকের অভিমুখে আবর্তিত হইতেছে; উহা যেন এক আশ্চর্য বৃক্ষশিশু, ধীরে ধীরে অভিব্যক্ত হইয়া এক অমূর্ত সত্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে, যে সত্যের নাম 'ঈশ্বর'। এবং উহার ঐ সত্যাভিমুখে প্রথম গতি—প্রথম ঘূর্ণন সর্বদা জড়ের মধ্য দিয়া, অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়াই হইয়া থাকে। ইহা এড়াইবার উপায় নাই।

এই-সকল অনুষ্ঠানের হৃদয়স্বরূপ এবং অন্যান্য বাহ্য ক্রিয়াকলাপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—নামোপাসনা। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা প্রাচীন খ্রীষ্টধর্ম ও পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা হয়তো লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, উহাদের ভিতর নামোপাসনা বলিয়া একটি অপূর্ব ভাব প্রচলিত। নাম অতিশয় পবিত্র বলিয়া পরিগণিত। বাইবেলে পড়িয়াছি—হিব্রুদের নিকট

ভগবানের নাম এত পবিত্র মনে করা হইত যে, যে-কেহ উহা উচ্চারণ করিতে পারিত না বা যে-কোন সময়ে উহা উচ্চারণ করা চলিত না, কিছুর সহিত উহার তুলনা হইতে পারে না। ভগবানের নাম পবিত্রতম এবং তাহাদের এই বিশ্বাস ছিল যে, ঐ নামই ঈশ্বর। ইহাও সত্য। বিশ্বজগৎ নামরূপ বই আর কি? আপনারা কি শব্দ ব্যতীত চিন্তা করিতে পারেন? শব্দ ও ভাবকে পৃথক্ করা যাইতে পারে না, উহারা অভিন্ন। চেষ্টা করুন, যদি কেহ এ-দুটিকে পৃথক্ করিতে পারেন! যখনই আপনারা চিন্তা করেন, তখনই শব্দ অবলম্বনে চিন্তা করেন। শব্দগুলি সূক্ষ্ম ভিতরের অংশ এবং ভাব বাহ্য অংশ; এ-দুটি সর্বদা একসঙ্গে আসিবে, ইহাদের পৃথক্ করা যায় না। একটি আর একটিকে লইয়া আসে। ভাব থাকিলেই শব্দ আসিবে, আবার শব্দ থাকিলেই ভাব আসিবে। সুতরাং সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড যেন ভগবানের বাহ্য প্রতীক-স্বরূপ, উহার পিছনে ভগবানের পুণ্য নাম রহিয়াছে। প্রত্যেক ব্যষ্টিদেহই রূপ এবং ঐ দেহবিশেষের পশ্চাতে উহার নাম রহিয়াছে। যখনই আপনি আপনার বন্ধু-বিশেষের বিষয় চিন্তা করেন, তখনই তাঁহার শরীরের কথা, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নামও আপনার মনে উদিত হয়। ইহা মানুষের প্রকৃতিগত ধর্ম। তাৎপর্য এই যে, মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখিলে বুঝা যায়, মানুষের চিত্তের মধ্যে রূপ-জ্ঞান ব্যতীত নাম-জ্ঞান আসিতে পারে না, এবং নাম-জ্ঞান ব্যতীত রূপ-জ্ঞান আসিতে পারে না। উহারা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। উহারা একই তরঙ্গের বাহিরের ও ভিতরের দিক্। এই কারণে সমগ্র জগতে নামের মহিমা ঘোষিত ও নামোপাসনা প্রচলিত দেখা যায়। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে মানুষ নামমাহাত্ম্য জানিতে পারিয়াছিল।

আবার আমরা দেখিতে পাই, অনেক ধর্মে সাধু-সন্ত মহাপুরুষগণের পূজা করা হয়। লোকে কৃষ্ণ বুদ্ধ যীশু প্রভৃতির পূজা করিয়া থাকে। আবার সাধুগণের পূজাও প্রচলিত আছে। সমগ্র জগতে শত শত সাধু-সন্তের পূজা হইয়া থাকে। না হইবেই বা কেন? আলোকের স্পন্দন সর্বত্র রহিয়াছে। পেচক অন্ধকারে দেখিতে পায়; তাহাতেই প্রমাণ হইতেছে, অন্ধকারেও আলো আছে, কিন্তু মানুষ তাহাতে আলো দেখিতে পায় না। ঐ আলোকের স্পন্দন একটা বিশেষ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে—যথা প্রদীপ, সূর্য ও চন্দ্র প্রভৃতিতে, মানুষের চক্ষুস্নায়ুতে আলোক অনুভূত হয়। ঈশ্বর সর্বব্যাপী, তিনি নিজেকে সকল

প্রাণীর ভিতর অভিব্যক্ত করিতেছেন, কিন্তু মানুষ তাঁহাকে মানুষের মধ্যে চিনিতে পারে। যখন তাঁহার আলোক, তাঁহার সত্তা, তাঁহার চৈতন্য মানুষের দিব্য মুখমণ্ডলে প্রকাশিত হয়, তখন—কেবল তখনই মানুষ তাঁহাকে বুঝিতে পারে। এইরূপে মানুষ চিরকালই মানুষের মধ্য দিয়া ভগবানের উপাসনা করিতেছে, এবং যতদিন সে মানুষ থাকিবে, ততদিন এইরূপই করিবে। মানুষ ইহার বিরুদ্ধে চীৎকার করিতে পারে, ইহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে পারে, কিন্তু যখনই সে ভগবান্‌কে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করে, সে বুঝিতে পারিবে ভগবান্‌কে মানুষরূপে চিন্তা করা মানুষের প্রকৃতিগত।

অতএব আমরা প্রায় সকল ধর্মেই ঈশ্বরোপাসনার তিনটি সোপান দেখিতে পাই—প্রতীক বা মূর্তি, নাম ও দেবমানব। সকল ধর্মেই এগুলি কোন না কোন আকারে আছে; তথাপি দেখিতে পাইবেন, মানুষ পরস্পর বিরোধ করিতে চায়। কেহ বলে, আমি যে-নাম সাধনা করিতেছি, তাহাই ঠিক নাম; আমি যে-রূপের উপাসক, তাহাই ভগবানের যথার্থ রূপ; আমি যে-সব দেব-মানব মানি, তাঁহারাই ঠিক; তোমার গুলি পৌরাণিক গল্পমাত্র। বর্তমান কালের খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজকগণ পূর্বাপেক্ষা একটু সদয় হইয়াছেন, কারণ তাঁহারা বলেন, প্রাচীন ধর্মগুলি খ্রীষ্টধর্মেরই পূর্বাভাস মাত্র। অবশ্য তাঁহাদের খ্রীষ্টধর্মই একমাত্র সত্য ধর্ম। প্রাচীনকালে বিভিন্ন ধর্ম সৃষ্টি করিয়া ঈশ্বর নিজের শক্তি পরীক্ষা করিতেছিলেন—শেষে খ্রীষ্টধর্মে সম্পূর্ণ আত্মপ্রকাশ করিতে সমর্থ হন। এ ভাব অন্ততঃ পূর্বের গোঁড়ামি অপেক্ষা অনেকটা ভাল। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে তাঁহারা এরূপ কথাও বলিতেন না, তাঁহাদের নিজ ধর্ম ছাড়া আর সব কিছু তাঁহারা তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। এ ভাব ধর্ম জাতি বা শ্রেণীবিশেষে সীমাবদ্ধ নয়। লোকে সর্বদাই ভাবে, তাহারা নিজেরা যাহা করিতেছে, অপরকেও তাহাই করিতে হইবে; এবং এখানেই বিভিন্ন ধর্মের আলোচনায় আমাদের উপকার হইয়া থাকে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, যে-ভাবগুলিকে আমরা আমাদের নিজস্ব, সম্পূর্ণ নিজস্ব বলিয়া মনে করিতেছিলাম, সেগুলি শত শত বর্ষ পূর্বে অন্যের ভিতর বর্তমান ছিল, সময়ে সময়ে বরং আমরা যেভাবে ঐগুলি ব্যক্ত করি, তাহা অপেক্ষা পরিস্ফুটভাবে ব্যক্ত ছিল।

ভক্তির এই-সকল বাহ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া মানুষকে অগ্রসর হইতে হয়; কিন্তু যদি সে অকপট হয়, যদি সে প্রকৃতপক্ষেই সত্যে পৌছিতে চায়, তবে

সে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর এক ভূমিতে উপনীত হয়, যেখানে বাহ্য অনুষ্ঠান-পদ্ধতির আর মূল্য থাকে না। মন্দির ও গির্জা, শাস্ত্র ও অনুষ্ঠান—এগুলি কেবল ধর্মের শিশুশিক্ষা মাত্র, যাহাতে প্রবর্তক—প্রাথমিক সাধক শক্ত সবল হইয়া ধর্মের উচ্চতর সোপান অবলম্বন করিতে পারে। আর যদি কেহ ধর্ম চায়, তবে এই প্রাথমিক সোপানগুলি একান্ত প্রয়োজন। ভগবানের জন্য আকাঙ্ক্ষা ও ব্যাকুলতা হইতেই যথার্থ ভক্তির উদয় হয়। কে তাঁহাকে চায়? ইহাই প্রশ্ন। ধর্ম—মতমতান্তরে নাই, তর্কযুক্তিতে নাই; ধর্ম—হওয়া; ধর্ম অপরোক্ষানুভূতি। আমরা দেখিতে পাই, সকলেই ঈশ্বর জীবাত্মা ও জগতের সর্বপ্রকার রহস্য সম্বন্ধে নানাপ্রকার কথা বলে, কিন্তু যদি তাহাদের প্রত্যেককে পৃথক্‌ভাবে জিজ্ঞাসা করেন—'তুমি কি ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিয়াছ? তুমি কি আত্মাকে দর্শন করিয়াছ?' কয়জন লোক সাহসের সহিত বলিতে পারে, 'করিয়াছি'? তথাপি তাহারা পরস্পর লড়াই করিতেছে!

একবার ভারতের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা সমবেত হইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইল। একজন বলিল, শিবই একমাত্র দেবতা; আর একজন বলিল, বিষ্ণুই একমাত্র দেবতা। পরস্পরের এইরূপ তর্কবিচার চলিতে লাগিল, কিছুতেই আর তর্কের বিরাম হয় না। সেই স্থান দিয়া এক মুনি যাইতেছিলেন, তাহারা তাঁহাকে ঐ প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিতে আহ্বান করিল। তিনি প্রথমে শৈবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি শিবকে দেখিয়াছ? তোমার সঙ্গে কি তাঁহার পরিচয় আছে? যদি না থাকে, তবে কিরূপে জানিলে, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা?' তারপর তিনি বৈষ্ণবকেও ঐ প্রশ্ন করিলেন, 'তুমি কি বিষ্ণুকে দেখিয়াছ?' সকলকে ঐ প্রশ্ন করিয়া জানা গেল, ঈশ্বর সম্বন্ধে কেহই কিছু জানে না, এবং সেইজন্যই তাহারা অত বিবাদ করিতেছিল; যদি তাহারা সত্য সত্য ঈশ্বরকে জানিত, তবে আর তাহারা তর্ক করিত না। শূন্য কলসী জলে ডুবাইলে শব্দ হইতে থাকে, কিন্তু পূর্ণ হইয়া গেলে আর কোন শব্দ হয় না। অতএব বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতর বিবাদ-বিসংবাদ দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, তাহারা ধর্মের কিছুই জানে না; ধর্ম তাহাদের নিকট পুস্তকে লিপিবদ্ধ করার জন্য কতকগুলি বাজে কথামাত্র। সকলেই তাড়াতাড়ি এক একখানা বড় পুস্তক লিখিতে ব্যস্ত—উহার কলেবর যতদূর সম্ভব বড় করিতে হইবে, সেজন্য যেখান হইতে পারে চুরি করিয়া পুস্তকের কলেবর বাড়াইতে

থাকে, অথচ কাহারও নিকট ঋণ স্বীকার করে না। তারপর তাহারা উহা প্রকাশ করিয়া পৃথিবীতে যে গণ্ডগোল পূর্ব হইতেই রহিয়াছে, তাহা আরও বাড়াইয়া তুলে।

সংসারের অধিকাংশ লোকই নাস্তিক। বর্তমান কালে পাশ্চাত্য জগতে আর এক প্রকার নাস্তিকের—জড়বাদীদের অভ্যুদয়ে আমি আনন্দিত। ইহারা অকপট নাস্তিক। ইহারা কপট ধর্মবাদী নাস্তিক অপেক্ষা ভাল। ধর্মবাদী নাস্তিকেরা ধর্মের কথা বলে, ধর্ম লইয়া বিবাদ করে, কিন্তু কখন ধর্ম চায় না—ধর্ম বুঝিবার বা সাক্ষাৎ করিবার চেষ্টা করে না। যীশুখ্রীষ্টের সেই বাক্যগুলি স্মরণ করুন, 'চাহিলেই তোমাকে দেওয়া হইবে, অনুসন্ধান করিলেই পাইবে, করাঘাত করিলেই দ্বার খুলিয়া যাইবে।' এই কথাগুলি উপন্যাস রূপক বা কল্পনা নয়, এগুলি বর্ণে বর্ণে সত্য। জগতে যে-সকল ঈশ্বরাবতার মহাপুরুষ আসিয়াছেন, তাঁহাদেরই হৃদয় হইতে উৎসারিত ঐ কথাগুলি কোন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া বলা নয়। ঐগুলি প্রত্যক্ষানুভূতির ফল—ঐগুলি এমন একজনের কথা, যিনি ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছিলেন—ভগবানের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন, ভগবানের সহিত একত্র বাস করিয়াছিলেন; আপনি আমি এই বাড়িটাকে যেরূপ প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, তাহা অপেক্ষা শতগুণ স্পষ্টভাবে তিনি ভগবানকে দর্শন করিয়াছিলেন। ভগবান্‌কে চায় কে?—ইহাই প্রশ্ন। আপনারা কি মনে করেন, দুনিয়াসুদ্ধ লোক ভগবান্‌কে চাহিয়াও পাইতেছে না? তাহা কখনই হইতে পারে না। মানুষের এমন কি অভাব আছে, যাহা পূরণ করিবার উপযোগী বস্তু বাহিরে নাই। মানুষ নিঃশ্বাস নিতে চায়—তাহার জন্য বায়ু আছে। মানুষ খাইতে চায়—সেজন্য খাদ্য রহিয়াছে। কোথা হইতে এই-সব বাসনার উৎপত্তি? বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব হইতে। আলোকই চক্ষু উৎপন্ন করিয়াছে, শব্দ হইতেই কর্ণ হইয়াছে। এইরূপ মানুষের মধ্যে যে-কোন বাসনা আছে, তাহাই পূর্ব হইতে অবস্থিত কোন বাহ্যবস্তু হইতে সৃষ্ট হইয়াছে; পূর্ণত্বলাভের, সেই চরম লক্ষ্যে পৌছিবার, প্রকৃতির পারে যাইবার ইচ্ছা কোথা হইতে আসিল, যদি না কেহ উহা আমাদের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিয়া থাকে? অতএব যাঁহার ভিতর এই আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে, তিনিই সেই চরম লক্ষ্যে পৌছিবেন। কিন্তু কাহার এই আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে? আমরা ভগবান্ ছাড়া আর সব কিছুই চাই। আপনারা সমাজে

যাহা দেখিতে পান, উহাকে ধর্ম বলা যায় না। 'আমাদের গৃহিণীর সমগ্র পৃথিবী হইতে সংগৃহীত নানাবিধ আসবাব আছে, কিন্তু এখন ফ্যাশন জাপানী কোন জিনিস ঘরে রাখা, তাই তিনি একটা জাপানী ফুলদানি কিনিয়া ঘরে রাখিলেন'—অধিকাংশ লোকের পক্ষে ধর্মও এইরূপ। ভোগের জন্য তাহাদের সর্বপ্রকার বস্তু রহিয়াছে, কিন্তু ধর্মের একটু চাটনি তার সঙ্গে না থাকায় জীবনটা যেন ঠিকভাবে চলিতেছে না। সমাজে সমালোচনা হইবে, সেই জন্যই একটু-আধটু ধর্ম চাই। আজকাল পৃথিবীতে ধর্মের এই অবস্থা।

এক শিষ্য তাহার গুরুর নিকটে গিয়া বলিল, 'গুরুদেব, আমি ধর্মলাভ করিতে চাই।' গুরু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, কোন কথা না বলিয়া শুধু একটু হাসিলেন। শিষ্য প্রত্যহ আসিয়া তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিয়া বলিত, 'আমাকে ধর্মলাভের উপায় করিয়া দিন।' গুরু অবশ্য এ বিষয়ে শিষ্য অপেক্ষা যথেষ্ট ভাল বুঝিতেন। একদিন খুব গরমের সময় তিনি সেই যুবককে সঙ্গে লইয়া নদীতে স্নান করিতে গেলেন। যুবকটি জলে ডুব দিবামাত্র গুরু তাহার পিছনে পিছনে যাইয়া তাহাকে জলের নীচে জোর করিয়া চাপিয়া ধরিলেন। যুবক জল হইতে উঠিবার জন্য অনেকক্ষণ ধস্তাধস্তি করিলে গুরু তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'যখন জলের ভিতর ছিলে, তখন তোমার সর্বাপেক্ষা কিসের অভাব বোধ হইতেছিল?' শিষ্য উত্তর করিল, 'নিঃশ্বাসের জন্য বায়ুর অভাবে প্রাণ যায় যায় হইয়াছিল।' তখন গুরু বলিলেন, 'ভগবানের জন্য কি তোমার ঐরূপ অভাব বোধ হইয়াছে? যদি হইয়া থাকে, তবে এক মুহূর্তেই তুমি তাঁহাকে পাইবে।' যতদিন না ধর্মের জন্য আপনাদের ঐরূপ ব্যাকুলতা ও তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিতেছে, ততদিন যতই তর্ক বিচার করুন, যতই পড়ুন, যতই বাহ্য অনুষ্ঠান করুন, কিছুতেই কিছু হইবে না। যতদিন না হৃদয়ে এই ধর্মপিপাসা জাগিতেছে, ততদিন নাস্তিক অপেক্ষা আপনি কিছুমাত্র উন্নত নন। নাস্তিক বরং অকপট, আপনি তা নন।

একজন মহাপুরুষ বলিতেন, 'মনে কর, এ ঘরে একটা চোর রহিয়াছে; সে কোনরূপে জানিতে পারিয়াছে যে, পাশের ঘরে একতাল সোনা আছে, এবং ঐ দুইটি ঘরের মধ্যে আছে একটি খুব পাতলা দেওয়াল। এরূপ অবস্থায় ঐ চোরের কিরূপ অবস্থা হইবে? তাহার ঘুম হইবে না, সে খাইতে পারিবে

না, সে কিছুই করিতে পারিবে না—কেবল কিরূপে ঐ সোনার তাল সংগ্রহ করিবে, সেইদিকে তাহার মন পড়িয়া থাকিবে। সে কেবল ভাবিবে, কিরূপে ঐ দেয়াল ছিদ্র করিয়া সোনার তালটা লইবে। তোমরা কি বলিতে চাও, যদি মানুষ যথার্থ বিশ্বাস করিত যে, সুখ আনন্দ ও মহিমার খনি স্বয়ং ভগবান্ এখানে রহিয়াছেন, তাহা হইলে তাহারা তাঁহাকে লাভ করিবার চেষ্টা না করিয়া সাধারণভাবে সাংসারিক কাজ করিতে সমর্থ হইত?' যখনই মানুষ বিশ্বাস করে যে, ভগবান্ বলিয়া একজন কেহ আছেন, তখনই সে তাঁহাকে পাইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় পাগল হইয়া উঠে। অপরে নিজ নিজ ভাবে জীবন-যাপন করিতে পারে, কিন্তু যখনই কেহ নিশ্চিতরূপে জানিতে পারে যে, সে যেভাবে জীবনযাপন করিতেছে, তাহা অপেক্ষা অনেক উচ্চতর এক জীবন আছে; যখনই সে নিশ্চিতরূপে জানিতে পারে যে, ইন্দ্রিয়গুলিই মানুষের সর্বস্ব নয়; যখনই সে বুঝিতে পারে যে, আত্মার অবিনাশী নিত্য অক্ষয় আনন্দের তুলনায় এই সীমাবদ্ধ জড়দেহ কিছুই নয়, তখনই সে নিজে সেই আনন্দ লাভ না করা পর্যন্ত পাগলের মতো উহারই অনুসন্ধান করে। এই উন্মত্ততা, এই তৃষ্ণা এই ঝোঁককে ধর্মজীবনের 'জাগরণ' বলে; যখনই মানুষের এই অবস্থা হয়, তখনই তাহার আধ্যাত্মিক জীবন শুরু হইয়াছে।

কিন্তু এরূপ হইতে অনেক দিন লাগে। এই-সব অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, প্রার্থনা, তীর্থপর্যটন, শাস্ত্রাদি, কাঁসর-ঘণ্টা, প্রদীপ-পুরোহিত ঐ অবস্থার জন্য প্রস্তুতি। ঐগুলি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। আর যখনই চিত্ত শুদ্ধ হইয়া যায়, তখনই উহা স্বভাবতই উহার মূলকারণ, সমুদয় বিশুদ্ধির আকর স্বয়ং ঈশ্বরকে লাভ করিতে চায়। শত শত যুগের ধূলি-আচ্ছাদিত লৌহখণ্ড চুম্বকের নিকট পড়িয়া থাকিলেও তাহা দ্বারা আকৃষ্ট হয় না, কিন্তু কোন উপায়ে ঐ ধূলি অপসারিত হইলে আবার উহার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপে জীবাত্মাও শত শত যুগের অপবিত্রতা, দুর্বৃত্ততা ও পাপের ধূলিজালে আবৃত রহিয়াছে। এই-সব ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান করিয়া, পরের কল্যাণসাধন করিয়া, পরকে ভালবাসিয়া অনেক জন্মের পরে যখন সে যথেষ্ট পবিত্র হয়, তখন তাহার স্বাভাবিক আধ্যাত্মিকতা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। সে তখন জাগরিত হইয়া ভগবান্‌কে লাভ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে থাকে।

কিন্তু এই-সকল অনুষ্ঠান, প্রতীকোপাসনা প্রভৃতি ধর্মের আরম্ভ মাত্র, এগুলিকে যথার্থ ঈশ্বরপ্রেম বলা যাইতে পারে না। প্রেমের কথা আমরা সর্বত্র শুনিয়া থাকি। সকলেই বলে, ভগবান্‌কে ভালবাসো, কিন্তু ভালবাসা কাহাকে বলে, তাহা কেহ জানে না। যদি জানিত, তবে যখন তখন হালকাভাবে ভালবাসার কথা বলিত না। প্রত্যেকে বলে, সে ভালবাসিতে পারে, কিন্তু পাচ মিনিটেই বুঝিতে পারে, তাহার প্রকৃতিতে ভালবাসা নাই। প্রত্যেকটি নারীই বলিয়া থাকেন, তিনি ভালবাসিতে পারেন; কিন্তু তিন মিনিটেই বুঝিতে পারেন যে, তিনি ভালবাসিতে পারেন না। এই সংসার ভালবাসার কথায় পূর্ণ, কিন্তু ভালবাসা বড় কঠিন। কোথায় ভালবাসা? ভালবাসা যে আছে, তাহা জানিবে কিরূপে? ভালবাসার প্রথম লক্ষণ এই যে, উহাতে আদানপ্রদান বা লাভক্ষতির প্রশ্ন নাই। কিছু পাইবার জন্য যখন একজন অপরকে ভালবাসে, জানিবেন ইহা ভালবাসা নয়, দোকানদারি মাত্র। যেখানে কেনাবেচার কথা, সেখানে আর ভালবাসা নাই। অতএব যখন কেহ 'ইহা দাও, উহা দাও' বলিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে, জানিবেন—তাহা ভালবাসা নয়। কি করিয়া হইবে? আমি তোমাকে আমার প্রার্থনা স্তবস্তুতি উপহার দিলাম, তুমি তাহার পরিবর্তে আমাকে কিছু দাও—ইহা তো দোকানদারি মাত্র।

এক রাজা বনে শিকার করিতে গিয়াছিলেন, সেখানে জনৈক সাধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। সাধুর সহিত কিছুক্ষণ আলাপ করিয়া রাজা এত খুশী হইলেন যে, তিনি সাধুকে তাঁহার নিকট হইতে কিছু উপহার গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সাধু বলিলেন, 'না, আমি নিজের অবস্থায় খুব সন্তুষ্ট আছি। এই-সব বৃক্ষ হইতে খাইবার জন্য যথেষ্ট ফল পাই, এই-সব সুন্দর পবিত্র নদী হইতে প্রয়োজনমত জল পাই, এই-সব গুহায় নিদ্রা যাই। যদিও তুমি রাজা, তথাপি তোমার প্রদত্ত উপহার আমি গ্রাহ্য করি না।' রাজা বলিলেন, 'শুধু আমাকে পবিত্র করিবার জন্য, আমাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য আমার নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করুন এবং অনুগ্রহপূর্বক একবার আমার রাজধানীতে আসুন।' অনেক পীড়াপীড়ির পর অবশেষে সাধু রাজার সহিত যাইতে স্বীকৃত হইলেন। সাধুকে প্রাসাদে লইয়া যাওয়া হইল, সেখানে চতুর্দিকে সোনা, হীরা, মণিমাণিক্য, জহরত এবং আরও অনেক অদ্ভুত বস্তু

ছিল। চারিদিকে ঐশ্বর্য-বৈভবের চিহ্ন। রাজা বলিলেন, 'আপনি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, আমি প্রার্থনা শেষ করিয়া আসিতেছি।' এই বলিয়া তিনি গৃহের এক কোণে গিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, 'প্রভো, আমাকে আরও অধিক ঐশ্বর্য দাও, আরও সন্তানসন্ততি দাও, রাজ্য দাও।' ইতিমধ্যে সাধু উঠিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া রাজা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া বলিলেন, 'দাঁড়ান, আমার উপহার গ্রহণ না করিয়াই চলিয়া যাইতেছেন?' তখন সাধু তাঁহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'ভিক্ষুক, আমি ভিক্ষুকের নিকট ভিক্ষা করি না। তুমি আর কি দিতে পারো? তুমি নিজেই সর্বদা ভিক্ষা করিতেছ!' ঐরূপ প্রার্থনা প্রেমের ভাষা নয়। যদি ভগবানের নিকট ইহা উহা প্রার্থনা কর, তবে প্রেমে ও দোকানদারিতে প্রভেদ কি? সুতরাং প্রেমের প্রথম লক্ষণ এই—উহাতে কোনরূপ আদান-প্রদান নাই, প্রেম সর্বদা দিয়াই যায়। প্রেম চিরকালই দাতা—গ্রহীতা নয়। ভগবানের প্রকৃত সন্তান বলেন, 'ভগবান্ যদি চান, তবে আমি তাঁহাকে আমার সর্বস্ব দিতে পারি, কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে আমি কিছুই চাই না, এই জগতের কোন জিনিসই আমি চাই না। তাঁহাকে ভালবাসিতে চাই বলিয়াই আমি তাঁহাকে ভালবাসি, পরিবর্তে তাঁহার নিকট কোন অনুগ্রহ ভিক্ষা করি না। কে জানিতে চায়—ঈশ্বর সর্বশক্তিমান্ কি না? আমি তাঁহার নিকট হইতে কোন শক্তিও চাই না এবং তাঁহার শক্তির কোন প্রকাশও দেখিতে চাই না। তিনি প্রেমের ভগবান্—এটুকু জানিলেই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আমি আর কিছু জানিতে চাই না।'

প্রেমের দ্বিতীয় লক্ষণ প্রেমে কোনরূপ ভয় নাই। প্রেমে কি কোন ভয় থাকিতে পারে? মেষশিশু কি কখন সিংহকে ভালবাসে? না—মূষিক বিড়ালকে? না—দাস প্রভুকে ভালবাসে? ক্রীতদাসগণ সময়ে সময়ে ভালবাসার ভান করিয়া থাকে বটে, কিন্তু বাস্তবিক উহা কি ভালবাসা? ভয়ের মধ্যে ভালবাসা কোথায় দেখিয়াছেন? উহা ভান মাত্র বুঝিতে হইবে। যতদিন মানুষ ভগবান্‌কে মেঘের উপর আসীন, এক হাতে পুরস্কার ও অপর হাতে দণ্ড দিতেছেন বলিয়া চিন্তা করে, ততদিন কোন ভালবাসা সম্ভব নয়। ভালবাসার সহিত কখনও ভয়ের ভাব থাকিবে না। ভাবিয়া দেখুন—একজন তরুণী জননী রাস্তায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন এবং একটা কুকুর তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া চীৎকার

করিতেছে—অমনি তিনি সামনের বাড়িতে আশ্রয় লইলেন। মনে করুন, পরদিনও তিনি রাস্তায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন—সঙ্গে তাঁহার শিশুসন্তান। মনে করুন, একটা সিংহ আসিয়া শিশুটিকে আক্রমণ করিল ; তখন তিনি কোথায় থাকিবেন, বলুন দেখি ? তখন তাঁহার শিশুকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি সিংহের মুখেই যাইবেন। এখানে প্রেম ভয়কে জয় করিয়াছে। ভগবৎপ্রেম সম্বন্ধেও এইরূপ। ভগবান্ পুরস্কারদাতা না দণ্ডদাতা—ইহা লইয়া কে মাথা ঘামায় ? প্রকৃত প্রেমিক কখনও এভাবে চিন্তা করে না। একজন বিচারপতির কথা ধরুন—তিনি যখন গৃহে ফিরিয়া আসেন, তখন তাঁহার পত্নী তাঁহাকে কিভাবে দেখেন ? পত্নী তাঁহাকে বিচারপতি বা পুরস্কারদাতা বা শাস্তিদাতারূপে দেখেন না—তাঁহাকে স্বামী বলিয়া, প্রেমাস্পদ বলিয়াই দেখেন। তাঁহার মেয়ে তাঁহাকে কি ভাবে দেখে ? স্নেহময় পিতা বলিয়াই দেখে, পুরস্কারদাতা বা শাস্তিদাতা বলিয়া দেখে না। এইরূপে ভগবানের সন্তানরাও কখন ভগবান্‌কে পুরস্কারদাতা বা দণ্ডবিধাতা বলিয়া দেখেন না। বাহিরের লোক—যাহারা তাঁহার প্রেমের আস্বাদ কখনও পায় নাই, তাহারাই তাঁহাকে ভয় করে এবং তাঁহার ভয়ে সর্বদা কাঁপিতে থাকে। এ-সব ভয়ের ভাব পরিত্যাগ করুন। ভগবান্ পুরস্কারদাতা বা দণ্ডদাতা, এ-সব ভাব ভয়াবহ ; যাহারা বর্বর-প্রকৃতি, তাহাদের পক্ষে হয়তো এগুলির কিছু উপযোগিতা থাকিতে পারে। অনেক লোক—খুব বুদ্ধিমান্ লোকও ধর্মজগতে বর্বরতুল্য, সুতরাং এ ভাবগুলিতে তাহাদিগের উপকার হইতে পারে। কিন্তু যে-সকল ব্যক্তি আধ্যাত্মিক রাজ্যে অগ্রসর, যাঁহাদের যথার্থ ধর্মভাব জাগরিত হইয়াছে, যাঁহাদের আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছে, তাঁহাদের পক্ষে ও-সব ভাব শুধু ছেলেমানুষি, বোকামি। এইরূপ ব্যক্তিগণ সর্বপ্রকার ভয়ের ভাব পরিত্যাগ করেন।

প্রেমের তৃতীয় লক্ষণ আরও উচ্চতর। প্রেম সর্বদাই উচ্চতম আদর্শ। যখন মানুষ এই দুই সোপান অতিক্রম করে, যখন সে দোকানদারি ও ভয়ের ভাব ছাড়িয়া দেয়, তখন সে উপলব্ধি করিতে থাকে যে, প্রেমই সর্বদা আমাদের উচ্চতম আদর্শ ছিল। আমরা এই জগতে কতই তো দেখিতে পাই, পরমা সুন্দরী অতি কুৎসিত পুরুষকে ভালবাসিতেছে ! আবার অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, সুন্দর পুরুষ এক অতি কুৎসিতা নারীকে ভালবাসিতেছে ! সেখানে কিসের আকর্ষণ ? বাহিরের লোক তাহাদের মধ্যে কুৎসিত নারী বা পুরুষকেই

দেখিতে পায়—প্রেমিককে দেখিতে পায় না, কখন তাহা দেখিবে না। প্রেমিকের চক্ষে প্রেমাস্পদের তুল্য পরম সুন্দর আর কেহ নাই। কিরূপে ইহা হয়? যে নারী কুৎসিত পুরুষকে ভালবাসে, সে তাহার নিজ মনের মধ্যে সৌন্দর্যের যে আদর্শ আছে, তাহাই লইয়া যেন ঐ কুৎসিত পুরুষের উপর প্রক্ষেপ করে, সে যে ঐ কুৎসিত পুরুষকে পূজা করিতেছে ও ভালবাসিতেছে তাহা নয়, সে তাহার নিজ আদর্শেরই পূজা করিতেছে। সেই পুরুষটি যেন উপলক্ষ্যমাত্র, এবং সেই উপলক্ষ্যের উপর সে তাহার নিজ আদর্শ প্রক্ষেপ করিয়া তাহাকে আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে এবং উহাই তাহার উপাস্য বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যেখানেই ভালবাসা, সেখানেই এ-কথা খাটে। ভাবিয়া দেখুন, আমাদের অনেকেরই ভাই-ভগিনী দেখিতে খুবই সাধারণ, কিন্তু আমাদের ভাই-ভগিনী বলিয়াই তাহারা আমাদের নিকট পরম সুন্দর।

এই-সব ব্যাপারের দার্শনিক ব্যাখ্যা এই যে, প্রত্যেকেই নিজ আদর্শ বাহিরে প্রক্ষেপ করিয়া তাহারই উপাসনা করে। এই বহির্জগৎ উপলক্ষ্য মাত্র। আমরা যাহা কিছু দেখি, তাহা আমাদেরই মন হইতে বাহিরে প্রক্ষেপ করি মাত্র। একটা শুক্তির খোলার ভিতর একটু বালুকণা প্রবেশ করিয়া তাহার ভিতর একটা উত্তেজনা সৃষ্টি করে। তাহার ফলে শুক্তি হইতে রস নির্গত হইয়া তৎক্ষণাৎ বালুকণাকে আবৃত করে। এইরূপে সুন্দর মুক্তা উৎপন্ন হয়। আমরাও ঠিক তাই করিতেছি। বহির্জগতের বস্তুসকল বালুকণার মতো আমাদের চিন্তার উপলক্ষ্য মাত্র—ঐগুলির উপর আমরা আমাদের নিজেদের ভাব আরোপ করিয়া বাহ্যবস্তুগুলি সৃষ্টি করিতেছি। মন্দ লোকেরা এই জগৎটাকে ঘোর নরকরূপে দেখে, ভাল লোকেরা ইহাকেই পরম স্বর্গ মনে করে। এই জগৎকে প্রেমিকেরা প্রেমপূর্ণ এবং দ্বেষপরায়ণ ব্যক্তিগণ দ্বেষপূর্ণ বলিয়া মনে করে। বিবাদপরায়ণ ব্যক্তিগণ জগতে বিবাদ-বিরোধ ছাড়া আর কিছু দেখিতে পায় না, এবং শান্তিপ্রিয় ব্যক্তিগণ শান্তি ছাড়া আর কিছু দেখিতে পান না। যিনি পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি ইহাতে ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই দর্শন করেন না। সুতরাং আমরা সর্বদাই আমাদের উচ্চতম আদর্শের উপাসনা করিয়া থাকি, এবং যখন আমরা এমন এক অবস্থায় উপনীত হই, যে অবস্থায় আদর্শকে আদর্শরূপেই উপাসনা করিতে পারি, তখন আমাদের তর্কযুক্তি ও সন্দেহ সব চলিয়া যায়। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ

করা যাইতে পারে কি না, এ-কথা লইয়া কে মাথা ঘামায়? আদর্শ তো কখন নষ্ট হইতে পারে না, কারণ উহা আমার প্রকৃতির অংশস্বরূপ। যখন আমি নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করি, শুধু তখনই ঐ আদর্শ সম্বন্ধে সন্দেহ করি, এবং যেহেতু আমি আমার অস্তিত্ব সন্দেহ করিতে পারি না, অতএব ঈশ্বরের অস্তিত্ব-বিষয়ে প্রশ্ন করিতে পারি না। আমার বাহিরে কোন স্থানে অবস্থিত, খেয়াল অনুযায়ী জগৎশাসনকারী, কয়েকদিন সৃষ্টি করার পর অবশিষ্ট কাল নিদ্রাগত এক ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিজ্ঞান প্রমাণ করিতে পারুক বা না পারুক, ইহা লইয়া কে মাথা ঘামায়? ঈশ্বর একাধারে সর্বশক্তিমান্ ও পূর্ণ-দয়াময় হইতে পারেন কি না, ইহা লইয়া কে মাথা ঘামায়? ভগবান্ মানুষের পুরস্কারদাতা কি না, এবং তিনি আমাদিগকে স্বেচ্ছাচারীর চোখে অথবা দয়াশীল সম্রাটের দৃষ্টিতে দেখেন, তাহা লইয়া কে মাথা ঘামায়? প্রেমিক এই ভাব অতিক্রম করিয়াছেন, তিনি এই-সব শাস্তির, ভয়-সন্দেহের এবং বৈজ্ঞানিক বা অন্য কোন প্রমাণের বাহিরে গিয়াছেন। তাঁহার পক্ষে প্রেমের আদর্শই যথেষ্ট, এবং এই জগৎ যে এই প্রেমেরই প্রকাশস্বরূপ—ইহা কি স্বতঃসিদ্ধ নয়?

(কোন্ শক্তিবলে অণু অণুর সহিত, পরমাণু পরমাণুর সহিত মিলিত হইতেছে, গ্রহ উপগ্রহ পরস্পরের দিকে আবর্তিত হইতেছে। কোন্ শক্তি নরকে নারীর প্রতি, নারীকে নরের প্রতি, মানুষকে মানুষের প্রতি, জীবজন্তুদের পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করিতেছে—যেন সমুদয় জগৎকে এক কেন্দ্রাভিমুখে আকর্ষণ করিতেছে? ইহাকেই প্রেম বলে। ক্ষুদ্রতম পরমাণু হইতে উচ্চতম প্রাণী পর্যন্ত আব্রহ্মস্তম্ব এই প্রেমের প্রকাশ—এই প্রেম সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান্। চেতন-অচেতন, ব্যষ্টি-সমষ্টি—সকলের মধ্যেই এই ভগবৎপ্রেম আকর্ষণী শক্তিরূপে বিরাজ করিতেছে। জগতের মধ্যে প্রেমই একমাত্র প্রেরণা-শক্তি। এই প্রেমের প্রেরণাতেই খ্রীষ্ট সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রাণ দিয়াছিলেন, বুদ্ধ একটি ছাগশিশুর জন্যও প্রাণ দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; ইহার প্রেরণাতেই মাতা সন্তানের জন্য এবং পতি পত্নীর জন্য প্রাণ বিসর্জন করিতে পারে। এই প্রেমের প্রেরণাতেই মানুষ স্বদেশের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়; আর আশ্চর্যের কথা, সেই একই প্রেমের প্রেরণায় চোর চুরি করে, হত্যাকারী হত্যা করে; কারণ এই-সবের মূলেও ঐ প্রেম, যদিও তাহার প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন। ইহাই জগতে একমাত্র প্রেরণা-শক্তি। চোরের

প্রেম টাকার উপর—প্রেম তাহার ভিতর রহিয়াছে, কিন্তু উহা বিপথে চালিত হইয়াছে। এইরূপে সর্বপ্রকার পাপকর্ম ও সমুদয় পুণ্য—সব কিছুর পশ্চাতেই সেই অনন্ত শাশ্বত প্রেম বিদ্যমান। মনে করুন, একজন একই ঘরে বসিয়া নিউ ইয়র্কের গরীবদের জন্য হাজার ডলারের একখানি চেক লিখিয়া দিলেন, এবং ঠিক সেই সময়েই আর একজন তাহার বন্ধুর নাম জাল করিল। এক আলোতেই দুই জন লিখিতেছে, কিন্তু যে যেভাবে আলো ব্যবহার করিতেছে, সে সেইজন্য দায়ী হইবে—আলোর কোন দোষ-গুণ নাই। এই প্রেম সর্ববস্তুতে প্রকাশিত অথচ নির্লিপ্ত, ইহাই সমগ্র জগতের প্রেরণা-শক্তি—ইহার অভাবে জগৎ মুহূর্তমধ্যে নষ্ট হইয়া যাইবে, এবং এই প্রেমই ঈশ্বর।

কেহই পতির জন্য পতিকে ভালবাসে না, পতির মধ্যে যে আত্মা আছেন, তাঁহার জন্যই পতিকে ভালবাসে; কেহই পত্নীর জন্য পত্নীকে ভালবাসে না, পত্নীর মধ্যে যে আত্মা আছেন, তাঁহার জন্যই পত্নীকে ভালবাসে; কেহই কোন বস্তুর জন্য সেই বস্তুকে ভালবাসে না, আত্মার জন্যই সেই বস্তুকে ভালবাসে।[১] এমন কি, অতি নিন্দিত এই স্বার্থপরতা, তাহাও সেই প্রেমেরই প্রকাশ। এই খেলা হইতে সরিয়া দাঁড়ান, ইহাতে মিশিয়া যাইবেন না, শুধু এই অদ্ভুত দৃশ্যাবলী—দৃশ্যের পর দৃশ্য অভিনীত এই বিচিত্র নাটক দেখিয়া যান, এবং এই অপূর্ব ঐকতান শ্রবণ করুন—সবই সেই এক প্রেমের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র—ঘোর স্বার্থপরতার মধ্যেও আত্মা বা 'অহং' ভাব ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। সেই এক 'অহং'—একটি মানুষ বিবাহিত হইলে দুইটি হইবে, সন্তানাদি হইলে কয়েকটি হইবে; এইরূপে তাহার 'অহং'-এর বিস্তৃতি হইতে থাকে; গ্রাম, নগর অবশেষে সমগ্র জগৎ তাহার আত্মস্বরূপ হইয়া যায়। শেষ পর্যন্ত সেই আত্মা সকল নরনারী, সকল শিশু, সকল জীবজন্তু, সমগ্র বিশ্বকে নিজের মধ্যে মিলিত করে, উহা ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়া এক সর্বজনীন প্রেমে—অনন্ত প্রেমে পরিণত হইবে, এবং এই প্রেমই ঈশ্বর।

এইরূপে আমরা পরা ভক্তিতে উপনীত হই—এই অবস্থায় অনুষ্ঠান ও প্রতীকাদির আর কোন প্রয়োজন থাকে না। যিনি ঐ অবস্থায় পৌঁছিয়াছেন, তিনি আর কোন সম্প্রদায়ভুক্ত হইতে পারেন না, কারণ সকল সম্প্রদায়ই

১ বৃহ. উপ., ২।৪।৫

তাঁহার মধ্যে রহিয়াছে। তিনি আর কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত হইবেন? সকল গির্জা-মন্দিরাদি তো তাহার ভিতরেই রহিয়াছে। এত বড় গির্জা কোথায়, যাহা তাঁহার পক্ষে পর্যাপ্ত হইতে পারে? এরূপ ব্যক্তি নিজেকে কতকগুলি নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন না। যে অসীম প্রেমের সহিত তিনি এক হইয়া গিয়াছেন, তাহার কি আর সীমা আছে? যে-সকল ধর্ম এই প্রেমের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে, সেই-সব ধর্মে প্রেমকে বিভিন্ন ভাবে ব্যক্ত করিবার চেষ্টা দেখা যায়। যদিও আমরা জানি এই প্রেম বলিতে কি বুঝায়, যদিও আমরা জানি—এই বিভিন্ন আসক্তি- ও আকর্ষণ-পূর্ণ জগতে সবই সেই অনন্ত প্রেমের আংশিক বা অন্যপ্রকার প্রকাশ মাত্র, তথাপি আমরা সর্বদা উহা কথায় প্রকাশ করিতে পারি না। বিভিন্ন দেশের সাধুমহাপুরুষগণ উহা ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা দেখিতে পাই, তাঁহারা ঐ প্রেমের তাৎপর্য এতটুকু প্রকাশ করিবার জন্যও ভাষার ভাণ্ডার তন্ন তন্ন করিয়া সন্ধান করিয়াছেন—এমন কি অতিশয় ইন্দ্রিয়গত শব্দগুলি পর্যন্ত দিব্যভাবে রূপান্তরিত করিয়া তাঁহারা ব্যবহার করিয়াছেন।

হিব্রু রাজর্ষি[১] এবং ভারতীয় মহাপুরুষগণও এইভাবে ঐ প্রেমের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন: 'হে প্রিয়তম, তুমি যাহাকে একবার চুম্বন করিয়াছ, তোমার দ্বারা একবার চুম্বিত হইলে তোমার জন্য তাহার পিপাসা ক্রমাগত বাড়িতে থাকে। তখন সকল দুঃখ দূর হয় এবং সে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সব ভুলিয়া কেবল তোমারই চিন্তা করিতে থাকে।'[২] ইহাই প্রেমিকের উন্মত্ত অবস্থা—এই অবস্থায় সব বাসনা লুপ্ত হইয়া যায়। প্রেমিক বলেন—মুক্তি কে চায়? কে মুক্ত হইতে চায়? এমন কি, কে পূর্ণত্ব বা নির্বাণপদের অভিলাষ করে?

'আমি ধন চাই না, আমি স্বাস্থ্যও প্রার্থনা করি না, আমি রূপযৌবনও চাই না, আমি তীক্ষ্ণবুদ্ধিও কামনা করি না—এই সংসারে সমুদয় অশুভের মধ্যেও আমার পুনঃ পুনঃ জন্ম হউক—আমি তাহাতে কিছুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করিব না, কিন্তু তোমার প্রতি আমার যেন অহেতুক প্রেম থাকে।'[৩] এই প্রেমের উন্মত্ততাই পূর্বোক্ত সঙ্গীতগুলিতে ব্যক্ত হইয়াছে। মানবীয় প্রেমের মধ্যে স্ত্রী-

---

১ দ্রষ্টব্য: সলোমনের গীত (The Song of Solomon—Old Test.)

২ শ্রীমদ্ভাগবত, ১০।৩১।১৪,

৩ শিক্ষাষ্টকম্, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

পুরুষের প্রেমই সর্বোচ্চ, স্পষ্টভাবে ব্যক্ত, প্রবলতম ও অতিশয় মনোহর। এই কারণে ভগবৎপ্রেমের বর্ণনায় সাধকেরা এই প্রেমের ভাষাই ব্যবহার করিয়াছেন। এই মানবীয় প্রেমের মত্ততা সাধুমহাপুরুষগণের উন্মত্ত ঈশ্বরপ্রেমের ক্ষীণতম প্রতিধ্বনি মাত্র। যথার্থ ভগবৎপ্রেমিকগণ ঈশ্বরের প্রেমমদিরা পান করিয়া উন্মত্ত হইতে চান—তাঁহারা 'ভগবৎপ্রেমে উন্মত্ত' হইতে চান। সকল ধর্মের সাধুমহাপুরুষগণ যে প্রেমমদিরা প্রস্তুত করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহারা নিজেদের হৃদয়-শোণিত মিশ্রিত করিয়াছেন, যাহার উপর নিষ্কাম ভক্তগণের সমগ্র মনপ্রাণ নিবদ্ধ, তাঁহারা সেই প্রেমের পেয়ালা পান করিতে চান। তাঁহারা এই প্রেম ছাড়া আর কিছুই চান না—প্রেমই প্রেমের একমাত্র পুরস্কার, এবং কি অপূর্ব এই পুরস্কার! ইহাই একমাত্র বস্তু, যাহা দ্বারা সকল দুঃখ দূরীভূত হয়; ইহাই একমাত্র পানপাত্র, যাহা পান করিলে ভবব্যাধি অন্তর্হিত হয়, তখন মানুষ ঈশ্বরপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া যায় এবং ভুলিয়া যায় যে, সে মানুষ।

শেষে আমরা দেখিতে পাই—বিভিন্ন সাধনপ্রণালী পরিণামে পূর্ণ একত্বরূপ এক কেন্দ্রের অভিমুখী। আমরা চিরকালই দ্বৈতবাদিরূপে সাধন আরম্ভ করি—ঈশ্বর ও আমি সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু। দুইয়ের মধ্যে প্রেম আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন মানুষ ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, ভগবান্‌ও যেন মানুষের দিকে আসিতে থাকেন। পিতা, মাতা, সখা, প্রেমিক প্রভৃতির ভাব মানুষ ভগবানের উপর আরোপ করে এবং যখনই সে তাহার উপাস্য বস্তুর সহিত অভিন্ন হইয়া যায়, তখনই চরমাবস্থা লাভ করে। তখন আমিই তুমি ও তুমিই আমি হইয়া যায়! দেখা যায়, তোমাকে উপাসনা করিলে আমারই উপাসনা করা হয়, আর আমাকে উপাসনা করিলে তোমারই উপাসনা করি। সেই অবস্থায় পৌছিলেই মানুষ—যে-অবস্থা হইতে তাহার জীবন বা উন্নতি আরম্ভ করিয়াছিল, তাহারই সর্বোচ্চ পরিণতি দেখিতে পায়। মানুষ যেখান হইতে আরম্ভ করে, শেষও সেইখানেই করিয়া থাকে। প্রথমে ছিল আত্মপ্রেম, কিন্তু আত্মাকে ক্ষুদ্র 'অহং' বলিয়া ভ্রম হওয়াতে ভালবাসাও স্বার্থপর ছিল। পরিণামে যখন আত্মা অনন্তস্বরূপ হইয়া গেল, তখনই পূর্ণ আলোক প্রকাশ পাইল। যে ঈশ্বরকে প্রথমে কোন এক স্থানে অবস্থিত পুরুষবিশেষ মনে হইত, তিনিই তখন যেন অনন্তপ্রেমে পরিণত

হইলেন। সাধক নিজেই তখন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া যান, ঈশ্বর-সামীপ্য লাভ করিতে থাকেন, পূর্বে তাঁহার যে-সব বৃথা বাসনা ছিল, তখন তিনি সেগুলি পরিত্যাগ করিতে থাকেন। বাসনা দূর হইলেই স্বার্থপরতা দূর হয়, এবং প্রেমের চরমশিখরে আরোহণ করিয়া সাধক দেখিতে পান—প্রেম, প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ—এক ও অভিন্ন।

দেববাণী

নিবেদন

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় ক্রমাগত বক্তৃতার পর বক্তৃতা-দানে ক্লান্ত হইয়া কয়েক সপ্তাহের জন্য নিউ ইয়র্ক হইতে কিয়দ্দূরবর্তী সহস্রদ্বীপোদ্যান (Thousand Island Park) নামক স্থানে নির্জনবাস করেন। কয়েকজন আমেরিকাবাসী তাঁহার উপদেশে এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা ঐ সুযোগে সদাসর্বদা তাঁহার নিকট বাস করিয়া বিশেষভাবে সাধন-ভজন শিক্ষা কারতে আরম্ভ করেন। স্বামীজী তথায় প্রতিদিন প্রাতে যে-সকল উপদেশ দিতেন, তাহার কিছু কিছু তাঁহার জনৈক শিষ্যা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেইগুলি একত্র সংগৃহীত হইয়া ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠ হইতে 'Inspired Talks' নামে প্রকাশিত হয়। বর্তমান পুস্তকখানি উহারই বঙ্গানুবাদ।

ইতি অনুবাদকস্য

ইংরেজী প্রথম সংস্করণের ভূমিকা হইতে

স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য যাঁহাদের হইয়াছিল, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, শুধু বক্তৃতামঞ্চে বক্তারূপে স্বামীজীকে জানিয়া তাঁহার যথার্থ শক্তি ও মহত্ত্বের অতি সামান্য পরিচয়ই তাঁহারা পাইয়াছেন। অন্তরঙ্গ বন্ধু ও শিষ্যদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ কথাবার্তাতেই তাঁহার জ্ঞানালোকের অপূর্ব স্ফুরণ, বাগ্মিতার শ্রেষ্ঠ বিকাশ এবং গভীরতম প্রজ্ঞার অভিব্যক্তি হইত। দুর্ভাগ্যক্রমে অদ্যাবধি মুদ্রিত স্বামীজীর গ্রন্থাবলীতে তিনি আমাদের নিকট শুধু বক্তারূপেই ধরা দিয়াছেন। যে অল্প কয়েকজন ভাগ্যবান্ ব্যক্তি বিবেকানন্দের চরণে বসিয়া শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, শুধু তাঁহারাই তাঁহাকে বন্ধু, আচার্য ও স্নেহময় গুরুরূপে জানিতে পারিয়াছেন। ইহা সত্য যে, তাঁহার প্রকাশিত পত্রাবলীতে আধ্যাত্মিক মহাশক্তির এই দিকটার আভাস পাওয়া যায়; কিন্তু অন্তরঙ্গ অনুরাগী ও শিষ্যদের সান্নিধ্যে (দিব্যভাবে) তিনি যে-সকল কথা বলিয়াছিলেন, সে-গুলি এই প্রথম বর্তমান গ্রন্থে প্রকাশিত হইল।

স্বামীজীর এই কথাগুলি নিউ ইয়র্কের মিস এস. ই. ওয়াল্ডো লিখিয়া রাখেন। মিস ওয়াল্ডো স্বামীজীর আমেরিকায় বক্তৃতা-সফরের প্রথম দিক হইতেই তাঁহাকে অফুরন্ত ভক্তির সহিত সেবা করিয়াছেন।…মিস ওয়াল্ডো নিজেই বলিয়াছেন, স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তারাশি যেন তাঁহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া লিপিবদ্ধ হইত।…একদিন মিস ওয়াল্ডো থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে কয়েকজন নবাগতের নিকট স্বামীজীর বক্তৃতার কিছু নোট পড়িয়া শুনাইতেছিলেন, স্বামীজী ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে করিতে উহা শুনিতে পাইলেন, কিন্তু ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলেন না। নবাগত ব্যক্তিগণ চলিয়া গেলে ওয়াল্ডোকে বলিয়াছিলেন, 'তুমি কিরূপে আমার চিন্তা ও কথাগুলি এমন নিখুঁতভাবে ধরিতে পারিলে? মনে হইতেছিল, আমি নিজের কথাই নিজে শুনিতেছিলাম।'

দেবমাতা

নভেম্বর, ১৯০৮

ইংরেজী দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা হইতে

…বর্তমানকালে সারা পৃথিবীতে স্বামীজী সর্বাপেক্ষা শক্তিমান্ ও শ্রেষ্ঠ বেদান্ত-ব্যাখ্যাতা বলিয়া পরিচিত। ভারতে ও বিদেশে অনেকেই তাঁহার বাগ্মিতার দুর্বার মনোহারিত্ব অনুভব করিয়াছেন। বর্তমান গ্রন্থে স্বামীজী ঝঞ্ঝার মতো বাগ্মিতার সহিত তাঁহার অকাট্য যুক্তি, মনোমুগ্ধকর ব্যক্তিত্ব, অতিশয় নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করিবার দুর্লভ শক্তি দ্বারা বিশাল শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয় জয় করিবার জন্য কোন বক্তৃতামঞ্চে দণ্ডায়মান হন নাই; তিনি বসিয়াছিলেন কয়েকজন বাছা-বাছা ভক্ত-শিষ্যের সম্মুখে, যাঁহারা তাঁহাকে অজ্ঞান ও দুঃখের পারে লইয়া যাইবার একমাত্র পথপ্রদর্শকরূপে দেখিতে শুরু করিয়াছেন। সেখানে স্বামীজী বসিয়াছিলেন স্বকীয় দেদীপ্যমান উপলব্ধির মহিমায়, মধুর ও সুকণ্ঠ স্বরে নিজের অন্তর্জ্যোতির শান্ত কিরণরাশি ভক্ত-অনুরাগীদের মধ্যে বিকিরণ করিয়া এবং তাঁহাদের হৃদয়-পদ্ম ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত করিয়া। তাঁহার চারিদিকে বিরাজ করিত শান্তি। যে-কয়েকজন ভাগ্যবান্ শিষ্য এরূপ মহান্ ঋষি ও গুরুর পাদমূলে বসিবার দুর্লভ অধিকার পাইয়াছিলেন, তাঁহারা বাস্তবিকই ধন্য।

বাগ্মী বিবেকানন্দ সেখানে ঝঞ্ঝার মতো আলোড়ন সৃষ্টি করিয়া সকলের হৃদয় জয় করেন নাই। প্রশান্ত ঋষির মতো কয়েকজন যথার্থ অনুরাগী ভক্তের নিকট তিনি শান্তি ও আনন্দের বাণী বিতরণ করিতেছেন। তাঁহার শ্রীমুখের মধুর বাণীগুলি কী আলোকপ্রদ ও সান্ত্বনাদায়ক! মনে হয়—যেন হাস্যময়ী ও মৃদুমন্দ সমীরণ-সঞ্চারিণী ঊষা রক্তিম পূর্বাকাশের ক্রোড় হইতে আবির্ভূত হইয়া অন্ধকার দূর করিতেছে। স্বামীজীর বাণীগুলিতে যদি কয়েকজনের প্রাণে সান্ত্বনা দিবার শক্তি নিহিত থাকে, তবে ঐগুলি সকলের হৃদয়েই শান্তি দিবে। সেই প্রিয় শিষ্যার মাতৃ-হৃদয় ধন্য হউক, যিনি স্বামীজীর ত্রাণকারিণী বাণীগুলি কালগর্ভে বিলুপ্তির হাত হইতে সযত্নে রক্ষা করিয়াছেন। বর্তমান গ্রন্থে লিপিবদ্ধ স্বামীজীর (Inspired Talks) 'দেববাণী'র জন্য মাতা হরিদাসীর (মিস এস. এলেন ওয়াল্ডো) নিকট সমগ্র জগৎ ঋণী। এই বাণীগুলি অপেক্ষা আর কিছুই মানবজাতির নিকট অধিক

হিতকর বন্ধু ও মহত্তর পথপ্রদর্শক হইতে পারে না। যে-কেহ বাণীগুলিতে নিহিত অমৃত পান করিবে, সে-ই নিশ্চয় জানিবে যে, সে অমর। যে-কেহ জ্ঞানালোক, শান্তি ও আনন্দ পাইতে চায়, সে-ই বাণীগুলিতে তাহা পাইবে এবং চিরদিনের জন্য তাহার দুঃখের অবসান হইবে।

মাদ্রাজ
৯ই ডিসেম্বর, ১৯১০

রামকৃষ্ণানন্দ

পটভূমিকা

[ইংরেজী Inspired Talks গ্রন্থারম্ভের পূর্বে মিস ওয়াল্ডো-লিখিত মূল্যবান্ ভূমিকাটির ইংরেজী শিরোনামা 'Introductory Narrative'—ইহার বাংলা অনুবাদ 'আমেরিকায় স্বামীজী', এই প্রবন্ধের প্রথমাংশে স্বামীজীর আমেরিকায় পদার্পণ কাল হইতে চিকাগো ধর্ম-মহাসভা, এবং তারপর পূর্ব উপকূলে বিভিন্ন স্থানে প্রচারকার্যের কথা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ। শেষাংশ 'দেববাণী'র পটভূমিকা-রূপে প্রদত্ত হইল]

অবশেষে স্বামীজী অনুভব করিলেন, স্বীয় আচার্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সকল ধর্মের সত্যতা ও মৌলিক একত্ব-প্রতিপাদক উপদেশবাণী পাশ্চাত্য জগতের নিকট প্রচার করা-রূপ নিজ অভীপ্সিত মহাকার্যে তিনি বেশ কিছুটা অগ্রসর হইয়াছেন। ক্লাসটি এত শীঘ্র বাড়িয়া উঠিল যে, আর উপরের ছোট ঘরটিতে স্থান হয় না, সুতরাং নীচেকার বড় বৈঠকখানাদুটি ভাড়া লওয়া হইল। এইখানেই স্বামীজী সেই ঋতুটির শেষ পর্যন্ত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এই শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে বিনা বেতনে প্রদত্ত হইত ; প্রয়োজনীয় ব্যয়, স্বেচ্ছায় যিনি যাহা দান করিতেন, তাহাতেই চালাইবার চেষ্টা করা হইত। কিন্তু সংগৃহীত অর্থ—ঘরভাড়া ও স্বামীজীর আহারাদি-ব্যয়ের পক্ষে যথেষ্ট না হওয়ায় অর্থাভাবে ক্লাসটি উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইল। অমনি স্বামীজী ঘোষণা করিলেন যে, ঐহিক বিষয়ে তিনি সাধারণের সমক্ষে কতকগুলি নিয়মিত বক্তৃতা দিবেন। সেগুলির জন্য পারিশ্রমিক লইতে তাঁহার বাধা ছিল না, সেই অর্থে তিনি ধর্মসম্বন্ধীয় ক্লাসটি চালাইতে লাগিলেন। তিনি বুঝাইয়া দিলেন যে, হিন্দুদের চক্ষে শুধু বিনামূল্যে শিক্ষা দিলেই ধর্মব্যাখ্যার কর্তব্য শেষ হইল না, সম্ভবপর হইলে তাঁহাকে এই কার্যের ব্যয়ভারও বহন করিতে হইবে। পূর্বকালে ভারতে এমনও নিয়ম ছিল যে, উপদেষ্টা শিষ্যগণের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিবেন।

ইতিমধ্যে কতিপয় ছাত্র স্বামীজীর উপদেশে এতদূর মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, যাহাতে তাঁহারা পরবর্তী গ্রীষ্ম ঋতুতেও ঐ শিক্ষালাভ করিতে পারেন, সেজন্য সমুৎসুক হইলেন। কিন্তু তিনি একটি ঋতুর কঠোর পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং পুনরায় গ্রীষ্মের সময় ঐরূপ পরিশ্রম করা

সম্বন্ধে প্রথমে আপত্তি করিয়াছিলেন। তারপর অনেক ছাত্র বৎসরের ঐ সময়ে শহরে থাকিবেন না। কিন্তু প্রশ্নটির আপনা-আপনি মীমাংসা হইয়া গেল। আমাদের মধ্যে একজনের সেণ্টলরেন্স নদীবক্ষস্থ বৃহত্তম দ্বীপ 'সহস্র-দ্বীপোদ্যানে' (Thousand Island Park) একখানি ছোট বাড়ি ছিল; তিনি উহা স্বামীজীর এবং আমাদের মধ্যে যত জনের উহাতে স্থান হয়, তত জনের ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দিবার প্রস্তাব করিলেন। এই ব্যবস্থা স্বামীজীর মনঃপূত হইল; তিনি তাঁহার জনৈক বন্ধুর 'মেইন ক্যাম্প' (Maine Camp) নামক ভবন হইতে প্রত্যাগত হইয়াই আমাদের নিকট সেখানে আসিবেন বলিয়া স্বীকৃত হইলেন।

যে ছাত্রীটি বাড়িখানির অধিকারিণী ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল মিস ডাচার। তিনি বুঝিলেন যে, এই উপলক্ষ্যে একটি পৃথক্ কক্ষ নির্মাণ করা আবশ্যক—যেখানে কেবল পবিত্র ভাবই বিরাজ করিবে, এবং তাঁহার গুরুর প্রতি প্রকৃত ভক্তি-অর্ঘ্য-হিসাবে আসল বাড়িখানি যত বড়, প্রায় তত বড়ই একটি নূতন পার্শ্ব সংযোজন করিয়া দিলেন। বাড়িটি এক উচ্চভূমির উপর অতি সুন্দর স্থানে অবস্থিত ছিল; সুরম্য নদীটি অনেকখানি এবং উহার বহুদূরবিস্তৃত সহস্রদ্বীপের অনেকগুলি তথা হইতে দৃষ্টিগোচর হইত। দূরে ক্লেটন অল্প অল্প দেখা যাইত, আর অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী বিস্তৃত ক্যানাডা উপকূল উত্তরে দৃষ্টি অবরোধ করিত। বাড়িখানি একটি পাহাড়ের গায়ে অবস্থিত ছিল; পাহাড়টির উত্তর ও পশ্চিম দিক হঠাৎ ঢালু হইয়া নদীতীর ও উহারই যে ক্ষুদ্র অংশটি ভিতরের দিকে ঢুকিয়া আসিয়াছে, তাহার তীর পর্যন্ত গিয়াছে; শেষোক্ত জলভাগটি একটি ক্ষুদ্র হ্রদের ন্যায় বাড়িখানির পশ্চাতে রহিয়াছে। বাড়িখানি সত্য সত্যই (বাইবেলের ভাষায়) 'একটি পাহাড়ের উপর নির্মিত,' আর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর উহার চারিদিকে পড়িয়াছিল। নবনির্মিত সংযোজনটি পাহাড়ের খুব ঢালু অংশে দণ্ডায়মান থাকায় যেন একটি বিরাট আলোকস্তম্ভের মতো দেখাইত। বাড়িটির তিন দিকে জানালা ছিল এবং উহা পিছনের দিকে ত্রিতল ও সামনের দিকে দ্বিতল ছিল। নীচের ঘরটিতে ছাত্রগণের মধ্যে একজন থাকিতেন; তাহার উপরকার ঘরটিতে বাড়িখানির প্রধান অংশ হইতে অনেকগুলি দ্বার দিয়া যাওয়া যাইত, এবং প্রশস্ত ও সুবিধাজনক হওয়ায় উহাতেই আমাদের ক্লাসের অধিবেশন

হইত, এবং সেখানেই স্বামীজী অনেক ঘণ্টা ধরিয়া আমাদিগের সুপরিচিত বন্ধুর মতো উপদেশ দিতেন। এই ঘরের উপরের ঘরটি শুধু স্বামীজীরই ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। যাহাতে উহা সম্পূর্ণরূপে নিরুপদ্রব হইতে পারে, সেজন্য মিস ডাচার বাহিরের দিকে একটি পৃথক্ সিঁড়ি করাইয়া দিয়াছিলেন। অবশ্য উহাতে দোতলার বারান্দায় আসিবার একটি দরজাও ছিল।

এই উপরতলায় বারান্দাটি আমাদের জীবনের সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল; কারণ স্বামীজীর সকল সান্ধ্য কথোপকথন এই স্থানেই হইত। বারান্দাটি প্রশস্ত থাকায় উহাতে কতকটা জায়গা ছিল। উহার উপরে ছাদ দেওয়া ছিল, এবং উহা বাড়িখানির দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশে বিস্তৃত ছিল। মিস ডাচার উহার পশ্চিমাংশটি একটি পর্দা দিয়া সযত্নে পৃথক্ করিয়া দিয়াছিলেন, সুতরাং যে-সকল অপরিচিত ব্যক্তি এই বারান্দা হইতে তত্রত্য অপূর্ব দৃশ্যটি দেখিবার জন্য সেখানে প্রায়ই আগমন করিতেন, তাঁহারা আমাদের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতে পারিতেন না।

এইখানেই আমাদের অবস্থান-কালের প্রতি সন্ধ্যায় আচার্যদেব তাঁহার দ্বারের সমীপে বসিয়া আমাদের সহিত কথাবার্তা বলিতেন। আমরাও সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে নির্বাক হইয়া বসিয়া তাঁহার অপূর্ব জ্ঞানগর্ভ বচনামৃত সাগ্রহে পান করিতাম। স্থানটি যেন সত্য সত্যই একটি পুণ্যনিকেতন ছিল। পাদনিম্নে হরিৎপত্রবিশিষ্ট বৃক্ষশীর্ষগুলি হরিৎসমুদ্রের মতো আন্দোলিত হইত, কারণ সমগ্র স্থানটি ঘন অরণ্যে পরিবৃত ছিল। সুবৃহৎ গ্রামটির একখানি বাড়িও সেখান হইতে দৃষ্টিগোচর হইত না, আমরা যেন লোকালয় হইতে বহু যোজন দূরে কোন নিবিড় অরণ্যানী-মধ্যে বাস করিতাম। বৃক্ষ-শ্রেণী হইতে দূরে বিস্তৃত সেণ্ট লরেন্স নদী; উহার বক্ষে মাঝে মাঝে দ্বীপসমূহ; উহাদের মধ্যে কতকগুলি আবার হোটেল ও ভোজনালয়ের উজ্জ্বল আলোকে ঝিকমিক করিত। এগুলি এত দূরে ছিল যে, উহারা সত্য অপেক্ষা চিত্রিত দৃশ্য বলিয়াই মনে হইত। আমাদের এই নির্জন স্থানে জনকোলাহলও কিছুমাত্র প্রবেশ করিত না। আমরা শুধু কীটপতঙ্গাদির অস্ফুট রব, পক্ষিগণের মধুর কাকলি, অথবা পাতার মধ্য দিয়া সঞ্চরমাণ বায়ুর মৃদু মর্মর-ধ্বনি শুনিতে পাইতাম। দৃশ্যটির কিয়দংশ স্নিগ্ধ চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিত থাকিত,

এবং নিম্নের স্থির জলরাশিবক্ষে দর্পণের ন্যায় চন্দ্রের মুখচ্ছবি প্রতিবিম্বিত হইত। এই অপূর্ব মায়া-রাজ্যে আমরা আচার্যদেবের সহিত সাতটি সপ্তাহ দিব্যানন্দে তাঁহার অতীন্দ্রিয়রাজ্যের বার্তাসমন্বিত অপূর্ব বচনাবলী শ্রবণ করিতে করিতে অতিবাহিত করিয়াছিলাম—তখন আমরা জগৎকে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, জগৎও আমাদিগকে ভুলিয়া গিয়াছিল। এই সময়ে প্রতিদিন সান্ধ্য-ভোজন-সমাপনান্তে আমরা সকলে উপরকার বারান্দায় গিয়া আচার্যদেবের আগমন প্রতীক্ষা করিতাম। অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইত না, কারণ আমরা সমবেত হইতে না হইতেই তাঁহার গৃহদ্বার উন্মুক্ত হইত এবং তিনি ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া তাঁহার অভ্যস্ত আসন গ্রহণ করিতেন। তিনি আমাদিগের সহিত প্রত্যহ দুই ঘণ্টা এবং অনেক সময়েই তদধিক কাল যাপন করিতেন। এক অপূর্বসৌন্দর্যময়ী রজনীতে (সে দিন নিশানাথ প্রায় পূর্ণাবয়ব ছিলেন) কথা কহিতে কহিতে চন্দ্র অস্ত গেল; আমরাও যেমন কালক্ষেপের বিষয়ই কিছুই জানিতে পারি নাই, স্বামীজীও মনে হয় ঠিক তেমনি কিছুই জানিতে পারেন নাই।

এই-সকল কথোপকথন লিপিবদ্ধ করিয়া লওয়া সম্ভব হয় নাই; ঐগুলি শুধু শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়েই গ্রথিত হইয়া আছে। এই দিব্য অবসরে আমরা যে উচ্চাঙ্গের গভীর ধর্মানুভূতি লাভ করিতাম, তাহা আমাদের কেহই ভুলিতে পারিবে না। স্বামীজী ঐ সময়ে তাঁহার হৃদয়ের দুয়ার খুলিয়া দিতেন। ধর্মলাভ করিবার জন্য তাঁহাকে যে-সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া যাইতে হইয়াছিল, সেগুলি যেন পুনরায় আমাদের দৃষ্টিগোচর হইত। তাঁহার গুরুদেবই যেন সূক্ষ্মশরীরে তাঁহার মুখাবলম্বনে আমাদের নিকট কথা কহিতেন, আমাদের সকল সন্দেহ মিটাইয়া দিতেন, সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেন এবং সমুদয় ভয় দূর করিতেন। অনেক সময়ে স্বামীজী যেন আমাদের উপস্থিতিই ভুলিয়া যাইতেন,—তখন আমরা পাছে তাঁহার চিন্তাপ্রবাহে বাধা দিয়া ফেলি এই ভয়ে যেন শ্বাস রুদ্ধ করিয়া থাকিতাম। তিনি আসন হইতে উঠিয়া বারান্দাটির সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে পায়চারি করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে অনর্গল কথা বলিয়া যাইতেন। এই সময়ে তিনি যেরূপ কোমলপ্রকৃতি ছিলেন এবং সকলের ভালবাসা আকর্ষণ করিতেন, তেমন আর কখনও দেখা যায় নাই; তাঁহার গুরুদেব যেরূপে তাঁহার শিষ্যবর্গকে শিক্ষা দিতেন, ইহা হয়তো অনেকটা

সেইরূপ ব্যাপার—তিনি নিজেই নিজ আত্মার সহিত ভাবমুখে কথা কহিয়া যাইতেন, আর শিষ্যগণ শুধু শুনিয়া যাইতেন।

স্বামী বিকোনন্দের ন্যায় একজন লোকের সহিত বাস করাই অবিশ্রান্ত উচ্চ উচ্চ অনুভূতি লাভ করা। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত সেই একই ভাব—আমরা এক ঘনীভূত ধর্মভাবের রাজ্যে বাস করিতাম। স্বামীজী মধ্যে মধ্যে বালকের ন্যায় ক্রীড়াশীল ও কৌতুকপ্রিয় হইলেও এবং সোল্লাসে পরিহাস করিতে ও কথার ক্ষিপ্র ও সরস প্রত্যুত্তর দিতে অভ্যস্ত থাকিলেও কখন মুহূর্তের জন্য জীবনের মূলসুর হইতে বেশীদূরে যাইতেন না। প্রতি জিনিসটি হইতেই তিনি কিছু না কিছু বলিবার অথবা উদাহরণ দিবার বিষয় পাইতেন, এবং এক মুহূর্তে তিনি আমাদিগকে কৌতুকজনক হিন্দু পৌরাণিক গল্প হইতে একেবারে গভীর দর্শনের মধ্যে লইয়া যাইতেন। স্বামীজী পৌরাণিক গল্পসমূহের অফুরন্ত ভাণ্ডার ছিলেন, আর প্রকৃতপক্ষে এই প্রাচীন আর্যগণের মতো আর কোন জাতির মধ্যেই এত অধিক পরিমাণে পৌরাণিক গল্পের প্রচলন নাই। তিনি আমাদিগকে ঐ-সকল গল্প শুনাইয়া প্রীতি অনুভব করিতেন এবং আমরাও ঐগুলি শুনিতে ভালবাসিতাম, কারণ তিনি কখনও এই-সকল গল্পের অন্তরালে যে সত্য নিহিত আছে, তাহা দেখাইয়া দিতে এবং উহা হইতে মূল্যবান্ ধর্মবিষয়ক উপদেশ আবিষ্কার করিয়া দিতে বিস্মৃত হইতেন না। আর কোন ভাগ্যবান্ ছাত্রমণ্ডলী এরূপ প্রতিভাবান্ আচার্য-লাভে নিজদিগকে ধন্য জ্ঞান করিবার এমন সুযোগ পাইয়াছেন কি না সন্দেহ।

আশ্চর্য, ঠিক দ্বাদশ জন ছাত্রী ও ছাত্র 'সহস্র-দ্বীপোদ্যানে' স্বামীজীর অনুগমন করিয়াছিলেন এবং তিনি বলিয়াছিলেন যে, তিনি আমাদিগকে প্রকৃত শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন; এবং সেজন্যই তিনি আমাদিগকে এরূপ দিবারাত্র প্রাণ খুলিয়া তাঁহার নিকট যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ বস্তু ছিল, তাহাই শিক্ষা দিতেন। এই বারো জনের সকলেই এক সময়ে একত্র হন নাই, ঊর্ধ্বসংখ্যায় দশ জনের অধিক কোন সময়ে উপস্থিত ছিলেন না। আমাদের মধ্যে দুইজন পরে 'সহস্রদ্বীপোদ্যানে'ই সন্ন্যাসদীক্ষা গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তির সন্ন্যাসের সময় স্বামীজী আমাদের পাঁচজনকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করিয়াছিলেন এবং অবশিষ্ট কয়জন পরে

নিউ ইয়র্ক নগরে স্বামীজীর তত্রত্য অপর কয়েকজন শিষ্যের সহিত একসঙ্গে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

'সহস্রদ্বীপোদ্যানে' গমনকালে স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে, আমরা পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া একযোগে বাস করিব ; প্রত্যেকেই গৃহকর্মের নিজ নিজ অংশ সম্পন্ন করিবেন, তাহাতে কোন বাজে লোকের সংস্পর্শে আমাদের গৃহের শান্তিভঙ্গ হইতে পারিবে না। স্বামীজী স্বয়ং একজন পাকা রাঁধুনী ছিলেন, এবং আমাদের জন্য প্রায়ই উপাদেয় ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিতেন। তাঁহার গুরুদেবের দেহান্তের পরে যখন তিনি তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণের সেবা করিতেন, সেই সময়েই তিনি রন্ধনকার্য শিখিয়াছিলেন। এই যুবকগণকে সংঘবদ্ধ করিয়া যাহাতে তাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রচারিত সত্যসমূহ সমগ্র জগতে ছড়াইয়া দিবার উপযুক্ত অধিকারী হইতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তাঁহার গুরুদেব কর্তৃক আরব্ধ শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার ভার তাঁহারই উপর পড়িয়াছিল।

প্রতিদিন প্রাতঃকালে আমাদের প্রত্যেকের নির্দিষ্ট কার্যগুলি শেষ হইবা-মাত্র (অনেক সময়ে তাহার পূর্বেই) স্বামীজী আমাদিগকে—যে বৃহৎ বৈঠক-খানাটিতে আমাদের ক্লাসের অধিবেশন হইত, সেখানে সমবেত করিয়া শিক্ষাদান আরম্ভ করিতেন। প্রতিদিন তিনি কোন একটি বিশেষ বিষয় নির্বাচন করিয়া লইয়া তৎসম্বন্ধে উপদেশ দিতেন, অথবা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, উপনিষৎ বা ব্যাসকৃত বেদান্তসূত্র প্রভৃতি কোন ধর্মগ্রন্থ লইয়া তাহার ব্যাখ্যা করিতেন। বেদান্ত-সূত্রে বেদান্তের অন্তর্গত মহাসত্যগুলি যতদূর সম্ভব স্বল্পাক্ষরে নিবদ্ধ আছে। তাহাদের কর্তা ক্রিয়া কিছুই নাই এবং সূত্রকারগণ প্রত্যেক অনাবশ্যক পদ পরিহার করিতে এত আগ্রহান্বিত থাকিতেন যে, হিন্দুগণের মধ্যে একটি প্রবাদ আছে,—সূত্রকার বরং তাঁহার একটি পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত, কিন্তু তাঁহার সূত্রে একটি অতিরিক্ত অক্ষরও বসাইতে প্রস্তুত নন।

অত্যন্ত স্বল্পাক্ষর—প্রায় হেঁয়ালির মতো বলিয়া বেদান্তসূত্রগুলিতে ভাষ্য-কারগণের মাথা খাটাইবার যথেষ্ট অবকাশ আছে, এবং শঙ্কর, রামানুজ ও মধ্ব, এই তিনজন হিন্দু মহাদার্শনিক উহাদের উপর বিস্তৃত ভাষ্য লিখিয়াছেন। প্রাতঃকালের কথোপকথনগুলিতে স্বামীজী প্রথমে এই ভাষ্যগুলির কোন একটি লইয়া, তারপরে আর একটি ভাষ্য এইরূপ করিয়া ব্যাখ্যা করিতেন এবং দেখাইতেন কিরূপে প্রত্যেক ভাষ্যকার তাঁহার নিজ মতানুযায়ী সূত্রগুলির

কদর্থ করার অপরাধে অপরাধী, এবং যাহা তাঁহার নিজ ব্যাখ্যাকে সমর্থন করিবে, নিঃসঙ্কোচে সেইরূপ অর্থই সেই সূত্রের মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়াছেন! জোর করিয়া মূলের বিকৃতার্থ করা-রূপ কদভ্যাস কত পুরাতন, তাহা স্বামীজী আমাদিগকে প্রায়ই দেখাইয়া দিতেন।

কাজেই এই কথোপকথনগুলিতে কোনদিন বা মধ্ববর্ণিত শুদ্ধদ্বৈতবাদ, আবার কোন দিন বা রামানুজ-প্রচারিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ব্যাখ্যাত হইত। কিন্তু শঙ্করের অদ্বৈতমূলক ব্যাখ্যাই সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যাখ্যাত হইত। তবে শঙ্করের ব্যাখ্যায় অত্যন্ত চুলচেরা বিচার আছে বলিয়া উহা সহজবোধ্য ছিল না, সুতরাং শেষ পর্যন্ত রামানুজই ছাত্রগণের মনের মতো ব্যাখ্যাকার রহিয়া যাইতেন।

কখনও কখনও স্বামীজী 'নারদীয় ভক্তিসূত্র' লইয়া ব্যাখ্যা করিতেন। এই সূত্রগুলিতে ঈশ্বরভক্তির সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে, এবং উহা পাঠ করিলে কথঞ্চিৎ ধারণা হয়—হিন্দুদের প্রকৃত সর্বগ্রাসী আদর্শ ঈশ্বরপ্রেম কিরূপ—সে-প্রেম সত্যসত্যই সাধকের মন হইতে অপর সমুদয় চিন্তা দূর করিয়া তাহাকে ভূতে-পাওয়ার মতো পাইয়া বসে! হিন্দুগণের মতে ভক্তি ঈশ্বরের সহিত তাদাত্ম্যভাব লাভ করিবার একটি প্রকৃষ্ট উপায়, এ উপায় ভক্তগণের স্বভাবতই ভাল লাগে। ঈশ্বরকে—কেবল তাঁহাকেই ভালবাসার নাম ভক্তি।

এই কথোপকথনগুলিতেই স্বামীজী সর্বপ্রথম আমাদিগের নিকট তাঁহার মহান্ আচার্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করেন—কিরূপে স্বামীজী দিনের পর দিন তাঁহার সহিত কাল কাটাইতেন এবং কিরূপে তাঁহাকে নিজ নাস্তিক মতের দিকে ঝোঁক দমন করিবার জন্য কঠোর চেষ্টা করিতে হইত এবং উহা যে সময়ে সময়ে তাঁহার গুরুদেবকে সন্তাপিত করিয়া তাঁহাকে কাঁদাইয়াও ফেলিত—এই-সকল কথা বলিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অপর শিষ্যগণ প্রায়ই উল্লেখ করিয়াছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বলিতেন, স্বামীজী একজন মুক্ত মহাপুরুষ, বিশেষভাবে তাঁহার কাজে সাহায্য করিবার জন্যই আগমন করিয়াছেন এবং তিনি কে, তাহা জানিবামাত্র শরীর ছাড়িয়া দিবেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ আরও বলিতেন যে, উক্ত 'সময় উপস্থিত হইবার পূর্বে স্বামীজীকে শুধু ভারতেরই কল্যাণের জন্য নয়, কিন্তু অপর দেশসমূহের জন্যও কোন একটি বিশেষ কার্য করিতে হইবে। তিনি প্রায়ই বলিতেন,

'বহুদূরে আমার আরও সব শিষ্য আছে ; তাহারা এমন সব ভাষায় কথা বলে, যাহা আমি জানি না।'

'সহস্রদ্বীপোদ্যানে' সাত সপ্তাহকাল অতিবাহিত করিয়া স্বামীজী নিউ ইয়র্কে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং পরে অন্যত্র ভ্রমণে বাহির হইলেন। নভেম্বরের শেষ পর্যন্ত তিনি ইংলণ্ডে বক্তৃতা দিতে এবং ছাত্রগণকে লইয়া ক্লাস করিতে লাগিলেন। তারপর নিউ ইয়র্কে প্রত্যাবর্তন করিয়া সেখানে পুনরায় ক্লাস আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে তাঁহার ছাত্রগণ জনৈক উপযুক্ত সাঙ্কেতিক-লিখনবিৎকে (stenographer) সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং এইরূপে স্বামীজীর উক্তিগুলি লিপিবদ্ধ করাইয়া রাখিয়াছিলেন। এই ক্লাসের বক্তৃতাগুলি কিছুদিন পরেই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পুস্তকগুলি ও পুস্তিকাকারে নিবদ্ধ তাঁহার সাধারণসমক্ষে বক্তৃতাগুলিই আজ স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকায় প্রচারকার্যের স্থায়ী স্মৃতিচিহ্নরূপে বর্তমান রহিয়াছে। আমাদের মধ্যে যাঁহারা এই বক্তৃতাগুলিতে উপস্থিত থাকিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকট মুদ্রিত পৃষ্ঠাগুলিতে স্বামীজীকে যেন আবার জীবন্ত বোধ হয় এবং তিনি যেন তাঁহাদের সহিত কথা কহিতেছেন, এইরূপ মনে হয়। তাঁহার বক্তৃতাগুলি যে এরূপ যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, সেজন্য কৃতিত্ব একজনের—যিনি পরে স্বামীজীর একজন মহা অনুরাগী ভক্ত হইয়াছিলেন। গুরু ও শিষ্য উভয়েরই কার্য নিষ্কামপ্রেম-প্রসূত ছিল, সুতরাং ঐ কার্যের উপর ঈশ্বরের আশীর্বাদ বর্ষিত হইয়াছিল।

এস. ই. ওয়াল্ডো
(S. E. Waldo)

নিউ ইয়র্ক, ১৯০৮

কাশীপুর উদ্যানবাটীতে ধ্যানস্থ স্বামীজী ১৮৮৬
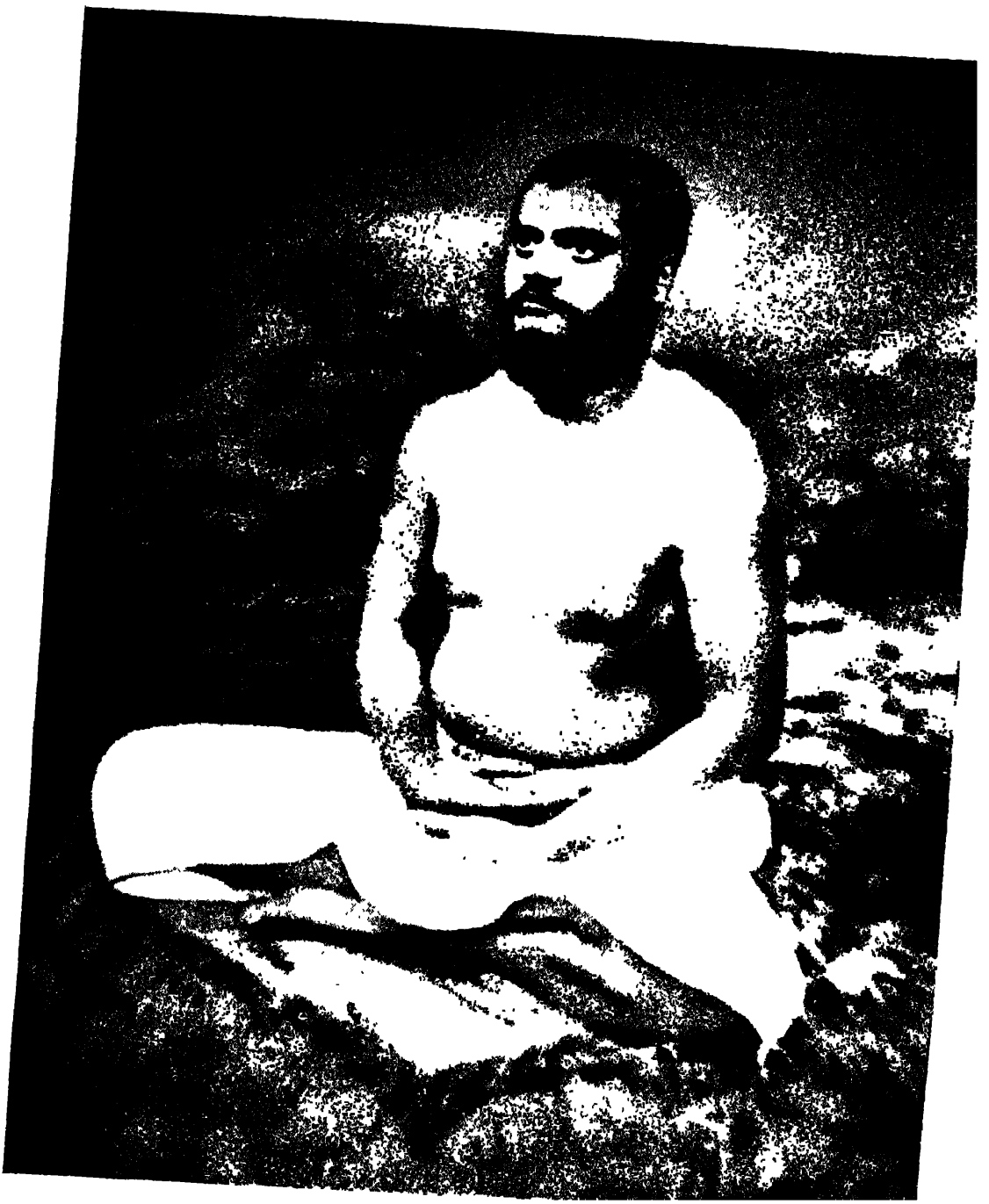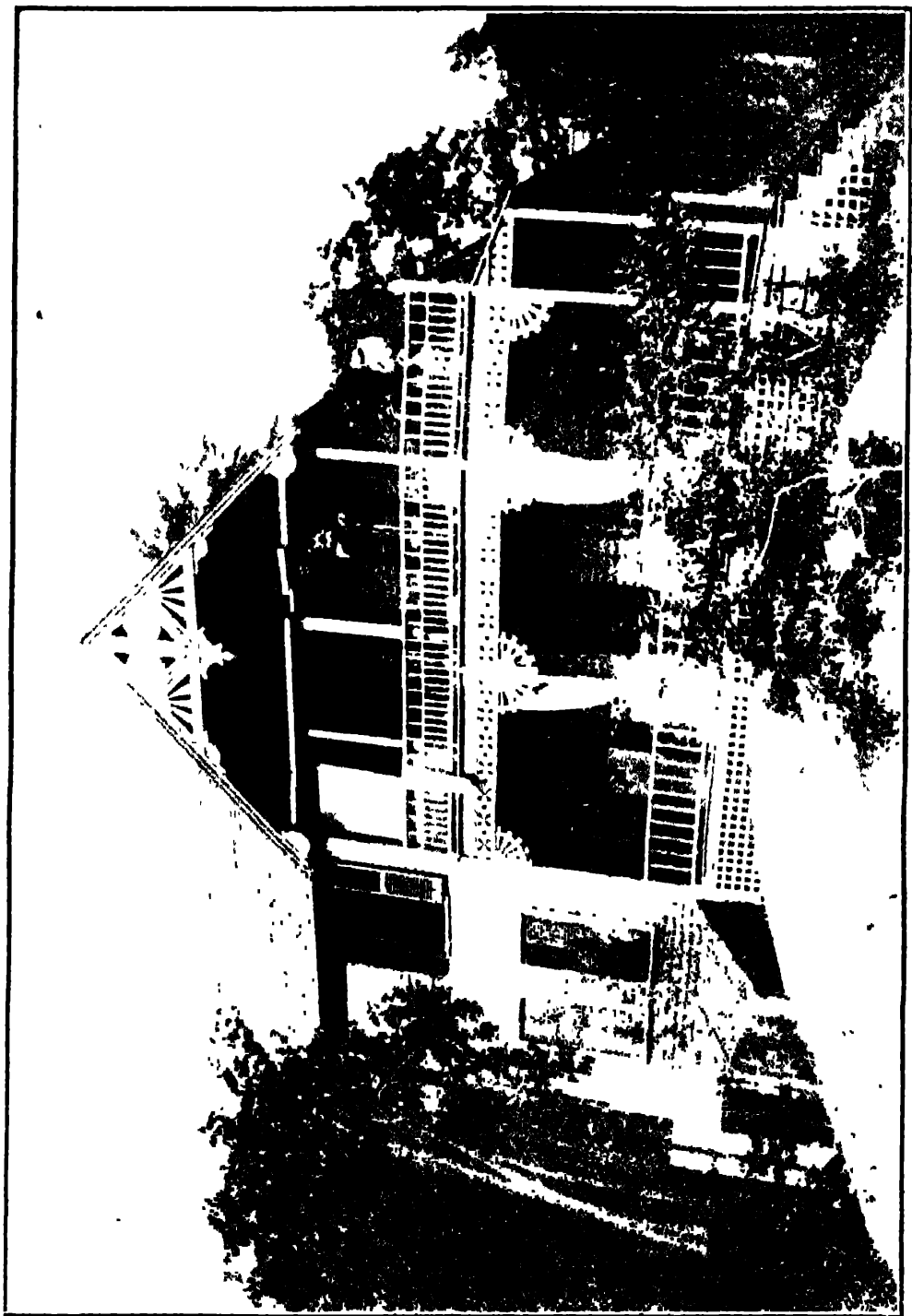
'Thousand Island Park'-এ স্বামীজীর ব্যবহৃত বাটী।

(এখানে স্বামীজী-প্রদত্ত উপদেশাবলী 'Inspired Talks' নামে সুপরিচিত

দেববাণী

বুধবার, ১৯শে জুন, ১৮৯৫

সহস্রদ্বীপোদ্যানে এই দিন হইতে স্বামীজী নিয়মিত শিক্ষাদান আরম্ভ করেন। আমাদের সকলে তখনও সমবেত হয় নাই, কিন্তু আচার্যের হৃদয় কাজ করিতে শুরু করিয়াছে; যে তিন-চারজন উপস্থিত ছিলাম, তাহাদিগকে লইয়াই তিনি শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন।

স্বামীজী একখানি বাইবেল হাতে করিয়া ছাত্রগণের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং উহা হইতে জনের গ্রন্থখানি[১] খুলিয়া বলিলেন, তোমরা যখন সকলেই খ্রীষ্টান, তখন খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র দিয়া আরম্ভ করাই ভাল।

জনের গ্রন্থ-প্রারম্ভেই আছে:

'আদিতে শব্দমাত্র ছিল, সেই শব্দ ব্রহ্মের সহিতই ছিল, আর সেই শব্দই ব্রহ্ম।'

হিন্দুরা এই 'শব্দ'কে বলে থাকেন মায়া বা ব্রহ্মের ব্যক্তভাব, কারণ এটি ব্রহ্মেরই শক্তি। যখন সেই নিরপেক্ষ ব্রহ্মসত্তাকে আমরা বিশ্বজগতে প্রতিফলিত দেখি, তখন তাকে 'প্রকৃতি' বলে থাকি। 'শব্দে'র দুটি বিকাশ, একটি এই 'প্রকৃতি'—এইটিই সাধারণ বিকাশ; আর এর বিশেষ বিকাশ হচ্ছে কৃষ্ণ, বুদ্ধ, ঈশা, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতার-পুরুষগণ। সেই নির্গুণ ব্রহ্মের বিশেষ বিকাশ যে খ্রীষ্ট, তাঁকে আমরা জেনে থাকি, তিনি আমাদের জ্ঞেয়। কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্মবস্তুকে আমরা জানতে পারি না। আমরা পরম পিতাকে[২] জানতে পারি না, কিন্তু তাঁর তনয়কে[৩] জানতে পারি। নির্গুণ ব্রহ্মকে আমরা শুধু মানবত্বরূপ রঙের মধ্য দিয়ে দেখতে পারি, খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে দেখতে পারি।

জন-লিখিত গ্রন্থের প্রথম পাঁচ শ্লোকেই খ্রীষ্টধর্মের সারতত্ত্ব নিহিত। এর প্রত্যেক শ্লোকটি গভীরতম দার্শনিক তত্ত্বে পূর্ণ।

১ Gospel according to St. John, New Testament

২ God the Father

৩ God the Son

পূর্ণস্বরূপ যিনি, তিনি কখনও অপূর্ণ হন না। তিনি অন্ধকারের মধ্যেও আছেন বটে, কিন্তু ঐ অন্ধকার তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। ঈশ্বরের দয়া সকলেরই উপর রয়েছে, কিন্তু তাদের পাপ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। আমরা নেত্ররোগাক্রান্ত হয়ে সূর্যকে অন্যরূপ দেখতে পারি, কিন্তু তাতে সূর্য যেমন তেমনই থাকে, তার কিছু এসে যায় না। জনের ঊনত্রিংশ শ্লোকে যে লেখা আছে, 'তিনি জগতের পাপ দূর করেন'—তার মানে এই যে, খ্রীষ্ট আমাদিগকে পূর্ণতা লাভ করবার পথ দেখিয়ে দেবেন। ঈশ্বর খ্রীষ্ট হয়ে জন্মালেন—মানুষকে তার প্রকৃত স্বরূপ দেখিয়ে দেবার জন্য, আমরাও যে প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মস্বরূপ, এইটি জানিয়ে দেবার জন্য। আমরা হচ্ছি দেবত্বের উপর মনুষ্যত্বের আবরণ, কিন্তু দেবভাবাপন্ন মানুষ-হিসাবে খ্রীষ্ট ও আমাদের মধ্যে স্বরূপতঃ কোন পার্থক্য নেই।

ত্রিত্ববাদীদের[১] যে খ্রীষ্ট, তিনি আমাদের মতো সাধারণ মনুষ্য থেকে অনেক উচ্চে অবস্থিত। একত্ববাদীদের (Unitarian) খ্রীষ্ট ঈশ্বর নন, শুধু একজন নৈতিক সাধুপুরুষ। এ দুইয়ের কেউই আমাদের সাহায্য করতে পারেন না। কিন্তু যে খ্রীষ্ট ঈশ্বরাবতার, তিনি নিজ ঈশ্বরত্ব বিস্মৃত হননি, সেই খ্রীষ্টই আমাদের সাহায্য করিতে পারেন, তাঁতে কোনরূপ অপূর্ণতা নেই। এই-সকল অবতারদের রাতদিন মনে থাকে যে তাঁরা ঈশ্বর—তাঁরা আজন্ম এটি জানেন। তাঁরা যেন সেই-সব অভিনেতাদের মতো, যাঁদের নিজ নিজ অংশের অভিনয় শেষ হয়ে গেছে—নিজেদের আর কোন প্রয়োজন নেই, তবু যাঁরা কেবল অপরকে আনন্দ দেবার জন্যই রঙ্গমঞ্চে ফিরে আসেন। এই মহাপুরুষগণকে সংসারের কোন মলিনতা স্পর্শ করতে পারে না। তাঁরা কেবল আমাদের শিক্ষা দেবার জন্য কিছুকাল আমাদের মতো মানুষ হয়ে আসেন, আমাদেরই মতো বদ্ধ ব'লে ভান করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরা কখনই বদ্ধ নন, সদাই মুক্তস্বভাব।

* * *

মঙ্গল বা কল্যাণভাব সত্যের সমীপবর্তী বটে, কিন্তু তবু পূর্ণ সত্য নয়। অমঙ্গল যেন আমাদের বিচলিত করতে না পারে, এটি শেখবার পর আমাদের

১ Trinitarian—ইঁহাদের মতে ঈশ্বর পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মাভেদে একেই তিন।

শিখতে হবে, মঙ্গলও যেন আমাদের সুখী করতে না পারে। আমাদের জানতে হবে যে, আমরা মঙ্গল-অমঙ্গল দুইয়েরই বাইরে। ওদের উভয়েরই যে যথাযোগ্য স্থান আছে, সেটি আমাদের লক্ষ্য করতে হবে ও বুঝতে হবে যে, একটা থাকলেই অপরটাও থাকবেই থাকবে।

দ্বৈতবাদের ভাবটি প্রাচীন পারসীকদের[১] কাছ থেকে এসেছে। প্রকৃতপক্ষে ভাল-মন্দ দুই-ই এক জিনিস এবং উভয়ই আমাদের মনে। মন যখন স্থির ও শান্ত হয়, তখন ভাল-মন্দ কিছুই তাকে স্পর্শ করতে পারে না। শুভাশুভ দুইয়েরই বন্ধন কাটিয়ে একেবারে মুক্ত হও, তখন এদের কেউ আর তোমায় স্পর্শ করতে পারবে না, তুমি মুক্ত হয়ে পরমানন্দ ভোগ করবে। অশুভ যেন লোহার শিকল, আর শুভ সোনার শিকল; কিন্তু দুই-ই শিকল। মুক্ত হও এবং জন্মের মতো জেনে রাখো, কোন শিকলই তোমায় বাঁধতে পারে না। সোনার শিকলটির সাহায্যে লোহার শিকলটি আলগা ক'রে নাও, তার পর দুটোই ফেলে দাও। অশুভরূপ কাঁটা আমাদের শরীরে রয়েছে; ঐ ঝাড়েরই আর একটি (শুভরূপ) কাঁটা নিয়ে পূর্বের কাঁটাটি তুলে ফেলে শেষে দুটোকেই ফেলে দাও, এবং মুক্ত হও।

* * *

জগতে সর্বদাই দাতার আসন গ্রহণ করো। সর্বস্ব দিয়ে দাও, আর ফিরে কিছু চেও না। ভালবাসা দাও, সাহায্য দাও, সেবা দাও, যতটুকু যা তোমার দেবার আছে দিয়ে যাও; কিন্তু সাবধান, বিনিময়ে কিছু চেও না। কোন শর্ত ক'রো না, তা হলেই তোমার ঘাড়েও কোন শর্ত চাপবে না। আমরা যেন আমাদের নিজেদের বদান্যতা থেকেই দিয়ে যাই—ঠিক যেমন ঈশ্বর আমাদের দিয়ে থাকেন।

ঈশ্বর একমাত্র দেনেওয়ালা, জগতের সকলেই তো দোকানদার মাত্র।··· তাঁর সই-করা চেক যোগাড় কর, সর্বত্রই তার খাতির হবে।

ঈশ্বর অনির্বচনীয় প্রেমস্বরূপ—তিনি উপলব্ধির বস্তু; কিন্তু তাঁকে কখনও 'ইতি ইতি' ক'রে নির্দেশ করা যায় না।

১ জরথুষ্ট্রের অনুগামী প্রাচীন পারস্যবাসিগণ বিশ্বাস করিতেন, অহুরমজ্‌দ্‌ ও অহ্রিমান (শুভাশুভের অধিষ্ঠাতা দেবতা)—এই দুই মূলতত্ত্ব হইতে সমগ্র জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে।

(আমরা যখন দুঃখকষ্ট ও সংঘর্ষের মধ্যে পড়ি, তখন জগৎটা আমাদের কাছে একটা অতি ভয়ানক স্থান ব'লে মনে হয়। কিন্তু যেমন আমরা দুটো কুকুর-বাচ্চাকে পরস্পর খেলা করতে বা কামড়াকামড়ি করতে দেখে সে দিকে আদৌ মনোযোগ দিই না, জানি যে দুটোতে মজা করছে, এমন কি, মাঝে মাঝে জোরে এক-আধটা কামড় লাগালেও জানি যে, তাতে বিশেষ কিছু অনিষ্ট হবে না, তেমনি আমাদেরও মারামারি ইত্যাদি যা কিছু সব ঈশ্বরের চক্ষে খেলা বই আর কিছু নয়। এই জগৎটা সবই কেবল খেলার জন্য—ভগবানের এতে শুধু মজাই হয়। জগতে যাই হোক না কেন, কিছুতেই তাঁর কোপ উৎপন্ন করতে পারে না।

'পড়িয়ে ভবসাগরে ডুবে মা তনুর তরী।
মায়া-ঝড় মোহ-তুফান ক্রমে বাড়ে গো শঙ্করী।
একে মন-মাঝি আনাড়ী, রিপু ছজন কুজন দাঁড়ী,
কুবাতাসে দিয়ে পাড়ি, হাবুডুবু খেয়ে মরি;
ভেঙে গেছে ভক্তির হাল, উড়ে গেল শ্রদ্ধার পাল,
তরী হ'ল বানচাল, উপায় কি করি?
উপায় না দেখে আর, নীলকমল ভেবেছে সার,
তরঙ্গে দিয়ে সাঁতার দুর্গানামের ভেলা ধরি।')

মা, তোমার প্রকাশ যে শুধু সাধুতেই আছে আর পাপীতে নেই, তা নয়; এ প্রকাশ প্রেমিকের ভিতরেও যেমন, হত্যাকারীর ভিতরেও তেমনি রয়েছে। মা সকলের মধ্য দিয়েই আপনাকে অভিব্যক্ত করছেন। অশুচি বস্তুর উপর পড়লেও আলোক অশুচি হয় না, আবার শুচি বস্তুর উপর পড়লেও তার গুণ বাড়ে না। আলোক নিত্যশুদ্ধ, সদা অপরিণামী। সকল প্রাণীর পেছনেই সেই 'সৌম্যাৎ সৌম্যতরা,' নিত্যশুদ্ধস্বভাবা, সদা অপরিণামিনী মা রয়েছেন।

'যা দেবী সর্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥'[১]

তিনি দুঃখকষ্টে, ক্ষুধাতৃষ্ণার মধ্যেও রয়েছেন, আবার সুখের ভিতর, মহান্ ভাবের ভিতরও রয়েছেন। যখন ভ্রমর মধুপান করে, তখন প্রভুই ভ্রমররূপে

১ দেবীমাহাত্ম্য, চণ্ডী ৫।১৭

মধুপান করেন। ঈশ্বরই সর্বত্র রয়েছেন জেনে জ্ঞানী ব্যক্তিরা নিন্দাস্তুতি দুই-ই ছেড়ে দেন। জেনে রাখো যে, কিছুতেই তোমার কোন অনিষ্ট করতে পারে না। কি ক'রে করবে? তুমি কি মুক্ত নও? তুমি কি আত্মা নও? তিনি আমাদের প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্রস্বরূপ।[১]

আমরা সংসারের মধ্য দিয়ে চলেছি, যেন পাহারাওয়ালা আমাদের ধরবার জন্য পিছু পিছু ছুটছে—তাই আমরা জগতের যা সৌন্দর্য, তার শুধু ঈষৎ আভাসমাত্রই দেখে থাকি। এই যে আমাদের এত ভয়, ওটা জড়কে সত্য ব'লে বিশ্বাস করা থেকে এসেছে। পেছনে মন রয়েছে বলেই জড়তার সত্তা লাভ ক'রে আমরা জগৎ ব'লে যা দেখছি, তা প্রকৃতির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত ঈশ্বরই।

রবিবার, ২৩শে জুন

সাহসী ও অকপট হও—তারপর তুমি যে পথে ইচ্ছা ভক্তিবিশ্বাসের সহিত চল, অবশ্যই সেই পূর্ণ বস্তুকে লাভ করবে। একবার শিকলের একটা কড়া কোনমতে যদি ধরে ফেল, সমগ্র শিকলটা ক্রমে ক্রমে টেনে আনতে পারবে! গাছের মূলে যদি জল দাও, সমগ্র গাছটাই জল পাবে। ভগবান্‌কে যদি আমরা লাভ করতে পারি, তবে সবই পাওয়া গেল।

একঘেয়ে ভাবই জগতে মহা অনিষ্টকর। তোমরা নিজেদের ভিতর যত ভিন্ন ভিন্ন ভাবের বিকাশ করতে পারবে, ততই জগৎকে বিভিন্নভাবে—কখনও জ্ঞানীর দৃষ্টিতে, কখনও বা ভক্তের দৃষ্টিতে সম্ভোগ করতে পারবে। নিজের প্রকৃতিটা আগে ঠিক কর, তারপর সেই প্রকৃতি-অনুযায়ী পথ অবলম্বন ক'রে তাতে নিষ্ঠাপূর্বক থাকো। প্রবর্তকের পক্ষে নিষ্ঠাই (একটা ভাবে দৃঢ় হওয়া) একমাত্র উপায়; কিন্তু যদি যথার্থ ভক্তিবিশ্বাস থাকে এবং যদি 'ভাবের ঘরে চুরি' না থাকে, তবে ঐ নিষ্ঠাই তোমায় এক ভাব থেকে সব ভাবে নিয়ে যাবে। গির্জা, মন্দির, মত-মতান্তর, নানাবিধ অনুষ্ঠান, এগুলি যেন চারাগাছকে রক্ষা করবার জন্য তার চারিদিকে বেড়া দেওয়া। কিন্তু যদি গাছটাকে বাড়াতে চাও, তা হ'লে শেষে সেগুলিকে ভেঙে দিতে হবে। এইরূপ

১ শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং······স উ প্রাণস্য প্রাণশ্চক্ষুষশ্চক্ষুঃ।—কেনোপনিষৎ, ১।২

বিভিন্ন ধর্ম, বেদ, বাইবেল, মত-মতান্তর—এ সবও যেন চারাগাছের টবের মতো, কিন্তু টব থেকে ওকে একদিন না একদিন বেরুতে হবে। নিষ্ঠা যেন চারাগাছটিকে টবে বসিয়ে রাখা—সাধককে তার নির্বাচিত পথে আগলে রাখা।

* * *

সমগ্র সমুদ্রের দিকে চেয়ে দেখ, এক একটি তরঙ্গের দিকে দেখো না; একটা পিঁপড়ে ও একজন দেবতার ভিতর কোন প্রভেদ দেখো না। প্রত্যেকটি কীট প্রভু ঈশার ভাই। একটাকে বড়, অপরটাকে ছোট বলো কি ক'রে? নিজের নিজের স্থানে সকলেই যে বড়। আমরা যেমন এখানে রয়েছি, তেমনি সূর্য, চন্দ্র, তারাতেও আছি। আত্মা দেশকালের অতীত ও সর্বব্যাপী। যে-কোন মুখে সেই প্রভুর গুণগান উচ্চারিত হচ্ছে, তাই আমার মুখ; যে-কোন চক্ষু কোন বস্তু দেখছে, তাই আমার চক্ষু। আমরা কোন নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ নই; আমরা দেহ নই, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই আমাদের দেহ। আমরা যেন ঐন্দ্রজালিকের মতো মায়াযষ্টি ঘোরাচ্ছি, আর ইচ্ছামত আমাদের সম্মুখে নানা দৃশ্য সৃষ্টি করছি। আমরা যেন মাকড়সার মতো আমাদেরই নির্মিত বৃহৎ জালের মধ্যে—মাকড়সা যখনই ইচ্ছা করে, তখনই তার জালের সুতোগুলোর যে-কোনটাতে যেতে পারে। বর্তমানে সে যেখানে রয়েছে, সেইটাই জানতে পারছে, কিন্তু কালে সমস্ত জালটাকে জানতে পারবে। আমরাও এখন যেখানে আমাদের দেহটা রয়েছে, সেখানেই নিজ সত্তা অনুভব করছি, এখন একটি মস্তিষ্কমাত্র ব্যবহার করতে পারি, কিন্তু যখন পূর্ণজ্ঞান বা জ্ঞানাতীত অবস্থায় উপনীত হই, তখন আমরা সব জানতে পারি, সব মস্তিষ্ক ব্যবহার করতে পারি। এখনই আমরা আমাদের বর্তমান জ্ঞানকে ধাক্কা দিয়ে এমন ঠেলে দিতে পারি যে, সে তার সীমা ছাড়িয়ে চলে গিয়ে জ্ঞানাতীত বা পূর্ণজ্ঞানভূমিতে কাজ করতে থাকবে।

আমরা চেষ্টা করছি, কেবল অস্তি-মাত্র, সৎস্বরূপ হ'তে—তাতে 'আমি' পর্যন্ত থাকবে না—কেবল শুদ্ধ স্ফটিকের মতো হবে; তাতে সমগ্র জগতের প্রতিবিম্ব পড়বে, কিন্তু তা যেমন তেমনই থাকবে। এই অবস্থা লাভ হ'লে আর ক্রিয়া কিছু থাকে না, শরীরটা কেবল যন্ত্রের মতো হয়ে যায়; সে সদা শুদ্ধভাবাপন্নই থাকে, তার শুদ্ধির জন্য আর চেষ্টা করতে হয় না; সে অপবিত্র হতেই পারে না।

নিজেকে সেই অনন্তস্বরূপ ব'লে জানো, তা হ'লে ভয় একদম চলে যাবে। সর্বদাই বলো, 'আমি ও আমার পিতা (ঈশ্বর) এক।'[১]

আঙুরগাছে যেমন থোলো থোলো আঙুর ফলে, ভবিষ্যতে তেমনই থোলো থোলো খ্রীষ্টের অভ্যুদয় হবে। তখন সংসার-খেলা শেষ হয়ে যাবে। সকলেই সংসারচক্র থেকে বেরিয়ে মুক্ত হয়ে যাবে। যেমন একটা কেটলিতে জল চড়ানো হয়েছে; জল ফুটতে আরম্ভ করলে প্রথমে একটার পর একটা ক'রে বুদ্বুদ উঠতে থাকে, ক্রমে এই বুদ্বুদগুলোর সংখ্যা বেশী হ'তে থাকে, শেষে সমস্ত জলটা টগবগ ক'রে ফুটতে থাকে ও বাষ্প হয়ে বেরিয়ে যায়। বুদ্ধ ও খ্রীষ্ট এই পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় দুটি বুদ্বুদ। মুশা ছিলেন একটি ছোট বুদ্বুদ, তারপর ক্রমশঃ বড় বড় আরও সব বুদ্বুদ উঠেছে। কোন সময়ে কিন্তু জগৎসুদ্ধ এইরূপ বুদ্বুদ হয়ে বাষ্পাকারে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু সৃষ্টি তো অবিরাম প্রবাহে চলছেই, আবার নূতন জলের সৃষ্টি হয়ে ঐ পূর্ব প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চলতে থাকবে।

সোমবার, ২৪শে জুন

অদ্য স্বামীজী 'নারদীয় ভক্তিসূত্র' হইতে স্থানে স্থানে পাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন:

'ভক্তি ঈশ্বরে পরমপ্রেমস্বরূপ এবং অমৃতস্বরূপ—যা লাভ ক'রে মানুষ সিদ্ধ হয়, অমৃতত্বলাভ করে ও তৃপ্ত হয়—যা পেলে আর কিছুই আকাঙ্ক্ষা করে না, কোন কিছুর জন্য শোক করে না, কারও প্রতি দ্বেষ করে না, অপর কোন বিষয়ে আনন্দ অনুভব করে না এবং সাংসারিক কোন বিষয়েই উৎসাহ বোধ করে না—যা জেনে মানব মত্ত হয়, স্তব্ধ হয় ও আত্মারাম হয়।'[২]

গুরুদেব বলতেন, 'এই জগৎটা একটা মস্ত পাগলা-গারদ। এখানে সবাই পাগল, কেউ টাকার জন্য পাগল, কেউ মেয়েমানুষের জন্য পাগল, কেউ নামযশের জন্য পাগল, আর জনকতক ঈশ্বরের জন্য পাগল। অন্যান্য জিনিসের

১ I and my Father are one.—বাইবেল

২ নারদভক্তিসূত্র, ১।২।৬

জন্য পাগল না হয়ে ঈশ্বরের জন্য পাগল হওয়াই ভাল নয় কি? ঈশ্বর হচ্ছেন পরশমণি। তাঁর স্পর্শে মানুষ এক মুহূর্তে সোনা হয়ে যায়; আকারটা যেমন তেমনি থাকে বটে, কিন্তু প্রকৃতি বদলে যায়—মানুষের আকার থাকে, কিন্তু তার দ্বারা কারও অনিষ্ট করা যেতে পারে না, কিংবা কোন অন্যায় কর্ম হ'তে পারে না।'

'ঈশ্বরের চিন্তা করতে করতে কেউ কাঁদে, কেউ হাসে, কেউ গায়, কেউ নাচে, কেউ কেউ অদ্ভুত বিষয় সব বলে। কিন্তু সকলেই সেই এক ঈশ্বরেরই কথা কয়।'[১]

মহাপুরুষেরা ধর্মপ্রচার ক'রে যান, কিন্তু যীশু, বুদ্ধ, রামকৃষ্ণ প্রভৃতির ন্যায় অবতারেরা ধর্ম দিতে পারেন। তাঁরা কটাক্ষে বা স্পর্শমাত্রে অপরের মধ্যে ধর্মশক্তি সঞ্চারিত করতে পারেন। খ্রীষ্টধর্মে একেই পবিত্রাত্মার (Holy Ghost) শক্তি বলেছে—এই ব্যাপারকে লক্ষ্য করেই 'হস্ত-স্পর্শে'র (The laying-on of hands) কথা বাইবেলে কথিত হয়েছে। আচার্য (খ্রীষ্ট) প্রকৃতপক্ষেই শিষ্যগণের ভিতর শক্তিসঞ্চার করেছিলেন। একেই 'গুরু-পরম্পরাগত শক্তি' বলে। এই যথার্থ ব্যাপটিজম্‌ই (Baptism—দীক্ষা) অনাদিকাল থেকে জগতে চলে আসছে।

'ভক্তিকে কোন বাসনাপূরণের সহায়রূপে গ্রহণ করতে পারা যায় না, কারণ ভক্তিই সমুদয় বাসনা-নিরোধের কারণস্বরূপ।'[২] নারদ ভক্তির এই লক্ষণগুলি দিয়েছেন, 'যখন সমুদয় চিন্তা, সমুদয় বাক্য ও সমুদয় ক্রিয়া তাঁর প্রতি অর্পিত হয় এবং ক্ষণকালের নিমিত্ত তাঁকে বিস্মৃত হ'লে হৃদয়ে পরম ব্যাকুলতা উপস্থিত হয়, তখনই যথার্থ ভক্তির উদয় হয়েছে, বুঝতে হবে।'[৩]

'পূর্বোক্ত ভক্তিই প্রেমের সর্বোচ্চ অবস্থা। কারণ অন্যান্য সাধারণ প্রেমে প্রেমিক প্রেমাস্পদের কাছ থেকে প্রতিদান চায়, কিন্তু ভক্ত এই প্রেমে কেবল তাঁর সুখে সুখী হয়ে থাকে।'[৪]

---

১ তুলনীয়: ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচিদ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ।
—শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।৩।৩২

২ ওঁ সা ন কাময়মানা নিরোধরূপাৎ।—নারদভক্তিসূত্র, ২, ৭

৩ ওঁ নারদস্তু তদর্পিতাখিলাচারতা তদ্বিস্মরণে পরমব্যাকুলতেতি।—ঐ, ৩, ১৯

৪ ওঁ নাস্ত্যেব তস্মিন্ তৎসুখসুখিত্বম্।—ঐ, ৩, ২৪

'প্রকৃত ভক্তিলাভ হ'লে যে সবকিছু ত্যাগ হয়—বলা হয়েছে, তার তাৎপর্য—ভক্তের সমুদয় লৌকিক ও বৈদিক কর্ম ত্যাগ হয়ে যায়।'

'যখন অন্য সব ত্যাগ ক'রে চিত্ত ঈশ্বরের দিকে যায়, তাঁর শরণাগত হয়, তাঁর বিরোধী সমুদয় বিষয়ে উদাসীন হয়, তখনই বুঝতে হবে, যথার্থ ভক্তিলাভ হ'তে চলেছে।'[১]

'যতদিন না ভক্তিতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হচ্ছ, ততদিন শাস্ত্রবিধি মেনে চলতে হবে।'[২]

যতদিন না তোমার চিত্তের এতদূর দৃঢ়তা হচ্ছে যে, শাস্ত্রবিধি প্রতিপালন না করলেও তোমার হৃদয়ের যথার্থ ভক্তিভাব নষ্ট হয় না, ততদিন ঐগুলি মেনে চল, কিন্তু তারপর তুমি শাস্ত্রের পারে চলে যাও। শাস্ত্রের বিধিনিষেধ মেনে চলাই জীবনের চরম উদ্দেশ্য নয়। আধ্যাত্মিক সত্যের একমাত্র প্রমাণ প্রত্যক্ষ করা। প্রত্যেককে নিজে নিজে পরীক্ষা ক'রে দেখতে হবে। যদি কোন ধর্মাচার্য বলেন, আমি এই সত্য দর্শন করেছি, কিন্তু তোমরা কোনকালে পারবে না, তাঁর কথায় বিশ্বাস ক'রো না; কিন্তু যিনি বলেন, তোমরাও চেষ্টা করলে দর্শন করতে পারো, কেবল তাঁর কথায় বিশ্বাস করবে। জগতের সকল যুগের সকল দেশের সকল শাস্ত্র সকল সত্যই বেদ। কারণ এই-সব সত্য প্রত্যক্ষ করতে হয়, আর যে-কোন মানুষই ঐ-সব সত্য আবিষ্কার করতে পারে।

যখন ভক্তিসূর্যের কিরণে দিগন্ত প্রথম উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তখন আমরা সকল কর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করতে চাই এবং এক মুহূর্ত তাঁকে বিস্মৃত হ'লে অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করি।

ঈশ্বর ও তাঁর প্রতি তোমার ভক্তি—এ দুয়ের মাঝখানে যেন আর কিছু না বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাঁকে ভক্তি কর, তাঁর প্রতি অনুরাগী হও, তাঁকে ভালোবাসো, জগতের লোক যে যা বলে বলুক, গ্রাহ্য ক'রো না। প্রেমভক্তি তিন প্রকার[৩]—প্রথম প্রকারে দাবির ভাব, নিজে কিছু দেয় না; দ্বিতীয়

১ ওঁ নিরোধস্তু লোকবেদব্যাপারসন্ন্যাসঃ।
ওঁ তস্মিন্ অনন্যতা তদ্বিরোধিষু উদাসীনতা।—ঐ, ২, ৮-৯

২ ওঁ ভবতু নিশ্চয়দার্ঢ্যাদূর্ধ্বং শাস্ত্ররক্ষণম্।—ঐ ২, ১২

৩ সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা

প্রকারে বিনিময়ের ভাব থাকে; তৃতীয় প্রকারে প্রতিদানের কোন চিন্তা নেই। যেন আলোর প্রতি পতঙ্গের ভালবাসা—পুড়ে মরবে, তবু ভালবাসতে ছাড়বে না।

'এই ভক্তি—কর্ম, জ্ঞান ও যোগ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।'[১]

কর্মের দ্বারা কর্মকর্তার নিজেরই চিত্তশুদ্ধি হয়, তার দ্বারা অপরের কোন উপকার হয় না। কর্ম দ্বারা আমাদের নিজেদের সমস্যা সমাধান করতে হবে, মহাপুরুষেরা কেবল আমাদের পথ দেখিয়ে দেন মাত্র। যা চিন্তা কর, তাই হয়ে যাও—'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।' যীশুর উপর যদি তুমি তোমার ভার দাও, তা হ'লে তোমায় সদা সর্বদা তাঁকে চিন্তা করতে হবে, এই চিন্তার ফলে তুমি তদ্ভাবাপন্ন হয়ে যাবে, তুমি তাঁকে ভালবাসবে। এইরূপ সদা সর্বদা ভাবনার নামই ভক্তি বা প্রেম।

'পরা ভক্তি ও পরা বিদ্যা এক জিনিস।'

তবে ঈশ্বর-সম্বন্ধে কেবল নানা মত-মতান্তরের আলোচনা করলে চলবে না। তাঁকে ভালবাসতে হবে এবং সাধন করতে হবে। সংসার ও সাংসারিক বিষয় সব ত্যাগ কর, বিশেষতঃ যতদিন 'চারাগাছ'—মন শক্ত না হয়। দিবারাত্র ঈশ্বরচিন্তা কর এবং যতদূর সম্ভব অন্য বিষয়ের চিন্তা ছেড়ে দাও। দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় চিন্তাগুলি সবই ঈশ্বর-ভাবিত হয়ে করা যেতে পারে।

'শয়নে প্রণামজ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান,
আহার কর মনে কর, আহুতি দিই শ্যামা মারে।'

সকল কার্যে, সকল বস্তুতে তাঁকে দর্শন কর। অপরের সঙ্গে ঈশ্বরবিষয়ে আলাপ কর। এতে আমাদের সাধনপথে খুব সাহায্য হয়ে থাকে।

ভগবানের অথবা তাঁর যোগ্যতম সন্তান যে-সব মহাপুরুষ—তাঁদের কৃপালাভ কর।[২] এই দুটিই হচ্ছে ভগবান্‌লাভের প্রধান উপায়।

এই-সকল মহাপুরুষের সঙ্গলাভ হওয়া বড়ই কঠিন, পাঁচ মিনিট কাল তাঁদের সঙ্গলাভ করলে সারাটা জীবন বদলে যায়।[৩] আর যদি সত্যসত্য

১ ওঁ সা তু কর্মজ্ঞানযোগেভ্যোঽপ্যধিকতরা।—নারদভক্তিসূত্র, ৪, ২৫

২ ওঁ মুখ্যতস্তু মহৎকৃপয়ৈব ভগবৎকৃপালেশাদ্বা।—ঐ, ৫, ৩৮

৩ ওঁ মহৎসঙ্গস্তু দুর্লভোঽগম্যোঽমোঘশ্চ।—ঐ, ৫, ৩৯

প্রাণে প্রাণে এই মহাপুরুষ-সঙ্গ চাও, তবে তোমার কোন-না-কোন মহাপুরুষের সঙ্গলাভ হবেই হবে।

এই ভক্তেরা যেখানে থাকেন, সেই স্থান তীর্থস্বরূপ হয়ে যায়; তাঁরা যা বলেন, তাই শাস্ত্রস্বরূপ; তাঁরা যে কোন কার্য করেন, তাই সৎকর্ম; এমনি তাঁদের মাহাত্ম্য।[১] তাঁরা যে স্থানে বাস করেছেন, সেই স্থান তাঁদের দেহনিঃসৃত পবিত্র শক্তি-স্পন্দনে পূর্ণ হয়ে যায়; যারা সেখানে যায়, তারাই এই স্পন্দন অনুভব করে; তাতে তাদেরও ভিতরে পবিত্রভাবের সঞ্চার হ'তে থাকে।

'এইরূপ ভক্তগণের ভিতর জাতি, বিদ্যা, রূপ, কুল, ধন প্রভৃতির ভেদ নাই। যেহেতু তারা তাঁর।'[২]

অসৎসঙ্গ একেবারে ছেড়ে দাও, বিশেষতঃ প্রথমাবস্থায়। বিষয়ী লোকদের সঙ্গ ত্যাগ কর, তাতে চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়ে থাকে। 'আমি, আমার' এই ভাব সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ কর। জগতে যাঁর 'আমার' বলতে কিছুই নেই, ভগবান্ তাঁরই কাছে আসেন। সব রকম মায়িক প্রীতির বন্ধন কেটে ফেল। আলস্য ত্যাগ কর। 'আমার কি হবে?'—এরূপ ভাবনা একেবারে ভেবো না। তুমি যে-সব কাজ করেছ, তার ফলাফল দেখবার জন্য ফিরেও চেও না। ভগবানে সব সমর্পণ ক'রে কর্ম ক'রে যাও, কিন্তু ফলাফলের চিন্তা একেবারে ক'রো না।[৩] যখন সব মনপ্রাণ এক অবিচ্ছিন্ন ধারায় ভগবানের দিকে যায়, যখন টাকাকড়ি বা নামযশ খুঁজে বেড়াবার সময় থাকে না, ভগবান্ ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করবার অবসর থাকে না, তখনই হৃদয়ে সেই অপার অপূর্ব প্রেমানন্দের উদয় হবে। বাসনাগুলো তো শুধু কাচের পুঁতির মতো অসার জিনিস।

প্রকৃত প্রেম বা ভক্তি অহেতুকী, 'এতে কোন কামনা নেই, এটি নিত্য নূতন ও প্রতিক্ষণ বাড়তে থাকে', এটি সূক্ষ্ম অনুভবস্বরূপ। অনুভবের দ্বারাই একে বুঝতে হয়, ব্যাখ্যা ক'রে বোঝানো যায় না।[৪]

---

১ ওঁ তীর্থীকুর্বন্তি তীর্থানি, সুকর্মীকুর্বন্তি কর্মাণি, সচ্ছাস্ত্রীকুর্বন্তি শাস্ত্রাণি।
ওঁ তন্ময়াঃ।—ঐ, ৯।৬৯-৭০

২ ওঁ নাস্তি তেষু জাতিবিদ্যারূপকুলধনক্রিয়াদিভেদঃ।
ওঁ যতস্তদীয়াঃ।—ঐ, ৯।৭২-৭৩

৩ নারদভক্তিসূত্র, ৬।৪৩-৪৯

৪ ওঁ গুণরহিতং কামনারহিতং প্রতিক্ষণবর্ধমানমবিচ্ছিন্নং সূক্ষ্মতরমনুভবরূপম্।—ঐ, ৭।৫৪

'ভক্তিই সব চেয়ে সহজ সাধন। ভক্তি স্বাভাবিক, এতে কোন যুক্তিতর্কের অপেক্ষা নেই; ভক্তি স্বতঃপ্রমাণ, এতে আর অন্য কোন প্রমাণের অপেক্ষা নেই।'[1] কোন বিষয়কে আমাদের মনের দ্বারা সীমাবদ্ধ করাকে যুক্তি বলে। আমরা যেন (মনরূপ) জাল ফেলে কোন বস্তুকে ধরে বলি; এই বিষয়টা প্রমাণ করেছি। কিন্তু ঈশ্বরকে আমরা কখনও জাল দিয়ে ধরতে পারব না—কোন কালেও নয়।

ভক্তি নিরপেক্ষ হওয়া চাই। এমন কি, আমরা যখন প্রেমের অযোগ্য কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে ভালবাসি, তখনও তা প্রকৃত প্রেম, প্রকৃত আনন্দের খেলা। প্রেমকে যেরূপেই ব্যবহার করি না কেন, শক্তি সেই একই। 'প্রেমের প্রকৃত ভাব শান্তি ও আনন্দ।'[2]

হত্যাকারী যখন নিজ শিশুকে চুম্বন করে, তখন সে ভালবাসা ছাড়া আর সব ভুলে যায়। অহংটাকে একেবারে নাশ ক'রে ফেলো। কাম ক্রোধ ত্যাগ কর—ঈশ্বরকে সর্বস্ব সমর্পণ কর। 'নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু'—পুরাতন মানুষটা একেবারে চলে গেছে, কেবল একমাত্র তুমিই আছ। 'আমি—তুমি'। কারও নিন্দা ক'রো না। যদি দুঃখ বিপদ আসে, জেনো—ঈশ্বর তোমার সঙ্গে খেলা করছেন, আর এইটি জেনে পরম আনন্দিত হও।

ভক্তি বা প্রেম দেশকালের অতীত, উহা পূর্ণস্বরূপ, নিরপেক্ষ।

মঙ্গলবার, ২৫শে জুন

যখনই কোন সুখভোগ করবে, তারপর দুঃখ আসবেই আসবে—এই দুঃখ তখন তখনই আসতে পারে, অথবা খুব বিলম্বেও আসতে পারে। যে আত্মা যত উন্নত, তার সুখের পর দুঃখ তত শীঘ্র আসবে। আমরা যা চাই, তা সুখও নয়, দুঃখও নয়। এ উভয়ই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ ভুলিয়ে দেয়। উভয়ই শিকল—একটা লোহার শিকল, অপরটা সোনার শিকল। ঐ উভয়ের পশ্চাতেই আত্মা রয়েছেন—তাঁতে সুখও নেই, দুঃখও নেই। সুখ-দুঃখ উভয়ই অবস্থাবিশেষ, আর অবস্থামাত্রেই সদা পরিবর্তনশীল। কিন্তু

১ ওঁ অন্যস্মাৎ সৌলভ্যং ভক্তৌ।
ওঁ প্রমাণান্তরস্যানপেক্ষত্বাৎ স্বয়ং প্রমাণত্বাৎ।—ঐ, ৮।৫৮-৫৯

২ ওঁ শান্তিরূপাৎ পরমানন্দরূপাচ্চ।—ঐ, ৮।৬০

আত্মা আনন্দস্বরূপ, অপরিণামী, শান্তিস্বরূপ। আমাদের আত্মাকে যে লাভ করতে হবে তা নয়; আমরা আত্মাকে পেয়েই আছি, কেবল তাঁর উপর যে ময়লা পড়েছে, সেটি ধুয়ে ফেলে তাঁকে দর্শন কর।

এই আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হও, তা হলেই আমরা জগৎকে ঠিক ঠিক ভালবাসতে পারব। খুব উচ্চভাবে প্রতিষ্ঠিত হও; আমি যে সেই অনন্ত আত্মস্বরূপ—এই জেনে আমাদের জগৎ-প্রপঞ্চের দিকে সম্পূর্ণ শান্তভাবে দৃষ্টিপাত করতে হবে। (এই জগৎটা একটি ছোট শিশুর খেলার মতো; আমরা যখন তা জানি, তখন জগতে যাই হোক না কেন, কিছুতেই আমাদের চঞ্চল করতে পারবে না। যদি প্রশংসা পেলে মন উৎফুল্ল হয়, তবে নিন্দায় নিশ্চয় বিষণ্ণ হবে। ইন্দ্রিয়ের, এমন কি মনেরও সমুদয় সুখ অনিত্য; কিন্তু আমাদের ভিতরেই সেই নিরপেক্ষ সুখ রয়েছে, যে সুখ কোন কিছুর উপর নির্ভর করে না। ঐ সুখ সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত সুখ, ঐ সুখ আনন্দস্বরূপ। সুখের জন্য বাইরের বস্তুর উপর নির্ভর না ক'রে যত ভিতরের উপর নির্ভর ক'রব—যতই আমরা 'অন্তঃসুখ, অন্তরারাম' হবো, আমরা ততই আধ্যাত্মিক হবো। এই আত্মানন্দকেই ধর্ম বলা হয়।)

অন্তর্জগৎ, যা বাস্তবিক সত্য, তা বহির্জগতের চেয়ে অনন্তগুণে বড়। বহির্জগৎটা সেই সত্য অন্তর্জগতের ছায়াময় প্রক্ষেপমাত্র। এই জগৎটা সত্যও নয়, মিথ্যাও নয়, এটা সত্যের ছায়ামাত্র। কবি বলেছেন, 'কল্পনা সত্যের সোনালী ছায়া।'

আমরা যখন সৃষ্টির মধ্যে প্রবেশ করি, তখনই তা আমাদের পক্ষে সজীব হয়ে ওঠে। আমাদের বাদ দিলে জগৎটা অচেতন, মৃত, জড়পদার্থ মাত্র। আমরাই জগতের পদার্থসমূহকে জীবন দান করছি, কিন্তু আবার মূর্খের মতো ঐ কথা ভুলে গিয়ে কখনও তা থেকে ভয় পাচ্ছি, কখনও আবার তাই ভোগ করতে যাচ্ছি।

সেই মেছুনীদের মতো হ'য়ো না। কয়েকজন মেছুনী আঁষচুবড়ি মাথায় ক'রে বাজার থেকে বাড়ি ফিরছিল—এমন সময় খুব ঝড়বৃষ্টি এলো। তারা বাড়ি যেতে না পেরে পথে তাদের এক আলাপী মালিনীর বাগানবাড়িতে আশ্রয় নিলে। মালিনী রাত্রে তাদের যে ঘরে শুতে দিলে, তার ঠিক পাশেই ফুলের বাগান। হাওয়াতে বাগানের সুন্দর সুন্দর ফুলের গন্ধ তাদের নাকে

আসতে লাগলো—সেই গন্ধ তাদের এত অসহ্য বোধ হ'তে লাগলো যে, তারা কোনমতে ঘুমাতে পারে না। শেষে তাদের মধ্যে একজন বললে, 'দেখ, আমাদের আঁষচুবড়িগুলোতে জল ছড়িয়ে দিয়ে মাথার কাছে রেখে দেওয়া যাক।' তাই করাতে যখন নাকের কাছে সেই আঁষচুবড়ির গন্ধ আসতে লাগলো, তখন তারা আরামে নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে লাগলো।

এই সংসারটা আঁষচুবড়ির মতো—আমরা যেন সুখভোগের জন্য ওর উপর নির্ভর না করি; যারা করে, তারা তামসপ্রকৃতি বা বদ্ধজীব। তারপর আবার রাজসপ্রকৃতির লোক আছে, তাঁদের অহংটা খুব প্রবল, তারা সদাই 'আমি, আমি' ব'লে থাকে। তারা কখন কখন সৎকার্য ক'রে থাকে, চেষ্টা করলে তারা ধার্মিক হ'তে পারে। কিন্তু সাত্ত্বিক প্রকৃতিই সর্বশ্রেষ্ঠ—তারা সদাই অন্তর্মুখ—তারা সদাই আত্মনিষ্ঠ। প্রত্যেক ব্যক্তিতেই এই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ আছে; এক এক সময় মানুষে এক এক গুণের প্রাধান্য হয় মাত্র।

সৃষ্টি মানে একটা কিছু নির্মাণ বা তৈরি করা নয়, সৃষ্টি মানে—যে সাম্য-ভাব নষ্ট হয়ে গেছে, সেইটাকে আবার ফিরে পাবার চেষ্টা, যেমন একটা শোলার ছিপি (cork) যদি টুকরো টুকরো ক'রে জলের নীচে ফেলে দেওয়া যায়, তা হ'লে সেগুলো যেমন আলাদা আলাদা বা একসঙ্গে কতকগুলো মিলে জলের উপরে ভেসে ওঠবার চেষ্টা করে, সেই রকম। যেখানে জীবন, যেখানে জগৎ, সেখানে কিছু না কিছু মন্দ, কিছু না কিছু অশুভ থাকবেই থাকবে। একটুখানি অশুভ থেকেই জগতের সৃষ্টি হয়েছে। জগতে যে কিছু কিছু মন্দ রয়েছে, এ খুব ভাল; কারণ সাম্যভাব এলে এই জগৎই নষ্ট হয়ে যাবে। সাম্য ও বিনাশ যে এক কথা। যতদিন এই জগৎ চলছে, ততদিন সঙ্গে সঙ্গে ভাল-মন্দও চলবে; কিন্তু যখন আমরা জগৎকে অতিক্রম করি, তখন ভাল-মন্দ দুয়েরই পারে চলে যাই—পরমানন্দ লাভ করি।

জগতে দুঃখবিরহিত সুখ, অশুভবিরহিত শুভ—কখন পাবার সম্ভাবনা নেই; কারণ জীবনের অর্থই হচ্ছে বিনষ্ট সাম্যভাব। আমাদের চাই মুক্তি; জীবন সুখ বা শুভ—এ সবের কোনটাই নয়। সৃষ্টিপ্রবাহ অনন্তকাল ধরে চলেছে—তার আদিও নেই, অন্তও নেই, যেন একটা অগাধ হ্রদের উপরকার সদা-গতিশীল তরঙ্গ। ঐ হ্রদের এমন সব গভীর স্থান আছে, যেখানে আমরা এখনও পৌঁছতে পারিনি এবং আর কতকগুলি জায়গা আছে, যেখানে সাম্য-

ভাব পুনঃস্থাপিত হয়েছে—কিন্তু উপরের তরঙ্গ সর্বদাই চলেছে, সেখানে অনন্তকাল ধরে ঐ সাম্যাবস্থালাভের চেষ্টা চলেছে। জীবন ও মৃত্যু একটা ব্যাপারেরই বিভিন্ন নামমাত্র, একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। উভয়ই মায়া—এ অবস্থাটা পরিষ্কার ক'রে বোঝাবার জো নেই—এক সময়ে বাঁচবার চেষ্টা হচ্ছে, আবার পরমুহূর্তে বিনাশ বা মৃত্যুর চেষ্টা। আমাদের যথার্থ স্বরূপ আত্মা—এ দুয়েরই পারে। আমরা যখন ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করি, তা আর কিছু নয়, তা প্রকৃতপক্ষে সেই আত্মাই—যা থেকে আমরা নিজেদের পৃথক্ ক'রে ফেলেছি, আর আমাদের থেকে পৃথক্ ব'লে উপাসনা করছি! কিন্তু সেই উপাস্য চিরকালই আমাদের প্রকৃত আত্মা, একও একমাত্র ঈশ্বর, যিনি পরমাত্মা।

সেই নষ্ট সাম্যাবস্থা ফিরে পেতে গেলে আমাদের প্রথমে তমঃকে ব্যর্থ করতে হবে রজঃ দ্বারা, পরে রজঃকে জয় করতে হবে সত্ত্ব দ্বারা। সত্ত্ব অর্থে সেই স্থির ধীর প্রশান্ত অবস্থা, যা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে, শেষে অন্যান্য ভাব একেবারে চলে যাবে। বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে দাও, মুক্ত হও, যথার্থ 'ঈশ্বরতনয়' হও, তবেই যীশুর মতো পিতাকে দেখতে পাবে। ধর্ম ও ঈশ্বর বলতে অনন্ত শক্তি, অনন্ত বীর্য বুঝায়। দুর্বলতা—দাসত্ব ত্যাগ কর। যদি তুমি মুক্তস্বভাব হও, তবেই তুমি কেবল আত্মা মাত্র; যদি মুক্তস্বভাব হও, তবেই অমৃতত্ব তোমার করতলগত; যদি তিনি মুক্তস্বভাব হন, তবেই ব'লব—ঈশ্বর যথার্থ আছেন।

* * *

জগৎটা আমার জন্য, আমি কখন জগতের জন্য নই। ভাল-মন্দ আমাদের দাসস্বরূপ, আমরা কখনও তাদের দাস নই। পশুর স্বভাব উন্নতি করা নয়, বরং যে অবস্থায় আছে, সেই অবস্থায় পড়ে থাকা; মানুষের স্বভাব মন্দ ত্যাগ ক'রে ভালটা পাবার চেষ্টা করা। আর দেবতার স্বভাব—ভালমন্দ কিছুর জন্য চেষ্টা থাকবে না—সর্বদা সর্বাবস্থায় আনন্দময় হয়ে থাকা। আমাদের দেবতা হ'তে হবে। হৃদয়টাকে সমুদ্রের মতো মহান্ ক'রে ফেলো; সাংসারিক তুচ্ছতার পারে চলে যাও; এমন কি অশুভ এলেও আনন্দে উন্মত্ত হয়ে যাও; জগৎটাকে একটা ছবির মতো দেখ; এইটি জেনে রাখো যে, জগতে কোন কিছুই তোমায় বিচলিত করতে পারে না; আর এইটি জেনে জগতের সৌন্দর্য

উপভোগ কর। জগতের সুখ কি রকম জানো?—যেমন ছোট ছোট ছেলেরা খেলা করতে করতে কাদার মধ্য থেকে কাচের পুঁতি কুড়িয়ে পেয়েছে। জগতের সুখদুঃখের উপর শান্তভাবে দৃষ্টিপাত কর, ভাল-মন্দ উভয়কেই সমান ব'লে দেখ—উভয়ই ভগবানের খেলা; সুতরাং ভালমন্দ, সুখদুঃখ—সবেতেই আনন্দ কর।

* * *

আমার গুরুদেব বলতেন, 'সবই নারায়ণ বটে, কিন্তু বাঘ-নারায়ণের কাছ থেকে সরে থাকতে হয়। সব জলই নারায়ণ বটে, তবে ময়লা জল খাওয়া যায় না।'

'গগনময় থালে রবিচন্দ্র-দীপক জ্বলে'—অন্য মন্দিরের আর কি দরকার? 'সব চক্ষু তোমার চক্ষু, অথচ তোমার চক্ষু নেই; সব হস্ত তোমার হস্ত, অথচ তোমার হস্ত নেই।'

কিছু পাবার চেষ্টা ক'রো না, কিছু এড়াবার চেষ্টাও ক'রো না—যা কিছু আসে গ্রহণ কর, যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্ট হও। কোন কিছুতে বিচলিত না হওয়াই মুক্তি বা স্বাধীনতা। কেবল সহ্য ক'রে গেলে হবে না, একেবারে অনাসক্ত হও। সেই ষাঁড়ের গল্পটি মনে রেখো।

একটা মশা অনেকক্ষণ ধরে একটা ষাঁড়ের শিঙে বসেছিল—অনেকক্ষণ বসবার পর তার বিবেকবুদ্ধি জেগে উঠল; হয়তো ষাঁড়ের শিঙে বসে থাকার দরুন তার বড় কষ্ট হচ্ছে—এই মনে ক'রে সে ষাঁড়কে সম্বোধন ক'রে বলতে লাগল, 'ভাই ষাঁড়, আমি অনেকক্ষণ তোমার শিঙের উপর বসে আছি, বোধ হয় তোমার অসুবিধে হচ্ছে, আমায় মাপ কর, এই আমি উড়ে যাচ্ছি।' ষাঁড় বললে, 'না, না, তুমি সপরিবারে এসে আমার শিঙে বাস কর না—তাতে আমার কি এসে যায়?'

বুধবার, ২৬শে জুন

যখন আমাদের অহংজ্ঞান থাকে না, তখনই আমরা সবচেয়ে ভাল কাজ করতে পারি, অপরকে আমাদের ভাবে সবচেয়ে বেশী অভিভূত করতে পারি। বড় বড় প্রতিভাশালী লোকেরা সকলেই এ-কথা জানেন। ঈশ্বরই একমাত্র যথার্থ কর্তা—তাঁর কাছে হৃদয় খুলে দাও, নিজে নিজে কিছু করতে যেও না।

শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলছেন, 'ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।'—হে অর্জুন, ত্রিলোকে আমার কর্তব্য ব'লে কিছুই নেই। তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর কর, সম্পূর্ণভাবে অনাসক্ত হও, তা হলেই তোমার দ্বারা কিছু কাজ হবে। যে-সব শক্তিতে কাজ হয়, সেগুলি তো আর আমরা দেখতে পাই না, আমরা কেবল তাদের ফলটা দেখতে পাই মাত্র। অহংকে সরিয়ে দাও, নাশ ক'রে ফেলো, ভুলে যাও; তোমার ভিতর দিয়ে ঈশ্বর কাজ করুন—এ তো তাঁরই কাজ। আমাদের আর কিছু করতে হবে না—কেবল সরে দাঁড়াতে হবে, তাঁকে কাজ করতে দিতে হবে। আমরা যত সরে যাব, ততই ঈশ্বর আমাদের ভিতর আসবেন। 'কাঁচা আমি'টাকে দূর ক'রে দাও। কেবল 'পাকা আমি'টাই থাক।

আমরা এখন যা হয়েছি, তা আমাদের চিন্তারই ফলস্বরূপ। সুতরাং তোমরা কি চিন্তা কর, সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রেখো। বাক্য তো গৌণ জিনিস। চিন্তাগুলিই বহুকালস্থায়ী, আর তাদের গতিও বহুদূরব্যাপী। আমরা যে কোন চিন্তা করি, তাতে আমাদের চরিত্রের ছাপ লেগে যায়; এইজন্য সাধুপুরুষদের ঠাট্টায় বা গালাগালিতে পর্যন্ত তাঁদের হৃদয়ের ভালবাসা ও পবিত্রতার একটুখানি রয়ে যায় এবং তা আমাদের কল্যাণসাধনই করে।

কিছুই কামনা ক'রো না। ঈশ্বরের চিন্তা কর, কিন্তু কোন ফল-কামনা ক'রো না। যাঁরা কামনাশূন্য, তাঁদেরই কাজ ফলপ্রসূ। ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসীরা লোকের দ্বারে দ্বারে ধর্ম বহন ক'রে নিয়ে যান, কিন্তু তাঁরা মনে করেন, আমরা কিছুই করছি না। তাঁরা কোনরূপ দাবিদাওয়া করেন না, তাঁদের কাজ অজ্ঞাতসারেই হয়ে থাকে। যদি তাঁরা (ঐহিক) জ্ঞান-বৃক্ষের ফল[১] খান, তা হ'লে তো তাদের অহঙ্কার এসে যাবে, আর যা কিছু লোককল্যাণ তাঁরা করবেন—সব লোপ পেয়ে যাবে। যখনই আমরা 'আমি' এই কথা বলি, তখনই আমরা আহাম্মক ব'নে যাই আর বলি, আমরা 'জ্ঞান'লাভ করেছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'চোখঢাকা বলদের মতো' আমরা ঘানিতেই ক্রমাগত ঘুরছি। ভগবান্ বেশ ভালভাবে আপনাকে লুকিয়ে

১ 'Tree of Knowledge'—*Bible*, O.T., Genesis

রেখেছেন, তাই তাঁর কাজও খুব ভাল। এইরূপ যিনি আপনাকে সম্পূর্ণ লুকিয়ে রাখতে পারেন, তিনি সবচেয়ে বেশী কাজ করতে পারেন। নিজেকে জয় কর, তা হলেই সমুদয় জগৎ তোমার পদতলে আসবে।

সত্ত্বগুণে অবস্থিত হ'লে আমরা সকল বস্তুর আসল স্বরূপ দেখতে পাই, তখন আমরা পঞ্চেন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির অতীত দেশে চলে যাই। অহংই সেই বজ্রদৃঢ় প্রাচীর, যা আমাদের বদ্ধ ক'রে রেখেছে—সত্যের মুক্ত বাতাসে যেতে দিচ্ছে না—সকল বিষয়েই, সকল কাজেই 'আমি, আমার' এই ভাব মনে এনে দেয়—আমরা ভাবি, আমি অমুক কাজ করেছি, তমুক কাজ করেছি, ইত্যাদি। এই ক্ষুদ্র আমিত্বটাকে দূর ক'রে দাও, আমাদের মধ্যে এই যে অহংরূপ শয়তানি ভাব রয়েছে, তাকে একেবারে মেরে ফেলো। 'নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু' এই মন্ত্র উচ্চারণ কর, প্রাণে প্রাণে এটা অনুভব কর, জীবনে ঐ ভাবটাকে নিয়ে এস। যতদিন না এই অহংভাবগঠিত জগৎটাকে ত্যাগ করতে পারছি, ততদিন আমরা কখনই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারব না, কেউ কখনও পারেনি, আর পারবেও না। সংসারত্যাগ করা মানে—এই 'অহং'টাকে একেবারে ভুলে যাওয়া, অহংটার দিকে একেবারে খেয়াল না রাখা; দেহে বাস করা যেতে পারে, কিন্তু আমরা যেন দেহের না হয়ে যাই। এই দুষ্ট 'আমিটা'কে একেবারে নষ্ট ক'রে ফেলতে হবে। লোকে যখন তোমায় মন্দ বলবে, তুমি তাদের আশীর্বাদ ক'রো; ভেবে দেখো, তারা তোমার কত উপকার করছে; অনিষ্ট যদি কারও হয়, তো কেবল তাদের নিজেদের হচ্ছে। এমন জায়গায় যাও, যেখানে লোকে তোমাকে ঘৃণা করে; তারা তোমার অহংটাকে মেরে মেরে তোমার ভেতর থেকে বার ক'রে দিক—তুমি তা হ'লে ভগবানের খুব কাছে অগ্রসর হবে। বানরী যেমন তার বাচ্চাকে আঁকড়ে ধরে থাকে, কিন্তু পরিশেষে বাধ্য হ'লে তাকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে তাকে পদদলিত করতেও পশ্চাৎপদ হয় না, সেইরূপ আমরাও সংসারটাকে যতদিন পারি আঁকড়ে ধরে থাকি, কিন্তু অবশেষে যখন তাকে পদদলিত করতে বাধ্য হই, তখনই আমরা ঈশ্বরের কাছে যাবার অধিকারী হই। ন্যায়ধর্মের জন্য যদি অপরের অত্যাচার সহ্য করতে হয় তো আমরা ধন্য; যদি আমরা লিখতে পড়তে না জানি তো আমরা ধন্য; আমাদের ঈশ্বরের কাছ থেকে তফাত করবার জিনিস অনেক কমে গেল।

ভোগ হচ্ছে লক্ষফণা সাপ—তাকে আমাদের পদদলিত করতে হবে। আমরা এই ভোগ ত্যাগ ক'রে অগ্রসর হ'তে থাকি ; কিছুই না পেয়ে হয়তো আমারা নৈরাশ্যে অবসন্ন হই। কিন্তু লেগে থাকো, লেগে থাকো—কখনই ছেড়ো না। এই সংসারটা একটা অসুরের মতো। এ সংসার যেন একটা রাজ্য—আমাদের ক্ষুদ্র 'অহং' যেন তার রাজা। তাকে সরিয়ে দিয়ে দৃঢ় হয়ে দাঁড়াও। কামকাঞ্চন, নামযশ ত্যাগ ক'রে দৃঢ়ভাবে ঈশ্বরকে ধরে থাকো, অবশেষে আমরা সুখে দুঃখে সম্পূর্ণ উদাসীনতা লাভ ক'রব। ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতাই সুখ—এ ধারণা একেবারে জড়বাদী। ওতে এক কণাও যথার্থ সুখ নেই ; যা কিছু সুখ, তা সেই প্রকৃত আনন্দের প্রতিবিম্বমাত্র।

যাঁরা ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করেছেন, তাঁরা তথাকথিত কর্মীদের চেয়ে জগতের জন্য অনেক বেশী কাজ করেন। আপনাকে সম্পূর্ণ শুদ্ধ করেছে, এমন একজন লোক হাজার ধর্মপ্রচারকের চেয়ে বেশী কাজ করে। চিত্তশুদ্ধি ও মৌন থেকেই কথার ভিতর জোর আসে।

পদ্মের মতো হও। পদ্ম এক জায়গাতেই থাকে, কিন্তু যখন ফুটে ওঠে, তখন চারদিক থেকে মৌমাছি আপনি এসে জোটে।

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন ও শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব জগতের ভিতর পাপ বা অশুভ দেখতে পেতেন না—তিনি জগতে কিছু মন্দ দেখতে পেতেন না, কাজেই সেই মন্দ দূর করবার জন্য চেষ্টা করারও কোন প্রয়োজন বোধ করতেন না। আর কেশবচন্দ্র একজন মস্ত নৈতিক সংস্কারক, নেতা এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। দ্বাদশবর্ষ পরে এই শান্তপ্রকৃতি দক্ষিণেশ্বরের মহাপুরুষ শুধু ভারতে নয়, সমগ্র জগতের ভাবরাজ্যে এক বিরাট পরিবর্তন এনে দিয়ে গেছেন। এই-সকল নীরব মহাপুরুষ বাস্তবিক মহাশক্তির আধার—তাঁরা প্রেমে তন্ময় হয়ে জীবন-যাপন ক'রে ভব-রঙ্গমঞ্চ হ'তে সরে যান। তাঁরা কখন 'আমি, আমার' বলেন না। তাঁরা নিজেদের ঈশ্বরের যন্ত্রস্বরূপ জ্ঞান করেই ধন্য মনে করেন। এরূপ ব্যক্তিগণই খ্রীষ্ট ও বুদ্ধসকলের নির্মাতা। তাঁরা সদাই ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে তাদাত্ম্য লাভ করেন, এই বাস্তব জগৎ থেকে বহুদূরে এক ভাবজগতে বাস করেন। তাঁরা কিছুই চান না এবং জ্ঞাতসারে কিছু করেনও না। তাঁরাই প্রকৃতপক্ষে জগতের সর্বপ্রকার উচ্চভাবের প্রেরকস্বরূপ—তাঁরা

জীবন্মুক্ত, একেবারে অহংশূন্য। তাঁদের ক্ষুদ্র অহংজ্ঞান একেবারে উড়ে গেছে, কোন আকাঙ্ক্ষা একেবারেই নেই। তাঁদের ব্যক্তিত্ব লুপ্ত হয়ে গেছে, তাঁরা শুধুই তত্ত্বস্বরূপ।

বৃহস্পতিবার, ২৭শে জুন

(স্বামীজী অদ্য বাইবেলের নিউ টেস্টামেণ্ট লইয়া আসিলেন এবং পুনর্বার জনের গ্রন্থ পড়িয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।)

যীশুখ্রীষ্ট যে শান্তিদাতা পাঠিয়ে দেবেন বলেছিলেন, মহম্মদ আপনাকে সেই 'শান্তিদাতা' বলে দাবি করতেন। তাঁর মতে—যীশুখ্রীষ্টের অলৌকিক ভাবে জন্ম হয়েছিল, এ-কথা স্বীকার করবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই। সকল যুগে, সকল দেশেই এইরূপ দাবি দেখতে পাওয়া যায়। সকল মহামানব দাবি করেছেন, দেবতা থেকেই তাঁদের জন্ম।

জ্ঞান আপেক্ষিক মাত্র। আমরা ঈশ্বর হ'তে পারি, কিন্তু তাঁকে কখন জানতে পারি না। জ্ঞান একটা নিম্নতর অবস্থামাত্র। তোমাদের বাইবেলেও আছে, আদম যখন 'জ্ঞানলাভ' করলেন, তখনই তাঁর পতন হ'ল। তার পূর্বে তিনি স্বয়ং সত্যস্বরূপ, পবিত্রতা-স্বরূপ, ঈশ্বরস্বরূপ ছিলেন। আমাদের মুখ আমাদের থেকে কিছু পৃথক্ পদার্থ নয়, কিন্তু আমরা কখন আসল মুখটা দেখতে পাই না, শুধু প্রতিবিম্বটাই দেখতে পাই। আমরা নিজেরাই প্রেমস্বরূপ, কিন্তু যখন ঐ প্রেমসম্বন্ধে চিন্তা করতে যাই, তখনই দেখি—আমাদের একটা কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। তাতেই প্রমাণ হয় যে, জড়বস্তু চিন্তারই বহিঃপ্রকাশ।

নিবৃত্তি-অর্থে সংসার থেকে সরে আসা। হিন্দুদের পুরাণে আছে, প্রথম সৃষ্ট চারিজন ঋষিকে[১] হংসরূপী ভগবান্ শিক্ষা দিয়েছিলেন—সৃষ্টিপ্রপঞ্চ গৌণমাত্র; সুতরাং তাঁরা আর প্রজাসৃষ্টি করলেন না। এর তাৎপর্য এই যে, অভিব্যক্তির অর্থই অবনতি; কারণ আত্মাকে অভিব্যক্ত করতে গেলে শব্দ দ্বারা ঐ অভিব্যক্তি সাধিত হয়, আর 'শব্দ ভাবকে নষ্ট ক'রে ফেলে'।[২]

---

১ সনক, সনাতন, সনন্দন ও সনৎকুমার

২ 'The letter killeth'—*Bible*, N. T., 2 Corinthians, III, 6.

তা হলেও তত্ত্ব জড়াবরণে আবৃত না হয়ে থাকতে পারে না, যদিও আমরা জানি যে অবশেষে এইরূপ আবরণের দিকে লক্ষ্য রাখতে রাখতে আমরা আসলটাকেই হারিয়ে ফেলি। সকল বড় বড় আচার্যই এ-কথা বোঝেন, আর সেইজন্যই অবতারেরা পুনঃ পুনঃ এসে আমাদের মূল তত্ত্বটি বুঝিয়ে দিয়ে যান, আর সেইকালের উপযোগী তার একটি নূতন আকার দিয়ে যান। আমার গুরুদেব বলতেনঃ ধর্ম এক; সকল অবতারকল্প পুরুষ একপ্রকার শিক্ষাই দিয়ে যান, তবে সকলকেই সেই তত্ত্বটি প্রকাশ করতে কোন-না-কোন আকার দিতে হয়। সেইজন্য তাঁরা তাকে তার পুরাতন আকার থেকে তুলে নিয়ে একটি নূতন আকারে আমাদের সামনে ধরেন। যখন আমরা নামরূপ থেকে—বিশেষতঃ দেহ থেকে মুক্ত হই, যখন আমাদের ভালমন্দ কোন দেহের প্রয়োজন থাকে না, তখনই কেবল আমরা বন্ধন অতিক্রম করতে পারি। অনন্ত উন্নতি মানে অনন্তকালের জন্য বন্ধন; তার চেয়ে সকল রকম আকারের ধ্বংসই বাঞ্ছনীয়। সব রকম দেহ, এমন কি দেবদেহ থেকেও আমাদের মুক্তিলাভ করতে হবে। ঈশ্বরই একমাত্র সত্যবস্তু, সত্যবস্তু কখনও দুটি থাকতে পারে না। একমাত্র আত্মাই আছেন, এবং 'আমিই সেই'।

মুক্তিলাভের সহায়ক বলেই শুভকর্মের যা মূল্য; তার দ্বারা—যে কাজ করে তারই কল্যাণ হয়, অপর কারও কিছু হয় না।

*　　　　　*

জ্ঞান মানে—শ্রেণীবদ্ধ করা, কতকগুলি জিনিসকে এক শ্রেণীর ভিতর ফেলা। আমরা একই প্রকারের অনেকগুলি জিনিস দেখলাম—দেখে সেই সবগুলির একটা কোন নাম দিলাম, তাতেই আমাদের মন শান্ত হ'ল। আমরা কেবল কতকগুলি 'ঘটনা' বা 'তথ্য' আবিষ্কার ক'রে থাকি, কিন্তু কেন সেগুলি ঘটছে, তা জানতে পারি না। অজ্ঞানের অন্ধকারেই আরও খানিকটা বেশী জায়গা এক পাক ঘুরে এসে আমরা মনে করি, কিছু জ্ঞানলাভ করলাম। এই জগতে 'কেন'র কোন উত্তর পাওয়া যেতে পারে না; 'কেন'র উত্তর পেতে হ'লে আমাদের ভগবানের কাছে যেতে হবে। 'জ্ঞাতা'কে কখন প্রকাশ করা যায় না। এ যেন এক টুকরো নুনের সমুদ্রে পড়ে যাওয়া—যেই প'ড়ল, অমনি গলে সমুদ্রে মিশে গেল।

বৈষম্যই সৃষ্টির মূল—এক-রসতা বা সমতাই ঈশ্বর। এই বৈষম্যভাবের পারে চলে যাও; তা হলেই জীবন ও মৃত্যু দুই-ই জয় করবে, এবং অনন্ত সমত্বে পৌঁছবে—তখনই ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হবে, ব্রহ্মস্বরূপ হবে। মুক্তিলাভ কর, সে চেষ্টায় প্রাণ যায়, তাও স্বীকার। একখানা বইয়ের সঙ্গে তার পাতাগুলির যে সম্বন্ধ, আমাদের সঙ্গে জন্মান্তরের জীবনগুলিরও সেই সম্বন্ধ; আমরা কিন্তু অপরিণামী, সাক্ষিস্বরূপ, আত্মস্বরূপ; আর তাঁরই উপর জন্মান্তরের ছায়া পড়ছে; যেমন একটা মশাল খুব জোরে জোরে ঘোরাতে থাকলে চোখে একটা বৃত্তের প্রতীতি হয়। আত্মাতেই সমস্ত ব্যক্তিত্বের সঙ্গতি; আর যেহেতু আত্মা অনন্ত, অপরিণামী ও অচঞ্চল, সেহেতু আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ—পরমাত্মা। আত্মাকে জীবন বলতে পারা যায় না, কিন্তু তাই থেকে সমুদয় জীবন গঠিত হয়। একে সুখ বলা যায় না, কিন্তু এই থেকেই সুখের উৎপত্তি হয়।

* * *

আজকাল জগতের লোক ভগবান্‌কে পরিত্যাগ করছে, কারণ তাদের ধারণা—জগতের যতদূর সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করা উচিত, তা তিনি করছেন না; তাই লোকে বলে থাকে, 'তাঁকে নিয়ে আমাদের লাভ কি?' ঈশ্বরকে একজন মিউনিসিপ্যালিটির কর্তা ব'লে ভাবতে হবে নাকি?

আমরা এইটুকু করতে পারি যে, আমাদের সব বাসনা, ঈর্ষা, ঘৃণা, ভেদবুদ্ধি—এইগুলিকে দূর ক'রে দিতে পারি। 'কাঁচা আমি'কে নষ্ট ক'রে ফেলতে হবে, মনকে মেরে ফেলতে হবে—এক-রকম মনে মনে আত্মহত্যা করা আর কি! শরীর ও মনকে পবিত্র ও সুস্থ রাখো—কিন্তু কেবল ঈশ্বরলাভ করবার যন্ত্ররূপে; ঐটুকুই এদের একমাত্র যথার্থ প্রয়োজন। কেবল সত্যের জন্যই সত্যের অনুসন্ধান কর; তার দ্বারা আনন্দলাভ হবে, এ-কথা ভেবো না। আনন্দ আপনা হ'তে আসতে পারে, কিন্তু তার জন্যই যেন সত্যলাভে উৎসাহিত হ'য়ো না। ঈশ্বরলাভ ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য রেখো না। সত্যলাভ করবার জন্য যদি নরকের ভিতর দিয়ে যেতে হয়, তাতেও পেছ-পা হ'য়ো না।

শুক্রবার, ২৮শে জুন

(অদ্য সকলেই স্বামীজীর সহিত বনভোজনে যাত্রা করিয়াছিলেন। যদিও স্বামীজী যেখানেই থাকিতেন, সেখানেই অবিরাম শিক্ষা দিতেন, অদ্যকার উপদেশের কোন প্রকার 'নোট' রাখা হয় নাই ; তাই তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কিছুই লিপিবদ্ধভাবে নাই। তবে বাহির হইবার পূর্বে প্রাতরাশের সময় তিনি এই কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন :)

সর্বপ্রকার অন্নের জন্য ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞ হও—অন্নই ব্রহ্মস্বরূপ। তাঁর সর্বব্যাপিনী শক্তিই আমাদের ব্যষ্টিশক্তিতে পরিণত হয়ে আমাদের সর্বপ্রকার কার্য করতে সাহায্য ক'রে থাকে।

শনিবার, ২৯শে জুন

(অদ্য স্বামীজী গীতা হাতে করিয়া উপস্থিত হইলেন।)

গীতায় 'হৃষীকেশ' অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বা (ইন্দ্রিয়যুক্ত) জীবাত্মাগণের ঈশ্বর কৃষ্ণ—'গুড়াকেশ'কে অর্থাৎ নিদ্রার অধীশ্বর (অর্থাৎ নিদ্রাজয়ী) অর্জুনকে উপদেশ দিচ্ছেন। এই সংসারই 'ধর্মক্ষেত্র' কুরুক্ষেত্র। পঞ্চপাণ্ডব (অর্থাৎ ধর্ম) শত কৌরবের (আমরা যে-সকল বিষয়ে আসক্ত এবং যাদের সঙ্গে আমাদের সতত বিরোধ তাদের) সঙ্গে যুদ্ধ করছেন! পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর অর্জুন (অর্থাৎ প্রবুদ্ধ জীবাত্মা) সেনাপতি। আমাদের সবচেয়ে আসক্তির বস্তু—সমুদয় ইন্দ্রিয়সুখের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে, তাদের মেরে ফেলতে হবে। আমাদের নিঃসঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। আমরা ব্রহ্মস্বরূপ, আমাদের আর সমস্ত ভাবকে এই ভাবে ডুবিয়ে দিতে হবে।

(শ্রীকৃষ্ণ সব কাজই করেছিলেন, কিন্তু আসক্তিবর্জিত হয়ে। তিনি সংসারে ছিলেন বটে, কিন্তু কখন সংসারের হয়ে যাননি। সকল কাজ কর, কিন্তু অনাসক্ত হয়ে কর ; কাজের জন্যই কাজ কর, কখনও নিজের জন্য ক'রো না।)

* * *

নামরূপাত্মক কোন কিছু কখন মুক্তস্বভাব হ'তে পারে না। মৃত্তিকা-রূপ আত্মা থেকে ঘটাদির মতো আমরা হয়েছি। এ অবস্থায় আত্মা সীমাবদ্ধ, আর মুক্ত নন ; আপেক্ষিক সত্তাকে কখনও মুক্ত বলা যেতে পারে না। ঘট যতক্ষণ ঘট থাকে, ততক্ষণ সে কখনই বলতে পারে না, 'আমি মুক্ত' ; যখনই

সে নামরূপ ভুলে যায়, তখনই মুক্ত হয়। সমুদয় জগৎটাই আত্মস্বরূপ—বহুভাবে অভিব্যক্ত, যেন এক সুরের মধ্যেই নানা রঙপরং তোলা হয়েছে—তা না হ'লে একঘেয়ে হয়ে পড়ত। সময়ে সময়ে বেসুরো বাজে বটে, তাতে বরং পরবর্তী সুরের ঐকতান আরও মিষ্ট লাগে। মহান্ বিশ্বসঙ্গীতে তিনটি ভাবের বিশেষ প্রকাশ দেখা যায়—সাম্য, শক্তি ও মুক্তি।

যদি তোমার স্বাধীনতা অপরকে ক্ষুণ্ণ করে, তা হ'লে বুঝতে হবে—তুমি স্বাধীন নও। অপরের কোন প্রকার ক্ষতি কখন ক'রো না।

মিল্টন বলেছেন, 'দুর্বলতাই দুঃখ।' কর্ম ও ফলভোগ—এই দুটির অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। অনেক সময়েই দেখা যায়, যে বেশী হাসে, তাকে কাঁদতেও হয় বেশী—যত হাসি তত কান্না। 'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন'—কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে নয়।

* * *

জড়বাদের দৃষ্টিতে দেখলে কুচিন্তাগুলিকে রোগবীজাণু বলা যেতে পারে। আমাদের দেহ যেন লৌহপিণ্ডের মতো আর আমাদের প্রত্যেক চিন্তা যেন তার উপর আস্তে আস্তে হাতুড়ির ঘা মারা—তাই দিয়ে আমরা দেহটাকে যেভাবে ইচ্ছা গঠন করি।

আমরা জগতের সমুদয় শুভচিন্তারাশির উত্তরাধিকারী, অবশ্য যদি সেগুলিকে আমাদের মধ্যে অবাধে আসতে দিই।

শাস্ত্র তো সব আমাদের মধ্যেই রয়েছে। মূর্খ, শুনতে পাচ্ছ না কি, তোমার নিজ হৃদয়ে দিবারাত্র সেই অনন্ত সঙ্গীত ধ্বনিত হচ্ছে—'সচ্চিদানন্দঃ সচ্চিদানন্দঃ, সোঽহং সোঽহম্।'

আমাদের প্রত্যেকের ভিতর—কি ক্ষুদ্র পিপীলিকা, কি স্বর্গের দেবতা—সকলেরই ভিতর অনন্ত জ্ঞানের প্রস্রবণ রয়েছে। প্রকৃত ধর্ম একটিই। আমরা তার বিভিন্ন রূপ নিয়ে, তার বিভিন্ন প্রতীক নিয়ে, তার বিভিন্ন প্রকাশ নিয়ে ঝগড়া ক'রে মরি। যারা খুঁজতে জানে, তাদের কাছে সত্যযুগ তো এখনই রয়েছে। আমরা নিজেরাই নষ্ট হয়েছি, আর মনে করছি, জগৎ সংসার গোল্লায় গেছে।

এ জগতে পূর্ণশক্তির কোন কার্য থাকে না। তাকে কেবল 'অস্তি' বা 'সৎ' মাত্র বলা যায়, তার দ্বারা কোন কাজ হয় না।

যথার্থ সিদ্ধিলাভ এক বটে, তবে আপেক্ষিক সিদ্ধি নানাবিধ হ'তে পারে।

রবিবার, ৩০শে জুন

একটা কিছু কল্পনা আশ্রয় না ক'রে চিন্তা করবার চেষ্টা আর অসম্ভবকে সম্ভব করবার চেষ্টা—এক কথা। আমরা কোন একটি বিশেষ জীবকে অবলম্বন না ক'রে স্তন্যপায়ী কোন জীবের ধারণা করতে পারি না। ঈশ্বরের ধারণাসম্বন্ধেও ঐ কথা।

জগতে যতপ্রকার ভাব বা ধারণা আছে, তার যে সূক্ষ্ম সারনিষ্কর্ষ, তাকেই আমরা 'ঈশ্বর' বলি।

প্রত্যেক চিন্তার দুটি ভাগ আছে—একটি হচ্ছে ভাব, আর দ্বিতীয়টি ঐ ভাবদ্যোতক 'শব্দ'—আমাদের ঐ দুটিকেই নিতে হবে। কি বিজ্ঞানবাদী (Idealist), কি জড়বাদী (Materialist), কারও মত খাঁটি সত্য নয়। ভাব ও তার প্রকাশ দুই-ই আমাদের নিতে হবে।

আমরা আরশিতেই আমাদের মুখ দেখতে পাই—সমুদয় জ্ঞানও সেইরকম প্রতিবিম্বিত বস্তুরই জ্ঞান। কেউ কখন তার নিজের আত্মা বা ঈশ্বরকে জানতে পারবে না, কিন্তু আমরা স্বয়ংই সেই আত্মা, আমরাই ঈশ্বর বা পরমাত্মা।

তখনই তোমার নির্বাণ-অবস্থা লাভ হবে, যখন তোমার 'তুমিত্ব' থাকবে না। বুদ্ধ বলেছিলেনঃ যখন 'তুমি' থাকবে না, তখনই তোমার যথার্থ অবস্থা—তখনই তোমার সর্বোচ্চ অবস্থা অর্থাৎ যখন ক্ষুদ্র বা কাঁচা আমিটা চলে যাবে।

অধিকাংশ ব্যক্তির মধ্যে সেই আভ্যন্তরীণ দিব্য জ্যোতিঃ আবৃত ও অস্পষ্ট হয়ে রয়েছে; যেন একটা লোহার পিপের ভিতর একটা আলো রয়েছে, ঐ আলোর একটি রশ্মিও বাইরে আসতে পারছে না। একটু একটু ক'রে পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থতা অভ্যাস করতে করতে আমরা ঐ মাঝের আড়ালটাকে ক্রমশঃ পাতলা ক'রে ফেলতে পারি। অবশেষে সেটা কাচের মতো স্বচ্ছ হয়ে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণে যেন ঐ লোহার পিপে কাচে পরিণত হয়েছে। তার মধ্য দিয়ে সেই আভ্যন্তরীণ জ্যোতিঃ যথার্থরূপে দেখা যাচ্ছে। আমরা সকলেই এইরূপ কাচের পিপে হবার পথে চলেছি—এমন কি, এর চেয়েও উচ্চতর বিকাশের

আধার হবো। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত আদৌ কোন পিপে রয়েছে, ততদিন আমাদের জড় উপায়ের সাহায্যেই চিন্তা করতে হবে। অসহিষ্ণু ব্যক্তি কোন কালে সিদ্ধ হ'তে পারে না।

* * *

বড় বড় সাধুপুরুষেরা আদর্শ তত্ত্বের (Principle) দৃষ্টান্তস্বরূপ; কিন্তু শিষ্যেরা ব্যক্তিকেই আদর্শ বা তত্ত্ব ক'রে তোলে, আর ব্যক্তিকে নাড়াচাড়া করতে করতে তত্ত্বটা ভুলে যায়।

বুদ্ধ কর্তৃক সগুণ ঈশ্বর-ভাবকে ক্রমাগত আক্রমণের ফলেই ভারতে প্রতিমা-পূজার সূত্রপাত হ'ল! বৈদিক যুগে প্রতিমার অস্তিত্বই ছিল না, তখন লোকে সর্বত্র ঈশ্বরদর্শন ক'রত। কিন্তু বুদ্ধের প্রচারের ফলে আমরা জগৎস্রষ্টা ও 'আমাদের সখা' ঈশ্বরকে হারালাম, আর তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ প্রতিমা-পূজার উৎপত্তি হ'ল। লোকে বুদ্ধের মূর্তি গড়ে পূজা করতে আরম্ভ করলে। যীশুখ্রীষ্ট-সম্বন্ধেও তাই হয়েছে। কাঠ-পাথরের পূজা থেকে যীশু-বুদ্ধের পূজা পর্যন্ত—সবই প্রতিমা-পূজা, কিন্তু কোন না কোনরূপ মূর্তি ব্যতীত আমাদের চলতে পারে না।

* * *

জোর ক'রে সংস্কারের চেষ্টার ফল এই যে, তাতে সংস্কার বা উন্নতির গতিরোধ হয়। কাউকে ব'লো না—'তুমি মন্দ', বরং তাকে বলো—'তুমি ভালই আছ, আরও ভাল হও।'

পুরুতরা সব দেশেই অনিষ্ট ক'রে থাকে; কারণ তারা লোককে গাল দেয় ও তাদের সমালোচনা করে। তারা একটা দড়ি ধরে টান দেয়, মনে করে সেটাকে ঠিক করবে, কিন্তু তার ফলে আর দু-তিনটা দড়ি স্থানভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। প্রেমে কখন কেউ গাল-মন্দ করে না, শুধু প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাতেই মানুষ ঐ রকম ক'রে থাকে। 'ন্যায়সঙ্গত রাগ' ব'লে কোন জিনিস নেই।

যদি তুমি কাউকে সিংহ হ'তে না দাও, তা হ'লে সে ধূর্ত শৃগাল হয়ে দাঁড়াবে। স্ত্রীজাতি শক্তিস্বরূপিণী, কিন্তু এখন ঐ শক্তি কেবল মন্দ বিষয়ে প্রযুক্ত হচ্ছে। তার কারণ, পুরুষ তার উপর অত্যাচার করছে। এখন সে শৃগালীর মতো; কিন্তু যখন তার উপর আর অত্যাচার হবে না, তখন সে সিংহী হয়ে দাঁড়াবে।

সাধারণতঃ ধর্মভাবকে বিচার-বুদ্ধি দ্বারা নিয়মিত করা উচিত। তা না হ'লে ঐ ভাবের অবনতি হয়ে ওটা ভাবুকতামাত্রে পরিণত হ'তে পারে।

* * *

আস্তিকমাত্রেই স্বীকার করেন যে, এই পরিণামী জগতের পশ্চাতে একটা অপরিণামী বস্তু আছে,—যদিও সেই চরম পদার্থের ধারণা-সম্বন্ধে তাঁদের মধ্যে মতভেদ আছে। বুদ্ধ এটা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছিলেন। তিনি বলতেন, 'ব্রহ্ম বা আত্মা ব'লে কিছু নেই।'

চরিত্র-হিসাবে জগতের মধ্যে বুদ্ধ সকলের চেয়ে বড়; তারপর খ্রীষ্ট। কিন্তু গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যা ব'লে গেছেন, তার মতো মহান্ উপদেশ জগতে আর নেই। যিনি সেই অদ্ভুত কাব্য রচনা করেছিলেন, তিনি সেই-সকল বিরল মহাত্মাদের মধ্যে একজন, যাঁদের জীবন দ্বারা সমগ্র জগতে এক এক নবজীবনের স্রোত বয়ে যায়। যিনি গীতা লিখেছেন, তাঁর মতো আশ্চর্য মাথা মনুষ্যজাতি আর কখনও দেখতে পাবে না!

* * *

জগতে একটামাত্র শক্তিই রয়েছে—সেইটেই কখন মন্দ, কখন বা ভালভাবে অভিব্যক্ত হচ্ছে। ঈশ্বর আর শয়তান একই নদী—কেবল স্রোতটা পরস্পরের বিপরীত-গামী।

সোমবার, ১লা জুলাই

(শ্রীরামকৃষ্ণদেব)

শ্রীরামকৃষ্ণের পিতা একজন খুব নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন—এমন কি, তিনি সকল প্রকার ব্রাহ্মণের দানও গ্রহণ করতেন না। জীবিকার জন্য তাঁর সাধারণের মতো কোন কাজ করবার জো ছিল না। পুঁথি বিক্রী করবার বা কারও চাকরি করবার জো তো ছিলই না, এমন কি, তাঁর কোন দেবমন্দিরে পৌরোহিত্য করবারও উপায় ছিল না। তিনি একরূপ আকাশবৃত্তি-অবলম্বন ক'রে ছিলেন, যা অযাচিতভাবে উপস্থিত হ'ত, তাতেই তাঁর খাওয়া পরা চ'লত; কিন্তু তাও কোন পতিত ব্রাহ্মণের কাছ থেকে তিনি গ্রহণ করতেন না। হিন্দুধর্মে দেবমন্দিরের তেমন প্রাধান্য

নেই। যদি সব মন্দির ধ্বংস হয়ে যায়, তাতেও ধর্মের বিন্দুমাত্র ক্ষতি হবে না। হিন্দুদের মতে নিজের জন্য বাড়ি তৈরি করা স্বার্থপরতার কাজ; কেবল দেবতা ও অতিথিদের জন্য বাড়ি তৈরি করা যেতে পারে। সেই জন্য লোকে ভগবানের নিবাস-রূপে মন্দিরাদি নির্মাণ ক'রে থাকে।

অতিশয় পারিবারিক অসচ্ছলতা হেতু শ্রীরামকৃষ্ণ অতি অল্পবয়সে এক মন্দিরে পূজারী হ'তে বাধ্য হয়েছিলেন। মন্দিরে জগজ্জননীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল—তাঁকে প্রকৃতি বা কালীও ব'লে থাকে। একটি নারীমূর্তি একটি পুরুষমূর্তির উপর দাঁড়িয়ে আছেন—তাতে এই প্রকাশ হচ্ছে যে, মায়াবরণ উন্মোচিত না হ'লে আমরা জ্ঞানলাভ করতে পারি না। ব্রহ্ম স্বয়ং স্ত্রী বা পুরুষ কিছুই নন—তিনি অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। তিনি যখন নিজেকে অভিব্যক্ত করেন, তখন তিনি নিজেকে মায়ার আবরণে আবৃত ক'রে জগজ্জননীরূপ ধারণ করেন ও সৃষ্টিপ্রপঞ্চের বিস্তার করেন। যে পুরুষমূর্তিটি শয়ানভাবে রয়েছেন, তিনি শিব বা ব্রহ্ম, তিনি মায়াবৃত হ'য়ে শব হয়েছেন। অদ্বৈতবাদী বা জ্ঞানী বলেন, 'আমি জোর ক'রে মায়া কাটিয়ে ব্রহ্মকে প্রকাশ ক'রব।' কিন্তু দ্বৈতবাদী বা ভক্ত বলেন, 'আমরা সেই জগজ্জননীর কাছে প্রার্থনা করলে তিনি দ্বার ছেড়ে দেবেন, আর তখনই ব্রহ্ম প্রকাশিত হবেন, তাঁরই হাতে চাবি রয়েছে।'

প্রতিদিন মা কালীর সেবা-পূজা করতে করতে এই তরুণ পুরোহিতের হৃদয়ে ক্রমে এমন তীব্র ব্যাকুলতা ও ভক্তির উদ্রেক হ'ল যে, তিনি আর নিয়মিতভাবে মন্দিরে পূজার কাজ চালাতে পারলেন না। সুতরাং তিনি তা পরিত্যাগ ক'রে মন্দিরের এলাকার ভিতরেই যেখানে এক পাশে ছোট-খাট জঙ্গল ছিল, সেইখানে গিয়ে দিবারাত্র ধ্যানধারণা করতে লাগলেন। সেটি ঠিক গঙ্গার উপরেই ছিল; একদিন গঙ্গার প্রবল স্রোতে ঠিক একখানি কুটির-নির্মাণের উপযোগী সব জিনিসপত্র তাঁর কাছে ভেসে এল। সেই কুটিরে থেকে তিনি ক্রমাগত প্রার্থনা ক'রতে লাগলেন ও কাঁদতে লাগলেন—জগজ্জননী ছাড়া আর কোন বিষয়ের চিন্তা, নিজের দেহরক্ষার চিন্তা পর্যন্ত তাঁর রইল না। তাঁর এক আত্মীয় এই সময়ে তাঁকে দিনের মধ্যে একবার ক'রে খাইয়ে যেতেন, আর তাঁর তত্ত্বাবধান করতেন। কিছুদিন পর এক সন্ন্যাসিনী এসে তাঁকে তাঁর 'মা'কে পাবার সহায়তা করতে লাগলেন।

তাঁর যে-কোন প্রকার গুরুর প্রয়োজন হ'ত, তাঁরা নিজে থেকেই তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হতেন। সকল সম্প্রদায়ের কোন না কোন সাধু এসে তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন, আর তিনি আগ্রহ ক'রে সকলেরই উপদেশ শুনতেন। তবে তিনি কেবল সেই জগন্মাতারই উপাসনা করতেন—তাঁর কাছে সবই 'মা' ব'লে মনে হ'ত।

শ্রীরামকৃষ্ণ কারও বিরুদ্ধে কখনও কড়া কথা বলেননি। তাঁর হৃদয় এত উদার ছিল যে, সকল সম্প্রদায়ই ভাবত—তিনি তাদেরই লোক। তিনি সকলকেই ভালবাসতেন। তাঁর দৃষ্টিতে সকল ধর্মই সত্য, তাঁর কাছে সকলেরই স্থান ছিল। তিনি মুক্তস্বভাব ছিলেন, কিন্তু সকলের প্রতি সমান প্রেমেই তাঁর মুক্তস্বভাবের পরিচয় পাওয়া যেত, বজ্রবৎ কঠোরতায় নয়। এইরূপ কোমল থাকের লোকেরাই নূতন ভাব সৃষ্টি করেন, আর 'হাঁক-ডেকে' থাকের লোক ঐ ভাব চারিদিকে ছড়িয়ে দেন। সেণ্ট পল এই শেষ থাকের ছিলেন। তাই তিনি সত্যের আলোক চতুর্দিকে বিস্তার করেছিলেন।

সেণ্ট পলের যুগ কিন্তু এখন আর নেই। আমাদেরই এ যুগের নূতন আলোক হ'তে হবে। আমাদের যুগের এখন বিশেষ প্রয়োজন—এমন একটি সঙ্ঘ, যা আপনা হতেই নিজেকে দেশকালের উপযোগী ক'রে নেবে। যখন তা হবে, তখন সেইটিই হবে জগতের শেষ ধর্ম। সংসারচক্র চলবে—আমাদের তাকে সাহায্য করতে হবে, তাকে বাধা দিলে চলবে না। নানাবিধ ধর্মভাবরূপ তরঙ্গ উঠছে পড়ছে, আর সেই-সকল তরঙ্গের শীর্ষদেশে সেইযুগের অবতার বিরাজ করছেন। রামকৃষ্ণ বর্তমান যুগের উপযোগী ধর্মশিক্ষা দিতে এসেছিলেন, তাঁর ধর্ম গঠনমূলক, এতে ধ্বংসমূলক কিছু নেই। তাঁকে নূতন ক'রে প্রকৃতির কাছে গিয়ে সত্য জানবার চেষ্টা করতে হয়েছিল, ফলে তিনি বৈজ্ঞানিক ধর্ম লাভ করেছিলেন। সে ধর্ম কাউকে কিছু মেনে নিতে বলে না, নিজে পরখ ক'রে নিতে বলে; বলে, 'আমি সত্য দর্শন করেছি, তুমিও ইচ্ছা করলে দেখতে পারো। আমি যে সাধন অবলম্বন করেছি, তুমিও সেই সাধন কর, তা হ'লে তুমিও আমার মতো সত্য দর্শন করবে।' ঈশ্বর সকলের কাছেই আসবেন—সেই সামঞ্জস্য সকলেরই আয়ত্তের ভিতর রয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ যা উপদেশ দিয়ে গেছেন, সেগুলি হিন্দুধর্মের সারস্বরূপ, তাঁর নিজের সৃষ্ট কোন নূতন বস্তু নয়। আর তিনি সেগুলি

তাঁর নিজস্ব ব'লে কখন দাবিও করেননি; তিনি নামযশের কিছুমাত্র আকাঙ্ক্ষা করতেন না। তাঁর বয়স যখন প্রায় চল্লিশ, সেই সময় তিনি প্রচার করতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তিনি ঐ প্রচারের জন্য কখন বাইরে কোথাও যাননি। যারা তাঁর কাছে এসে উপদেশ গ্রহণ করবে, তাদের জন্য তিনি অপেক্ষা করেছিলেন।

হিন্দুসমাজের প্রথানুযায়ী তাঁর পিতামাতা তাঁর যৌবনের প্রারম্ভে পাঁচ বছরের একটি ছোট মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিয়েছিলেন। বালিকা এক সুদূর পল্লীতে তাঁর নিজ পরিজনের মধ্যেই বাস করতে থাকেন—তাঁর যুবা-পতি যে কি কঠোর সাধনার ভিতর দিয়ে ঈশ্বরের পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তার বিষয় তিনি কিছু জানতেন না। যখন তিনি বড় হলেন, তখন তাঁর স্বামী ভগবৎপ্রেমে তন্ময় হয়ে গিয়েছেন। তিনি হেঁটে দেশ থেকে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন। স্বামীকে দেখেই তিনি বুঝতে পারলেন, তাঁর কি অবস্থা; কারণ তিনি স্বয়ং মহা পবিত্রা বিশুদ্ধা ও উন্নতস্বভাবা ছিলেন। তিনি তাঁর কাজে কেবল সাহায্য করবার ইচ্ছাই করেছিলেন; তাঁর কখনও এ ইচ্ছা হয়নি যে, তাঁকে গৃহস্থের পর্যায়ে টেনে নামিয়ে আনেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভারতে মহান্ অবতারপুরুষগণের মধ্যে একজন ব'লে পূজিত হয়ে থাকেন। তাঁর জন্মদিন সেখানে ধর্মোৎসবরূপে পরিগণিত হয়ে থাকে।

* * *

একটি বিশিষ্টলক্ষণযুক্ত গোলাকার শিলা বিষ্ণু অর্থাৎ সর্বব্যাপী ভগবানের প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রাতঃকালে পুরোহিত এসে সেই শালগ্রাম-শিলাকে পুষ্পচন্দন নৈবেদ্যাদি দ্বারা পূজা করেন, ধূপকর্পূরাদির দ্বারা আরতি করেন, তারপর তাঁর শয়ন দিয়ে ঐভাবে পূজা করার জন্য তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ঈশ্বর স্বরূপতঃ রূপবিবর্জিত হলেও তিনি ঐরূপ প্রতীক বা কোনরূপ জড়বস্তুর সাহায্য ব্যতীত তাঁর উপাসনা করতে পারছেন না, এই দোষ বা দুর্বলতার জন্য তিনি তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি শিলাটিকে স্নান করান, কাপড় পরান এবং নিজের চৈতন্যশক্তি দ্বারা তাঁর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেন।

* * *

একটি সম্প্রদায় আছে, তারা বলে—ভগবান্‌কে কেবল শিব ও সুন্দররূপে পূজা করা দুর্বলতামাত্র, আমাদের অশিবরূপকেও ভালবাসতে হবে, পূজা করতে হবে। এই সম্প্রদায় তিব্বত-দেশের সর্বত্র বিদ্যমান, আর তাদের ভিতর বিবাহ-পদ্ধতি নেই। এই সম্প্রদায়ের ভারতে প্রকাশ্যভাবে থাকবার জো নেই, সুতরাং তারা গোপনে গোপনে সম্প্রদায় ক'রে থাকে। কোন ভদ্রলোক গুপ্তভাবে ভিন্ন এই-সকল সম্প্রদায়ে যোগ দিতে পারেন না। তিব্বত-দেশে তিনবার সমাধিকারবাদ[1] কার্যে পরিণত করবার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু প্রতিবারই সে চেষ্টা বিফল হয়। তারা খুব তপস্যা করে, আর শক্তি (বিভূতি)-লাভের দিক দিয়ে খুব সাফল্যও লাভ ক'রে থাকে।

('তপস্' শব্দের ধাত্বর্থ তাপ দেওয়া বা উত্তপ্ত করা। এটা আমাদের উচ্চ প্রকৃতিকে 'তপ্ত' বা উত্তেজিত করবার সাধনা বা প্রক্রিয়াবিশেষ। যেমন, হয়তো উদয়াস্ত জপ করা—সূর্যোদয় হ'তে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ক্রমাগত ওঙ্কারজপ। এই-সকল ক্রিয়া দ্বারা এমন একটা শক্তি জন্মায়, যাকে আধ্যাত্মিক বা ভৌতিক যে-কোনরূপে ইচ্ছা—পরিণত করা যেতে পারে। এই তপস্যার ভাব সমগ্র হিন্দুধর্মে ওতপ্রোত রয়েছে। এমন কি হিন্দুরা বলেন যে, ঈশ্বরকেও জগৎসৃষ্টি করবার জন্য তপস্যা করতে হয়েছিল। এটা যেন মানসিক যন্ত্রবিশেষ—এ দিয়ে সব করা যেতে পারে। শাস্ত্রে আছে—'ত্রিভুবনে এমন কিছু নেই, যা তপস্যা দ্বারা পাওয়া যায় না।')

* * *

যে-সব লোক এমন সব সম্প্রদায়ের মতামত বা কার্যকলাপ বর্ণনা করে, যেগুলির সঙ্গে তাদের সহানুভূতি নেই, তারা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে মিথ্যাবাদী। যারা সম্প্রদায়বিশেষে দৃঢ়বিশ্বাসী, তারা অপর সম্প্রদায়ে যে সত্য আছে, তা বড় একটা দেখতে পায় না।

* * *

ভক্তশ্রেষ্ঠ হনুমানকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—আজ মাসের কোন্ তারিখ? তিনি তাতে উত্তর দিয়েছিলেন, 'রামই আমার চিরদিনের সন তারিখ সব। আমি আর কোন তারিখ গ্রাহ্য করি না।'

১ Communism—কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকা উচিত নয়, সকলের সাধারণ সম্পত্তি থাকিবে—এই মত।

মঙ্গলবার, ২রা জুলাই

(জগজ্জননী)

শাক্তেরা জগতের সেই সর্বব্যাপিনী শক্তিকে মা ব'লে পূজা ক'রে থাকেন —কারণ মা-নামের চেয়ে মিষ্ট নাম আর কিছু নেই। ভারতে মাতাই নারী-চরিত্রের সর্বোচ্চ আদর্শ। ভগবান্‌কে মাতৃরূপে, প্রেমের উচ্চতম বিকাশরূপে পূজা করাকে হিন্দুরা 'দক্ষিণাচার' বা 'দক্ষিণমার্গ' বলেন, ঐ উপাসনায় আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়, মুক্তি হয়—এর দ্বারা কখন ঐহিক উন্নতি হয় না। আর তাঁর ভীষণ রূপের—রুদ্রমূর্তির উপাসনাকে 'বামাচার' বা 'বামমার্গ' বলে; সাধারণতঃ এতে সাংসারিক উন্নতি খুব হয়ে থাকে, কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতি বড় একটা হয় না। কালে ঐ থেকে অবনতি এসে থাকে, আর যারা ঐ সাধন করে, সেই জাতির একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়।

জননীই শক্তির প্রথম বিকাশ-স্বরূপ, আর জনকের ধারণা থেকে জননীর ধারণা ভারতে উচ্চতর বিবেচিত হয়ে থাকে। মা-নাম করলেই শক্তির ভাব, সর্বশক্তিমত্তা—ঐশ্বরিক শক্তির ভাব এসে থাকে, শিশু যেমন নিজের মাকে সর্বশক্তিমতী মনে ক'রে ভাবে—মা সব করতে পারে। সেই জগজ্জননী ভগবতীই আমাদের অভ্যন্তরে নিদ্রিতা কুণ্ডলিনী—তাঁকে উপাসনা না ক'রে আমরা কখন নিজেদের জানতে পারি না।

সর্বশক্তিমত্তা, সর্বব্যাপিতা ও অনন্ত দয়া—সেই জগজ্জননী ভগবতীর গুণ। জগতে যত শক্তি আছে, তিনিই তার সমষ্টিরূপিণী। জগতে যত শক্তির বিকাশ দেখা যায়, সবই সেই মা। তিনিই প্রাণরূপিণী, তিনিই বুদ্ধিরূপিণী, তিনি প্রেমরূপিণী। তিনি সমগ্র জগতের ভিতর রয়েছেন, আবার জগৎ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্। তিনি একজন ব্যক্তি—তাঁকে জানা যেতে পারে এবং দেখা যেতে পারে (যেমন রামকৃষ্ণ তাঁকে জেনেছিলেন ও দেখেছিলেন)। সেই জগন্মাতার ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আমরা যা খুশি তাই করতে পারি। তিনি অতি সত্বর আমাদের প্রার্থনার উত্তর দিয়ে থাকেন।

তিনি যখন ইচ্ছা—যে কোনরূপে আমাদের দেখা দিতে পারেন। সেই জগজ্জননীর নাম রূপ—দুই-ই থাকতে পারে, অথবা রূপ না থেকে শুধু নাম থাকতে পারে। তাঁকে এই-সকল বিভিন্ন ভাবে উপাসনা করতে করতে

আমরা এমন এক অবস্থায় উপনীত হই, যেখানে নামরূপ কিছুই নেই, কেবল শুদ্ধসত্তামাত্র বিরাজিত।

যেমন কোন শরীরবিশেষের সমুদয় কোষগুলি (cells) মিলে একটি মানুষ হয়, সেইরূপ প্রত্যেক জীবাত্মা যেন এক একটি কোষস্বরূপ, এবং তাদের সমষ্টি ঈশ্বর—আর সেই অনন্ত পূর্ণ তত্ত্ব (ব্রহ্ম) তারও অতীত। সমুদ্র যখন স্থির থাকে, তখন তাকে বলা যায় ব্রহ্ম, আর সেই সমুদ্রে যখন তরঙ্গ ওঠে, তখন তাকেই আমরা শক্তি বা 'মা' বলি। সেই শক্তি বা মহামায়াই দেশকালনিমিত্ত-স্বরূপ। সেই ব্রহ্মই মা। তাঁর দুই রূপ—একটি সবিশেষ বা সগুণ, এবং অপরটি নির্বিশেষ বা নির্গুণ। প্রথমোক্ত রূপে তিনি ঈশ্বর, জীব ও জগৎ, দ্বিতীয় রূপে তিনি অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। সেই নিরুপাধিক সত্তা থেকেই ঈশ্বর, জীব ও জগৎ এই ত্রিত্বভাব এসেছে। সমস্ত সত্তা—যা কিছু আমরা জানতে পারি, সবই এই ত্রিকোণাত্মক অস্তিত্ব; এটিই বিশিষ্টাদ্বৈত ভাব।

সেই জগদম্বার এক কণা—এক বিন্দু হচ্ছেন কৃষ্ণ, আর এক কণা বুদ্ধ, আর এক কণা খ্রীষ্ট। আমাদের পার্থিব জননীতে সেই জগন্মাতার যে এক কণা প্রকাশ রয়েছে, তারই উপাসনাতে মহত্ত্ব লাভ হয়। যদি পরম জ্ঞান ও আনন্দ চাও, তবে সেই জগজ্জননীর উপাসনা কর।

বুধবার, ৩রা জুলাই

সাধারণভাবে বলতে গেলে বলা যায়, ভয়েতেই মানুষের ধর্মের আরম্ভ। ঈশ্বরভীতিই জ্ঞানের আরম্ভ। কিন্তু পরে তা থেকে এই উচ্চতর ভাব আসে যে, 'পূর্ণ প্রেমের উদয়ে ভয় দূরে যায়।' যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা জ্ঞানলাভ করছি, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা জানতে পারছি ঈশ্বর কি বস্তু, ততক্ষণ পর্যন্ত কিছু না কিছু ভয় থাকবেই। যীশুখৃষ্ট মানুষ ছিলেন, সুতরাং তিনি জগতে অপবিত্রতা দেখতে পেতেন—আর তার খুব নিন্দাও ক'রে গেছেন। কিন্তু ঈশ্বর অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ, তিনি জগতে কিছু অন্যায় দেখতে পান না, সুতরাং তাঁর ক্রোধেরও কোন কারণ নেই। অন্যায়ের প্রতিবাদ বা নিন্দাবাদ কখনও সর্বোচ্চ ভাব হ'তে পারে না। ডেভিডের হস্ত শোণিতে কলুষিত ছিল, সেই জন্য তিনি মন্দির নির্মাণ করতে পারেননি।[১]

১ *Bible*, O.T., Samuel, XVII

আমাদের হৃদয়ে প্রেম, ধর্ম ও পবিত্রতার ভাব যতই বাড়তে থাকে, ততই আমরা বাইরে প্রেম, ধর্ম ও পবিত্রতা দেখতে পাই। আমরা অপরের কার্যের যে নিন্দাবাদ করি, তা প্রকৃতপক্ষে আমাদের নিজেদেরই নিন্দা। তুমি তোমার ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডটাকে ঠিক কর—যা তোমার হাতের ভিতর রয়েছে—তা হ'লে বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডও তোমার পক্ষে আপনা-আপনি ঠিক হয়ে যাবে। এ যেন জলস্থিতিবিজ্ঞানের (Hydrostatics) সমস্যার মতো—একবিন্দু জলের শক্তিতে সমগ্র জগৎকে সাম্যাবস্থায় রাখা যেতে পারে। আমাদের ভিতরে যা নেই, বাইরেও তা দেখতে পারি না। বৃহৎ ইঞ্জিনের পক্ষে তৎসদৃশ অতি ক্ষুদ্র ইঞ্জিন যেরূপ, সমগ্র জগতের তুলনায় আমরাও সেইরূপ। ক্ষুদ্র ইঞ্জিনটির ভিতর কোন গোলমাল দেখে আমরা বৃহৎ ইঞ্জিনটাতেও কোন গোল হয়েছে, এরূপ কল্পনা ক'রে থাকি।

জগতে যথার্থ যা কিছু উন্নতি হয়েছে, তা প্রেমের শক্তিতেই হয়েছে। দোষ দেখিয়ে দেখিয়ে কোন কালে ভাল কাজ করা যায় না। হাজার হাজার বছর ধরে সেটা পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে। নিন্দাবাদে কোনই ফল হয় না।

যথার্থ বৈদান্তিককে সকলের সহিত সহানুভূতি করতে হবে, কারণ অদ্বৈতবাদ বা সম্পূর্ণ একত্বভাবই বেদান্তের সারমর্ম। দ্বৈতবাদীরা সাধারণতঃ গোঁড়া হয়ে থাকে—তারা মনে করে, তাদের পথই একমাত্র পথ। ভারতে বৈষ্ণব সম্প্রদায় দ্বৈতবাদী, আর তারা অত্যন্ত গোঁড়া। শৈবেরা আর একটি দ্বৈতবাদী সম্প্রদায়; তাদের মধ্যে ঘণ্টাকর্ণ নামক এক ভক্তের গল্প প্রচলিত আছে। সে শিবের এমন গোঁড়া ভক্ত ছিল যে, অপর কোন দেবতার নাম কানে শুনবে না। পাছে অপর দেবতার নাম শুনতে হয়, সেই ভয়ে সে দু-কানে দুটি ঘণ্টা বেঁধে রাখত। শিব তার প্রগাঢ় ভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে ভাবলেন, শিব ও বিষ্ণুতে যে কোন প্রভেদ নেই, তা একে বুঝিয়ে দেব। সেইজন্য তিনি তার কাছে অর্ধশিব অর্ধবিষ্ণু অর্থাৎ হরিহরমূর্তিতে আবির্ভূত হলেন। সেই সময় ঘণ্টাকর্ণ তাঁকে আরতি করছিল। কিন্তু তার এমন গোঁড়ামি যে, যখন সে দেখলে ধূপধুনার গন্ধ বিষ্ণুর নাকে যাচ্ছে, তখন বিষ্ণু যাতে সেই সুগন্ধ উপভোগ করতে না পান, সেজন্য তাঁর নাক চেপে ধরলে!

* * *

মাংসাশী প্রাণী—যেমন সিংহ—এক আঘাত করেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু সহিষ্ণু বলদ সারাদিন চলেছে, চলতে চলতেই সে খেয়ে ও ঘুমিয়ে নিচ্ছে। চঞ্চল, সদাক্রিয়াশীল 'ইয়াঙ্কি' (মার্কিন) ভাতখেকো চীনা কুলির সঙ্গে পেরে ওঠে না। যতদিন ক্ষাত্রশক্তির প্রাধান্য থাকবে, ততদিন মাংসভোজন প্রচলিত থাকবে। কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ কমে যাবে, তখন নিরামিষাশীর দল প্রবল হবে।

* * *

যখন আমরা ভগবান্‌কে ভালবাসি, তখন যেন আমরা নিজেকে দুভাগ ক'রে ফেলি—আমিই আমার অন্তরাত্মাকে ভালবাসি। ঈশ্বর আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আবার আমিও ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছি। আমরা ঈশ্বরকে আমাদের অনুরূপ ক'রে সৃষ্টি ক'রে থাকি। আমরাই ঈশ্বরকে আমাদের প্রভু হবার জন্য সৃষ্টি ক'রে থাকি, ঈশ্বর আমাদের তাঁর দাস করেন নি। যখন আমরা জানতে পারি, আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে এক, ঈশ্বর আমাদের সখা, তখনই প্রকৃত সাম্যাবস্থা লাভ হয়, তখনই আমাদের মুক্তি হয়। সেই অনন্ত পুরুষ থেকে যতদিন তুমি আপনাকে এক চুলও তফাত করবে, ততদিন ভয় কখন দূর হ'তে পারে না।

ভগবৎ-সাধনা ক'রে—ভগবান্‌কে ভালবেসে জগতের কি কল্যাণ হবে? —বোকার মতো এই প্রশ্ন কখন ক'রো না। চুলোয় যাক জগৎ, ভগবান্‌কে ভালবাসো—আর কিছু চেও না। ভালবাসো এবং অপর কিছু প্রত্যাশা ক'রো না। ভালবাসো—আর সব মত-মতান্তর ভুলে যাও। প্রেমের পেয়ালা পান ক'রে পাগল হয়ে যাও। বল, 'হে প্রভু, আমি তোমারই—চিরকালের জন্য তোমারই' এবং আর সব ভুলে গিয়ে ঝাঁপ দাও। 'ঈশ্বর' বলতে যে 'প্রেম' ছাড়া আর কিছুই বুঝায় না। একটা বিড়াল তার বাচ্চাদের ভালবেসে আদর করছে দেখে সেইখানে দাঁড়িয়ে যাও, আর ভগবানের উপাসনা কর। সেই স্থানে ভগবানের আবির্ভাব হয়েছে। এটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য, এ কথা বিশ্বাস কর। সর্বদা বলো, 'আমি তোমার, আমি তোমার'; কারণ আমরা সর্বত্র ভগবান্‌কে দর্শন করতে পারি। তাঁকে কোথাও খুঁজে বেড়িও না—তিনি তো প্রত্যক্ষ রয়েছেন, তাঁকে শুধু দেখে যাও। 'সেই বিশ্বাত্মা, জগজ্জ্যোতিঃ প্রভু সর্বদা তোমাদের রক্ষা করুন।'

* * *

নিগুর্ণ পরব্রহ্মকে উপাসনা করা যেতে পারে না, সুতরাং আমাদিগকে আমাদেরই মতো প্রকৃতিসম্পন্ন তাঁর প্রকাশ-বিশেষকে উপাসনা করতেই হবে। যীশু আমাদের মতো মনুষ্যপ্রকৃতিসম্পন্ন ছিলেন—তিনি খ্রীষ্ট হয়েছিলেন। আমরাও তাঁর মতো খ্রীষ্ট হ'তে পারি, আর আমাদের তা হতেই হবে। খ্রীষ্ট ও বুদ্ধ অবস্থা-বিশেষের নাম—যা আমাদের লাভ করতে হবে। যীশু ও গৌতমের মধ্যে সেই সেই অবস্থা প্রকাশ পেয়েছিল। জগন্মাতা বা আদ্যাশক্তিই ব্রহ্মের প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ—তারপর খ্রীষ্ট ও বুদ্ধগণ তাঁর থেকে প্রকাশ হয়েছেন। আমরাই আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা গঠন ক'রে নিজেদের বদ্ধ করি, আবার আমরাই ঐ শিকল ছিঁড়ে মুক্ত হই। আত্মা অভয়স্বরূপ। আমরা যখন আমাদের আত্মার বাইরে অবস্থিত ঈশ্বরের উপাসনা করি, তখন ভালই ক'রে থাকি, তবে আমরা যে কি করছি, তা জানি না। আমরা যখন আত্মার স্বরূপ জানতে পারি, তখনই ঐ রহস্য বুঝি। একত্বই প্রেমের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি।

পারসীক সুফীদিগের কবিতায় আছে :

'একদিন্ এমন ছিল, যখন আমি নারী ও তিনি পুরুষ ছিলেন। উভয়ের মধ্যে ভালবাসা বাড়তে লাগল—শেষে তিনি বা আমি কেউই রইলাম না। এখন এইটুকু মাত্র অস্পষ্টভাবে স্মরণ হয় যে, এক সময়ে দুজন পৃথক্ লোক ছিল; শেষে প্রেম এসে উভয়কে এক ক'রে দিলে।'[১]

জ্ঞান অনাদি অনন্তকাল বর্তমান—ঈশ্বর যতদিন আছেন, জ্ঞানও ততদিন আছে। যে ব্যক্তি কোন আধ্যাত্মিক নিয়ম আবিষ্কার করেন, তাঁকেই 'inspired' বা প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ বা ঋষি বলে; তিনি যা প্রকাশ করেন, তাকে 'revelation' বা অপৌরুষেয় বাণী বলে। কিন্তু এরূপ অপৌরুষেয় বাণীও অনন্ত—এমন নয় যে এ-পর্যন্ত যা হয়েছে, তাতেই তা শেষ হয়ে গেছে, এবং এখন অন্ধভাবে তার অনুসরণ করতে হবে। হিন্দুদের বিজেতারা এতদিন ধরে তাদের সমালোচনা ক'রে এসেছে যে, এখন তারা নিজেরাই নিজেদের ধর্ম সমালোচনা করতে সাহস করে, আর এর ফলে তারা

১ তুলনীয়—শ্রীচৈতন্যের সহিত রায় রামানন্দের কথোপকথন :
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুহু মন মনোভব পেশল জানি।—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

স্বাধীনচেতা হয়ে গিয়েছে। তাদের বৈদেশিক শাসনকর্তারা অজ্ঞাতসারে হিন্দুদের পায়ের বেড়ি ভেঙে দিয়েছে। হিন্দুরা জগতের মধ্যে সব চেয়ে ধার্মিক জাতি হয়েও বাস্তবিকই ভগবন্নিন্দা বা ধর্মনিন্দা কাকে বলে, তা জানে না। তাদের মতে ভগবান্ বা ধর্মসম্বন্ধে যে-কোন ভাবে আলোচনা করা হোক না, তাতেই পবিত্রতা ও কল্যাণলাভ হয়ে থাকে। আর তারা অবতার বা শাস্ত্র বা ধর্মধ্বজিতার প্রতি কোন প্রকার কৃত্রিম শ্রদ্ধা বা ভক্তি দেখায় না।

খ্রীষ্টীয় ধর্মসম্প্রদায় খ্রীষ্টকে তাদের নিজের মতানুযায়ী ক'রে গড়ে তোলবার চেষ্টা করছে, কিন্তু খ্রীষ্টীয় জীবনাদর্শে নিজেদের গড়বার চেষ্টা করেনি। এজন্যই খ্রীষ্ট-সম্বন্ধে যে-সকল গ্রন্থ উক্ত সম্প্রদায়ের সাময়িক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার সহায় হয়েছিল, কেবল সেগুলিকেই রাখা হয়েছিল। সুতরাং সেই গ্রন্থগুলির উপর কখনই নির্ভর করা যেতে পারে না। আর এইরূপ গ্রন্থ বা শাস্ত্রোপাসনা সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট পৌত্তলিকতা—ওটা আমাদের হাত-পা একেবারে বেঁধে রেখে দেয়। এদের মতে কি বিজ্ঞান, কি ধর্ম, কি দর্শন—সবকিছুই ঐ শাস্ত্রের মতানুযায়ী হ'তে হবে। প্রটেস্টান্টদের এই বাইবেলের অত্যাচার সর্বাপেক্ষা ভয়ানক অত্যাচার। খ্রীষ্টান দেশসমূহে প্রত্যেকের মাথার উপর একটা প্রকাণ্ড গির্জা চাপানো রয়েছে, আর তার উপরে একখানা ধর্মগ্রন্থ, কিন্তু তবুও মানুষ বেঁচে রয়েছে, আর তার উন্নতিও হচ্ছে। এতেই কি প্রমাণিত হচ্ছে না যে, মানুষ ঈশ্বরস্বরূপ?

জীবের মধ্যে মানুষই সর্বোচ্চ জীব, আর পৃথিবীই সর্বোচ্চ লোক। আমরা ঈশ্বরকে মানুষের চেয়ে বড় ব'লে ধারণা করতে পারি না; সুতরাং আমাদের ঈশ্বর মানুষ—আবার মানুষও ঈশ্বর। যখন আমরা মনুষ্যভাবের উপরে উঠে তার অতীত উচ্চতর কোন কিছু সাক্ষাৎ করি, তখন আমাদের এ জগৎ ছেড়ে, দেহ-মন-কল্পনা—এ সবেরই বাইরে লাফ দিতে হয়। আমরা যখন উচ্চাবস্থা লাভ ক'রে সেই অনন্তস্বরূপ হই, তখন আর আমরা এ জগতে থাকি না। আমাদের এই জগৎ ছাড়া অন্য কোন জগৎ জানবার সম্ভাবনা নেই, আর মানুষই এই জগতের সর্বোচ্চ সীমা। পশুদের সম্বন্ধে আমরা যা জানতে পারি, তা কেবল সাদৃশ্যমূলক জ্ঞান। আমরা নিজেরা যা কিছু ক'রে থাকি অথবা অনুভব করি, তাই দিয়ে আমরা তাদের বিচার ক'রে থাকি।

সমুদয় জ্ঞানের সমষ্টি সর্বদাই সমান—কেবল সেটা কখন বেশী, কখন কম অভিব্যক্ত হয়, এই মাত্র। ঐ জ্ঞানের একমাত্র উৎস আমাদের ভিতরে এবং কেবল সেইখানেই ঐ জ্ঞানলাভ করা যায়।

* * *

সমুদয় কাব্য, চিত্রবিদ্যা ও সঙ্গীত কেবল ভাষা, বর্ণ ও ধ্বনির মধ্য দিয়ে ভাবের অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

* * *

ধন্য তারা, যারা শীঘ্র শীঘ্র পাপের ফলভোগ করে—তাদের হিসাব শীঘ্র শীঘ্র মিটে গেল। যাদের পাপের প্রতিফল বিলম্বে আসে, তাদের মহা দুর্দৈব—তাদের বেশী বেশী ভুগতে হবে।

যাঁরা সমত্বভাব লাভ করেছেন, তাঁরাই ব্রহ্মে অবস্থিত ব'লে কথিত হন। সকল রকম ঘৃণার অর্থ—যেন আত্মার দ্বারা আত্মার হনন। সুতরাং প্রেমই জীবনের যথার্থ নিয়ামক। প্রেমের অবস্থা লাভ করাই সিদ্ধাবস্থা; কিন্তু আমরা যতই সিদ্ধির দিকে অগ্রসর হই, ততই আমরা কম কাজ (তথাকথিত কাজ) করতে পারি। সাত্ত্বিক ব্যক্তিরা জানে ও দেখে যে, সবই ছেলেখেলা-মাত্র, সুতরাং তারা কোন কিছু নিয়ে মাথা ঘামায় না।

এক ঘা দিয়ে দেওয়া সোজা, কিন্তু হাত গুটিয়ে স্থির হয়ে থেকে 'হে প্রভু, আমি তোমারই শরণাগত হলাম' বলা এবং তিনি যা হয় করুন ব'লে অপেক্ষা ক'রে থাকা খুবই কঠিন।

শুক্রবার, ৫ই জুলাই

যতক্ষণ তুমি সত্যের অনুরোধে যে-কোন মুহূর্তে বদলাতে প্রস্তুত না হচ্ছ, ততক্ষণ তুমি কখনই সত্যলাভ করতে পারবে না; অবশ্য তোমাকে দৃঢ়ভাবে সত্যের অনুসন্ধানে লেগে থাকতে হবে।

* * *

চার্বাকেরা ভারতের একটি অতি প্রাচীন সম্প্রদায়—তারা সম্পূর্ণ জড়বাদী ছিল। এখন সে সম্প্রদায় লুপ্ত হয়ে গেছে, আর তাদের অধিকাংশ গ্রন্থও লোপ পেয়ে গেছে। তাদের মতে আত্মা—দেহ ও ভৌতিক শক্তি থেকে উৎপন্ন ব'লে দেহের নাশে আত্মারও নাশ, এবং দেহনাশের পরও যে আত্মার

অস্তিত্ব থাকে, তার কোনও প্রমাণ নেই। তারা কেবল্ ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষ জ্ঞান স্বীকার ক'রত—অনুমান দ্বারাও যে জ্ঞানলাভ হ'তে পারে, তা স্বীকার ক'রত না।

*　　　*　　　*

সমাধি-অর্থে জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদভাব, অথবা সমত্বভাব লাভ করা।

*　　　*　　　*

(জড়বাদী বলেন, আমি মুক্ত ব'লে আমাদের যে জ্ঞান হয়, সেটা ভ্রমমাত্র। বিজ্ঞানবাদী বলেন, আমি বদ্ধ ব'লে যে জ্ঞান হয়, সেটাই ভ্রম। বেদান্তবাদী বলেন, তুমি মুক্ত ও বদ্ধ দুই-ই। ব্যাবহারিক ভূমিতে তুমি কখনই মুক্ত নও, কিন্তু পারমার্থিক বা আধ্যাত্মিক ভূমিতে তুমি নিত্যমুক্ত।

মুক্তি ও বন্ধন উভয়েরই পারে চলে যাও।

আমরাই শিবস্বরূপ, অতীন্দ্রিয়, অবিনাশী জ্ঞানস্বরূপ। প্রত্যেক ব্যক্তির পশ্চাতে অনন্ত শক্তি রয়েছে; জগদম্বার কাছে প্রার্থনা করলেই ঐ শক্তি তোমাতে আসবে।

'হে মাতঃ বাগীশ্বরি, তুমি স্বয়ম্ভু, তুমি আমার জিহ্বায় বাক্-রূপে আবির্ভূতা হও!

'হে মাতঃ, বজ্র তোমার বাণীস্বরূপ—তুমি আমার ভিতর আবির্ভূতা হও! হে কালি, তুমি অনন্ত কালরূপিণী, তুমিই অমোঘ শক্তিস্বরূপিণী।')

শনিবার, ৬ই জুলাই

(অদ্য স্বামীজী ব্যাসকৃত বেদান্তসূত্রের শাঙ্করভাষ্য অবলম্বন করিয়া উপদেশ দিতে লাগিলেন।)

ওঁ তৎ সৎ!

শঙ্করের মতে জগৎকে দু-ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—অস্মদ্ (আমি) ও যুষ্মদ্ (তুমি)। আর আলো ও অন্ধকার যেমন সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ বস্তু, ঐ দুটিও সেরূপ; সুতরাং বলা বাহুল্য, এ দুয়ের কোনটি থেকে অপরটি উৎপন্ন হ'তে পারে না। এই আমি বা বিষয়ীর (subject) উপর তুমি বা বিষয়ের (object) অধ্যাস হয়েছে। বিষয়ীই একমাত্র সত্য বস্তু, অপরটি অর্থাৎ

বিষয় আপাতপ্রতীয়মান সত্তামাত্র। ইহার বিরুদ্ধ মত, অর্থাৎ বিষয় সত্য ও বিষয়ী মিথ্যা—এ মত কখন প্রমাণ করা যেতে পারে না। জড়পদার্থ ও বহির্জগৎ শুধু আত্মারই অবস্থাবিশেষ। প্রকৃতপক্ষে একটি সত্তাই রয়েছে।

আমাদের অনুভূত এই জগৎ সত্য ও মিথ্যার মিশ্রণে উৎপন্ন। যেমন বল-সামান্তরিকে[১] দুই বিভিন্নমুখী বলপ্রয়োগের ফলে একটি বস্তুতে কর্ণাভিমুখী গতির উৎপত্তি হয়, সেরূপ এই সংসারও আমাদের উপর প্রযুক্ত বিভিন্ন বিরুদ্ধ শক্তিসমূহের ফলস্বরূপ। এই জগৎ ব্রহ্মস্বরূপ ও সত্য; কিন্তু আমরা জগৎকে সে ভাবে দেখছি না; যেমন শুক্তিতে রজত-ভ্রম হয়, তেমনি আমাদেরও ব্রহ্মে জগদ্‌ভ্রম হয়েছে। একেই বলে 'অধ্যাস'। যে সত্তা একটা সত্য বস্তুর অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে, তাকেই অধ্যস্ত সত্তা বলে। যেমন পূর্বে যে দৃশ্য দেখেছি, এখন তার স্মরণ হ'ল। সেই সময়ের জন্য সেটা সত্য ব'লে বোধ হয় বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সত্য নয়। অথবা অধ্যাসের দৃষ্টান্ত অপরে এইরূপ দেন—উষ্ণতা জলের ধর্ম বা গুণ নয়, অথচ যেমন আমরা জলে উষ্ণতা কল্পনা ক'রে থাকি। সুতরাং অধ্যাস মানে 'অ-তস্মিন্ তদ্‌বুদ্ধিঃ'—যে বস্তু যা নয়, তাতে সেই বুদ্ধি করা। অতএব বোঝা যাচ্ছে যে, আমরা যখন জগৎ দেখছি, তখন আমরা সত্যকেই দর্শন করছি, কিন্তু যে মাধ্যমের ভেতর দিয়ে দেখছি—তার দ্বারা সত্য বিকৃতভাবাপন্ন হয়ে দেখা যাচ্ছে।

তুমি নিজেকে বাইরে বিষয়রূপে প্রক্ষেপ না ক'রে কখনও নিজেকে জানতে পার না। ভ্রান্তির অবস্থায় আমাদের সামনের বস্তুগুলোকেই আমরা সত্য ব'লে মনে করি, অদৃষ্ট বস্তুকে কখন সত্য ব'লে আমাদের বোধ হয় না। এইরূপে আমরা বিষয়কে (object) বিষয়ী (subject) ব'লে ভুল ক'রে থাকি। আত্মা কিন্তু কখন বিষয় (object) হন না। মনে হচ্ছে অন্তঃকরণ বা অন্তরিন্দ্রিয়, আর বহিরিন্দ্রিয়গুলি তারই যন্ত্রস্বরূপ। বিষয়ীতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে বহিঃপ্রক্ষেপশক্তি (objectifying power) আছে—তার দ্বারাই তিনি জানতে পারেন, 'আমি আছি'। কিন্তু সেই আত্মা বা বিষয়ী নিজেরই বিষয়, মন বা ইন্দ্রিয়ের বিষয় নন। তবে আমরা একটা ভাবকে (idea)

১ Parallelogram of forces: একটি সামান্তরিক ক্ষেত্রের সংলগ্ন বাহুদ্বয় যদি দুইটি বলের তীব্রতা ও গতিরেখার সূচনা করে, তাহা হইলে উহার কর্ণ দ্বারা ঐ দুইটি বলের সমবায়জনিত ফলের তীব্রতা ও গতিরেখা নিরূপিত হইবে।

আর একটা ভাবের উপর অধ্যাস করতে পারি—যেমন আমরা যখন বলি, 'আকাশ নীল'—আকাশটা একটা ভাবমাত্র, আর নীলত্বও একটা ভাব—আমরা নীলত্ব-ভাবটা আকাশের উপর আরোপ বা অধ্যাস ক'রে থাকি।

বিদ্যা ও অবিদ্যা বা জ্ঞান ও অজ্ঞান—এই দুই নিয়ে জগৎ, কিন্তু আত্মা কোন কালে অবিদ্যায় আচ্ছন্ন হন না। আপেক্ষিক জ্ঞানও ভাল, কারণ সেটা সেই চরম জ্ঞানে আরোহণ করিবার সোপান। কিন্তু ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান বা মানসিক জ্ঞান, এমন কি বেদপ্রমাণজন্য জ্ঞানও কখন পরমার্থ সত্য হ'তে পারে না; কারণ ঐগুলি সবই আপেক্ষিক জ্ঞানের সীমার ভিতর। প্রথমে 'আমি দেহ' এই ভ্রম দূর ক'রে দাও, তবেই যথার্থ জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা হবে। মানবীয় জ্ঞান পশুজ্ঞানেরই উচ্চতর অবস্থামাত্র।

* * *

বেদের এক অংশে কর্মকাণ্ড—নানাবিধ অনুষ্ঠানপদ্ধতি, যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতির উপদেশ আছে। অপরাংশে ব্রহ্মজ্ঞান ও যথার্থ আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মের বিষয় বর্ণিত আছে। বেদের এই ভাগ আত্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে উপদেশ দেন, আর সেইজন্যই বেদের ঐ ভাগের জ্ঞান যথার্থ পারমার্থিক জ্ঞানের অতি সমীপবর্তী। সেই অনন্ত পূর্ণ পরব্রহ্মের জ্ঞান কোন শাস্ত্রের উপর বা অপর কিছুর উপর নির্ভর করে না; এই জ্ঞান স্বয়ংপূর্ণস্বরূপ। বহুশাস্ত্রপাঠেও এই জ্ঞান লাভ হয় না; এ কোন মতবিশেষ নয়, এ জ্ঞান অপরোক্ষানুভূতি। আরশির উপর যে ময়লা রয়েছে, তা পরিষ্কার ক'রে ফেলো। নিজের মনটা পবিত্র কর, তা হলেই দপ্ ক'রে তোমার এই জ্ঞানের উদয় হবে যে, তুমি ব্রহ্ম।

শুধু ব্রহ্মই আছেন—জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, দুঃখ নেই, কষ্ট নেই, নরহত্যা নেই, কোনরূপ পরিণাম নেই, ভালও নেই, মন্দও নেই, সবই আমরা 'রজ্জুকে সর্প' মনে করছি—ভ্রম আমাদেরই। আমরা তখনই কেবল জগতের কল্যাণ করতে পারি, যখন আমরা ভগবান্‌কে ভালবাসি, এবং তিনিও আমাদের ভালবাসেন। হত্যাকারী ব্যক্তিও ব্রহ্মস্বরূপ—তার উপর হত্যাকারি-রূপ যে আবরণ রয়েছে, সেটা তাতে অধ্যস্ত বা আরোপিত হয়েছে মাত্র। আস্তে আস্তে হাত ধ'রে তাকে এই সত্য জানিয়ে দাও।

আত্মাতে কোন জাতিভেদ নেই; আছে—ভাবাটাই ভ্রম। সেই রকম আত্মার জীবন বা মরণ বা কোন প্রকার গতি বা গুণ আছে—এরূপ ভাবাও

ভ্রম। আত্মার কখনও পরিণাম হয় না, আত্মা কোথাও যানও না, আসেনও না। তিনি তাঁর নিজের সমুদয় প্রকাশগুলির অনন্ত সাক্ষিস্বরূপ, কিন্তু আমরা তাঁকে ঐ ঐ প্রকাশ ব'লে মনে করছি। এ এক অনাদি অনন্ত ভ্রম চিরকাল ধরে চলেছে। তবে বেদকে আমাদের ভূমিতে নেমে এসে উপদেশ দিতে হচ্ছে, কারণ বেদ যদি উচ্চতম সত্যকে উচ্চতম ভাবে বা ভাষায় আমাদের কাছে বলতেন, তা হ'লে আমরা বুঝতেই পারতাম না।

স্বর্গ আমাদের বাসনাসৃষ্ট কুসংস্কার-মাত্র, আর বাসনা চিরকালই বন্ধন—অবনতির দ্বারস্বরূপ। ব্রহ্মদৃষ্টি ছাড়া আর কোন ভাবে কোন বস্তুকে দেখো না। তা যদি কর, তা হ'লে অন্যায় বা মন্দ দেখবে; কারণ আমরা যে বস্তু দেখতে পাই, তার উপর একটা ভ্রমাত্মক আবরণ প্রক্ষেপ করি, তাই মন্দ দেখতে পাই। এই-সব ভ্রম থেকে মুক্ত হও এবং পরমানন্দ উপভোগ কর। সব রকম ভ্রম থেকে মুক্ত হওয়াই মুক্তি।

এক হিসাবে সকল মানুষই ব্রহ্মকে জানে; কারণ সে জানে, 'আমি আছি'; কিন্তু মানুষ নিজের যথার্থ স্বরূপ জানে না। আমরা সকলেই জানি যে, আমরা আছি, কিন্তু কি ক'রে আছি, তা জানি না। অদ্বৈতবাদ ছাড়া জগতের অন্যান্য নিম্নতর ব্যাখ্যা আংশিক সত্যমাত্র। কিন্তু বেদের তত্ত্ব এই যে, আমাদের প্রত্যেকের ভিতর যে আত্মা রয়েছে, তা ব্রহ্মস্বরূপ। জগৎপ্রপঞ্চের মধ্যে যা কিছু সব—জন্ম, মৃত্যু, বৃদ্ধি, উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় দ্বারা সীমাবদ্ধ। আমাদের অপরোক্ষানুভূতি বেদেরও অতীত; কারণ বেদেরও প্রামাণ্য ঐ অপরোক্ষানুভূতির উপর নির্ভর করে। সর্বোচ্চ বেদান্ত হচ্ছে—প্রপঞ্চাতীত সত্তার তত্ত্বজ্ঞান।

'সৃষ্টির আদি আছে' বললে সর্বপ্রকার দার্শনিক বিচারের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়।

জগৎপ্রপঞ্চের অন্তর্গত অব্যক্ত ও ব্যক্ত শক্তিকে 'মায়া' বলে। যতক্ষণ সেই মাতৃরূপিণী মহামায়া আমাদের ছেড়ে না দিচ্ছেন, ততক্ষণ আমরা মুক্ত হ'তে পারি না।

জগৎটা আমাদের উপভোগের জন্য পড়ে রয়েছে; কিন্তু কখনও অভাববোধ ক'রে কিছু চেও না। অভাববোধ করাটা দুর্বলতা, অভাববোধই আমাদের ভিক্ষুক ক'রে ফেলে। আমরা ভিক্ষুক নয়, আমরা রাজপুত্র!

রবিবার, ৭ই জুলাই, প্রাতঃকাল

অনন্ত জগৎপ্রপঞ্চকে যতই ভাগ করা যাক না কেন, তা অনন্তই থাকে, আর তার প্রত্যেক ভাগটাও অনন্ত।

পরিণামী ও অপরিণামী, ব্যক্ত ও অব্যক্ত—উভয় অবস্থাতেই ব্রহ্ম এক। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়কে এক ব'লে জেনো। জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়—এই ত্রিপুটী জগৎপ্রপঞ্চরূপে প্রকাশ পাচ্ছে। যোগী ধ্যানে যে ঈশ্বর দর্শন করেন, তা তিনি নিজ আত্মার শক্তিতেই দেখে থাকেন।

(আমরা যাকে স্বভাব বা অদৃষ্ট বলি, তা কেবল ঈশ্বরেচ্ছা মাত্র। যতদিন ভোগসুখ খোঁজা যায়, ততদিন বন্ধন থেকে যায়। যতক্ষণ অপূর্ণ থাকা যায়, ততক্ষণই ভোগ সম্ভব; কারণ ভোগের অর্থ অপূর্ণ বাসনার পরিপূর্তি। জীবাত্মা প্রকৃতিকে সম্ভোগ ক'রে থাকে। প্রকৃতি, জীবাত্মা ও ঈশ্বর—এদের অন্তর্নিহিত সত্য হচ্ছেন ব্রহ্ম। কিন্তু যতদিন আমরা তাঁকে বাইরে প্রকাশ না করছি, ততদিন তাঁকে আমরা দেখতে পাই না। যেমন ঘর্ষণের দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করতে পারা যায়, তেমনি ব্রহ্মকেও মন্থনের দ্বারা প্রকাশ করতে পারা যায়। দেহটাকে নিম্ন অরণি, প্রণব বা ওঙ্কারকে উত্তরারণি ব'লে কল্পনা কর, আর ধ্যান যেন মন্থনস্বরূপ।[1] তা হ'লে আত্মার মধ্যে যে ব্রহ্মজ্ঞানরূপ অগ্নি আছে, তা প্রকাশ হয়ে পড়বে। তপস্যা দ্বারা এইটে করতে চেষ্টা কর। দেহকে সরলভাবে রেখে ইন্দ্রিয়গুলিকে মনে আহুতি দাও। ইন্দ্রিয়কেন্দ্রগুলি সব ভিতরে, তাদের যন্ত্র বা গোলকগুলি কেবল বাইরে। সুতরাং তাদের জোর ক'রে মনে প্রবেশ করিয়ে দাও। তারপর ধারণার সহায়ে মনকে ধ্যানে স্থির কর। যেমন দুধের ভিতর সর্বত্র ঘি রয়েছে, ব্রহ্মও সেইরূপ জগতের সর্বত্র রয়েছেন। কিন্তু মন্থন দ্বারা তিনি এক বিশেষ স্থানে প্রকাশ পান। যেমন মন্থন করলে দুধের মাখন উঠে পড়ে, তেমনি ধ্যানের দ্বারা আত্মার মধ্যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়।[2])

১ আত্মানমরণিং কৃত্বা প্রণবং চোত্তরারণিম্।
ধ্যাননির্মথনাভ্যাসাদ্দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ ॥—ব্রহ্মোপনিষৎ

২ ঘৃতমিব পয়সি নিগূঢ়ং ভূতে ভূতে বসতি চ বিজ্ঞানম্
সততং মন্থয়িতব্যং মনসা মন্থানভূতেন ।—ব্রহ্মবিন্দু উপ., ২০

সমুদয় হিন্দুদর্শন বলেন, আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয় ছাড়া একটি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে। তাই দিয়েই অতীন্দ্রিয় জ্ঞানলাভ হয়ে থাকে।

* * *

জগৎটা একটা অবিরাম গতিস্বরূপ; আর ঘর্ষণ (friction) হতেই কালে সমুদয়ের নাশ হবে; তারপর দিন কতক বিশ্রাম হয়ে আবার সব আরম্ভ হবে।

যতদিন এই 'ত্বগম্বর' মানুষকে বেষ্টন ক'রে থাকে, অর্থাৎ যতদিন সে নিজেকে দেহের সঙ্গে অভিন্ন ভাবছে, ততদিন সে ঈশ্বরকে দেখতে পায় না।

রবিবার, অপরাহ্ণ

ভারতে ছটি দর্শনকে 'আস্তিক দর্শন' বলে; কারণ তারা বেদে বিশ্বাসী।

ব্যাসের দর্শন বিশেষভাবে উপনিষদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি সূত্রাকারে অর্থাৎ যেমন বীজগণিতশাস্ত্রে খুব সংক্ষেপে কয়েকটা অক্ষরের সাহায্যে ভাব-প্রকাশ করা হয়, তেমনি ভাবে এটা লিখেছিলেন—এতে কর্তা ক্রিয়া বড় একটা নেই। ব্যাসসূত্র এইরূপ সংক্ষেপে রচিত হওয়ায় শেষে তার অর্থ বুঝতে এত গোল হ'ল যে, ঐ এক সূত্র থেকেই দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈত-বাদের উৎপত্তি হ'ল। এই অদ্বৈতবাদই 'বেদান্ত-কেশরী'। আর এই-সব বিভিন্ন মতের বড় বড় ভাষ্যকারেরা বেদের অক্ষর-রাশিকে তাঁদের দর্শনের সঙ্গে খাপ খাওয়াবার জন্য সময়ে সময়ে 'জেনে শুনে মিথ্যাবাদী' হয়েছেন।

উপনিষদে কোন ব্যক্তিবিশেষের কার্যকলাপের ইতিহাস অতি অল্পই পাওয়া যায়; কিন্তু অন্যান্য প্রায় সকল ধর্মগ্রন্থই প্রধানতঃ কোন ব্যক্তিবিশেষের ইতিহাস।

বেদে প্রায় শুধু দার্শনিক তত্ত্বেরই আলোচনা আছে। দর্শনবর্জিত ধর্ম কুসংস্কারে গিয়ে দাঁড়ায়, আবার ধর্মবর্জিত দর্শন শুধু নাস্তিকতায় পরিণত হয়।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ মানে অদ্বৈতবাদ, কিন্তু বিশেষযুক্ত। তার ব্যাখ্যাতা রামানুজ। তিনি বলেন, 'বেদরূপ ক্ষীরসমুদ্র মন্থন ক'রে ব্যাস মানবজাতির কল্যাণের জন্য এই বেদান্তদর্শনরূপ মাখন তুলেছেন।' তিনি আরও বলেছেন, 'জগৎপ্রভু ব্রহ্ম অশেষকল্যাণগুণ-সমন্বিত পুরুষোত্তম।' মধ্ব পুরোদস্তর দ্বৈতবাদী। তিনি বলেন, স্ত্রীলোকের পর্যন্ত বেদপাঠে অধিকার আছে।

তিনি প্রধানতঃ পুরাণ থেকে তাঁর মত-স্থাপনের জন্য শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন, ব্রহ্ম মানে বিষ্ণু—শিব নন; কারণ বিষ্ণু ভিন্ন মুক্তিদাতা আর কেউ নেই।

সোমবার, ৮ই জুলাই

মধ্বাচার্যের ব্যাখ্যার ভিতর বিচারের স্থান নেই—তিনি শাস্ত্রপ্রমাণেই সব গ্রহণ করেছেন।

রামানুজ বলেন, বেদই সর্বাপেক্ষা পবিত্র পঠনীয় গ্রন্থ। ত্রৈবর্ণিক অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন উচ্চ বর্ণের সন্তানদের যজ্ঞোপবীত-গ্রহণের পর অষ্টম, দশম বা একাদশ বর্ষ বয়সে বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করা উচিত। বেদাধ্যয়নের অর্থ গুরুগৃহে গিয়ে নিয়মিত স্বর ও উচ্চারণের সহিত বেদের শব্দরাশি আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ করা।

জপের অর্থ ভগবানের পবিত্র নাম পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ; এই জপ করতে করতে সাধক ক্রমে ক্রমে সেই অনন্তরূপে উপনীত হন। যাগযজ্ঞাদি যেন ভঙ্গুর নৌকা। ব্রহ্মকে জানতে হ'লে ঐ যাগযজ্ঞাদি ছাড়া আরও কিছু চাই। আর ব্রহ্মজ্ঞানই মুক্তি। মুক্তি আর কিছু নয়—অজ্ঞানের বিনাশ; ব্রহ্মজ্ঞানেই এই অজ্ঞানের বিনাশ হয়। (বেদান্তের তাৎপর্য জানতে গেলে যে এই-সব যাগযজ্ঞ করতেই হবে, তার কোন মানে নেই; কেবল ওঙ্কার জপ

ভেদ-দর্শনই সমুদয় দুঃখের কারণ, আর অজ্ঞানই এই ভেদ-দর্শনের কারণ। এইজন্যই যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের কোন প্রয়োজন নেই; কারণ তাতে ভেদজ্ঞান আরও বাড়িয়ে দেয়। ঐ-সকল যাগযজ্ঞাদির উদ্দেশ্য কিছু (ভোগসুখ) লাভ করা—অথবা কোন কিছু (দুঃখ) থেকে নিস্তার পাওয়া।

ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, আত্মাই ব্রহ্ম, এবং আমরাই সেই আত্মস্বরূপ—এই প্রকার জ্ঞানের দ্বারাই সকল ভ্রান্তি দূর হয়। এই তত্ত্ব প্রথম শুনতে হবে, পরে মনন অর্থাৎ বিচার দ্বারা ধারণা করতে হবে, অবশেষে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করতে হবে। মনন অর্থে বিচার করা—বিচার দ্বারা, যুক্তিতর্কের দ্বারা ঐ জ্ঞান নিজের ভিতর প্রতিষ্ঠিত করা। প্রত্যক্ষানুভূতি ও সাক্ষাৎকার অর্থে সর্বদা চিন্তা বা ধ্যানের দ্বারা তাঁকে আমাদের জীবনের অঙ্গীভূত ক'রে ফেলা।

এই অবিরাম চিন্তা বা ধ্যান যেন একপাত্র থেকে অপর পাত্রে ঢালা অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার মতো। ধ্যান দিবারাত্র মনকে ঐ ভাবের মধ্যে রেখে দেয় এবং তাইতে আমাদের মুক্তিলাভ করতে সাহায্য করে। সর্বদা 'সোঽহম্, সোঽহম্' চিন্তা কর—অহরহ এইরূপ চিন্তা মুক্তির প্রায় কাছাকাছি। দিবারাত্র বলো—'সোঽহম্, সোঽহম্'। সর্বদা এইরূপ চিন্তার ফলে অপরোক্ষানুভূতি লাভ হবে। ভগবান্‌কে এইরূপ তন্ময়ভাবে সদাসর্বদা স্মরণের নামই ভক্তি।

সব রকম শুভকর্ম এই ভক্তিলাভ করতে গৌণভাবে সাহায্য ক'রে থাকে। শুভ চিন্তা ও শুভ কার্য অশুভ চিন্তা ও অশুভ কর্ম অপেক্ষা কম ভেদজ্ঞান উৎপন্ন করে, সুতরাং গৌণভাবে এরা মুক্তির দিকে নিয়ে যায়। কর্ম কর, কিন্তু কর্মফল ভগবানে অর্পণ কর। কেবল জ্ঞানের দ্বারাই পূর্ণতা বা সিদ্ধাবস্থা লাভ হয়। যিনি ভক্তিপূর্বক সত্যস্বরূপ ভগবানের সাধনা করেন, তাঁর কাছে সেই সত্যস্বরূপ ভগবান্ প্রকাশিত হন।

* * *

আমরা যেন প্রদীপ-স্বরূপ, আর ঐ প্রদীপের জ্বলাটাই হচ্ছে আমরা যাকে 'জীবন' বলি। যখনই অম্লজান ফুরিয়ে যাবে, তখনই আলোটাও নিবে যাবে। আমরা কেবল প্রদীপটাকে সাফ রাখতে পারি। জীবনটা কতকগুলি জিনিসের মিশ্রণে উৎপন্ন, সুতরাং জীবন অবশ্যই তার উপাদান-কারণগুলিতে লীন হবে।

মঙ্গলবার, ৯ই জুলাই

আত্মা-হিসাবে মানুষ বাস্তবিকই মুক্ত, কিন্তু মানুষ-হিসাবে সে বদ্ধ, প্রতেকটি প্রাকৃতিক পরিবেশে সে পরিবর্তিত হচ্ছে। মানুষ-হিসাবে তাকে একটা যন্ত্রবিশেষ বলা যায়, শুধু তার ভিতর একটা মুক্তি বা স্বাধীনতার ভাব আছে, এই পর্যন্ত। কিন্তু জগতের সর্বপ্রকার শরীরের মধ্যে এই মনুষ্যশরীরই শ্রেষ্ঠ শরীর, আর মনুষ্যমনই শ্রেষ্ঠ মন। যখন মানুষ আত্মোপলব্ধি করে, তখন সে আবশ্যকমত যে-কোন শরীর ধারণ করতে পারে; তখন সে সব নিয়মের পারে। এটা প্রথমতঃ একটা উক্তিমাত্র; একে প্রমাণ ক'রে দেখাতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে কার্যে এটা নিজে নিজে প্রমাণ ক'রে দেখতে হবে; আমরা নিজের মনকে বুঝাতে পারি, কিন্তু

অপরের মনকে বুঝাতে পারি না। ধর্মবিজ্ঞানের মধ্যে একমাত্র রাজযোগই প্রমাণ ক'রে দেখানো যেতে পারে, আর আমি নিজে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ক'রে যা ঠিক ব'লে জেনেছি, শুধু তাই শিক্ষা দিয়ে থাকি। বিচার-শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশপ্রাপ্ত অবস্থাই প্রাতিভ জ্ঞান, কিন্তু তা কখন যুক্তিবিরোধী হ'তে পারে না।

কর্মের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়, সুতরাং কর্ম বিদ্যা বা জ্ঞানের সহায়ক। বৌদ্ধদের মতে মানুষ ও জীবজন্তুর হিতসাধনই একমাত্র কর্ম; ব্রাহ্মণদের মতে উপাসনা ও সর্বপ্রকার যাগযজ্ঞাদি-অনুষ্ঠানও ঠিক সেইরূপ কর্ম এবং চিত্তশুদ্ধির সহায়ক। শঙ্করের মতে, 'শুভাশুভ সর্বপ্রকার কর্মই জ্ঞানের প্রতিবন্ধক।' যে-সকল কর্ম অজ্ঞানের দিকে নিয়ে যায়, সেগুলো পাপ—সাক্ষাৎসম্বন্ধে নয়, কিন্তু কারণস্বরূপে, যেহেতু সেগুলির দ্বারা রজঃ ও তমঃ বেড়ে যায়। সত্ত্বের দ্বারাই কেবল জ্ঞানলাভ হয়। পুণ্য ও শুভকর্মের দ্বারা জ্ঞানের আবরণ দূর হয়, আর কেবল জ্ঞানের দ্বারাই আমাদের ঈশ্বর-দর্শন হয়।

জ্ঞান কখন উৎপন্ন করা যেতে পারে না, তাকে কেবল অনাবৃত বা আবিষ্কার করা যেতে পারে; যে-কোন ব্যক্তি কোন বড় আবিষ্ক্রিয়া করেন, তাঁকেই উদ্বুদ্ধ বা অনুপ্রাণিত (inspired) পুরুষ বলা হয়। কেবল যদি তিনি আধ্যাত্মিক সত্য আবিষ্কার করেন, আমরা তাঁকে ঋষি বা অবতার বলি; আর যখন সেটা কোন জড়জগতের সত্য হয়, তখন তাঁকে বৈজ্ঞানিক বলি। যদিও সকল সত্যের মূল সেই এক ব্রহ্ম, তথাপি আমরা প্রথমোক্ত শ্রেণীকে উচ্চতর আসন দিয়ে থাকি।

শঙ্কর বলেন, ব্রহ্ম সর্বপ্রকার জ্ঞানের সার—তত্ত্বস্বরূপ; আর জ্ঞাতা-জ্ঞান-জ্ঞেয়-রূপ যে অভিব্যক্তি, তা ব্রহ্মে কাল্পনিক ভেদমাত্র। রামানুজ ব্রহ্মে জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। খাঁটী অদ্বৈতবাদীরা ব্রহ্মে কোন গুণই স্বীকার করেন না—এমন কি সত্তা পর্যন্ত নয়, সত্তা বলতে আমরা যাই কেন বুঝি না। রামানুজ বলেন, আমরা সচরাচর যাকে জ্ঞান বলি, ব্রহ্ম তাঁরই সারস্বরূপ। অব্যক্ত বা সাম্যভাবাপন্ন জ্ঞান ব্যক্ত বা বৈষম্যাবস্থা প্রাপ্ত হলেই জগৎপ্রপঞ্চের উৎপত্তি।

*　　*　　*

জগতের উচ্চতম দার্শনিক ধর্মসমূহের অন্যতম—বৌদ্ধধর্ম ভারতের আপামর সাধারণ সকলের ভিতর ছড়িয়ে পড়েছিল। ভেবে দেখ দেখি, আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে আর্যদের সভ্যতা ও শিক্ষা কি অদ্ভুত ছিল, যাতে তারা ঐরূপ উচ্চ উচ্চ ভাব ধারণা করতে পেরেছিল!

ভারতীয় শ্রেষ্ঠ দার্শনিকগণের মধ্যে একমাত্র বুদ্ধই জাতিভেদ স্বীকার করেননি, আর এখন ভারতে তাঁর একটিও অনুগামী দেখতে পাওয়া যায় না। অন্যান্য দার্শনিকেরা সকলেই সামাজিক কুসংস্কারগুলোর অল্পবিস্তর দালাল ছিলেন; তাঁরা যতই উঁচুতে উঠে থাকুন না কেন, তাঁদের মধ্যে একটু-আধটু চিল-শকুনির ভাব ছিলই। আমার গুরুদেব যেমন বলতেন, 'চিল-শকুনি এত উঁচুতে ওঠে যে, তাদের দেখা যায় না, কিন্তু তাদের নজর থাকে গো-ভাগাড়ে, কোথায় এক টুকরা পচা মাংস পড়ে আছে!'

* *

প্রাচীন হিন্দুরা অদ্ভুত পণ্ডিত ছিলেন—যেন জীবন্ত বিশ্বকোষ। তাঁরা বলতেন, বিদ্যা যদি পুঁথিগত হয়, আর ধন যদি পরের হাতে থাকে, কার্যকাল উপস্থিত হ'লে সে বিদ্যা বিদ্যা নয়, সে ধনও ধন নয়।[1]

শঙ্করকে অনেকে শিবের অবতার বলে জ্ঞান ক'রে থাকে।

বুধবার, ১০ই জুলাই

ভারতে সাড়ে ছ-কোটি মুসলমান আছে—তাদের মধ্যে কতক সুফী আছে। এই সুফীরা জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত অভিন্ন জ্ঞান করে। আর তাদের মাধ্যমেই ঐ ভাব ইওরোপে এসেছে। তারা বলে, 'আন্ আল্ হক্' অর্থাৎ আমিই সেই সত্যস্বরূপ। তবে তাদের ভিতর বহিরঙ্গ (বা প্রকাশ্য), এবং অন্তরঙ্গ (বা গুহ্য) মত আছে। যদিও মহম্মদ নিজে এ মত পোষণ করতেন না।

'হাশাশিন' শব্দ থেকে ইংরেজী assassin (হত্যাকারী) শব্দ এসেছে। মুসলমানদের একটি প্রাচীন সম্প্রদায় ধর্মমতের অঙ্গ মনে ক'রে কাফের বা অবিশ্বাসীদের হত্যা ক'রত।

---

[1] পুস্তকস্থা তু যা বিদ্যা পরহস্তগতং ধনম্।
কার্যকালে সমুৎপন্নে ন সা বিদ্যা ন তদ্ধনম্।—চাণক্যনীতি

মুসলমানদের উপাসনার সময় এক কুঁজো জল সামনে রাখতে হয়। ঈশ্বর সমগ্র জগৎ পরিপূর্ণ ক'রে রয়েছেন, এটা তাঁরই প্রতীকস্বরূপ।[১]

* * *

হিন্দুরা দশাবতারে বিশ্বাস করেন তাঁদের মতে নয় জন অবতার হয়ে গেছেন, দশম অবতার পরে আসবেন।

* * *

বেদের সকল বাক্য তৎপ্রচারিত দর্শনের সমর্থক—এইটি প্রমাণ করতে শঙ্করকে কখন কখন কূট তর্কের আশ্রয় নিতে হয়েছে। বুদ্ধ অন্য সকল ধর্মাচার্যের চেয়ে বেশী সাহসী ও অকপট ছিলেন। তিনি বলে গেছেন, 'কোন শাস্ত্রে বিশ্বাস ক'রো না। বেদ[২] মিথ্যা। যদি আমার উপলব্ধির সঙ্গে বেদ মেলে, সে বেদেরই সৌভাগ্য। আমিই সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র; যাগযজ্ঞ ও দেবোপাসনায় কোন ফল নেই।' মনুষ্যজাতির মধ্যে বুদ্ধই জগৎকে প্রথমে সর্বাঙ্গসম্পন্ন নীতিবিজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলেন। মঙ্গলের জন্যই তিনি মঙ্গলময় জীবন যাপন করতেন, ভালবাসার জন্যই তিনি ভালবাসতেন; তাঁর অন্য অভিসন্ধি কিছু ছিল না।

শঙ্কর বলেন, ব্রহ্মকে যুক্তি দিয়ে বিচার করতে হবে, মনন করতে হবে, কারণ বেদ এইরূপ বলছেন। বিচার অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের সহায়ক। বেদ এবং অনুভূত যুক্তি বা ব্যক্তিগত অনুভূতি উভয়ই ব্রহ্মের অস্তিত্বের প্রমাণ। তাঁর মতে বেদ একপ্রকার অনন্ত জ্ঞানের সাকার বিগ্রহ-স্বরূপ। বেদের প্রমাণ এই যে, তা ব্রহ্ম হ'তে প্রসূত হয়েছে, আবার ব্রহ্মের প্রমাণ এই যে, বেদের মতো অদ্ভুত গ্রন্থ ব্রহ্ম ব্যতীত আর কারও প্রকাশ করবার সাধ্য নেই। বেদ সর্বপ্রকার জ্ঞানের খনিস্বরূপ; আর মানুষ যেমন নিঃশ্বাসের দ্বারা বায়ু বাইরে প্রক্ষেপ করে, সেইরূপ বেদও তাঁর ভেতর থেকে প্রকাশিত হয়েছে; সেইজন্যই আমরা জানতে পারি, তিনি সর্বশক্তিমান্ ও সর্বজ্ঞ। তিনি জগৎ সৃষ্টি ক'রে থাকুন বা না থাকুন, তাতে বড় কিছু আসে যায় না; কিন্তু তিনি যে বেদ প্রকাশ করেছেন, এইটেই বড় জিনিস। বেদের সাহায্যেই জগৎ ব্রহ্ম-সম্বন্ধে জানতে পেরেছে—তাঁকে জানবার আর অন্য উপায় নেই।

১ তুলনীয়ঃ বৈদিক বা তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্মে ঘটস্থাপন।

২ এখানে বেদের কর্মকাণ্ডই লক্ষিত।

শঙ্করের এই মত, অর্থাৎ বেদ সমুদয় জ্ঞানের খনি—এটা সমগ্র হিন্দুজাতির এমন মজ্জাগত হয়ে গেছে যে, তাদের মধ্যে একটা প্রবাদ এই যে, গরু হারালেও বেদে তা খুঁজে পাওয়া যায়।

শঙ্কর আরও বলেন, কর্মকাণ্ডের বিধিনিষেধ মেনে চলাই জ্ঞান নয়। ব্রহ্মজ্ঞান কোনপ্রকার নৈতিক বাধ্যবাধকতা, যাগযজ্ঞাদি-অনুষ্ঠান বা আমাদের মতামতের উপর নির্ভর করে না; যেমন একটা স্থাণুকে একজন ভূত মনে করছে বা অপর একজন স্থাণুজ্ঞান করছে, তাতে স্থাণুর কিছু আসে যায় না।

বেদান্তবেদ্য জ্ঞান আমাদের বিশেষ প্রয়োজন, কারণ বিচার বা শাস্ত্রদ্বারা আমাদের ব্রহ্ম উপলব্ধি হ'তে পারে না। তাঁকে সমাধি দ্বারা উপলব্ধি করতে হবে, আর বেদান্তই ঐ অবস্থালাভের উপায় দেখিয়ে দেয়। আমাদের সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের ভাব অতিক্রম ক'রে সেই নির্গুণ ব্রহ্মে পৌঁছতে হবে। সব অনুভূতির ভেতর প্রত্যেক ব্যক্তিই ব্রহ্মকে অনুভব করছে[১]; ব্রহ্ম ছাড়া আর অনুভব করবার দ্বিতীয় বস্তুই নেই। আমাদের ভিতর যেটা 'আমি, আমি' করছে, সেটাই ব্রহ্ম। কিন্তু যদিও আমরা দিনরাত তাঁকে অনুভব করছি, তথাপি আমরা জানি না যে, তাঁকে অনুভব করছি। যে মুহূর্তে আমরা ঐ সত্য জানতে পারি, সেই মুহূর্তেই আমাদের সব দুঃখকষ্ট চলে যায়; সুতরাং আমাদের ঐ সত্যকে জানতেই হবে। একত্ব-অবস্থা লাভ কর, তা হ'লে আর দ্বৈতভাব আসবে না। কিন্তু যাগযজ্ঞাদি দ্বারা জ্ঞানলাভ হয় না; আত্মাকে অন্বেষণ, উপাসনা এবং সাক্ষাৎ করা—এই-সকলের দ্বারাই সেই জ্ঞানলাভ হবে।

ব্রহ্মবিদ্যাই পরা বিদ্যা; অপরা বিদ্যা হচ্ছে বিজ্ঞান। মুণ্ডকোপনিষৎ অর্থাৎ সন্ন্যাসীদের জন্য উপদিষ্ট উপনিষৎ এই উপদেশ দিচ্ছেন।[২] দুই প্রকার বিদ্যা আছে—পরা ও অপরা। তন্মধ্যে বেদের যে অংশে দেবোপাসনা ও নানাবিধ যাগযজ্ঞের উপদেশ—সেই কর্মকাণ্ড এবং সর্ববিধ লৌকিক জ্ঞানই অপরা বিদ্যা। যে বিদ্যা দ্বারা সেই অক্ষর পুরুষকে লাভ করা যায়, তাই পরা বিদ্যা। সেই অক্ষর পুরুষ নিজের মধ্য থেকেই সমুদয় সৃষ্টি করছেন—বাইরে অপর কিছু নেই, যা জগৎকারণ হ'তে পারে। সেই ব্রহ্মই সমুদয় শক্তিস্বরূপ,

১ প্রতিবোধবিদিতং······কেন উপ., ২।৪

২ মুণ্ডক উপ., ১।১।৪

ব্রহ্মই যা কিছু আছে—সব। যিনি আত্মযাজী, তিনিই কেবল ব্রহ্মকে জানেন। মূর্খেরাই বাহ্য পূজাকে শ্রেষ্ঠ মনে করে, অজ্ঞানব্যক্তিরাই মনে করে, কর্মের দ্বারা আমাদের ব্রহ্মলাভ হ'তে পারে। যাঁরা সুষুম্নাবর্ত্মে (যোগীদের মার্গে) গমন করেন, তাঁরাই শুধু আত্মাকে লাভ করেন। এই ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করতে হ'লে গুরুর কাছে যেতে হবে। সমষ্টিতেও যা আছে, ব্যষ্টিতেও তাই আছে; আত্মা থেকেই সব কিছু প্রসূত হয়েছে। (ওঙ্কার হচ্ছে যেন ধনু, আত্মা হচ্ছে যেন তীর, আর ব্রহ্ম হচ্ছেন লক্ষ্য।) অপ্রমত্ত হয়ে তাঁকে বিদ্ধ করতে হবে। তাঁতে মিশে এক হয়ে যেতে হবে।[1] সসীম অবস্থায় আমরা সেই অসীমকে কখনও প্রকাশ করতে পারি না। কিন্তু আমরাই সেই অসীমস্বরূপ। এইটি জানলে আর কারও সঙ্গে আমরা তর্ক করি না।

ভক্তি, ধ্যান ও ব্রহ্মচর্যের দ্বারা সেই দিব্যজ্ঞানলাভ করতে হবে। 'সত্যমেব জয়তে নানৃতম্, সত্যেনৈব পন্থা বিততো দেবযানঃ।'[2] সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার কখনই জয় হয় না। সত্যের ভিতর দিয়েই ব্রহ্মলাভের একমাত্র পথ রয়েছে; কেবল সেখানেই প্রেম ও সত্য বর্তমান।

বৃহস্পতিবার, ১১ই জুলাই

মায়ের ভালবাসা ব্যতীত কোন সৃষ্টিই স্থায়ী হ'তে পারে না। জগতের কোন কিছুই সম্পূর্ণ জড়ও নয়, আবার সম্পূর্ণ চিৎও নয়। জড় ও চিৎ পরস্পর-সাপেক্ষ—একটা দ্বারাই অপরটার ব্যাখ্যা হয়। এই পরিদৃশ্যমান জগতের যে একটা ভিত্তি আছে, এ-বিষয়ে সকল আস্তিকই একমত, কেবল সেই ভিত্তিস্থানীয় বস্তুর প্রকৃতি বা স্বরূপ-সম্বন্ধেই তাঁদের মতভেদ। জড়বাদীরা জগতের ঐরূপ কোন ভিত্তি আছে বলে স্বীকারই করে না।

সকল ধর্মের জ্ঞানাতীত বা তুরীয় অবস্থা এক। দেহজ্ঞান অতিক্রম করলে হিন্দু, খ্রীষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ—এমন কি যারা কোনপ্রকার ধর্মমত স্বীকার করে না, সকলের ঠিক একই প্রকার অনুভূতি হয়ে থাকে।

*　　　*　　　*

১ তুলনীয় : প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ ॥—মুণ্ডক, ২।২।৪

২ মুণ্ডক উপ., ৩।১।৬

যীশুর দেহত্যাগের পঁচিশ বৎসর পরে তাঁর শিষ্য টমাস (Apostle Thomas) কর্তৃক জগতের মধ্যে সব চেয়ে বিশুদ্ধ খ্রীষ্টান সম্প্রদায় ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অ্যাংলো-স্যাক্সনরা (Anglo-Saxons) তখনও অসভ্য ছিল—গায়ে চিত্র-বিচিত্র আঁকত ও পর্বতগুহায় বাস ক'রত। এক সময়ে ভারতে প্রায় ৩০ লক্ষ খ্রীষ্টান ছিল, কিন্তু এখন তাদের সংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষ হবে।

খ্রীষ্টধর্ম চিরকালই তরবারির বলে প্রচারিত হয়েছে। কি আশ্চর্য, খ্রীষ্টের ন্যায় নিরীহ মহাপুরুষের শিষ্যেরা এত নরহত্যা করেছে! বৌদ্ধ, মুসলমান ও খ্রীষ্ট ধর্ম—জগতে এই তিনটিই প্রচারশীল ধর্ম। এদের পূর্ববর্তী তিনটি ধর্ম, যথা—হিন্দু, য়াহুদী ও জরথুষ্ট্রের (পারসী) ধর্ম কখনও অপরকে ধর্মান্তরিত ক'রে দলপুষ্টি করতে চেষ্টা করেনি। বৌদ্ধেরা কখনও নরহত্যা করেনি, তারা শুধু কোমল ব্যবহারের দ্বারাই এক সময় জগতের তিন-চতুর্থাংশ লোককে নিজমতে নিয়ে এসেছিল।

বৌদ্ধেরা ছিল সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত অজ্ঞেয়বাদী। বাস্তবিকই শূন্যবাদ বা অদ্বৈতবাদ, এই দুয়ের মাঝখানে সত্যি কোথাও থামতে পার না। বৌদ্ধেরা বিচারের দ্বারা সব কেটে দিয়েছিল—তারা তাদের মত যুক্তিদ্বারা যতদূর নিয়ে যাওয়া চলে, তা নিয়ে গিয়েছিল। অদ্বৈতবাদীরাও তাদের মত যুক্তির চরম সীমায় নিয়ে গিয়েছিল এবং সেই এক অখণ্ড অদ্বয় ব্রহ্মবস্তুতে পৌঁছেছিল—যা থেকে সমুদয় জগৎপ্রপঞ্চ ব্যক্ত হচ্ছে। বৌদ্ধ ও অদ্বৈতবাদী উভয়েরই একই সময়ে একত্ব ও পৃথক্ত্ব বা বহুত্ববোধ আছে। এই দুটি অনুভূতির মধ্যে একটি সত্য, অপরটি মিথ্যা হবেই। শূন্যবাদী বলেন, পৃথক্ত্ব বা বহুত্ববোধ সত্য; অদ্বৈতবাদী বলেন, একত্ববোধই সত্য; সমগ্র জগতে এই বিবাদই চলেছে। এই নিয়েই ধস্তাধস্তি (tug of war) চলেছে।

অদ্বৈতবাদী জিজ্ঞাসা করেন, শূন্যবাদী একত্বের কোন ভাব পান কি ক'রে? ঘূর্ণমান আলোটা (অলাতচক্র) বৃত্তাকার মনে হয় কি ক'রে? একটা স্থিতি স্বীকার করলে তবেই গতির ব্যাখ্যা হ'তে পারে। সব জিনিসের পশ্চাতে একটা অখণ্ড সত্তা প্রতীয়মান হচ্ছে, সেটা শূন্যবাদী বলেন ভ্রমমাত্র; কিন্তু এরূপ ভ্রমোৎপত্তির কারণ কি, তা তিনি কোনরূপে ব্যাখ্যা করতে পারেন না। আবার অদ্বৈতবাদীও বোঝাতে পারেন না যে, এক

বহু হ'ল কি ক'রে। এর ব্যাখ্যা কেবলমাত্র পঞ্চেন্দ্রিয়ের অতীত অবস্থায় গেলেই পাওয়া যেতে পারে। আমাদের তুরীয় ভূমিতে উঠতে হবে, একেবারে অতীন্দ্রিয় অবস্থায় যেতে হবে। ঐ অবস্থায় যাবার অতীন্দ্রিয় শক্তি যেন একটি যন্ত্রস্বরূপ, আর তার ব্যবহার অদ্বৈতবাদীরই করায়ত্ত। তিনিই ব্রহ্মসত্তাকে অনুভব করতে সমর্থ; মানুষ 'বিবেকানন্দ' নিজেকে ব্রহ্মসত্তাতে পরিণত করতে পারে, আবার সেই অবস্থা থেকে মানবীয় অবস্থায় ফিরে আসতে পারে। সুতরাং তার পক্ষে জগৎসমস্যার মীমাংসা হয়ে গেছে, আর গৌণভাবে অপরের পক্ষেও ঐ মীমাংসা হয়ে গেছে; কারণ সে অপরকে ঐ অবস্থায় পৌঁছবার পথ দেখিয়ে দিতে পারে। এইরূপে বোঝা যাচ্ছে, যেখানে দর্শনের শেষ, সেখানে ধর্মের আরম্ভ। আর এইরূপ উপলব্ধি দ্বারা জগতের কল্যাণ এই হবে যে, এখন যা জ্ঞানাতীত রয়েছে, কালে তা সর্বসাধারণের পক্ষে জ্ঞানগম্য হয়ে যাবে। সুতরাং জগতে ধর্মলাভই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ কার্য; আর মানব অজ্ঞাতসারে এইটি অনুভব করেছে বলেই সে আবহমান কাল ধর্মভাবকে আশ্রয় ক'রে রয়েছে।

ধর্ম যেন বহুগুণশালিনী পয়স্বিনী গাভী; সে অনেক লাথি মেরেছে, কিন্তু তাতে কি? সে অনেক দুধও দেয়। যে গরুটা দুধ দেয়, গোয়ালা তার লাথি সহ্য ক'রে যায়।

'প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে' আছে, মহামোহ ও বিবেক এই দুই রাজায় লড়াই বেধেছিল। বিবেক রাজার সম্পূর্ণ জয় আর হয় না। অবশেষে বিবেক-রাজার সঙ্গে উপনিষদ্-দেবীর পুনর্মিলন হয়, এবং তাঁদের প্রবোধ-রূপ পুত্রের জন্ম হ'ল। আর সেই পুত্রের প্রভাবে তাঁর শত্রু ব'লে আর কেউ রইল না। তখন তাঁরা পরমসুখে বাস করতে লাগলেন। আমাদের প্রবোধ বা ধর্মসাক্ষাৎকাররূপ মহৈশ্বর্যবান্ পুত্রলাভ করতে হবে। ঐ প্রবোধ-রূপ পুত্রকে খাইয়ে দাইয়ে মানুষ করতে হবে, তা হলেই সে মস্ত একটা বীর হয়ে দাঁড়াবে।

ভক্তি বা প্রেমের দ্বারা বিনা চেষ্টায় মানুষের সমুদয় ইচ্ছাশক্তি একমুখী হয়ে পড়ে—স্ত্রী-পুরুষের প্রেমই এর দৃষ্টান্ত। ভক্তিমার্গ স্বাভাবিক পথ এবং তাতে যেতেও বেশ আরাম। জ্ঞানমার্গ কি রকম?—না—যেন একটা প্রবল বেগশালিনী পার্বত্য নদীকে জোর ক'রে ঠেলে তার উৎপত্তিস্থানে নিয়ে

যাওয়া। এতে অতি সত্বর বস্তুলাভ হয় বটে, কিন্তু বড় কঠিন। জ্ঞানমার্গ বলে, 'সমুদয় প্রবৃত্তিকে নিরোধ কর।' ভক্তিমার্গ বলে, 'স্রোতে গা ভাসিয়ে দাও, চিরদিনের জন্য পূর্ণ আত্মসমর্পণ কর।' এ পথ দীর্ঘ বটে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত সহজ ও সুখকর।

ভক্ত বলেন: 'প্রভো, চিরকালের জন্য আমি তোমার। এখন থেকে আমি যা কিছু করছি বলে মনে করি, তা বাস্তবিকই তুমিই ক'রছ—আর 'আমি' বা 'আমার' বলে কিছু নেই।'

'হে প্রভো, আমার অর্থ নেই যে আমি দান ক'রব; আমার বুদ্ধি নেই যে আমি শাস্ত্র শিক্ষা ক'রব; আমার সময় নেই যে যোগ-অভ্যাস ক'রব; হে প্রেমময়, আমি তাই তোমাকে আমার দেহমন অর্পণ করলাম।'

যতই অজ্ঞান বা ভ্রান্তধারণা আসুক, কিছুই জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে ব্যবধান ঘটাতে পারে না। ঈশ্বর ব'লে কেউ যদি নাও থাকেন, তবু প্রেমের ভাবকে দৃঢ়ভাবে ধ'রে থাকো। কুকুরের মতো পচা মড়া খুঁজে খুঁজে মরার চেয়ে ঈশ্বরের অন্বেষণ করতে করতে মরা ভাল। সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ বেছে নাও, আর সেই আদর্শকে লাভ করবার জন্য সারা জীবন নিয়োজিত কর। মৃত্যু যখন এত নিশ্চিত, তখন একটা মহান্ উদ্দেশ্যের জন্য জীবনপাত করার চেয়ে আর বড় জিনিস কিছু নেই।[১]

ভক্তিদ্বারা বিনা আয়াসে জ্ঞানলাভ হয়—ঐ জ্ঞানের পর পরাভক্তি আসে।

জ্ঞানী বড় সূক্ষ্ম বিচার করতে ভালবাসে, অতি সামান্য বিষয় নিয়েও একটা হৈ-চৈ বাধিয়ে দেয়; কিন্তু ভক্ত বলে, 'ঈশ্বর তাঁর যথার্থ স্বরূপ আমার কাছে প্রকাশ করবেন'; তাই সে সব কিছুই গ্রহণ করে।

রাবিয়া

রাবিয়া রোগেতে হয়ে মুহ্যমান
নিজ শয্যা'পরে আছিলা শয়ান।
এহেন কালেতে নিকটে তাঁহার
আগমন হ'ল দুই মহাত্মার ;—

[১] তুলনীয়: 'সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি।'—হিতোপদেশ

পবিত্র মালিক, জ্ঞানী সে হাসান,
পূজেন যাঁদের সব মুসলমান।

কহিলা হাসান সম্বোধিয়া তাঁরে,
'পবিত্র ভাবেতে প্রার্থনা যে করে,
যে শাস্তি ঈশ্বর দিননা তাহারে,
সহিষ্ণুতা-বলে বহন সে করে।'

পবিত্র মালিক—গভীরাত্মা যিনি,
বলিলেন নিজ অনুভব-বাণী,
'প্রভুর যা ইচ্ছা, তাই প্রিয় যার,
আনন্দ হইবে শাস্তিতে তাহার।'

রাবিয়া শুনিয়া দুজনের বাণী,
স্বার্থগন্ধলেশ আছে তাহে গণি ;
কহিলা, 'হে ঈশ, কৃপার ভাজন,
তুঁহু প্রতি এক করি নিবেদন—
যে জন দেখেছে প্রভুর বদন,
আনন্দ-পাথারে হইবে মগন।
প্রার্থনার কালে মনেতে তাহার
উঠিবে না কভু এমত বিচার—
শাস্তি পাইয়াছি আমি কোনকালে ;
জানিবে না কভু শাস্তি কারে বলে।'

—পারসী কবিতা

শুক্রবার, ১২ই জুলাই

(অদ্য বেদান্তসূত্রের শাঙ্করভাষ্য হইতে পড়া হইতে লাগিল।)

চতুর্থ ব্যাসসূত্র—'তৎ তু সমন্বয়াৎ'—আত্মা বা ব্রহ্মই সমুদয় বেদান্তের প্রতিপাদ্য।

ঈশ্বরকে—বেদান্ত থেকে জানতে হবে। সমুদয় বেদই জগৎকারণ সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়-কর্তা ঈশ্বরের কথা বলছে। সমুদয় হিন্দু দেবদেবীর উপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই দেবত্রয় রয়েছেন। ঈশ্বর এই তিনের একীভাব।

(বেদ তোমাকে ব্রহ্ম দেখিয়ে দিতে পারে না। তুমি তো সেই ব্রহ্মই রয়েছ। বেদ এইটুকু করতে পারে, যে-আবরণটা আমাদের চোখের সামনে থেকে সত্যকে আড়াল ক'রে রেখেছে, সেইটেই দূর ক'রে দিতে সাহায্য করতে পারে। প্রথম চলে যায় অজ্ঞানাবরণ, তারপর যায় পাপ, তারপর বাসনা ও স্বার্থপরতা দূর হয়; এইভাবে সব দুঃখ-কষ্টের অবসান হয়। এই অজ্ঞানের তিরোভাব তখনই হ'তে পারে, যখন আমরা জানতে পারি যে, ব্রহ্ম ও আমি এক; অর্থাৎ নিজেকে আত্মার সঙ্গে অভিন্ন ব'লে দেখ, মানবীয় উপাধিগুলির সঙ্গে নয়। দেহাত্মবুদ্ধি দূর ক'রে দাও দেখি, তা হলেই সব দুঃখ দূর হবে। মনের জোরে রোগ ভাল ক'রে দেওয়ার এই রহস্য। এই জগৎটা একটা সম্মোহনের (hypnotism) ব্যাপার; নিজের ওপর থেকে এই সম্মোহনের আবেশটা দূর ক'রে ফেলো, তা হলেই তোমার আর কষ্ট থাকবে না।)

মুক্ত হ'তে গেলে প্রথমে পাপের মধ্য দিয়ে যেতে হয়, তারপর পুণ্য অর্জন করতে হয়, শেষে পাপপুণ্য উভয়ই ত্যাগ করতে হবে। প্রথমে রজঃ দ্বারা তমঃকে জয় করতে হবে, পরে উভয়কেই সত্ত্বগুণে লয় করতে হবে—সর্বশেষে এই তিন গুণকেই অতিক্রম করতে হবে। এমন একটা অবস্থা লাভ কর, যেখানে তোমার প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাস তাঁর উপাসনা-স্বরূপ হবে।

যখনই দেখ যে অপরের কথা থেকে কোন কিছু শিখছ (বা লাভ ক'রছ), জেনো যে পূর্বজন্মে তোমার সেই বিষয় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, কারণ অভিজ্ঞতাই আমাদের একমাত্র শিক্ষক।[১]

যতই ক্ষমতালাভ হবে, ততই দুঃখ বেড়ে যাবে, সুতরাং বাসনাকে একেবারে নাশ ক'রে ফেলো। কোন কিছু বাসনা করা যেন ভীমরুলের চাকে কাটি দেওয়া। আর বাসনাগুলো সোনার পাতমোড়া বিষের বড়ি—এইটে জানার নামই বৈরাগ্য।

১ যখনই আমরা কোন ব্যক্তি স্থান বা বস্তুকে জানি, তা স্মৃতির মধ্য দিয়েই জানি, নতুবা বলি—জানি না। যার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে, তার সম্বন্ধেই স্মৃতি সম্ভব, অতএব অভিজ্ঞতাই একমাত্র শিক্ষক।

'মন ব্রহ্ম নয়।' 'তত্ত্বমসি'—তুমিই সেই, 'অহং ব্রহ্মাস্মি'—আমিই ব্রহ্ম। যখন মানুষ এইটি উপলব্ধি করে, তখন 'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ'।[১] তার সব হৃদয়গ্রন্থি কেটে যায়, সব সংশয় ছিন্ন হয়। যতদিন আমাদের উপরে কেউ, এমন কি ঈশ্বর পর্যন্ত থাকবেন, ততদিন অভয় অবস্থালাভ হ'তে পারে না। আমাদের সেই ঈশ্বর বা ব্রহ্ম হয়ে যেতে হবে। যদি এমন কোন বস্তু থাকে যা ব্রহ্ম থেকে পৃথক্, তা চিরকালই পৃথক্ থাকবে; তুমি যদি স্বরূপতঃ ব্রহ্ম থেকে পৃথক্ হও, তুমি কখনও তাঁর সঙ্গে এক হ'তে পারবে না; আবার বিপরীতক্রমে যদি তুমি এক হও, তা হ'লে কখনই পৃথক্ থাকতে পার না। যদি পুণ্যবলেই তোমার ব্রহ্মের সহিত যোগ হয়, তা হ'লে পুণ্যক্ষয়েই বিচ্ছেদ আসবে। আসল কথা, ব্রহ্মের সহিত তোমার নিত্য যোগ রয়েছে—পুণ্যকর্ম কেবল আবরণটা দূর করবার সহায়তা করে। আমরা 'আজাদ' অর্থাৎ মুক্ত, এইটি আমাদের উপলব্ধি করতে হবে।

'যমেবৈষ বৃণুতে'—যাঁকে এই আত্মা বরণ করেন[২]—এর তাৎপর্য, আমরাই আত্মা এবং আমরাই নিজেদের বরণ করি।

ব্রহ্মদর্শন কি আমাদের নিজেদের চেষ্টা ও পুরুষকারের উপর নির্ভর করছে, অথবা বাইরের কারও সাহায্যের উপর নির্ভর করছে?—আমাদের নিজেদের চেষ্টার উপর এটা নির্ভর করছে। আমাদের চেষ্টার দ্বারা আরশির উপর যে ময়লা পড়ে রয়েছে, সেইটে অপসারিত হয়—আরশি যেমন তেমনি থাকে, পরিবর্তিত হয় না। জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়—এ তিনের বাস্তবিক অস্তিত্ব নেই। 'যিনি জানেন যে, তিনি জানেন না, তিনিই ঠিক ঠিক জানেন। যিনি কেবল একটা মত অবলম্বন ক'রে বসে আছেন, তিনি কিছুই জানেন না।'[৩]

আমরা বদ্ধ—এই ধারণাটাই ভুল।

ধর্ম জিনিসটা জাগতিক নয়; ধর্ম হচ্ছে চিত্তশুদ্ধির ব্যাপার; এই জগতের উপর এর প্রভাব গৌণ মাত্র। মুক্তি জিনিসটা আত্মার স্বরূপ হ'তে অভিন্ন। আত্মা সদা শুদ্ধ, সদা পূর্ণ, সদা অপরিণামী। এই আত্মাকে তুমি

১ মুণ্ডক উপ., ২।২।৮

২ কঠ উপ., ১।২।২৩

৩ যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্‌॥ —কেন উপ., ২।৩

কখনও জানতে পার না। আমরা এই আত্মার সম্বন্ধে 'নেতি নেতি' ছাড়া আর কিছুই বলতে পারি না। শঙ্কর বলেন, 'যাকে আমরা মন বা কল্পনার সমুদয় শক্তিপ্রয়োগ করেও দূর করতে পারি না, তাই ব্রহ্ম।'

* * *

এই জগৎপ্রপঞ্চ ভাবমাত্র, আর বেদ এই ভাবপ্রকাশক শব্দরাশিমাত্র। আমরা ইচ্ছামত এই সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চ সৃষ্টি করতে পারি, আবার লয় করতে পারি। এক সম্প্রদায়ের কর্মী (কর্মানুষ্ঠানকারী)-দের মত এই যে, শব্দের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণে তার অব্যক্ত ভাবটি জাগরিত হয়, আর ফলস্বরূপ একটি ব্যক্ত কার্য উৎপন্ন হয়। তাঁরা বলেন, আমরা প্রত্যেকেই এক একজন সৃষ্টি-কর্তা। শব্দবিশেষ উচ্চারণ করলেই তৎসংশ্লিষ্ট ভাবটি উৎপন্ন হবে, আর তার ফল দেখা যাবে। হিন্দু দর্শনের এক সম্প্রদায়—মীমাংসকগণ বলেন, ভাব হচ্ছে শব্দের শক্তি, আর শব্দ হচ্ছে ভাবের অভিব্যক্তি।

শনিবার, ১৩ই জুলাই

(আমরা যা কিছু জানি, তাই মিশ্রণস্বরূপ ; আর আমাদের সমুদয় বিষয়ানুভূতি বিশ্লেষণ থেকেই এসে থাকে। মনকে অমিশ্র, স্বতন্ত্র বা স্বাধীন বস্তু ভাবাই দ্বৈতবাদ। শাস্ত্র বা বই পড়ে দার্শনিক জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান হয় না ; বরং যত বই পড়বে, ততই মন গুলিয়ে যাবে। যে-সব দার্শনিক তত চিন্তাশীল নন, তাঁরা ভাবতেন—মনটা একটা অমিশ্র বস্তু ; আর তাই থেকে তাঁরা 'স্বাধীন ইচ্ছা' নামক মতবাদে বিশ্বাসী হয়েছিলেন। কিন্তু মনোবিজ্ঞান (Psychology) মনের অবস্থাসমূহের বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছে যে, মন একটা মিশ্রবস্তু ; আর যেহেতু প্রত্যেক মিশ্রবস্তু কোন না কোন বাহ্য শক্তিবলে বিধৃত থাকে, সেই হেতু মন বা ইচ্ছাও বহিঃস্থ শক্তিসমূহের সংযোগে বিধৃত রয়েছে। এমন কি, যতক্ষণ না মানুষের ক্ষুধা পাচ্ছে, ততক্ষণ সে খাবার ইচ্ছা করতেও পারে না। ইচ্ছা বা সঙ্কল্প (will) বাসনার (desire) অধীন। কিন্তু তবুও আমরা স্বাধীন বা মুক্তস্বভাব—সকলেই এটা অনুভব ক'রে থাকে।)

অজ্ঞেয়বাদী বলেন, এই ধারণাটা ভ্রমমাত্র। তা হ'লে জগতের অস্তিত্বের প্রমাণ কিরূপে হবে ? এর এই মাত্র প্রমাণ যে, আমরা সকলেই জগৎ

দেখছি ও তার অস্তিত্ব অনুভব করছি। তা হ'লে আমরা যে সকলেই নিজেদের মুক্তস্বভাব ব'লে অনুভব করছি, এ অনুভবও যথার্থ না হবে কেন? যদি সকলে অনুভব করছে ব'লে জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়, তবে সকলেই যখন নিজেদের মুক্তস্বভাব বা স্বাধীনপ্রকৃতি অনুভব করছে, তখন তারও অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। তবে ইচ্ছাটাকে আমরা যেমন দেখছি, সেভাবে তার সম্বন্ধে 'স্বাধীন' কথাটা প্রয়োগ করা চলে না। মানুষের নিজ মুক্ত স্বভাব সম্বন্ধে এই স্বাভাবিক বিশ্বাসই সমুদয় তর্ক যুক্তি বিচারের ভিত্তি। 'ইচ্ছা'—বদ্ধভাবাপন্ন হবার আগে যেরূপ ছিল, তাই মুক্ত স্বভাব। এই যে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার ধারণা—এতেই প্রতিমুহূর্তে দেখাচ্ছে যে, মানুষ বন্ধন কাটাবার চেষ্টা করছে। একমাত্র বস্তু, যা প্রকৃত মুক্তস্বভাব হ'তে পারে—তা অনন্ত, অসীম, দেশ-কাল-নিমিত্তের বাইরে। মানুষের ভিতর এখন যে স্বাধীনতা রয়েছে, সেটা একটা পূর্বস্মৃতিমাত্র, স্বাধীনতা বা মুক্তিলাভের চেষ্টামাত্র।

জগতে সকল জিনিস যেন ঘুরে একটা বৃত্ত সম্পূর্ণ করবার চেষ্টা করছে—তার উৎপত্তিস্থানে যাবার, তার একমাত্র যথার্থ উৎস আত্মার কাছে যাবার চেষ্টা করছে। মানুষ যে সুখের অন্বেষণ করছে, সেটা আর কিছু নয়—সে যে সাম্যভাব হারিয়েছে, সেইটে ফিরে পাবার চেষ্টা করছে। এই যে নীতিপালন, এও বদ্ধভাবাপন্ন ইচ্ছার মুক্ত হবার চেষ্টা, আর এই থেকেই প্রমাণিত হয় যে, আমরা পূর্ণাবস্থা থেকে নেমে এসেছি।

* * * *

কর্তব্যের ধারণাটা যেন দুঃখরূপ মধ্যাহ্ন-মার্তণ্ড—আত্মাকেই যেন দগ্ধ ক'রে ফেলছে। 'হে রাজন্, এই এক বিন্দু অমৃত পান ক'রে সুখী হও।' আত্মা অকর্তা—এই ধারণাই অমৃত।

ক্রিয়া হ'তে থাক, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া যেন না আসে; ক্রিয়া থেকে সুখই হয়ে থাকে, সমুদয় দুঃখ হচ্ছে প্রতিক্রিয়ার ফল। শিশু আগুনে হাত দেয়—তার সুখ হয় বলেই; কিন্তু যখনই তার শরীর প্রতিক্রিয়া করে, তখনই পুড়ে যাওয়ার কষ্টবোধ হয়ে থাকে। ঐ প্রতিক্রিয়াটা বন্ধ করতে পারলে আমাদের আর ভয়ের কারণ কিছু নেই। মস্তিষ্ককে নিজের বশে নিয়ে এস, যেন সে প্রতিক্রিয়াটার খবর না রাখতে

প্যারে। সাক্ষিস্বরূপ হও, দেখো যেন প্রতিক্রিয়া না আসে, কেবল তা হলেই তুমি সুখী হ'তে পারবে। আমাদের জীবনের সবচেয়ে সুখকর মুহূর্ত সেইগুলি, যখন আমরা নিজেদের একেবারে ভুলে যাই। স্বাধীনভাবে প্রাণ খুলে কাজ কর, কর্তব্যের ভাব থেকে কাজ ক'রো না। আমাদের কোনই কর্তব্য নেই। এই জগৎ তো একটা খেলার আখড়া—এখানে আমরা খেলছি; আমাদের জীবন তো অনন্ত আনন্দের অবকাশ!

জীবনের সমগ্র রহস্য হচ্ছে নির্ভীক হওয়া। তোমার কি হবে—এ ভয় কখনও ক'রো না, কারও উপর নির্ভর ক'রো না। যে মুহূর্তে তুমি সকল সাহায্য প্রত্যাখ্যান কর, সেই মুহূর্তেই তুমি মুক্ত। যে স্পঞ্জটা পুরো জল শুষে নিয়েছে, সে আর জল টানতে পারে না।

* * *

আত্মরক্ষার জন্যও লড়াই করা অন্যায়, যদিও গায়ে পড়ে অপরকে আক্রমণ করার চেয়ে সেটা উঁচু জিনিস। 'ন্যায়সঙ্গত ক্রোধ' ব'লে কোন জিনিস নেই, কারণ সকল বস্তুতে সমত্ববুদ্ধির অভাব থেকেই ক্রোধ এসে থাকে।

রবিবার, ১৪ই জুলাই

ভারতে দর্শন-শাস্ত্রের অর্থ হচ্ছে—যে শাস্ত্র বা যে বিদ্যা দ্বারা আমরা ঈশ্বর দর্শন করতে পারি। দর্শন হচ্ছে ধর্মের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা। সুতরাং কোন হিন্দু কখনও ধর্ম ও দর্শনের ভিতর সংযোগসূত্র কি, তা জানতে চায় না।

দার্শনিক চিন্তাপ্রণালীর তিনটি সোপান আছে: (১) স্থূল বস্তুসমূহের পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞান (concrete); (২) ঐগুলিকে এক এক শ্রেণীতে শ্রেণীভুক্ত করা বা ঐগুলির মধ্যে 'সামান্য' আবিষ্কার করা (generalised); (৩) সেই সামান্য-গুলির ভিতর আবার সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা ঐক্য আবিষ্কার করা (abstract)। সমুদয় বস্তু যেখানে একত্বপ্রাপ্ত হয়, সেই চূড়ান্ত বস্তু হচ্ছেন অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। ধর্মের প্রথমাবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন প্রতীক বা রূপবিশেষের সহায়তা গৃহীত হয়ে থাকে, দেখা যায়; দ্বিতীয় অবস্থায় নানাবিধ পৌরাণিক বর্ণনা ও উপদেশের বাহুল্য; সর্বশেষ অবস্থায় দার্শনিক তত্ত্বসমূহের বিবৃতি। এদের মধ্যে প্রথম দুটি শুধু সাময়িক প্রয়োজনের জন্য, কিন্তু দর্শনই ঐ-সকলের মূল ভিত্তিস্বরূপ, আর অন্যগুলি সেই চরমতত্ত্বে পৌঁছবার সোপান মাত্র।

পাশ্চাত্য দেশে ধর্মের ধারণা এই—বাইবেলের নিউ টেস্টামেণ্ট ও খ্রীষ্ট ব্যতীত ধর্মই হ'তে পারে না। য়াহুদীধর্মেও মূশা ও প্রফেটদের সম্বন্ধে এই রকম এক ধারণা আছে। এরূপ ধারণার হেতু এই যে, এই-সব ধর্ম কেবল পৌরাণিক বর্ণনার উপর নির্ভর করে। প্রকৃত সর্বোচ্চ ধর্ম এই-সকল পৌরাণিক বর্ণনা ছাড়িয়ে ওঠে; সে-ধর্ম কখনও শুধু এগুলিরই উপর নির্ভর করতে পারে না। আধুনিক বিজ্ঞান বাস্তবিকই প্রকৃত ধর্মের ভিত্তিকে আরও দৃঢ় করেছে। সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডটা যে এক অখণ্ড বস্তু, তা বিজ্ঞানের দ্বারা প্রমাণ করা যেতে পারে। দার্শনিক যাকে 'সত্তা' (being) বলেন, বৈজ্ঞানিক তাকেই 'জড়' (matter) ব'লে থাকেন; কিন্তু ঠিক ঠিক দেখতে গেলে, এদের দুজনের মধ্যে কোন বিরোধ নেই, কারণ তত্ত্বতঃ দুই-ই এক জিনিস। দেখ না, পরমাণু অদৃশ্য ও অচিন্ত্য, অথচ তাতে ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় শক্তি ও সম্ভাবনা রয়েছে। বেদান্তীরাও আত্মা সম্বন্ধে ঠিক এইভাবের কথাই ব'লে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে সব সম্প্রদায়ই বিভিন্ন ভাষায় ঐ এক কথাই বলছেন।

বেদান্ত ও আধুনিক বিজ্ঞান উভয়ই জগতের কারণস্বরূপ এমন এক বস্তুকে নির্দেশ করছেন, যা হ'তে অন্য কিছুর সাহায্য ব্যতীত জগতের প্রকাশ হয়েছে। সেই এক কারণই নিমিত্ত-কারণ, আবার সমবায়ী ও অসমবায়ী উপাদান-কারণ—সবই। যেন কুম্ভকার মৃত্তিকা থেকে ঘট নির্মাণ করছে; এখানে কুম্ভকার হচ্ছে নিমিত্ত-কারণ, মৃত্তিকা হচ্ছে সমবায়ী উপাদান-কারণ, আর কুম্ভকারের চক্র অসমবায়ী উপাদান-কারণ। কিন্তু আত্মা এই তিনই। আত্মা কারণও বটে, এবং অভিব্যক্তি বা কার্যও বটে। বেদান্তী বলেন, এই জগৎটা সত্য নয়, আপাতপ্রতীয়মান মাত্র। প্রকৃতি আর কিছুই নয়, অবিদ্যাবরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত ব্রহ্মমাত্র। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা বলেন, ঈশ্বর প্রকৃতি বা এই জগৎপ্রপঞ্চ হয়েছেন। অদ্বৈতবাদীরা সিদ্ধান্ত করেন, ঈশ্বর এই জগৎপ্রপঞ্চরূপে প্রতীয়মান হচ্ছেন বটে, কিন্তু তিনি এই জগৎ নন।

আমরা অনুভূতি-বিশেষকে একটা মানসিক প্রক্রিয়ারূপেই জানতে পারি—একে মানসিক একটি ঘটনারূপে এবং মস্তিষ্কের মধ্যে একটা দাগরূপে জানতে পারি। আমরা মস্তিষ্ককে সম্মুখে বা পশ্চাতে চালাতে পারি না, কিন্তু মনকে

পারি। মনকে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান—সমুদয় কালেই প্রসারিত করা যেতে পারে; সুতরাং মনের মধ্যে যা যা ঘটে, তা অনন্তকালের জন্য সঞ্চিত থাকে। মনের মধ্যে সব ঘটনা পূর্ব থেকেই সংস্কারের আকারে রয়েছে; মন সর্বব্যাপী কি না।

'দেশ-কাল-নিমিত্ত যে চিন্তারই প্রণালীবিশেষ'—এই আবিষ্ক্রিয়াই ক্যাণ্টের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। কিন্তু বেদান্ত বহু পূর্বেই এই তত্ত্ব শিক্ষা দিয়েছে, আর একে 'মায়া' নামে অভিহিত করেছে। শোপেনহাওয়ার শুধু যুক্তির উপর দাঁড়িয়ে বেদোক্ত তত্ত্বগুলির যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন। শঙ্কর বেদকে আর্ষ বলে গেছেন।

* * *

অনেকগুলি বৃক্ষ দেখে তাদের যে সাধারণ ধর্ম বৃক্ষত্ব—এই আবিষ্কারের নামই 'জ্ঞান'। আর সর্বোচ্চ জ্ঞান হচ্ছে অদ্বৈত জ্ঞান।…

সমুদয় জগৎপ্রপঞ্চের চরম সামান্য বা সাধারণ ভাবই সগুণ ঈশ্বর; কেবল সেটা অস্পষ্ট, এবং সুনির্দিষ্ট ও দার্শনিক বিচারসম্মত নয়।…

সেই এক তত্ত্ব স্বয়ং অভিব্যক্ত হচ্ছে, তা থেকেই যা কিছু সব হয়েছে।…

পদার্থ-বিজ্ঞানের কাজ ঘটনাবলী আবিষ্কার করা, আর দর্শন যেন ঐ বিভিন্ন ঘটনারূপ ফুলগুলি নিয়ে তোড়া বাঁধবার সুতো। চিন্তাসহায়ে ঐক্য আবিষ্কারের চেষ্টামাত্রই দর্শনের এলাকায়। এমন কি, একটা গাছের গোড়ায় সার দেওয়ার ব্যাপারেও এইরূপ একটা প্রণালীর সহায়তা নিতে হয়।…

ধর্মের ভিতর স্থূল, অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও চরম একত্ব—এই তিনটি ভাবই আছে। কেবল স্থূল বা বিশেষ নিয়েই পড়ে থেকো না। সেই চরম সূক্ষ্ম তত্ত্বে—সেই একত্বে চলে যাও।

* * *

অসুরেরা তমঃপ্রধান যন্ত্র, দেবতারা সত্ত্বপ্রধান যন্ত্র; কিন্তু দুই-ই যন্ত্র; মানুষই কেবল চেতন, জীবন্ত। যন্ত্রবৎ ভাবটাকে দূর ক'রে দাও; ধারণা কর, তুমি যন্ত্র নিয়ে কাজ ক'রছ—তুমি যন্ত্র নও, তবেই মুক্ত হ'তে পারবে। এই পৃথিবীই একমাত্র স্থান, যেখানে মানুষ নিজের মুক্তিসাধন করতে পারে।

'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ'—এই আত্মা যাকে বরণ করেন, এ কথাটা সত্য। বরণ বা মনোনীত করাটা সত্য, কিন্তু ভিতরের দিক থেকে এর

অর্থ করতে হবে। বাইরে থেকে কেউ বরণ করছে—কথাটার যদি এইরূপ অদৃষ্টবাদমূলক ব্যাখ্যা করা যায়, তবে তো এটা ভয়ানক কথা হয়ে দাঁড়ায়।

সোমবার, ১৫ই জুলাই

যেখানে স্ত্রীলোকদের বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে, যেমন তিব্বতে, সেখানে স্ত্রীলোকদের শারীরিক শক্তি পুরুষের চেয়ে বেশী। যখন ইংরেজরা ঐ দেশে যায়, এই স্ত্রীলোকেরা জোয়ান জোয়ান পুরুষদের ঘাড়ে নিয়ে পাহাড় চড়াই করে।

মালাবার দেশে অবশ্য মেয়েদের বহুবিবাহ নাই, কিন্তু সেখানে সব বিষয়ে তাদের প্রাধান্য। সেখানে সর্বত্রই বিশেষভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবার দিকে নজর দেখা যায়, আর বিদ্যাচর্চায় যারপর নাই উৎসাহ। ঐ দেশে দেখেছি—অনেক মেয়ে ভাল সংস্কৃত বলতে পারে, কিন্তু ভারতের অন্যত্র দশ লক্ষের মধ্যে একটি মেয়েও সংস্কৃত বলতে পারে কি না, সন্দেহ। স্বাধীনতায় উন্নতি হয়, আর দাসত্ব থেকে অবনতিই হয়ে থাকে। পোর্তুগীজ বা মুসলমান কারও দ্বারাই মালাবার কখনও বিজিত হয়নি।

দ্রাবিড়ীরা মধ্য-এশিয়ার এক অনার্যজাতি—আর্যদের পূর্বেই তারা ভারতে এসেছিল, আর দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়ীরাই সব চেয়ে সভ্য ছিল। তাদের মধ্যে পুরুষের চেয়ে নারীর সামাজিক অবস্থা উন্নত ছিল। পরে তারা ভাগ হয়ে গেল; কতকগুলি মিশরে, কতকগুলি বাবিলোনিয়ায় চলে গেল, অবশিষ্ট ভারতেই রইল।

মঙ্গলবার, ১৬ই জুলাই

(শঙ্কর)

অদৃষ্ট (অর্থাৎ অব্যক্ত কারণ বা সংস্কার) আমাদের যাগযজ্ঞ উপাসনাদি করায়, তা থেকে ব্যক্ত ফল উৎপন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু মুক্তি লাভ করতে হ'লে আমাদের ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রথমে শ্রবণ, পরে মনন, তারপর নিদিধ্যাসন করতে হবে।

কর্মের ফল আর জ্ঞানের ফল সম্পূর্ণ পৃথক। সর্বপ্রকার নীতি-ধর্মের মূল হচ্ছে বিধিনিষেধ—'এই কাজ করো' এবং 'এই কাজ ক'রো না'; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেহমনের সঙ্গেই এগুলির সম্বন্ধ। সর্বপ্রকার সুখদুঃখ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত; সুতরাং সুখদুঃখ ভোগ করতে গেলেই শরীরের প্রয়োজন। যার দেহ যত উন্নত, তার ধর্ম বা পুণ্যের আদর্শও তত উচ্চ; এই রকম ব্রহ্মা পর্যন্ত; এ পর্যন্ত সকলেরই শরীর আছে। আর যতক্ষণ শরীর আছে, ততক্ষণ সুখদুঃখ থাকবেই; কেবল দেহভাবমুক্ত হলেই সুখদুঃখ অতিক্রম করা যেতে পারে। শঙ্কর বলেন, আত্মা দেহহীন।

কোন বিধি-নিষেধের দ্বারা মুক্তিলাভ হ'তে পারে না। তুমি সদা মুক্তই আছ। যদি তুমি পূর্ব হতেই মুক্ত না থাকো, তবে কিছুই তোমায় মুক্তি দিতে পারে না। আত্মা স্বপ্রকাশ। কার্যকারণ আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে না—এই দেহশূন্য ভাব বা বিদেহ অবস্থার নামই মুক্তি। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান—সব কিছুর পারে ব্রহ্ম। যদি মুক্তি কোন কর্মের ফল হ'ত, তবে তার কোন মূল্যই থাকত না, সেটা একটা যৌগিক বস্তু হ'ত, সুতরাং তার ভিতর বন্ধনের বীজ নিহিত থাকত। এই মুক্তিই আত্মার একমাত্র নিত্যভাব, তাকে লাভ করতে হয় না, সেটা আত্মার যথার্থ স্বরূপ।

তবে আত্মার উপর যে আবরণ পড়ে রয়েছে, সেইটে সরাবার জন্য—বন্ধন ও ভ্রম দূর করবার জন্য—কর্ম ও উপাসনার প্রয়োজন; এরা মুক্তি দিতে পারে না বটে, কিন্তু তথাপি আমরা যদি নিজেরা চেষ্টা না করি, তা হ'লে আমাদের চোখ ফোটে না, আমরা আমাদের স্বরূপ জানতে পারি না। শঙ্কর আরও বলেন, অদ্বৈতবাদই বেদের গৌরব-মুকুট; কিন্তু বেদের নিম্নতরভাগগুলিরও প্রয়োজন আছে, কারণ তারা আমাদের কর্ম ও উপাসনার উপদেশ দিয়ে থাকে, আর এইগুলির সাহায্যেও অনেকে ভগবানের কাছে গিয়ে থাকে। তবে এমন অনেকে থাকতে পারে, যারা কেবল অদ্বৈতবাদের সাহায্যেই সেই অবস্থায় যাবে। অদ্বৈতবাদ যে অবস্থায় নিয়ে যায়, কর্ম এবং উপাসনাও সেই অবস্থাতেই নিয়ে যায়।

শাস্ত্র ব্রহ্মসম্বন্ধে কিছু শিক্ষা দিতে পারে না, কেবল অজ্ঞান দূর ক'রে দিতে পারে। শাস্ত্রের কার্য নাশাত্মক (negative)। শঙ্করের প্রধান কৃতিত্ব এই যে, তিনি শাস্ত্রও মেনেছিলেন, আবার সকলের সামনে মুক্তির পথও

খুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু যাই বলো, তাঁকে ঐ নিয়ে চুলচেরা বিচার করতে হয়েছে। প্রথমে মানুষকে একটা স্থূল অবলম্বন দাও, তারপর ধীরে ধীরে তাকে সর্বোচ্চ অবস্থায় নিয়ে যাও। বিভিন্ন প্রকার ধর্ম এই চেষ্টাই করছে, আর এ থেকে বোঝা যায়—কেন ঐ-সকল ধর্ম জগতে এখনও রয়েছে এবং কি ক'রে প্রত্যেকটিই মানুষের উন্নতির কোন না কোন অবস্থার উপযোগী। শাস্ত্র অবিদ্যা দূর করতে সাহায্য করে, কিন্তু শাস্ত্রও ঐ অবিদ্যার অন্তর্গত। শাস্ত্রের কাজ হচ্ছে জ্ঞানের উপর যে অজ্ঞানরূপ আবরণ এসে পড়েছে, তা দূর করা। 'সত্য অসত্যকে দূর ক'রে দেবে।' তুমি মুক্তই আছ, তোমাকে মুক্ত করা যায় না। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি ধর্মমতবিশেষ অবলম্বন ক'রে আছ, ততক্ষণ তুমি ব্রহ্মকে লাভ করনি। 'যিনি মনে করেন আমি জানি, তিনি জানেন না।'[১] যিনি স্বয়ং জ্ঞাতাস্বরূপ, তাঁকে কে জানতে পারে?[২] দুটি চিরন্তন বস্তু আছে—ব্রহ্ম ও জগৎ। প্রথমটি অর্থাৎ ব্রহ্ম অপরিণামী, দ্বিতীয়টি অর্থাৎ জগৎ পরিণামী। জগৎ অনন্তকাল ধ'রে রয়েছে। যেখানে পরিণাম কতখানি হচ্ছে, মন তা ধরতে পারে না, তোমরা তো তাকেই অনন্ত বলে থাকো। জগৎ ও ব্রহ্ম এক বটে, কিন্তু একই সময়ে তো তোমরা দুটো দেখতে পাও না—একখানা পাথরের উপর একটা ছবি বা মূর্তি খোদাই করা রয়েছে; যখন তোমার পাথরের দিকে খেয়াল থাকে, তখন খোদাই-এর দিকে থাকে না; আবার যখন খোদাই-এর দিকে মন দাও, তখন পাথরের খেয়াল থাকে না; অথচ দুই-ই এক।

* * *

তুমি কি এক মুহূর্তের জন্যও নিজেকে সম্পূর্ণ স্থির শান্ত করতে পারো? সকল যোগীই বলেন, এটা করা সম্ভব।

* * *

সকলের চেয়ে বেশী পাপ হচ্ছে নিজেকে দুর্বল ভাবা। তোমার চেয়ে বড় আর কেউ নেই; উপলব্ধি কর যে, তুমি ব্রহ্মস্বরূপ। কোন বস্তুতে তুমি যে শক্তির বিকাশ দেখ, সে শক্তি তোমারই দেওয়া।

১ কেন উপ., ২।৩

২ 'বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ'—বৃহ. উপ., ২।৪।১৪ ও ৪।৫।১৫

(আমরা সূর্য, চন্দ্র, তারা, এমন কি—সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চ অতিক্রম ক'রে রয়েছি। শিক্ষা দাও, মানুষ ব্রহ্মস্বরূপ। মন্দ ব'লে কিছু আছে—এটি স্বীকার ক'রো না, যা নেই তাকে আর নূতন ক'রে সৃষ্টি ক'রো না। সদর্পে বলো—আমি প্রভু, আমি সকলের প্রভু। আমরাই নিজেদের শৃঙ্খল নিজেরা গড়েছি, আর আমরাই কেবল ঐ শিকল ভাঙতে পারি।)

কোন প্রকার কর্ম তোমায় মুক্তি দিতে পারে না, কেবল জ্ঞানের দ্বারাই মুক্তি হ'তে পারে। জ্ঞান অপ্রতিরোধ্য; ইচ্ছা হ'ল তাকে গ্রহণ করলাম, ইচ্ছা হ'ল ত্যাগ করলাম—এরূপ হ'তে পারে না। যখন জ্ঞানোদয় হবে, মনকে তা গ্রহণ করতেই হবে। সুতরাং এই জ্ঞানলাভ মনের কার্য নয়, তবে মনে ঐ জ্ঞানের প্রকাশ হয়ে থাকে বটে।

কর্ম বা উপাসনার ফল এইটুকু যে, ওতে তোমার যে-স্বরূপ ভুলেছিলে, তা ফিরে পাও। আত্মা যে দেহ, এইটে মনে করাই সম্পূর্ণ ভ্রম; সুতরাং আমরা এই শরীরে থাকতে থাকতেই মুক্ত হ'তে পারি। দেহের সঙ্গে আত্মার কিছুমাত্র সাদৃশ্য নেই। মায়ার অর্থ 'কিছু না' নয়, 'অসৎ'কে 'সৎ' বা সত্য ব'লে গ্রহণ করা।

বুধবার, ১৭ই জুলাই

রামানুজ জগৎপ্রপঞ্চকে চিৎ (জীবাত্মা বা প্রাণী), অচিৎ (জড়প্রকৃতি), এবং ঈশ্বর—এই তিন ভাগে ভাগ করেছেন; অথবা চেতন, অবচেতন ও অধিচেতন—এই তিন ভাগ। শঙ্কর কিন্তু বলেন: জীবাত্মা চিৎ ও (পরমাত্মা) ঈশ্বর বা ব্রহ্ম এক বস্তু। ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ; ঐ সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত তাঁর গুণ নয়। ব্রহ্মকে চিন্তা করতে গেলেই তাঁকে বিশিষ্ট করা হয়; তাঁর সম্বন্ধে বড় জোর বলা যেতে পারে 'ওঁ তৎ সৎ'—অর্থাৎ তিনি সত্তাস্বরূপ, তিনি অস্তিস্বরূপ—এই মাত্র।

শঙ্কর আরও জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি সত্তাকে আর সব বস্তু থেকে পৃথক্ ক'রে দেখতে পারো? দুটি বস্তুর মধ্যে 'বিশেষ' বা পার্থক্য কোন্‌খানে? ইন্দ্রিয়জ্ঞানে নয়, কারণ তা হ'লে সব জিনিসই এক রকম বোধ হ'ত। আমাদের বিষয়-জ্ঞান একটার পর আর একটা, এই ক্রমে হয়ে থাকে। একটা বস্তু কি, তা জানতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে জানতে হয়, সেটা কি নয়। দুটি বস্তুর

মধ্যে পার্থক্যগুলি আমাদের স্মৃতির মধ্যে অবস্থিত, আর চিত্তে যা সঞ্চিত রয়েছে, তারই সঙ্গে তুলনা ক'রে আমরা এগুলি জানতে পারি। বস্তুর স্বরূপের মধ্যে ভেদ নেই, সেটা আমাদের মস্তিষ্কে রয়েছে। বাইরে এক অখণ্ড বস্তুই রয়েছে; ভেদ কেবল ভেতরে, আমাদের মনে; সুতরাং বহুজ্ঞান মনেরই

এই 'বিশেষ'গুলিই গুণপদবাচ্য হয়, যখন তারা পৃথক্ থাকে, অথচ কোন একটি জিনিসের সঙ্গে জড়িত থাকে। এই 'বিশেষ' জিনিসটা কি, তা আমরা ঠিক ক'রে বলতে পারি না। আমরা বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে দেখতে পাই ও অনুভব করি কেবল সত্তা বা একটা 'অস্তি'ভাব। আর যা কিছু সব আমাদেরই মধ্যে রয়েছে। কোন বস্তুর সত্তাসম্বন্ধেই শুধু আমরা নিঃসংশয় প্রমাণ পেয়ে থাকি। বিশেষ বা ভেদগুলি প্রকৃতপক্ষে গৌণভাবে সত্য—যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান, কারণ ঐ সর্পজ্ঞানেরও সত্যতা আছে; ভুলভাবে হলেও একটা কিছু তো দেখা যাচ্ছে। যখন রজ্জুজ্ঞান বাধিত হয়, তখনই সর্পজ্ঞানের আবির্ভাব হয়, আবার বিপরীতক্রমে সর্পজ্ঞানের লোপে রজ্জুজ্ঞানের আবির্ভাব। কিন্তু তুমি একটা মাত্র জিনিস দেখছ ব'লে প্রমাণিত হয় না যে, অন্য জিনিসটা নেই। জগৎ-জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়ে তাকে আবরণ ক'রে রেখেছে, তাকে দূর করতে হবে, কিন্তু তার যে অস্তিত্ব আছে, এ-কথা স্বীকার করতেই হবে।

শঙ্কর আরও বলেন যে, অনুভূতিই (perception) অস্তিত্বের চরম প্রমাণ। অনুভূতি স্বয়ংজ্যোতিঃ ও আত্মসচেতন, কারণ ইন্দ্রিয়জ্ঞানের বাইরে যেতে গেলে আমরা তাকে ছাড়তে পারি না। অনুভূতি কোন ইন্দ্রিয়- বা করণ-সাপেক্ষ নয়, সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। চেতনা (consciousness) ব্যতীত অনুভূতি হ'তে পারে না; অনুভব স্বপ্রকাশ, তারই নিম্নতর মাত্রার প্রকাশকে 'চেতনা' বলে। কোন প্রকার অনুভব-ক্রিয়াই চেতনারহিত হ'তে পারে না, প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক অনুভূতির স্বরূপই হচ্ছে চেতনা। সত্তা আর অনুভব এক বস্তু, দুটি পৃথক্ পৃথক্ ভাব এক সঙ্গে জোড়া নয়। যার কোন কারণ বা প্রয়োজন নেই, তাই অনন্ত; সুতরাং অনুভূতি যখন নিজেই নিজের চরম প্রমাণ, তখন অনুভূতিও অনন্তস্বরূপ; অনুভূতি সর্বদাই স্বসংবেদ্য। অনুভূতি নিজেই নিজের জ্ঞাতাস্বরূপ; এটা মনের ধর্ম নয়, কিন্তু তা থেকেই মন হয়েছে;

অনুভূতি নিরপেক্ষ, পূর্ণ—একমাত্র জ্ঞাতা, সুতরাং প্রকৃতপক্ষে অনুভূতিই আত্মা। অনুভূতি স্বয়ং অনুভব করে, কিন্তু আত্মাকে 'জ্ঞাতা' বলা যেতে পারে না; কারণ 'জ্ঞাতা' বললে জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার কর্তাকে বুঝায়। কিন্তু শঙ্কর বলেন, আত্মা 'অহং' নন, কারণ তাঁতে 'আমি আছি' এই ভাবটি নেই। আমরা (অহং ভাব) সেই আত্মার প্রতিবিম্বমাত্র, আত্মা ও ব্রহ্ম এক।

যখনই তুমি সেই পূর্ণব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছু বলো বা ভাবো, তখনই আপেক্ষিক-ভাবে ঐ কাজগুলি করতে হয়, সুতরাং সেখানে এই-সকল যুক্তিবিচার খাটে। কিন্তু যোগাবস্থায় অনুভব ও অপরোক্ষানুভূতি এক হয়ে যায়। রামানুজ-ব্যাখ্যাত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ আংশিকভাবে একত্বদর্শন, এবং অদ্বৈতাবস্থার অভিমুখে একটি সোপানস্বরূপ। 'বিশিষ্ট' মানেই ভেদ বা পৃথক্‌করণ। 'প্রকৃতি' মানে জগৎ, আর তার সদা পরিণাম বা পরিবর্তন হচ্ছে। পরিবর্তন-শীল চিন্তারাশি পরিবর্তনশীল শব্দরাশি দ্বারা অভিব্যক্ত হয়ে কখনও সেই পূর্ণস্বরূপকে প্রমাণ করতে পারে না। ঐরূপ ক'রে আমরা শুধু এমন একটা বস্তুতে উপনীত হই, যা থেকে কতকগুলি গুণ বাদ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু যা স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ নয়। আমরা কেবল শব্দগত একত্বে পৌছই, তার চেয়ে আর চরম ঐক্য বার করা যায় না, কিন্তু তাতে আপেক্ষিক জগতের বিলোপসাধন হয় না।

বৃহস্পতিবার, ১৮ই জুলাই

(অদ্যকার আলোচ্য বিষয়: প্রধানতঃ সাংখ্যদর্শনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে শঙ্করাচার্যের যুক্তি।)

সাংখ্যেরা বলেন, জ্ঞান একটি মিশ্র বা যৌগিক পদার্থ, আর তারও পারে বিশ্লেষণ করতে করতে শেষে আমরা সাক্ষিস্বরূপ পুরুষের অস্তিত্ব অবগত হই। এই পুরুষ সংখ্যায় বহু; আমরা প্রত্যেকেই এক-একটি পুরুষ। অদ্বৈত-বেদান্ত কিন্তু এর বিরুদ্ধে বলেন, পুরুষ কেবল একটিই হ'তে পারেন, সেই পুরুষ চেতন; তিনি অচেতন বা কোন গুণ-সম্পন্ন হ'তে পারেন না, কারণ গুণ থাকলেই সেগুলি তাঁর বন্ধনের কারণ হবে, পরিণামে সেগুলির লোপও হবে। অতএব সেই এক বস্তু অবশ্যই সর্বপ্রকারগুণরহিত, এমন কি—জ্ঞান পর্যন্ত তাতে থাকতে পারে না, এবং সেই পুরুষ জগৎ বা আর কিছুর কারণ

হ'তে পারে না। বেদ বলেন, 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্'—হে সৌম্য, প্রথমে সেই এক অদ্বিতীয় সৎই ছিলেন।

*　　　*　　　*

যেখানে সত্ত্বগুণ, সেইখানেই জ্ঞান দেখা যায় ব'লে প্রমাণিত হয় না যে, সত্ত্বই জ্ঞানের কারণ; বরং মানুষের ভিতর জ্ঞান পূর্ব হতেই রয়েছে, সত্ত্বের সান্নিধ্যে সেই জ্ঞান উদ্‌বুদ্ধ হয় মাত্র। যেমন আগুনের কাছে একটা লৌহ-গোলক রাখলে ঐ আগুন লৌহগোলকটার ভিতর পূর্ব হতেই যে তেজ অব্যক্তভাবে ছিল, তাকেই ব্যক্ত ক'রে গোলকটাকে উত্তপ্ত করে—তার ভিতরে প্রবেশ করে না, সেই রকম।

শঙ্কর বলেন, জ্ঞান একটা বন্ধন নয়, কারণ জ্ঞান সেই পুরুষ বা ব্রহ্মের স্বরূপ। জগৎ ব্যক্ত বা অব্যক্তরূপে সর্বদাই রয়েছে, সুতরাং চিরন্তন জ্ঞেয় বস্তু একটি আছেই।

জ্ঞান-বল-ক্রিয়াই ঈশ্বর। জ্ঞানলাভের জন্য তাঁর দেহেন্দ্রিয়াদি কোন আকারেরই প্রয়োজন নেই—যে সসীম, তার পক্ষে সেই অনন্ত জ্ঞানকে ধরে রাখবার জন্য একটা প্রতিবন্ধকের (অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদির) প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু ঈশ্বরের ঐরূপ সহায়তার আদৌ কোন আবশ্যকতা নেই। বাস্তবিক এক আত্মাই আছেন, বিভিন্ন-লোকগামী 'সংসারী' জীবাত্মা ব'লে স্বতন্ত্র আত্মা কিছু নেই। পঞ্চ প্রাণ যাঁতে একীভূত হয়েছে, এই দেহের সেই চেতন নিয়ন্তাকেই 'জীবাত্মা' বলে, কিন্তু সেই জীবাত্মাই পরমাত্মা, যেহেতু আত্মাই সব। তুমি তাকে যে অন্যরূপ বোধ ক'রছ, সে ভ্রান্তি তোমারই, জীবে সে ভ্রান্তি নেই। তুমিই ব্রহ্ম, আর তুমি নিজেকে আর যা কিছু ব'লে ভাবছ, তা ভুল। কৃষ্ণকে কৃষ্ণ ব'লে পূজা ক'রো না, কৃষ্ণের মধ্যে যে আত্মা রয়েছেন, তাঁরই উপাসনা কর। শুধু আত্মার উপাসনাতেই মুক্তিলাভ হবে। এমন কি, সগুণ ঈশ্বর পর্যন্ত সেই আত্মার বহিঃপ্রকাশমাত্র। শঙ্কর বলেছেন, 'স্বস্বরূপানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে।'—নিজস্বরূপের আন্তরিক অনুসন্ধানকেই ভক্তি বলে।

আমরা ঈশ্বরলাভের জন্য যত বিভিন্ন উপায় অবলম্বন ক'রে থাকি, সে সব সত্য। যেমন ধ্রুবতারাকে দেখাতে হ'লে তার আশপাশের নক্ষত্রগুলির সাহায্য নিতে হয়, এও তেমনি।

* * * ভগবদ্গীতা বেদান্তসম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ।

শুক্রবার, ১৯শে জুলাই

যতদিন আমার 'আমি, তুমি' এইরূপ ভেদজ্ঞান রয়েছে, ততদিন একজন ভগবান্ আমাদের রক্ষা করছেন, এ-কথা বলবার অধিকারও আমার আছে। যতদিন আমার এইরূপ ভেদবোধ রয়েছে, ততদিন এই ভেদবোধ থেকে যে-সকল অনিবার্য সিদ্ধান্ত আসে, সেগুলিও নিতে হবে, 'আমি, তুমি' স্বীকার করলেই আমাদের আদর্শস্থানীয় আর একটি তৃতীয় বস্তু স্বীকার করতে হবে, যা আমি-তুমির মাঝখানে আছে; সেইটিই—ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দুস্বরূপ। যেমন বাষ্প তুষার হয়, তুষার থেকে জল হয়, সেই জল আবার গঙ্গাদি নানা নামে প্রসিদ্ধ হয়; কিন্তু যখন বাষ্পাবস্থা, তখন আর গঙ্গা নেই; আবার যখন জল, তখন তার মধ্যে বাষ্প চিন্তা করি না।

সৃষ্টি বা পরিণামের ধারণার সঙ্গে ইচ্ছাশক্তির ধারণা অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। যতদিন পর্যন্ত আমরা জগৎকে গতিশীল দেখছি, ততদিন তার পশ্চাতে ইচ্ছাশক্তির অস্তিত্ব আমাদের স্বীকার করতে হয়। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান যে সম্পূর্ণ ভ্রম, পদার্থবিজ্ঞান তা প্রমাণ ক'রে দেয়; আমরা কোন জিনিসকে যেমন দেখি, শুনি, স্পর্শ ঘ্রাণ বা আস্বাদ করি, স্বরূপতঃ জিনিসটা বাস্তবিক তা নয়। বিশেষ বিশেষ প্রকারের স্পন্দন বিশেষ বিশেষ ফল উৎপন্ন করছে, আর সেইগুলি আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপর ক্রিয়া করছে; আমরা কেবল আপেক্ষিক সত্যই জানতে পারি।

'সত্য' শব্দ 'সৎ' থেকে এসেছে। যা 'সৎ' অর্থাৎ 'আছে,' যেটি 'অস্তিস্বরূপ' সেটিই সত্য। আমাদের বর্তমান দৃষ্টি থেকে এই জগৎপ্রপঞ্চ ইচ্ছা ও জ্ঞান-শক্তির প্রকাশ ব'লে বোধ হচ্ছে। আমাদের কাছে আমাদের অস্তিত্ব যতটুকু সত্য, তাঁর নিজের কাছে সগুণ ঈশ্বরের অস্তিত্বও ততটুকু সত্য, তদপেক্ষা অধিক সত্য নয়। আমাদের রূপ যেমন দেখা যায়, ঈশ্বরকেও তেমনি সাকারভাবে দেখা যেতে পারে। মানুষ-হিসাবে আমাদের একটি ঈশ্বরের প্রয়োজন; আত্মস্বরূপে আমাদের ঈশ্বরের প্রয়োজন থাকে না। সেজন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ সেই জগজ্জননীকে সদাসর্বদা তাঁর কাছে বর্তমান দেখতেন—তাঁর চারপাশের অন্যান্য সকল বস্তু অপেক্ষা তাঁকেই বেশী বাস্তব ব'লে দেখতেন; কিন্তু সমাধি-অবস্থায় তাঁর আত্মা ব্যতীত আর কিছুর অনুভব থাকত না। সেই

সগুণ ঈশ্বর ক্রমশঃ আমাদের কাছে এগিয়ে আসতে থাকেন, শেষে তিনি যেন গলে যান, তখন 'ঈশ্বর'ও থাকেন না, 'আমি'ও থাকে না—সব সেই আত্মায় লীন হয়ে যায়।

চেতনার জ্ঞান একটা বন্ধন। 'সৃষ্টি দেখে স্রষ্টার কল্পনা'-রূপ এক মত আছে, তাতে রূপাদি-সৃষ্টির পূর্বে বুদ্ধির অস্তিত্ব স্বীকার ক'রে নেওয়া হয়। কিন্তু বুদ্ধি যদি কিছুর কারণ হয়, তবে তা আবার অপর কিছুর কার্যস্বরূপ। একেই বলে 'মায়া'। ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেন, আবার আমরা ঈশ্বরকে সৃষ্টি করি—এই হ'ল মায়া। সর্বত্র এইরূপ চক্রগতি দেখা যায়ঃ মন দেহ সৃষ্টি করছে, আবার দেহ মন সৃষ্টি করছে; ডিম থেকে পাখি, আবার পাখি থেকে ডিম; গাছ থেকে বীজ, আবার বীজ থেকে গাছ। এই জগৎপ্রপঞ্চ একেবারে বৈষম্যে পূর্ণ নয়, আবার পুরোপুরি সমভাবাপন্নও নয়। মানুষ স্বাধীন—তাকে এই দুই-ভাবের উপরে উঠতে হবে। এ দুটোই নিজ নিজ প্রকাশভূমিতে সত্য বটে, কিন্তু সেই যথার্থ সত্য, সেই অস্তি-স্বরূপকে লাভ করতে গেলে আমরা এখন যা কিছু অস্তিত্ব, ইচ্ছা, চেতনা, করা, যাওয়া, জানা ব'লে জানি, সে-সব অতিক্রম করতে হবে। (পৃথক্ বা স্বতন্ত্র) জীবাত্মার প্রকৃত ব্যক্তিত্ব নেই—ওটা মিশ্র বস্তু হ'লে তো কালে খণ্ড খণ্ড হয়ে নষ্ট হয়ে যাবে। যাকে আর কোনরূপে বিশ্লেষণ করা যায় না, কেবল সেই বস্তুই অমিশ্র এবং কেবল সেইটিই সত্যস্বরূপ, মুক্তস্বভাব, অমৃত ও আনন্দস্বরূপ। এই ভ্রমাত্মক স্বাতন্ত্র্যকে রক্ষা করবার জন্য যত চেষ্টা, সবই বাস্তবিক পাপ, আর ঐ স্বাতন্ত্র্যকে নাশ করবার সমুদয় চেষ্টাই ধর্ম বা পুণ্য। এই জগতে সব কিছুই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এই স্বাতন্ত্র্যকে ভাঙবার চেষ্টা করছে। চারিত্র্যনীতির (morality) ভিত্তি হচ্ছে এই পার্থক্যজ্ঞান বা ভ্রমাত্মক স্বাতন্ত্র্যকে ভাঙবার চেষ্টা, কারণ এইটিই সকল প্রকার পাপের মূল; চারিত্র্যনীতি আগে থেকেই রয়েছে, ধর্মশাস্ত্র ঐ নীতি পরবর্তী কালে বিধিবদ্ধ করেছে মাত্র। প্রথমে সমাজে নানাবিধ প্রথা স্বভাবতই উৎপন্ন হয়ে থাকে, সেগুলি ব্যাখ্যা করার জন্য পরে পুরাণের উৎপত্তি। যখন ঘটনাসমূহ ঘটে যায়, তখন সেগুলি যুক্তি-বিচারের চেয়ে উচ্চতর কোন নিয়মেই ঘটে থাকে, যুক্তিবিচারের আবির্ভাব হয় পরে—ঐগুলি বোঝবার চেষ্টায়। যুক্তিবিচারের কোন কিছু ঘটাবার শক্তি নেই, এ যেন ঘটনাগুলি ঘটে যাবার পরে

সেগুলির জাবরকাটা। যুক্তিতর্ক যেন মানুষের কার্যকলাপের ঐতিহাসিক (historian)।

* * *

বুদ্ধ একজন মহা বৈদান্তিক ছিলেন (কারণ বৌদ্ধধর্ম প্রকৃতপক্ষে বেদান্তের একটি শাখা মাত্র), আর শঙ্করকেও কখন কখন 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' বলা হয়। বুদ্ধ বিশ্লেষণ করেছিলেন, শঙ্কর সেইগুলি সংশ্লেষণ বা সমন্বয় করলেন। বুদ্ধ কখনও কারও কাছে মাথা নোয়াননি—বেদ, জাতিভেদ, পুরোহিত বা সামাজিক প্রথা—কারও কাছে নয়। যতদূর পর্যন্ত যুক্তিবিচার চলতে পারে, ততদূর নির্ভীকভাবে তিনি যুক্তিবিচার ক'রে গেছেন। এরূপ নির্ভীক সত্যানুসন্ধান, আবার সকল প্রাণীর প্রতি এমন ভালবাসা জগতে কেউ কখনও দেখেনি। বুদ্ধ যেন ধর্মজগতের ওয়াশিংটন ছিলেন, তিনি সিংহাসন জয় করেছিলেন শুধু জগৎকে দেবার জন্য, যেমন ওয়াশিংটন মার্কিনজাতির জন্য করেছিলেন। তিনি নিজের জন্য কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করতেন না।

শনিবার, ২০শে জুলাই

(প্রত্যক্ষানুভূতিই যথার্থ জ্ঞান বা যথার্থ ধর্ম। অনন্ত যুগ ধ'রে আমরা ধর্ম সম্বন্ধে যদি কেবল কথা ব'লে যাই, তাতে কখনই আমাদের আত্মজ্ঞান হ'তে পারে না। কেবল মতবাদে বিশ্বাসী হওয়া ও নাস্তিকতায় কিছু তফাত নেই। মানুষ-হিসাবে এ দুয়ের মধ্যে নাস্তিকই বেশী খাঁটি। সেই প্রত্যক্ষানুভূতির আলোকে আমি যে কয় পা অগ্রসর হবো, তা থেকে কোন কিছুই আমাকে কখনও হটাতে পারবে না। কোন দেশ যখন তুমি স্বয়ং গিয়ে দেখলে, তখনই তোমার তার সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান হ'ল। আমাদের প্রত্যেককে নিজে নিজে দেখতে হবে। গুরু কেবল আমাদের কাছে 'আধ্যাত্মিক খাবার' এনে দিতে পারেন—ঐ খাদ্য থেকে পুষ্টিলাভ করতে গেলে আমাদের তা খেতে হবে। তর্কযুক্তি কখনও ঈশ্বরকে প্রমাণ করতে পারে না, কেবল যুক্তিসঙ্গত একটা সিদ্ধান্তরূপে তাঁকে উপস্থাপিত করে।)

ভগবান্‌কে আমাদের বাইরে পাওয়া অসম্ভব। বাইরে যা ঈশ্বরতত্ত্বের উপলব্ধি হয়, তা আমাদের আত্মারই প্রকাশমাত্র। আমরাই হচ্ছি ভগবানের

সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির। বাইরে যা দেখা যায়, তা আমাদের ভিতরের জিনিসেরই অতি অস্পষ্ট অনুকরণ-মাত্র।

আমাদের মনের শক্তিগুলির একাগ্রতাই আমাদের ঈশ্বরদর্শনে সহায়তা করবার একমাত্র যন্ত্র। যদি তুমি একটি আত্মাকে (নিজ আত্মাকে) জানতে পারো, তা হ'লে তুমি ভূত, ভবিষ্যৎ, ও বর্তমানে সকল আত্মাকেই জানতে পারবে। ইচ্ছাশক্তি দ্বারাই মনের একাগ্রতাসাধন হয়—যুক্তি, বিচার, ভক্তি, ভালবাসা, প্রাণায়াম ইত্যাদি বিভিন্ন উপায়ের দ্বারা এই ইচ্ছাশক্তি উদ্বুদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত হ'তে পারে। একাগ্র মন যেন একটি প্রদীপ—এর দ্বারা আত্মার স্বরূপ তন্ন তন্ন ক'রে দেখা যায়।

একপ্রকার সাধনপ্রণালী সকলের উপযোগী হ'তে পারে না। কিন্তু এই-সকল বিভিন্ন সাধনপ্রণালী যে সোপানের মতো একটার পর একটা অবলম্বন করতে হবে, তা নয়। ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠানাদি সর্বনিম্ন সাধন, তারপর ঈশ্বরকে আমাদের বাইরে দেখা, তারপর অন্তর্যামিরূপে দেখা। স্থলবিশেষে, একটার পর আর একটা—এইরূপ ক্রম আবশ্যক হ'তে পারে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে কেবল একটা পথই প্রয়োজন। 'জ্ঞানলাভ করতে হ'লে তোমাকে কর্ম ও ভক্তির পথ দিয়ে প্রথমে যেতেই হবে'—সকলকেই এ-কথা বলা চরম মূর্খতা।

যতদিন না যুক্তিবিচারের অতীত কোন তত্ত্বলাভ ক'রছ, ততদিন তুমি তোমার যুক্তিবিচার ধ'রে থাকো, আর ঐ অবস্থায় পৌছলে তুমি বুঝবে যে, সেটা যুক্তিবিচারের চেয়ে শ্রেষ্ঠ জিনিস, কারণ ঐ অবস্থা তোমার যুক্তির বিরোধী হবে না। যুক্তিবিচার বা জ্ঞানের অতীত এই ভূমি হচ্ছে সমাধি, কিন্তু স্নায়বীয় রোগের তাড়নায় মূর্ছাবিশেষকে সমাধি ব'লে ভুল ক'রো না। অনেকে মিছামিছি সমাধি হয়েছে ব'লে দাবি ক'রে থাকে, স্বাভাবিক বা সহজ জ্ঞানকে সমাধি-অবস্থা ব'লে ভ্রম ক'রে থাকে—এ বড় ভয়ানক কথা। বাইরের কোন লক্ষণ দেখে নির্ণয় করবার উপায় নেই—যথার্থ সমাধি হয়েছে কি না, নিজে নিজেই তা টের পাওয়া যায়। তবে যুক্তিবিচারের সাহায্য নিলে ভুলভ্রান্তি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, সুতরাং একে ব্যতিরেকী পরীক্ষা বলা যেতে পারে; ধর্মলাভ মানে হচ্ছে যুক্তিতর্কের বাইরে যাওয়া, কিন্তু ঐ ধর্মলাভ করবার পথ একমাত্র যুক্তিবিচারেরই ভিতর দিয়ে। সহজাত জ্ঞান

যেন বরফ, যুক্তিবিচার যেন জল, আর অলৌকিক জ্ঞান বা সমাধি যেন বাষ্প—সব চেয়ে সূক্ষ্ম অবস্থা। একটার পর আর একটা আসে। সব জায়গাতেই এই নিত্য পৌর্বাপর্য বা ক্রম রয়েছে, যেমন অজ্ঞান, সংজ্ঞা বা আপেক্ষিক জ্ঞান ও বোধি; জড় পদার্থ, দেহ, মন। আর আমরা এই শৃঙ্খলের যে পাবটা (link) প্রথম ধরি, সেইটা থেকেই শিকলটা আরম্ভ হয়েছে, আমাদের কাছে এই রকম বোধ হয়। অর্থাৎ কেউ বলে—দেহ থেকে মনের উৎপত্তি, কেউ বা ব'লে থাকে—মন থেকে দেহ হয়েছে। উভয় পক্ষেই যুক্তির সমান মূল্য, আর উভয় মতই সত্য। আমাদের ঐ দুটোরই পারে যেতে হবে—এমন জায়গায় যেতে হবে, যেখানে দেহ বা মন কোনটি-ই নেই। এই যে ক্রম—এও মায়া।

ধর্ম যুক্তিবিচারের পারে, ধর্ম অতিপ্রাকৃতিক। বিশ্বাস-অর্থে কিছু মেনে নেওয়া নয়—বিশ্বাসের অর্থ সেই চরম পদার্থকে ধারণা করা—এতে হৃদয়-কন্দরকে উদ্ভাসিত ক'রে দেয়। প্রথমে সেই আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে শোন, তারপর বিচার কর—বিচার দ্বারা উক্ত আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কতদূর জানতে পারা যায় তা দেখ; এর উপর দিয়ে বিচারের বন্যা বয়ে যাক—তারপর বাকী যা থাকে, সেইটুকু গ্রহণ কর। যদি কিছু বাকী না থাকে, তবে ভগবানকে ধন্যবাদ দাও যে, তুমি একটা কুসংস্কারের হাত থেকে বেঁচেছ। আর যখন তুমি স্থির সিদ্ধান্ত করবে যে, কিছুই আত্মাকে উড়িয়ে দিতে পারে না, যখন আত্মা সর্বপ্রকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে, তখন তাকে দৃঢ়ভাবে ধ'রে থাকো এবং সকলকে ঐ আত্মতত্ত্ব শিক্ষা দাও; সত্য কখন পক্ষপাতী হ'তে পারে না, এতে সকলেরই কল্যাণ হবে। সবশেষে স্থিরভাবে ও শান্তচিত্তে তাঁর উপর নিদিধ্যাসন কর বা তাঁর ধ্যান কর, তোমার মনকে তাঁর উপর একাগ্র কর, ঐ আত্মার সহিত নিজেকে একভাবাপন্ন ক'রে ফেলো। তখন আর বাক্যের কোন প্রয়োজন থাকবে না, তোমার ঐ মৌনভাবই অপরের ভিতর সত্য তত্ত্ব সঞ্চার করবে। বৃথা কথা ব'লে শক্তিক্ষয় ক'রো না, চুপচাপ ধ্যান কর। আর বহির্জগতের গণ্ডগোল যেন তোমাকে বিক্ষুব্ধ না করে। যখন তোমার মন সর্বোচ্চ অবস্থায় উপনীত হয়, তখন তুমি তা জানতে পার না। চুপচাপ থেকে শক্তিসঞ্চয় কর, আর আধ্যাত্মিকতার বিদ্যুদাধার (dynamo) হয়ে যাও। ভিখারী আবার কি দিতে পারে? রাজাই

কেবল দিতে পারে—সেও আবার শুধু তখনই দিতে পারে, যখন সে নিজে কিছু চায় না।)

*　　　*　　　*

(তোমার যা টাকাকড়ি, তা তোমার নিজের মনে ক'রো না, নিজেকে ভগবানের ভাণ্ডারী ব'লে মনে কর। ধনের প্রতি আসক্ত হ'য়ো না। নামযশ টাকাকড়ি সব যাক্, এগুলি সব ভয়ানক বন্ধন। মুক্তির অপূর্ব পরিবেশ অনুভব কর। তুমি তো মুক্ত, মুক্ত, মুক্ত ; অবিরত বলো, আমি ধন্য, আমি আনন্দময়, আমি মুক্তস্বরূপ, আমি অনন্তস্বরূপ, আমার আত্মাতে আদি নেই, অন্ত নেই ; সবই আমার আত্মস্বরূপ)।

রবিবার, ২১শে জুলাই

(পাতঞ্জল যোগসূত্র)

(চিত্ত বা মন যাতে বৃত্তিরূপে বিভক্ত না হয়ে পড়ে, যোগশাস্ত্র তাই শিক্ষা দিয়ে থাকে—'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।' মনটা বিষয়-সমূহের ছাপ ও অনুভূতির, অর্থাৎ ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার মিশ্রণস্বরূপ, সুতরাং তা নিত্য হ'তে পারে না। মনের একটা সূক্ষ্ম শরীর আছে, সেই শরীর দ্বারা মন স্থূল দেহের উপর কার্য ক'রে থাকে। বেদান্ত বলেন, মনের পশ্চাতে যথার্থ আত্মা আছেন। বেদান্ত অপর দুটিকে—অর্থাৎ দেহ ও মনকে স্বীকার ক'রে থাকেন ; আর একটি তৃতীয় পদার্থ স্বীকার করেন—যা অনন্ত, চরমতত্ত্বস্বরূপ, বিশ্লেষণের শেষ ফলস্বরূপ, এক অখণ্ড বস্তু—যাকে আর ভাগ করা যেতে পারে না। জন্ম হচ্ছে পুনর্যোজন, মৃত্যু হচ্ছে বিয়োজন, সব কিছু বিশ্লেষণ করতে করতে শেষে আত্মাকে পাওয়া যায়। আত্মাকে আর ভাগ করতে পারা যায় না, সুতরাং আত্মাতে পৌঁছলে নিত্য সনাতন তত্ত্বে পৌঁছানো গেল।)

প্রত্যেক তরঙ্গের পশ্চাতে সমগ্র সমুদ্রটা রয়েছে—যত কিছু অভিব্যক্তি, সবই তরঙ্গ, তবে কতকগুলি খুব বড় আর কতকগুলি ছোট, এইমাত্র। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐসব তরঙ্গ স্বরূপতঃ সমুদ্র—সমগ্র সমুদ্র ; কিন্তু তরঙ্গ-হিসাবে প্রত্যেকটি অংশ মাত্র। তরঙ্গসমূহ যখন শান্ত হয়ে যায়, তখন সব এক। পতঞ্জলি বলেন—'দৃশ্যবিহীন দ্রষ্টা'। যখন মন ক্রিয়াশীল থাকে, তখন আত্মা

তার সঙ্গে মিশিয়ে থাকেন। অনুভূত পুরাতন বিষয়গুলির দ্রুত পুনরাবৃত্তিকে 'স্মৃতি' বলে।

(অনাসক্ত হও। জ্ঞানই শক্তি আর জ্ঞানলাভ করলেই তোমার শক্তিও আসবে। জ্ঞানের দ্বারা এমন কি এই জড় জগৎটাও তুমি উড়িয়ে দিতে পারো। যখন তুমি মনে মনে কোন বস্তু থেকে এক একটা ক'রে গুণ বাদ দিতে দিতে ক্রমে সব গুণই বাদ দিতে পারবে, তখন তুমি ইচ্ছা করলেই সমগ্র জিনিসটাকে তোমার জ্ঞান থেকে দূর ক'রে দিতে পারবে।)

যারা উত্তম অধিকারী, তারা যোগে খুব শীঘ্র শীঘ্র উন্নতি করতে পারে—ছ-মাসে তারা যোগী হ'তে পারে। যারা তদপেক্ষা নিম্নাধিকারী, তাদের যোগে সিদ্ধিলাভ করতে কয়েক বৎসর লাগতে পারে, আর যে-কোন ব্যক্তি নিষ্ঠার সঙ্গে সাধন করলে, অন্য সব কাজ ছেড়ে দিয়ে কেবল সদাসর্বদা সাধনে রত থাকলে দ্বাদশ বর্ষে সিদ্ধিলাভ করতে পারে। এই-সব মানসিক ব্যায়াম না ক'রে কেবল ভক্তি দ্বারাও ঐ অবস্থায় যেতে পারা যায়, কিন্তু তাতে কিছু বিলম্ব হয়।

(মনের দ্বারা সেই আত্মাকে যেভাবে দেখা বা ধরা যেতে পারে, তাকেই 'ঈশ্বর' বলে। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ নাম 'ওঁ', সুতরাং ঐ ওঙ্কার জপ কর, তার ধ্যান কর, তার ভিতর যে অপূর্ব অর্থসমূহ নিহিত রয়েছে, তা ভাবনা কর। সর্বদা ওঙ্কার-জপই যথার্থ উপাসনা। ওঙ্কার সাধারণ শব্দমাত্র নয়, স্বয়ং ঈশ্বরস্বরূপ।)

(ধর্ম তোমায় নূতন কিছুই দেয় না, কেবল প্রতিবন্ধগুলি সরিয়ে দিয়ে তোমার নিজের স্বরূপ দেখতে দেয়। ব্যাধিই প্রথম মস্ত বিঘ্ন—সুস্থ শরীরই সেই যোগাবস্থা লাভ করবার সর্বোৎকৃষ্ট যন্ত্রস্বরূপ। দৌর্মনস্য বা মন খারাপ হওয়া-রূপ বিঘ্নটিকে দূর করা একরকম অসম্ভব বললেই হয়। তবে একবার যদি তুমি ব্রহ্মকে জানতে পারো, পরে আর তোমার মন খারাপ হবার সম্ভাবনা থাকবে না। সংশয়, অধ্যবসায়ের অভাব, ভ্রান্ত ধারণা—এগুলিও অন্যান্য বিঘ্ন।)

* * *

প্রাণ হচ্ছে দেহস্থ অতি সূক্ষ্ম শক্তি—দেহের সর্বপ্রকার গতির উৎস। প্রাণ সর্বসুদ্ধ দশটি—তন্মধ্যে পাঁচটি অন্তর্মুখ আর পাঁচটি বহির্মুখ। একটি প্রধান প্রাণপ্রবাহ উপরের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে, অপরগুলি নীচের দিকে। প্রাণায়ামের অর্থ শ্বাসপ্রশ্বাসের নিয়মনের দ্বারা প্রাণসমূহকে নিয়মিত করা।

শ্বাস যেন ইন্ধন, প্রাণ বাষ্প এবং শরীরটা যেন ইঞ্জিন। প্রাণায়ামে তিনটি ক্রিয়া আছেঃ পূরক—শ্বাসকে ভিতরে টানা, কুম্ভক—শ্বাসকে ভিতরে ধারণ করে রাখা, আর রেচক—বাইরে শ্বাসনিক্ষেপ করা।

গুরু হচ্ছেন সেই আধার, যাঁর মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক শক্তি তোমার কাছে পৌঁছয়। যে-কেউ শিক্ষা দিতে পারে বটে, কিন্তু গুরুই শিষ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চার ক'রে থাকেন, তাতেই আধ্যাত্মিক উন্নতিরূপ ফল হয়ে থাকে। শিষ্যদের মধ্যে পরস্পর ভাই-ভাই-সম্বন্ধ, আর ভারতের আইন এই সম্বন্ধ স্বীকার ক'রে থাকে। গুরু তাঁর পূর্ব পূর্ব আচার্যদের কাছ থেকে যে মন্ত্র বা ভাবশক্তিময় শব্দ পেয়েছেন, তাই শিষ্যে সংক্রামিত করেন—গুরু ব্যতীত সাধনভজন কিছু হ'তে পারে না; বরং বিপদের আশঙ্কা যথেষ্ট আছে। সাধারণতঃ গুরুর সাহায্য না নিয়ে এই-সকল যোগ অভ্যাস করতে গেলে কামের প্রাবল্য হয়ে থাকে, কিন্তু গুরুর সাহায্য থাকলে প্রায়ই এটা ঘটে না। প্রত্যেক ইষ্টদেবতার এক-একটি মন্ত্র আছে। ইষ্ট-অর্থে বিশেষ উপাসকের বিশেষ আদর্শ বুঝিয়ে থাকে। মন্ত্র হচ্ছে ঐ ভাব-বিশেষব্যঞ্জক শব্দ। ঐ শব্দের ক্রমাগত জপের দ্বারা আদর্শটিকে মনে দৃঢ়ভাবে রাখবার সহায়তা হয়ে থাকে। এইরূপ উপাসনাপ্রণালী ভারতের সকল সাধকের মধ্যে প্রচলিত।

মঙ্গলবার, ২৩শে জুলাই

(ভগবদ্গীতা—কর্মযোগ)

কর্মের দ্বারা মুক্তিলাভ করতে হ'লে নিজেকে কর্মে নিযুক্ত কর, কিন্তু কোন কামনা ক'রো না—ফলাকাঙ্ক্ষা যেন তোমার না থাকে। এইরূপ কর্মের দ্বারা জ্ঞানলাভ হয়ে থাকে—ঐ জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি হয়। জ্ঞানলাভ করবার পূর্বে কর্মত্যাগ করলে তাতে দুঃখই এসে থাকে। 'আত্মা'র জন্য কর্ম করলে তা থেকে কোন বন্ধন আসে না। কর্ম থেকে সুখের আকাঙ্ক্ষাও ক'রো না; আবার কর্ম করলে কষ্ট হবে—এ ভয়ও ক'রো না। দেহ-মনই কাজ ক'রে থাকে, আমি করি না। সদাসর্বদা নিজেকে এই কথা বলো এবং এটি প্রত্যক্ষ করতে চেষ্টা কর। চেষ্টা কর—যাতে তোমার বোধই হবে না যে, তুমি কিছু ক'রছ।

সমুদয় কর্ম ভগবানে অর্পণ কর। সংসারে থাকো, কিন্তু সংসারের হয়ে যেও না—পদ্মপত্রের মূল যেমন পাঁকের মধ্যে থাকে, কিন্তু তা যেমন সদাই শুদ্ধ থাকে, সেইরূপ লোকে তোমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করুক না, তোমার ভালবাসা যেন কারও প্রতি কম না হয়। যে অন্ধ, তার রঙের জ্ঞান নেই, সুতরাং আমার নিজের ভিতর দোষ না থাকলে অপরের ভিতর দোষ দেখব কি ক'রে? আমরা আমাদের নিজেদের ভিতর যা রয়েছে, তার সঙ্গে বাইরে যা দেখতে পাই, তার তুলনা করি এবং তদনুসারেই কোন বিষয়ে আমাদের মতামত দিয়ে থাকি। যদি আমরা নিজেরা পবিত্র হই, তবে বাইরে অপবিত্রতা দেখতে পাবো না। বাইরে অপবিত্রতা থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের পক্ষে তার অস্তিত্ব থাকবে না। (প্রত্যেক নরনারী, বালকবালিকার ভিতর ব্রহ্মকে দর্শন কর, 'অন্তর্জ্যোতিঃ' দ্বারা তাঁকে দেখ; যদি সর্বত্র সেই ব্রহ্মদর্শন হয়, তবে আমরা আর অন্য কিছু দেখতে পাবো না। এই সংসারটাকে চেও না, কারণ যে যা চায়, সে তাই পায়। ভগবান্‌কে—কেবল ভগবান্‌কেই অন্বেষণ কর। যত অধিক শক্তিলাভ হবে, ততই বন্ধন আসবে, ততই ভয় আসবে। একটা সামান্য পিঁপড়ের চেয়ে আমরা কত অধিক ভীত ও দুঃখী। এই সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চের বাইরে ভগবানের কাছে যাও। স্রষ্টার তত্ত্ব জানবার চেষ্টা কর, সৃষ্টের তত্ত্ব জানবার চেষ্টা ক'রো না।

'আমিই কর্তা ও আমিই কার্য।' 'যিনি কামক্রোধের বেগধারণ করতে পারেন, তিনি মহাযোগী পুরুষ।'[১]

'অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারাই কেবল মনকে নিরোধ করা যেতে পারে।')[২]

* * *

আমাদের পূর্বপুরুষেরা ধীর স্থির হ'য়ে বসে ধর্ম ও ঈশ্বর সম্বন্ধে চিন্তা ক'রে গেছেন, ফলে আমাদেরও ঐ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবার জন্য মস্তিষ্কটুকু রয়েছে। কিন্তু এখন আমরা লাভের আশায় যে রকম ছুটোছুটি আরম্ভ করেছি, তাতে সেটি নষ্ট হবার জোগাড় হচ্ছে।

* * *

১ গীতা, ৫।২৩

২ ঐ, ৬।৩৫

শরীরের নিজেরই নিজেকে আরোগ্য করবার একটা শক্তি আছে—আর মানসিক অবস্থা, ঔষধ, ব্যায়াম প্রভৃতি নানা বিষয় এই আরোগ্য-শক্তিকে জাগিয়ে দিতে পারে। যতদিন আমরা প্রাকৃতিক অবস্থাচক্রের দ্বারা বিচলিত হই, ততদিন আমাদের জড়ের সহায়তা প্রয়োজন। আমরা যতদিন না স্নায়ু-সমূহের দাসত্ব কাটাতে পারছি, ততদিন জড়ের সাহায্য আমরা উপেক্ষা করতে পারি না।

আমাদের সাধারণ জ্ঞানভূমির নীচে মনের আর এক ভূমি আছে—তাকে 'অজ্ঞানভূমি' বা 'অবচেতন মন' বলা যেতে পারে; আমরা যাকে সমগ্র মানুষ বলি, জ্ঞান তার একটা অংশমাত্র। দর্শনশাস্ত্র মন সম্বন্ধে কতকগুলি আন্দাজ-মাত্র। ধর্ম কিন্তু প্রত্যক্ষানুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত—প্রত্যক্ষদর্শন, যা জ্ঞানের একমাত্র ভিত্তি—তারই উপর প্রতিষ্ঠিত। মন যখন জ্ঞানেরও অতীত ভূমিতে চলে যায়, তখন সে যথার্থ বস্তু—যথার্থ বিষয়কেই উপলব্ধি করে। 'আপ্ত' তাঁদের বলে, যাঁরা ধর্মকে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁরা যে উপলব্ধি করেছেন, তার প্রমাণ এই যে, তুমিও যদি তাঁদের প্রণালী অনুসরণ কর, তুমিও প্রত্যক্ষ করবে। প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই নিজস্ব বিশেষ প্রণালী ও বিশেষ যন্ত্রের প্রয়োজন। একজন জ্যোতির্বিদ্ রান্নাঘরের সমস্ত হাঁড়িকুড়ির সাহায্য নিয়ে শনিগ্রহের বলয়গুলি দেখাতে পারেন না, তার জন্য দূরবীক্ষণযন্ত্র প্রয়োজন। সেইরূপ ধর্মের মহান্ সত্যসমূহ দেখতে হলে, যাঁরা পূর্বেই সেগুলি প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁদের প্রণালীগুলি অনুসরণ করতে হবে। যে বিজ্ঞান যত বড়, তার শিক্ষা করবার উপায়ও তত নানাবিধ। আমরা সংসারে আসবার পূর্বেই ভগবান্ এ থেকে বেরুবার উপায়ও ক'রে রেখেছেন। সুতরাং আমাদের চাই শুধু সেই উপায়টাকে জানা। তবে বিভিন্ন প্রণালী নিয়ে মারামারি ক'রো না। কেবল যাতে তোমার অপরোক্ষানুভূতি হয়, তার চেষ্টা কর, আর যে সাধনপ্রণালী তোমার পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী হয়, তাই অবলম্বন কর। তুমি আম খেয়ে যাও, অপরে ঝুড়িটা নিয়ে মারামারি ক'রে মরুক। খ্রীষ্টকে দর্শন কর, তবেই তুমি যথার্থ খ্রীষ্টান হবে। আর সবই বাজে কথামাত্র—কথা যত কম হয়, ততই ভাল।

জগতে যার কিছু বার্তা বহন করবার বা শিক্ষা দেবার থাকে, তাকেই বার্তাবহ বা দূত বলা যেতে পারে; দেবতা থাকলে তবেই তাকে মন্দির বলা যেতে পারে, এর বিপরীতটা সত্য নয়।

ততদিন পর্যন্ত শিক্ষা কর, যতদিন পর্যন্ত না তোমার মুখ ব্রহ্মবিদের মতো প্রতিভাত হয়, যেমন সত্যকামের[১] হয়েছিল।

আনুমানিক জ্ঞানের বিরুদ্ধে আনুমানিক জ্ঞান নিয়ে কথা বললেই ঝগড়া বাধে। কিন্তু যা প্রত্যক্ষ দর্শন করেছ, তারই সম্বন্ধে কথা বঁলো দেখি—কোন মনুষ্যহৃদয়ই তাকে স্বীকার না ক'রে পারবে না। প্রত্যক্ষানুভূতি করাতেই সেণ্ট পল্‌কে (St. Paul) ইচ্ছার বিরুদ্ধে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করতে হয়েছিল।

ঐ, অপরাহ্ণ

(মধ্যাহ্নভোজনের পর অল্পক্ষণ কথাবার্তা হয়—সেই কথাবার্তা-প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেন :)

ভ্রমই ভ্রমকে সৃষ্টি ক'রে থাকে। ভ্রম নিজেকেই নিজে সৃষ্টি করে, আবার নিজেকেই নিজে ধ্বংস করে। একেই বলে মায়া। যেহেতু তথাকথিত সমুদয় জ্ঞানেরই ভিত্তি মায়া, ঐ জ্ঞান অন্যোন্যাশ্রয়দোষদুষ্ট। এমন এক সময় আসে—যখন ঐ জ্ঞান নিজেই নিজেকে নষ্ট করে। 'ছেড়ে দাও রজ্জু—যাহে আকর্ষণ।' ভ্রম কখনও আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে না। যখনই আমরা সেই দড়িটাকে ধরি, মায়ার সহিত নিজেদের এক ক'রে ফেলি, তখনই মায়া আমাদের উপর শক্তি বিস্তার করে। মায়াকে ছেড়ে দাও, কেবল সাক্ষিস্বরূপ হয়ে থাকো। তা হলেই অবিচলিত থেকে জগৎপ্রপঞ্চরূপ ছবির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হ'তে পারবে।

বুধবার, ২৪শে জুলাই

যিনি যোগে সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করেছেন, তাঁর পক্ষে যোগসিদ্ধিগুলি বিঘ্ন নয়, কিন্তু প্রবর্তকের পক্ষে সেগুলি বিঘ্নস্বরূপ হ'তে পারে, কারণ ঐগুলি প্রয়োগ করতে করতে ঐসবে একটা আনন্দ ও বিস্ময়ের ভাব আসতে পারে। সিদ্ধি বা বিভূতিগুলি যোগসাধনার পথে যে ঠিক ঠিক অগ্রসর হওয়া যাচ্ছে, তারই চিহ্নস্বরূপ ; কিন্তু সেগুলি মন্ত্রজপ, উপবাসাদি, তপস্যা, যোগসাধন,

১ ছান্দোগ্য উপ., ৪।৯।২

এমন কি ঔষধ-বিশেষের ব্যবহারের দ্বারাও আসতে পারে। যে যোগী যোগসিদ্ধিসমূহেও বৈরাগ্য অবলম্বন করেন এবং সমুদয় কর্মফল ত্যাগ করেন, তাঁর 'ধর্মমেঘ' নামে সমাধিলাভ হয়। যেমন মেঘ বৃষ্টি বর্ষণ করে, তেমনি তিনি যে যোগাবস্থা লাভ করেন, তা চারিদিকে ধর্ম বা পবিত্রতার প্রভাব বিস্তার করতে থাকে।

যখন একরূপ প্রত্যয়ের ক্রমাগত আবৃত্তি হ'তে থাকে, তখনই সেটা ধ্যান-পদবাচ্য, কিন্তু সমাধি এক বস্তুতেই হয়ে থাকে।

মন আত্মার জ্ঞেয়, কিন্তু মন স্বপ্রকাশ নয়। আত্মা কোন বস্তুর কারণ হ'তে পারে না। কিরূপে হবে? পুরুষ প্রকৃতিতে যুক্ত হবে কিরূপে? পুরুষ প্রকৃতপক্ষে কখনও প্রকৃতিতে যুক্ত হন না—অবিবেকের দরুন বোধ হয় পুরুষ প্রকৃতিতে যুক্ত হয়েছে।

*　　　*　　　*

(লোককে করুণার চক্ষে না দেখে, অথবা তারা অতি হীনদশায় পড়ে আছে—এ-রকম মনে না ক'রে, অপরকে সাহায্য করতে শিক্ষা কর। শত্রুমিত্র উভয়ের প্রতি সমদৃষ্টি হ'তে শিক্ষা কর; যখন তা হ'তে পারবে, আর যখন তোমার কোন বাসনা থাকবে না, তখন তোমার চরমাবস্থা লাভ হয়েছে বুঝতে হবে।

বাসনারূপ অশ্বত্থবৃক্ষকে অনাসক্তিরূপ কুঠার দ্বারা কেটে ফেল, তা হলেই তা একেবারে চ'লে যাবে—ও তো একটা ভ্রমমাত্র। 'যাঁর মোহ ও শোক চ'লে গেছে, যিনি সঙ্গদোষ জয় করেছেন, তিনিই কেবল 'আজাদ' বা মুক্ত।')

(কোন ব্যক্তিকে বিশেষভাবে—ব্যক্তিগতভাবে ভালবাসা হচ্ছে বন্ধন। সকলকে সমানভাবে ভালবাসো, তা হ'লে সব বাসনা চ'লে যাবে।)

(সর্বভক্ষক কাল এলে সকলকেই যেতে হবে। অতএব পৃথিবীর উন্নতির জন্য, ক্ষণস্থায়ী প্রজাপতিকে রঙচঙে করবার জন্য কেন চেষ্টা কর? সবই তো শেষে চলে যাবে। সাদা ইঁদুরের মতো খাঁচায় ব'সে কেবল ডিগবাজি খেও না; সদাই ব্যস্ত অথচ প্রকৃত কাজ কিছু হচ্ছে না। বাসনা ভালই হোক, আর মন্দই হোক, বাসনা জিনিসটাই খারাপ। এ যেন কুকুরের মতো মাংসখণ্ড পাবার জন্য দিন-রাত লাফানো, অথচ মাংসের

টুকরোটা ক্রমাগত সামনে থেকে সরে যাচ্ছে, আর শেষ পর্যন্ত কুকুরের মতো মৃত্যু। ও-রকম হ'য়ো না। সমস্ত বাসনা নষ্ট ক'রে ফেলো।)

* * *

পরমাত্মা যখন মায়াধীশ, তখন তিনি ঈশ্বর; পরমাত্মা যখন মায়ার অধীন, তখন তিনিই জীবাত্মা। সমুদয় জগৎপ্রপঞ্চের সমষ্টিই মায়া, একদিন সেটা একেবারে উড়ে যাবে।

বৃক্ষের বৃক্ষত্বটা মায়া—গাছ দেখবার সময় আমরা প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মস্বরূপকেই দেখছি, মায়া-আবরণে ঢাকা। কোন ঘটনা সম্বন্ধে 'কেন' এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসাটাই মায়ার অন্তর্গত। সুতরাং মায়া কিরূপে এল?—এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা বৃথা, কারণ মায়ার মধ্য থেকে ওর উত্তর কখন দেওয়া যেতে পারে না; আর মায়ার পারে কে ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে? মন্দ বা মায়া বা অসদ্দৃষ্টিই 'কেন' এই প্রশ্নের সৃষ্টি করে, কিন্তু 'কেন' প্রশ্ন থেকে মায়া আসে না—মায়াই ঐ 'কেন' জিজ্ঞাসা করে। ভ্রমই ভ্রমকে নষ্ট ক'রে দেয়। যুক্তি-বিচার নিজেই একটা বিরোধের উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং এটা একটা চক্র-স্বরূপ, কাজেই যুক্তি নিজেই নিজেকে ধ্বংস করবে। ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি একটা আনুমানিক জ্ঞান, আবার সব আনুমানিক জ্ঞানের ভিত্তি অনুভূতি।

অজ্ঞানে যখন ব্রহ্মজ্যোতিঃ প্রতিবিম্বিত হয়, তখনই তাকে দেখা যায়—স্বতন্ত্রভাবে ধরলে সেটা শূন্য ছাড়া কিছুই নয়। মেঘে সূর্যকিরণ প্রতিফলিত না হ'লে মেঘকে দেখাই যায় না।

* * *

চারজন লোক দেশভ্রমণ করতে করতে একটা খুব উঁচু দেয়ালের কাছে এসে উপস্থিত হ'ল। প্রথম পথিকটি অতি কষ্টে দেয়াল বেয়ে উঠল, আর পেছন দিকে চেয়ে না দেখেই দেয়ালের ওপারে লাফ দিয়ে প'ড়ল। দ্বিতীয় পথিকটি দেওয়ালে উঠল, ভেতরের দিকে দেখলে, আর আনন্দধ্বনি ক'রে ভেতরে প'ড়ল। তারপর তৃতীয়টিও দেয়ালের মাথায় উঠল, তার সঙ্গীরা কোথায় গিয়েছে সে দিকে লক্ষ্য ক'রে দেখলে, তারপর আনন্দে হাঃ হাঃ ক'রে হেসে তাদের অনুসরণ করলে। কিন্তু চতুর্থ পথিকটি দেয়ালে উঠে তার সঙ্গীদের কি হ'ল জেনে লোককে তা জানাবার জন্য ফিরে এল। এই সংসার-প্রপঞ্চের বাইরে যে কিছু আছে, আমাদের কাছে তার প্রমাণ হচ্ছে—

যে-সকল মহাপুরুষ মায়ার দেয়াল বেয়ে ভেতরের দিকে পড়েছেন, তাঁরা পড়বার আগে যে আনন্দে হাঃ হাঃ ক'রে হেসে উঠেন, সেই হাস্য।

*　　　*　　　*

আমরা যখন সেই পূর্ণ সত্তা থেকে নিজেদের পৃথক্ ক'রে তাতে কতকগুলি গুণের আরোপ করি, তখন তাঁকেই আমরা ঈশ্বর বলি। ঈশ্বর হচ্ছেন—আমাদের মনের দ্বারা দৃষ্ট এই জগৎপ্রপঞ্চের মূল সত্তা। জগতের সমুদয় মন্দ ও দুঃখরাশিকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন যেভাবে দেখে, তাকেই 'শয়তান' বলে।

বৃহস্পতিবার, ২৫শে জুলাই

(পাতঞ্জল যোগসূত্র)

কার্য তিন প্রকারের হ'তে পারে—কৃত (যা তুমি নিজে ক'রছ), কারিত (যা অপরের দ্বারা করাচ্ছ), আর অনুমোদিত (অপরে করছে তাতে তোমার অনুমোদন আছে, কোন আপত্তি নেই)। আমাদের উপর এই তিন প্রকার কার্যের ফল প্রায় একরূপ।

(পূর্ণ ব্রহ্মচর্যের দ্বারা মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি খুব প্রবল হয়ে থাকে। ব্রহ্মচারীকে কায়মনোবাক্যে মৈথুনবর্জিত হ'তে হবে। দেহটার যত্ন ভুলে যাও। যতটা সম্ভব, দেহচেতনা ভুলে যাও।

যে অবস্থায় স্থিরভাবে ও সুখে অনেকক্ষণ বসে থাকতে পারা যায়, তাকেই 'আসন' বলে। সর্বদা অভ্যাসের দ্বারা এবং মনকে অনন্তভাবে ভাবিত করতে পারলে এটি হ'তে পারে)

একটা বিষয়ে সর্বদা চিত্তবৃত্তি প্রবাহিত করার নাম 'ধ্যান'। স্থির জলে যদি একটা প্রস্তরখণ্ড ফেলা যায়, তা হ'লে জলে অনেকগুলি বৃত্তাকার তরঙ্গ উৎপন্ন হয়—বৃত্তগুলি সব পৃথক্ পৃথক্, অথচ পরস্পর পরস্পরের উপর কার্য করছে। আমাদের মনের ভেতরও এইরূপ বৃত্তিপ্রবাহ চলেছে ; তবে আমাদের ভেতর সেটি অজ্ঞাতসারে হচ্ছে, আর যোগীদের ভেতর ঐরূপ কার্য তাঁদের জ্ঞাতসারে হয়ে থাকে। আমরা যেন মাকড়সার মতো নিজের জালের মধ্যে রয়েছি, যোগ-অভ্যাসের দ্বারা আমরা মাকড়সার মতো জালের যে অংশে

ইচ্ছা যেতে পারি। যারা যোগী নয়, তারা যেখানে রয়েছে, সেই নির্দিষ্ট স্থল-বিশেষেই আবদ্ধ থাকতে বাধ্য হয়।

* * *

(অপরকে হিংসা করলে বন্ধন হয় ও আমাদের সামনে থেকে সত্য ঢাকা পড়ে যায়।) শুধু নিষেধাত্মক ধর্মসাধনাই যথেষ্ট নয়। মায়াকে আমাদের জয় করতে হবে, তা হলেই মায়া আমাদের অনুসরণ করবে। যখন কোন বস্তু আমাদের আর বাঁধতে না পারে, তখনই আমরা সেই বস্তু পাবার যোগ্যতা লাভ করি। যখন ঠিক ঠিক বন্ধন ছুটে যায়, তখন সবই আমাদের নিকট এসে উপস্থিত হয়। যারা কোন কিছু চায় না, শুধু তারাই প্রকৃতিকে জয় করেছে।

(এমন কোন মহাত্মার শরণাগত হও, যিনি নিজের বন্ধন ছিন্ন করেছেন, কালে তিনিই কৃপাবশে তোমায় মুক্ত ক'রে দেবেন। ঈশ্বরের শরণাগত হওয়া এর চেয়ে উচ্চভাব, কিন্তু অতি কঠিন। প্রকৃতপক্ষে এটি কার্যে পরিণত করেছে—এমন লোক শতাব্দীর ভিতর বড়জোর একজন দেখা যায়। কিছু অনুভব ক'রো না, কিছু জেনো না, কিছু ক'রো না, নিজের ব'লে কিছু রেখো না—সব কিছু ঈশ্বরে সমর্পণ কর আর সর্বান্তঃকরণে বলো, 'তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক।'

আমরা বদ্ধ—এই ভাব আমাদের স্বপ্নমাত্র। জেগে ওঠ—বন্ধন চ'লে যাক। ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও, এই মায়া-মরু অতিক্রম করবার এই একমাত্র উপায়।

'ছেড়ে দাও রজ্জু, বলো হে সন্ন্যাসি, ওঁ তৎ সৎ ওঁ।'[১])

আমরা যে অপরের সেবা করতে পারছি, এ আমাদের একটা বিশেষ সৌভাগ্য—কারণ ঐরূপ অনুষ্ঠানের দ্বারাই আমাদের আত্মোন্নতি হবে। লোকে যে কষ্ট পাচ্ছে, তার কারণ তার উপকার ক'রে আমাদের কল্যাণ হবে। অতএব দাতা দান করবার সময় গ্রহীতার সামনে হাঁটু গেড়ে বসুন এবং তাকে ধন্যবাদ দিন, গ্রহীতা সম্মুখে দাঁড়িয়ে থেকে দান করতে অনুমতি

১ 'সন্ন্যাসীর গীতি' (Song of the Sannyasin) হইতে। কবিতাটি সহস্রদ্বীপোদ্যানে এইকালেই রচিত।

দিন। সব প্রাণীর মধ্যে সেই প্রভুকে দর্শন ক'রে তাঁকেই দান কর। যখন আমরা আর মন্দ কিছু দেখতে পাব না, তখন আমাদের পক্ষে জগৎপ্রপঞ্চই আর থাকবে না, কারণ প্রকৃতির অস্তিত্বের উদ্দেশ্যই হচ্ছে এই ভ্রম থেকে আমাদের মুক্ত করা। অপূর্ণতা ব'লে কিছু আছে, এইটে ভাবাই অপূর্ণতা সৃষ্টি করা। আমরা পূর্ণস্বরূপ ও ওজঃস্বরূপ, এই চিন্তাতেই কেবল এটা দূর হ'তে পারে। (যতই ভাল কাজ কর না কেন, কিছু না কিছু মন্দ তাতে লেগে থাকবেই থাকবে। তবে সমুদয় কার্য নিজের ব্যক্তিগত ফলাফলের দিকে দৃষ্টি না রেখে ক'রে যাও, সব ফল ঈশ্বরে সমর্পণ কর, তা হ'লে ভাল-মন্দ কিছুই তোমায় অভিভূত করতে পারবে না।)

(কাজ করাটা ধর্ম নয় বটে, তবে ঠিক ঠিক ভাবে অনুষ্ঠিত কাজ মুক্তির দিকে নিয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে অপরকে করুণার চক্ষে দেখা অজ্ঞানমাত্র, কারণ আমরা করুণা ক'রব কাকে? তুমি ঈশ্বরকে করুণার চক্ষে দেখতে পার কি? আর ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু আছে কি? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও যে, তিনি তোমাকে তোমার আত্মোন্নতির জন্য এই জগৎরূপ একটি নৈতিক ব্যায়ামশালা দিয়েছেন, কিন্তু কখনও ভেবো না—তুমি এই জগৎকে সাহায্য করতে পারো। তোমায় যদি কেউ অভিশাপ দেয়, তার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, কারণ গালাগালি বা অভিশাপ জিনিসটা কি, তা দেখবার জন্য সে যেন তোমার সম্মুখে একখানি আরশি ধরছে, আর তোমাকে আত্মসংযম অভ্যাস করবার অবসর দিচ্ছে। সুতরাং তাকে আশীর্বাদ কর ও সুখী হও। অভ্যাস করবার অবকাশ না হ'লে শক্তির বিকাশ হ'তে পারে না, আর আরশি সামনে না ধরলে আমরা নিজের মুখ নিজে দেখতে পাই না।)

(অপবিত্র চিন্তা ও কল্পনা অপবিত্র ক্রিয়ার মতোই দোষাবহ। কামনা দমন করলে তা থেকে উচ্চতম ফললাভ হয়। কামশক্তিকে আধ্যাত্মিক শক্তিতে পরিণত কর, কিন্তু নিজেকে পুরুষত্বহীন ক'রো না, কারণ তাতে কেবল শক্তির অপচয় হয়। এই শক্তি যত প্রবল থাকবে, এর দ্বারা তত অধিক কাজ সম্পন্ন হ'তে পারবে। প্রবল জলের স্রোত পেলে তবেই জলশক্তির সাহায্যে খনির কাজ করা যেতে পারে।)

আজকাল আমাদের বিশেষ প্রয়োজন এই যে, আমাদের জানতে হবে, একজন ঈশ্বর আছেন, আর এখানে এবং এখনই আমরা তাঁকে অনুভব করতে

—দেখতে পারি। চিকাগোর একজন অধ্যাপক বলেন, 'এই জগতের তত্ত্বাবধান তুমি কর, পরলোকের খবর ঈশ্বর নেবেন।' কি আহাম্মকি কথা! যদি আমরা এই জগতের সব বন্দোবস্ত করতে পারি, তবে পরলোকের ভার নেবার জন্য আবার অকারণ একজন ঈশ্বরের কি দরকার?

শুক্রবার, ২৬শে জুলাই

(বৃহদারণ্যক উপনিষৎ)

সব কিছুকে ভালবাসো, কেবল আত্মার ভিতর দিয়ে এবং আত্মার জন্য। যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে বলেছিলেন, 'আত্মার দ্বারাই আমরা সব জিনিস জানতে পারছি।' আত্মা কখনও জ্ঞানের বিষয় হ'তে পারে না—যে নিজে জ্ঞাতা, সে কি ক'রে জ্ঞেয় হবে?[১] যিনি নিজেকে আত্মা ব'লে জানতে পারেন, তাঁর পক্ষে আর কোন বিধিনিষেধ থাকে না। তিনি জানেন—তিনিই এই জগৎপ্রপঞ্চ, আবার এর স্রষ্টাও বটে।

* * *

(পুরাতন পৌরাণিক ব্যাপারগুলিকে রূপকের আকারে চিরস্থায়ী করবার চেষ্টা করলে এবং তাদের নিয়ে বেশী বাড়াবাড়ি করলে কুসংস্কারের উৎপত্তি হয়, আর এটা বাস্তবিক দুর্বলতা। সত্যের সঙ্গে যেন কখন কিছুর আপস না করা হয়। সত্যের উপদেশ দাও, আর কোন প্রকার কুসংস্কারের দোহাই দিতে চেষ্টা ক'রো না, অথবা সত্যকে শিক্ষার্থীর ধারণাশক্তির উপযোগী করবার জন্য নামিয়ে এনো না।)

শনিবার, ২৭শে জুলাই

(কঠোপনিষৎ)

অপরোক্ষানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত অপর কারও কাছে আত্মতত্ত্ব শিক্ষা করতে যেও না। অপরের কাছে তা কেবল কথার কথামাত্র। প্রত্যক্ষানুভূতি হ'লে মানুষ ধর্মাধর্ম, ভূত-ভবিষ্যৎ—সর্বপ্রকার দ্বন্দ্বের পারে চলে যায়। 'নিষ্কাম ব্যক্তি সেই আত্মাকে দর্শন করেন, আর তাঁর আত্মার শাশ্বতী শান্তি

১ বৃহ. উপ., ২।৪।১৪

এসে থাকে।'[১] শুধু কথা বলা, বিচার, শাস্ত্রপাঠ ও বুদ্ধির চূড়ান্ত পরিচালনা করা, এমন কি বেদ পর্যন্ত মানুষকে সেই আত্মজ্ঞান দিতে পারে না।

আমাদের ভিতর পরমাত্মা ও জীবাত্মা—দুই-ই আছেন। জ্ঞানীরা জীবাত্মাকে ছায়াস্বরূপ, আর পরমাত্মাকে যথার্থ সূর্যস্বরূপ ব'লে জানেন।

আমরা যদি মনটাকে ইন্দ্রিয়গুলির সঙ্গে সংযুক্ত না করি, তা হ'লে আমরা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা কোন জ্ঞানই লাভ করতে পারি না। মনের শক্তি দ্বারাই বহিরিন্দ্রিয়গুলিকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ইন্দ্রিয়-গুলিকে বাইরে যেতে দিও না, তা হ'লে দেহ এবং বহির্জগৎ—এই উভয়েরই হাত থেকে মুক্তি পাবে।

(এই যে অজ্ঞাত বস্তুটাকে আমরা বহির্জগৎ ব'লে দেখছি, মৃত্যুর পর নিজ নিজ মনের অবস্থানুসারে একেই কেউ স্বর্গ, কেউ বা নরক ব'লে দেখে। ইহলোক পরলোক—এ দুটোই স্বপ্নমাত্র, পরেরটি আবার প্রথমটির ছাঁচে গড়া। ঐ দুই প্রকার স্বপ্ন থেকেই মুক্ত হও, জানো—সবই সর্বব্যাপী, সবই বর্তমান। প্রকৃতি, দেহ ও মনেরই মৃত্যু হয়, আমাদের মৃত্যু হয় না; আমরা যাই-ও না, আসি-ও না। এই যে মানুষ 'স্বামী বিবেকানন্দ'—এর সত্তা প্রকৃতির ভিতর, সুতরাং এর জন্মও হয়েছে এবং মৃত্যুও হবে। কিন্তু আত্মা—যাঁকে আমরা স্বামী বিবেকানন্দ-রূপে দর্শন করছি—তাঁর কখনও জন্ম হয়নি; তিনি কখনও মরবেন না—তিনি অনন্ত ও অপরিণামী সত্তা।)

আমরা মনঃশক্তিকে পাঁচটা ইন্দ্রিয়শক্তিতেই ভাগ করি, বা একটা শক্তিরূপেই দেখি, মনঃশক্তি একরকমই থাকে। একজন অন্ধ বলে, 'প্রত্যেক জিনিসের ভিন্ন ভিন্ন রকমের প্রতিধ্বনি আছে, সুতরাং আমি হাততালি দিয়ে বিভিন্ন জিনিসের প্রতিধ্বনি দ্বারা আমার চতুর্দিকে কোথায় কি আছে, ঠিক ঠিক বলতে পারি।' সুতরাং ঘন কুয়াসার ভিতর একজন অন্ধ একজন চক্ষুষ্মান্ লোককে অনায়াসে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারে, কারণ তার কাছে কুয়াসা বা অন্ধকারে কিছু তফাত হয় না।

(মনকে সংযত কর, ইন্দ্রিয়গুলিকে নিরোধ কর, তা হলেই তুমি যোগী; তারপর বাকি যা কিছু—সবই হবে। শুনতে, দেখতে, ঘ্রাণ বা স্বাদ নিতে

১ কঠ. উপ., ২।২।১৩

অস্বীকার কর; বহিরিন্দ্রিয়গুলি থেকে মনঃশক্তিকে সরিয়ে নাও। তুমি তো অজ্ঞাতসারে এটি সদাসর্বদাই ক'রছ—যেমন যখন তোমার মন কোন বিষয়ে মগ্ন থাকে; সুতরাং তুমি জ্ঞাতসারেও এটি করবার অভ্যাস করতে পারো। মন যেখানে ইচ্ছা ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রয়োগ করতে পারে। দেহের সাহায্যেই যে আমাদের কাজ করতে হবে, এই মূল কুসংস্কারটি একেবারে ছেড়ে দাও। তা তো করতে হয় না। নিজের ঘরে গিয়ে বসো, আর নিজের অন্তরাত্মার ভিতর থেকে উপনিষদের তত্ত্বগুলি আবিষ্কার কর। তুমি সকল বিষয়ের অনন্তখনি-স্বরূপ, ভূত-ভবিষ্যৎ সকল গ্রন্থের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। যতদিন না সেই ভিতরের অন্তর্যামী গুরুর প্রকাশ হচ্ছে, ততদিন বাহিরের উপদেশ সব বৃথা। বাহিরের শিক্ষাদ্বারা যদি হৃদয়রূপ গ্রন্থ খুলে যায়, তবেই তার কিছু মূল্য আছে—বলা যেতে পারে।

আমাদের ইচ্ছাশক্তিই সেই 'ক্ষুদ্র মৃদু বাণী'; সেই যথার্থ নিয়ন্তা, যে আমাদের বলছে—এই কাজ কর, এই কাজ ক'রো না। এই ইচ্ছাশক্তি আমাদের যত বন্ধনের মধ্যে এনেছে। অজ্ঞ ব্যক্তির ইচ্ছাশক্তি তাকে বন্ধনে ফেলে, আর সেইটেই জ্ঞানপূর্বক পরিচালিত হ'লে আমাদের মুক্তি দিতে পারে। সহস্র সহস্র উপায়ে ইচ্ছাশক্তিকে দৃঢ় করা যেতে পারে, প্রত্যেক উপায়ই এক এক প্রকার যোগ; তবে প্রণালীবদ্ধ যোগের দ্বারা এটা খুব শীঘ্র সাধিত হ'তে পারে। ভক্তিযোগ, কর্মযোগ, রাজযোগ ও জ্ঞানযোগের দ্বারা খুব নিশ্চিত-রূপে কৃতকার্য হওয়া যায়। মুক্তিলাভ করবার জন্য তোমার যত প্রকার শক্তি আছে সব প্রয়োগ কর; জ্ঞানবিচার, কর্ম, উপাসনা, ধ্যান—সমুদয় অবলম্বন কর, সব পাল এক সঙ্গে তুলে দাও, সব কলগুলি পুরাদমে চালাও, আর গন্তব্যস্থানে উপনীত হও। যত শীঘ্র পারো, ততই ভাল।

* * *

খ্রীষ্টানদের ব্যাপ্টিজ্‌ম্ (baptism) সংস্কার একটা বাহ্যশুদ্ধি-স্বরূপ—এটি অন্তঃশুদ্ধির প্রতীক। বৌদ্ধধর্ম থেকে এর উৎপত্তি।

খ্রীষ্টানদের ইউক্যারিষ্ট নামক অনুষ্ঠান অসভ্য জাতিসমূহের একটি অতি প্রাচীন প্রথার অবশেষ। ঐ-সব অসভ্য জাতি—কখন কখন তাদের বড় বড় নেতারা যে-সব গুণে মহৎ হয়েছেন, সেইগুলি পাবার আশায় তাঁদের মেরে ফেলত এবং তাঁদের মাংস খেত। তাদের বিশ্বাস ছিল, যে-সকল শক্তিতে

তাদের নেতা বীর্যবান্, সাহসী ও জ্ঞানী হয়েছিলেন, এই উপায়ে সেই শক্তিগুলি তাদের ভিতর আসবে, আর কেবল এক ব্যক্তি ঐরূপ বীর্যবান্ ও জ্ঞানী না হয়ে সমগ্র জাতিটাই ঐরূপ হবে। নরবলিপ্রথা য়াহুদীজাতির ভিতরও ছিল, আর তাঁদের ঈশ্বর জিহোবা ঐ প্রথার জন্য তাদের অনেক শাস্তি দিলেও সেটা তাদের ভিতর থেকে একেবারে লোপ পায়নি। যীশু নিজে শান্তপ্রকৃতি ও প্রেমিক পুরুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁকে য়াহুদীজাতির বিশ্বাসের সঙ্গে খাপ খাইয়ে প্রচার করবার চেষ্টার ফলে খ্রীষ্টানদের মধ্যে এই মতবাদের উৎপত্তি হ'ল যে, যীশু ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে সমগ্র মানবজাতির প্রতিনিধি-রূপে নিজেকে বলি দিয়ে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করলেন। য়াহুদীদের মধ্যে পূর্বে এক প্রথা ছিল—তাঁদের পুরোহিতেরা মন্ত্রপাঠ ক'রে ছাগলের উপর মানুষের পাপ চাপিয়ে দিয়ে তাকে জঙ্গলে তাড়িয়ে দিতেন—এখানে ছাগলের বদলে মানুষ, এই তফাত। এই নিষ্ঠুর ভাব প্রবেশ করার দরুন খ্রীষ্টধর্ম যীশুর যথার্থ শিক্ষা থেকে অনেক দূরে সরে গেল এবং তার ভিতর পরের উপর অত্যাচার করবার ও অপরের রক্তপাত করবার ভাব এল।

* * *

কোন কাজ করবার সময় ব'লো না, 'এটা আমার কর্তব্য'; বরং বলো, 'এটা আমার স্বভাব'।

'সত্যমেব জয়তে নানৃতম্'—সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার হয় না। সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হও, তা হলেই তুমি ভগবানকে লাভ করবে।

* * *

অতি প্রাচীনকাল থেকে ভারতে ব্রাহ্মণজাতি নিজেদের সর্বপ্রকার বিধি-নিষেধের অতীত ব'লে ঘোষণা করেছেন, তাঁরা নিজেদের 'ভূদেব' ব'লে দাবি করেন। তাঁরা খুব দরিদ্রভাবে থাকেন, তবে তাঁদের দোষ এই যে, তাঁরা আধিপত্য বা প্রভুত্ব খোঁজেন। যাই হোক, ভারতে প্রায় ছয় কোটী ব্রাহ্মণের বাস; তাঁদের কোনপ্রকার বিষয়-আশয় নেই, অথচ তাঁরা বেশ ভাল লোক, নীতিপরায়ণ। আর এইরূপ হবার কারণ এই যে, বাল্যকাল থেকেই তাঁরা শিক্ষা পেয়ে আসছেন যে, তাঁরা বিধিনিষেধের অতীত, তাঁদের কোন প্রকার শাস্তির বিধান নেই। তাঁরা নিজেদের 'দ্বিজ' বা ঈশ্বরতনয় জ্ঞান ক'রে থাকেন।

রবিবার, ২৮শে জুলাই

(দত্তাত্রেয়[১]-কৃত অবধূত-গীতা)

'মনের স্থিরতার উপর সমুদয় জ্ঞান নির্ভর করছে।'

'যিনি সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চে পূর্ণভাবে বিরাজ করছেন, যিনি আত্মার মধ্যে আত্ম-স্বরূপ, তাঁকে আমি নমস্কার করি কিরূপে?'

আত্মাকে আমার নিজের স্বভাব—নিজের স্বরূপ ব'লে জানাই পূর্ণজ্ঞান এবং প্রত্যক্ষানুভূতি। 'আমিই তিনি, এ-বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নেই।'

'কোন চিন্তা, কোন বাক্য বা কোন কার্যই আমার বন্ধন উৎপন্ন করতে পারে না। আমি ইন্দ্রিয়াতীত, আমি চিদানন্দস্বরূপ।'

'অস্তি নাস্তি' কিছুই নেই, সবই আত্ম-স্বরূপ। সবই আপেক্ষিক ভাব। সমুদয় দ্বন্দ্ব দূর ক'রে দাও, সব কুসংস্কার ঝেড়ে ফেলো, জাতি কুল দেবতা—আর যা কিছু—সব চ'লে যাক। ব্রহ্ম হওয়া বা হয়ে যাওয়া—এ-সবের কথা কেন বলো? দ্বৈত অদ্বৈত বাদের কথাও ছেড়ে দাও। তুমি দুই ছিলে কবে যে দুই ও একের কথা ব'লছ? এই জগৎপ্রপঞ্চ সেই নিত্যশুদ্ধ ব্রহ্মমাত্র, তিনি ছাড়া আর কিছু নয়। যোগের দ্বারা শুদ্ধ হবো, এ-কথা ব'লো না—তুমি স্বয়ং যে শুদ্ধ-স্বভাব। কেউ তোমায় শিক্ষা দিতে পারে না।

যিনি এই গীতা লিখেছেন, তাঁর মতো লোকই ধর্মটাকে জীবন্ত রেখেছেন। তাঁরা বাস্তবিকই সেই ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করেছেন। তাঁরা কোন কিছু গ্রাহ্য করেন না, শরীরের সুখদুঃখ গ্রাহ্য করেন না, শীত-উষ্ণ বা বিপদ-আপদ বা অন্য কিছু মোটেই গ্রাহ্য করেন না। জ্বলন্ত অঙ্গার তাঁদের দেহকে দগ্ধ করতে থাকলেও তাঁরা স্থির হয়ে ব'সে আত্মানন্দ সম্ভোগ করেন, গা যে পুড়ছে, তা তাঁরা টেরই পান না।

'জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়-রূপ ত্রিবিধ বন্ধন যখন দূর হয়ে যায়, তখনই আত্ম-স্বরূপের প্রকাশ হয়।'

'যখন বন্ধন ও মুক্তিরূপ ভ্রম চলে যায়, তখনই আত্মস্বরূপের প্রকাশ হয়।'

'মনঃসংযম ক'রে থাকো তাতেই বা কি, না ক'রে থাকো তাতেই বা কি? তোমার অর্থ থাকে তাতেই বা কি, না থাকে তাতেই বা কি? তুমি নিত্যশুদ্ধ

১ দত্তাত্রেয় মুনি—অত্রি ও অনসূয়ার পুত্র, এক শরীরে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের অবতার।

। বলো আমি আত্মা, কোন বন্ধন কখনও আমার কাছে ঘেঁষতে পারেনি। আমি অপরিণামী নির্মল আকাশস্বরূপ; নানাবিধ বিশ্বাস বা ধারণারূপ মেঘ আমার উপর দিয়ে চলে যেতে পারে, কিন্তু আমাকে তারা স্পর্শ ই করতে পারে না।'

'ধর্মাধর্ম—পাপপুণ্য উভয়কেই দগ্ধ ক'রে ফেলো। মুক্তি ছেলেমানুষী কথামাত্র। আমি সেই অবিনাশী জ্ঞানস্বরূপ, আমি সেই পবিত্রতাস্বরূপ।'

'কেউ কখন বদ্ধ হয়নি, কেউ কখন মুক্তও হয়নি। আমি ছাড়া কেউ নেই। আমি অনন্তস্বরূপ, নিত্যমুক্তস্বভাব। আমাকে আর শেখাতে এসো না—আমি চিদ্‌ঘনস্বভাব, কিসে আমার এই স্বভাব বদলাতে পারে? কাকেই বা শেখানো যেতে পারে? কে শেখাতে পারে?'

তর্কযুক্তি, জ্ঞানবিচার ছুঁড়ে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দাও।

'বদ্ধস্বভাব লোকই অপরকে বদ্ধ দেখে, ভ্রান্ত ব্যক্তিই অপরকে ভ্রান্ত মনে করে, যে অপবিত্র সেই অপবিত্রতা দেখে থাকে।'

দেশ-কাল-নিমিত্ত—এ সবই ভ্রম। তুমি যে মনে ক'রছ তুমি বদ্ধ আছ, মুক্ত হবে—এটা তোমার রোগ। তুমি অপরিণামী সত্তা। কথা বন্ধ কর, চুপ ক'রে ব'সে থাকো—সব জিনিস তোমার সামনে থেকে উড়ে যাক—ওগুলি স্বপ্নমাত্র। পার্থক্য বা ভেদ ব'লে কোন কিছু নেই, ও-সব কুসংস্কারমাত্র। অতএব মৌনভাব অবলম্বন কর, আর নিজের স্বরূপ অবগত হও।

'আমি আনন্দঘনস্বরূপ।' কোন আদর্শের অনুসরণ করবার দরকার নেই—তুমি ছাড়া আর কি আছে? কিছুতে ভয় পেও না। তুমি সারসত্তাস্বরূপ। শান্তিতে থাকো—নিজেকে ব্যতিব্যস্ত ক'রো না। তুমি কখনও বদ্ধ হওনি। পুণ্য বা পাপ তোমাকে স্পর্শ করেনি। এই সমস্ত ভ্রম দূর ক'রে দিয়ে শান্তিতে থাকো। কাকে উপাসনা করবে? কেই বা উপাসনা করে? সবই তো আত্মা। কোন কথা কওয়া, কোনরূপ চিন্তা করাই কুসংস্কার। বার বার বলো—'আমি আত্মা, আমি আত্মা'। আর সব উড়ে যাক

সোমবার, প্রাতঃকাল, ২৯শে জুলাই

আমরা কখন কখন কোন জিনিস নির্ণয় করতে হ'লে তার পরিবেশ বর্ণনা ক'রে থাকি। একে তটস্থ লক্ষণ বলে। আমরা যখন ব্রহ্মকে 'সচ্চিদানন্দ'

নামে অভিহিত করি, প্রকৃতপক্ষে আমরা তখন সেই অনির্বাচ্য সর্বাতীত সত্তারূপ সমুদ্রের তটের কিছু কিছু বর্ণনা করছি মাত্র। আমরা একে 'অস্তি' বলতে পারি না, কারণ 'অস্তি' বলতে গেলেই তার বিপরীত 'নাস্তি'র জ্ঞানও হয়ে থাকে, সুতরাং তাও আপেক্ষিক। তাঁর সম্বন্ধে কোন ধারণা, কোন প্রকার কল্পনা ঠিক ঠিক হ'তে পারে না। কেবল 'নেতি, নেতি'—এ নয়, ও নয়—এই বলেই তাঁকে বর্ণনা করা যেতে পারে, কারণ তাঁকে চিন্তা করতে গেলেও সীমাবদ্ধ করতে হয়; সুতরাং চিন্তা দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় না।

ইন্দ্রিয়গুলো দিবারাত্র তোমায় (ভুলজ্ঞান এনে দিয়ে) প্রতারিত করছে। বেদান্ত অনেককাল আগে এটি আবিষ্কার করেছেন। আধুনিক বিজ্ঞান সবেমাত্র ঐ তত্ত্বটি বুঝতে আরম্ভ করেছে। একখানা ছবির প্রকৃতপক্ষে কেবল দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ আছে। কিন্তু চিত্রকর ছবিখানিতে কৃত্রিমভাবে গভীরতার ভাব ফলিয়ে প্রকৃতির প্রতারণা অনুকরণ ক'রে থাকে। দুজন লোক কখনও এক জগৎ দেখে না। চূড়ান্ত জ্ঞানলাভ হ'লে তুমি দেখতে পাবে—কোন বস্তুতে কোন প্রকার গতি, কোন প্রকার পরিণাম নেই। কোন প্রকার গতি বা পরিবর্তন আছে, আমাদের এই ধারণাই মায়া। প্রকৃতিকে সমষ্টিভাবে আলোচনা কর অর্থাৎ গতির তত্ত্ব আলোচনা কর। দেহ ও মন কোনটাই আমাদের যথার্থ আত্মা নয়—দুই-ই প্রকৃতির অন্তর্গত, কিন্তু কালে আমরা এদের ভিতরের সারসত্য—যথার্থ তত্ত্বকে জানতে পারি। তখন আমরা দেহ-মনের পারে চলে যাই, সুতরাং দেহ-মনের দ্বারা যা কিছু অনুভব হয়, তাও চলে যায়। যখন তুমি এই জগৎপ্রপঞ্চকে দেখতে পাবে না বা জানতে পারবে না, তখনই তোমার আত্মোপলব্ধি হবে। আমাদের বাস্তবিক প্রয়োজন এই দ্বৈত বা আপেক্ষিক জ্ঞানকে অতিক্রম করা। অনন্ত মন বা অনন্ত জ্ঞান ব'লে কিছুই নেই, কারণ মন ও জ্ঞান উভয়ই সসীম। আমরা এখন আবরণের মধ্য দিয়ে দেখছি—তারপর ক্রমশঃ আবরণকে অতিক্রম ক'রে আমরা আমাদের সমুদয় জ্ঞানের সারসত্যস্বরূপ সেই অজ্ঞাত বস্তুর কাছে পৌছব।

যদি আমরা একটা কার্ডবোর্ডের ছোট ফুটোর মধ্য দিয়ে একখানা ছবি দেখি, তা হ'লে আমরা ঐ ছবির সম্বন্ধে একটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা লাভ করি; তথাপি আমরা যা দেখি, তা বাস্তবিক ছবিটাই। ফুটোটা যত বড় করতে

থাকি, ততই আমরা ছবিটার সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা পেতে থাকি। আমাদের নামরূপের ভ্রমাত্মক উপলব্ধি অনুসারে আমরা সত্য জিনিসটারই সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা ক'রে থাকি। আবার যখন আমরা কার্ডবোর্ডখানা ফেলে দিই, তখনও আমরা সেই একই ছবি দেখে থাকি, কিন্তু এবার ছবিটাকে ঠিক ঠিক দেখতে পাই। আমরা ঐ ছবিটাতে যত বিভিন্ন প্রকার গুণ বা ভ্রমাত্মক ধারণা আরোপ করি না কেন, তা দ্বারা ছবিটার কিছু পরিবর্তন হয় না। এইরূপ আত্মাই সকল বস্তুর মূল সত্যস্বরূপ—আমরা যা কিছু দেখছি, সবই আত্মা; কিন্তু আমরা যেভাবে এদের নামরূপাকারে দেখছি, সেভাবে নয়। ঐ নামরূপ আবরণের অন্তর্গত—মায়ার অন্তর্গত।

ঐগুলি যেন দূরবীনের কাচের উপরের দাগ; আবার যেমন সূর্যের আলোকের দ্বারাই আমরা ঐ দাগগুলি দেখতে পাই, সেইরূপ ব্রহ্মরূপ সত্যবস্তু পশ্চাতে না থাকলে আমরা মায়াটাকেও দেখতে পেতাম না। 'স্বামী বিবেকানন্দ' ব'লে মানুষটা ঐ দূরবীনের কাচের উপর একটা দাগমাত্র। প্রকৃত 'আমি' সত্যস্বরূপ অপরিণামী আত্মা, আর কেবল সেই সত্যবস্তুটাই আমাকে —(নামরূপাত্মক) স্বামী বিবেকানন্দ দেখতে সমর্থ করছে। প্রত্যেকটি ভ্রমেরও সারসত্তা আত্মা—আর যেমন সূর্য কখন ঐ কাচের উপরের দাগগুলির সঙ্গে এক হয়ে যায় না, দাগগুলি আমাদের দেখিয়ে দেয় মাত্র, সেইরূপ আত্মাও কখনও নামরূপের সঙ্গে মিশিয়ে যান না। আমাদের শুভ ও অশুভ কর্মসমূহ ঐ দাগগুলিকে যথাক্রমে কমায় বাড়ায় মাত্র, কিন্তু তারা আমাদের অন্তর্যামী ঈশ্বরের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। মনের দাগগুলি সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার ক'রে ফেলো। তা হলেই আমরা দেখব—'আমি ও আমার পিতা এক।'

আগে আমাদের অনুভূতি হয়, যুক্তিবিচার পরে এসে থাকে। আমাদের এই অনুভূতি লাভ করতে হবে, আর এই প্রত্যক্ষানুভূতিই হ'ল বাস্তবিক ধর্ম। কোন ব্যক্তি শাস্ত্র, বিভিন্ন ধর্মমত বা অবতারের কথা না শুনে থাকতে পারে, কিন্তু তার যদি প্রত্যক্ষ অনুভূতি হয়ে থাকে, তবে আর কিছু দরকার নেই। চিত্ত শুদ্ধ কর—এই হচ্ছে ধর্মের সার কথা; আর আমরা নিজেরা যতক্ষণ না মনের ঐ দাগগুলো দূর করছি, ততক্ষণ আমরা সেই সত্যস্বরূপকে ঠিক ঠিক দর্শন করতে পারি না। শিশু কোথাও কোন পাপ দেখতে পায় না, কারণ

বাইরের পাপটার পরিমাণ নির্ণয় করবার কোন মাপকাঠি তার নিজের ভিতর নেই। তোমার ভিতর যে দোষগুলি আছে, সব দূর ক'রে ফেলো—তা হলেই তুমি আর বাইরে কোন দোষ দেখতে পাবে না। ছোটছেলের সামনে চুরি-ডাকাতি হয়ে যাচ্ছে, তার কাছে এর কোন অর্থ ই নেই, সে এর কিছুই বোঝে না। ধাঁধার ছবির ভিতর লুকানো জিনিসটা একবার যদি দেখতে পাও, তা হ'লে পরেও সর্বদাই দেখতে পাবে। এইরূপে যখন তুমি একবার মুক্ত ও নির্দোষ হয়ে যাবে, তখন জগৎপ্রপঞ্চের ভিতর তুমি মুক্তি ও শুদ্ধতা ছাড়া আর কিছু দেখতে পাবে না। সেই মুহূর্তেই হৃদয়ের গ্রন্থি সব ছিন্ন হয়ে যায়, সব বাঁকাচোরা সিধা হয়ে যায়, আর এই জগৎপ্রপঞ্চ স্বপ্নের মতো মিলিয়ে যায়। আর ঘুম ভাঙলে ভেবে আশ্চর্য হই যে কি ক'রে এই সব বাজে স্বপ্ন আমরা দেখছিলাম।

'যাঁকে লাভ করলে পর্ব্বতপ্রমাণ দুঃখও হৃদয়কে বিচলিত করতে পারে না', তাঁকে লাভ করতে হবে।[১]

জ্ঞানকুঠার দ্বারা দেহমনরূপ চক্রদ্বয়কে পৃথক্ ক'রে ফেলো, তা হলেই আত্মা মুক্তস্বরূপ হয়ে পৃথক্‌ভাবে দাঁড়াতে পারবে—যদিও পুরাতন বেগে তখনও দেহমনরূপ-চক্র খানিকক্ষণের জন্য চলবে। তবে তখন চাকাটি সোজাই চলবে, অর্থাৎ এই দেহমনের দ্বারা তখন শুভ কার্যই হবে। যদি সেই শরীরের দ্বারা কিছু মন্দ কার্য হয়, তা হ'লে জেনো, সে ব্যক্তি জীবন্মুক্ত নয়—যদি সে আপনাকে 'জীবন্মুক্ত' ব'লে দাবি করে, তবে সে মিথ্যা কথা বলছে। এটাও বুঝতে হবে যে, যখন চিত্তশুদ্ধির দ্বারা চক্রের বেশ সরল গতি এসে গেছে, সেই সময়ই তার উপর কুঠারপ্রয়োগ সম্ভব। সকল শুদ্ধিকর কর্মই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ভ্রম বা অজ্ঞানকে নষ্ট করছে। অপরকে পাপী বলাই সবচেয়ে গর্হিত কাজ। ভাল কাজ না জেনে করলেও তার ফল একই প্রকার হয়—তা বন্ধন-মোচনের সহায়তা করে।

দূরবীনের কাচের দাগগুলি দেখে সূর্যকেও দাগযুক্ত মনে করাই আমাদের মৌলিক ভ্রম। সেই 'আমি'-রূপ সূর্য কোনপ্রকার বাহ্য-দোষে লিপ্ত নন—এইটি জেনে রাখো, আর নিজেকে ঐ দাগগুলি তুলতে নিযুক্ত কর। যত

---

১ গীতা, ৬।২২

প্রাণী সম্ভব, তার মধ্যে মানুষই শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও খ্রীষ্টের ন্যায় মনুষ্যের উপাসনাই সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা। তোমার যা কিছুরই অভাব বোধ হয়, তাই তুমি সৃষ্টি ক'রে থাকো,—বাসনামুক্ত হও।

*   *   *

দেবতারা ও পরলোকগত ব্যক্তিরা সকলে এখানেই রয়েছেন—এই জগৎকেই তাঁরা স্বর্গ ব'লে দেখছেন। একই অজ্ঞাত বস্তুকে সকলে নিজ নিজ মনের ভাব অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখছে। এই পৃথিবীতেই কিন্তু ঐ অজ্ঞাত বস্তুর উৎকৃষ্ট দর্শনলাভ হ'তে পারে। কখনও স্বর্গে যাবার ইচ্ছা ক'রো না—এইটেই সব চেয়ে নিকৃষ্ট ভ্রম। এই পৃথিবীতেও খুব বেশী পয়সা থাকা ও ঘোর দারিদ্র্য, দুই-ই বন্ধন—দুই-ই আমাদের ধর্মপথ থেকে, মুক্তিপথ থেকে দূরে রাখে। তিনটি জিনিস এ পৃথিবীতে বড় দুর্লভ: প্রথম—মনুষ্য-দেহ (মনুষ্যমনেই ঈশ্বরের উৎকৃষ্ট প্রতিবিম্ব বিদ্যমান; বাইবেলে আছে, 'মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিস্বরূপ')। দ্বিতীয়—মুক্ত হবার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা। তৃতীয়—মহাপুরুষের আশ্রয়লাভ, যিনি স্বয়ং মায়ামোহ-সমুদ্র পার হয়ে গেছেন, এমন মহাত্মাকে গুরুরূপে পাওয়া[১]। এই তিনটি যদি পেয়ে থাকো, তবে ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দাও, তুমি মুক্ত হবেই হবে।

কেবল তর্কযুক্তির দ্বারা তোমার যে সত্যের জ্ঞান লাভ হয়, তা একটা নূতন যুক্তিতর্কের দ্বারা উড়ে যেতে পারে, কিন্তু তুমি যা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ অনুভব কর, তা তোমার কোনকালে যাবার নয়। ধর্মসম্বন্ধে কেবল বচনবাগীশ হ'লে কিছু ফল হয় না। যে-কোন বস্তুর সংস্পর্শে আসবে—যেমন মানুষ, জানোয়ার, আহার, কাজকর্ম—সকলের পশ্চাতে ব্রহ্মদৃষ্টি কর; আর এইরূপ সর্বত্র ব্রহ্মদৃষ্টি করাকে একটা অভ্যাসে পরিণত কর।

ইঙ্গারসোল[২] আমায় একবার বলেন, 'এই জগৎটা থেকে যতদূর লাভ করা যেতে পারে, তার চেষ্টা সকলের করা উচিত—এই আমার বিশ্বাস। কমলালেবুটাকে নিংড়ে যতটা সম্ভব রস বার ক'রে নিতে হবে, যেন এক ফোঁটা

১ দুর্লভং ত্রয়মেবৈতৎ দেবানুগ্রহহেতুকম্।
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ। —বিবেকচূড়ামণি, ৩

২ Robert Ingersoll—আমেরিকার বিখ্যাত অজ্ঞেয়বাদী।

রসও বাদ না যায়; কারণ এই জগৎ ছাড়া অপর কোন জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা সুনিশ্চিত নই।' আমি তাঁকে উত্তর দিয়েছিলাম: এই জগৎরূপ কমলালেবু নিংড়াবার যে প্রণালী আপনি জানেন, তার চেয়ে ভাল প্রণালী আমি জানি, আর আমি তা দ্বারা বেশী রস পেয়ে থাকি। আমি জানি আমার মৃত্যু নেই, সুতরাং আমার ঐ রস নিংড়ে নেবার তাড়া নেই। আমি জানি ভয়ের কোন কারণ নেই, সুতরাং বেশ ক'রে ধীরে ধীরে আনন্দ ক'রে নিংড়াচ্ছি। আমার কোন কর্তব্য নেই, আমার স্ত্রীপুত্রাদি ও বিষয়সম্পত্তির কোন বন্ধন নেই, আমি সকল নরনারীকে ভালবাসতে পারি। সকলেই আমার পক্ষে ব্রহ্মস্বরূপ। মানুষকে ভগবান্ ব'লে ভালবাসলে কি আনন্দ—একবার ভেবে দেখুন দেখি! কমলালেবুটাকে এইভাবে নিংড়ান দেখি—অন্যভাবে নিংড়ে যা রস পান, তার চেয়ে দশহাজারগুণ রস পাবেন—একটি ফোঁটাও বাদ যাবে না। প্রত্যেকটি ফোঁটাই পাবেন।

যাকে আমাদের 'ইচ্ছা' ব'লে মনে হচ্ছে, সেটা প্রকৃতপক্ষে আমাদের অন্তরালস্থ আত্মা, এবং বাস্তবিকই মুক্তস্বভাব।

সোমবার, অপরাহ্ণ

যীশুখ্রীষ্ট অসম্পূর্ণ ছিলেন, কারণ তিনি যে আদর্শ প্রচার করেছিলেন, তদনুসারে সম্পূর্ণভাবে জীবনযাপন করেননি, আর সর্বোপরি তিনি নারীগণকে পুরুষের তুল্য মর্যাদা দেননি। মেয়েরাই তাঁর জন্য সব করলে, কিন্তু তিনি য়াহুদীদের দেশাচার দ্বারা এতদূর বদ্ধ ছিলেন যে, একজন নারীকেও তিনি 'প্রেরিত শিষ্য' (Apostle) পদে উন্নীত করলেন না। তথাপি উচ্চতম চরিত্র হিসাবে বুদ্ধের পরেই তাঁর স্থান—আবার বুদ্ধও যে একেবারে সম্পূর্ণ নিখুঁত ছিলেন, তা নয়। যাই হোক, বুদ্ধ ধর্মরাজ্যে পুরুষের সহিত স্ত্রীলোকের সমানাধিকার স্বীকার করেছিলেন, আর তাঁর নিজের স্ত্রীই তাঁর প্রথম ও একজন প্রধানা শিষ্যা। তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদের অধিনায়িকা হয়েছিলেন। আমাদের কিন্তু এই-সকল মহাপুরুষের সমালোচনা করা উচিত নয়, আমাদের শুধু উচিত—তাঁদের আমাদের চেয়ে অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করা। তা হলেও কিন্তু যিনি যত বড়ই হোন না কেন, কোন মানুষকেই আমাদের শুধু বিশ্বাস ক'রে পড়ে থাকলে চলবে না, আমাদেরও বুদ্ধ ও খ্রীষ্ট হ'তে হবে।

কোন ব্যক্তিকেই তার দোষ বা অসম্পূর্ণতা দেখে বিচার করা উচিত নয়। মানুষের যে বড় বড় গুণগুলি দেখা যায়, সেগুলি তার নিজের, কিন্তু তার দোষগুলি মনুষ্যজাতির সাধারণ দুর্বলতা মাত্র; সুতরাং তার চরিত্র বিচার করবার সময় সেগুলি কখন গণনা করতে নেই।

*　　　　*　　　　*

ইংরেজী ভার্চু (*virtue*)-শব্দটি সংস্কৃত 'বীর' শব্দ থেকে এসেছে; কারণ প্রাচীনকালে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাদেরই লোকে শ্রেষ্ঠ ধার্মিক লোক ব'লে বিবেচনা ক'রত

মঙ্গলবার, ৩০শে জুলাই

খ্রীষ্ট ও বুদ্ধের মতো মহাপুরুষেরা কেবল বহিরবলম্বন; তাঁদের উপর আমাদের ভিতরের শক্তিগুলি আমরা আরোপ ক'রে থাকি মাত্র। প্রকৃতপক্ষে আমরাই আমাদের প্রার্থনার উত্তর দিয়ে থাকি।

যীশু যদি না জন্মাতেন, তবে মনুষ্যজাতির কখন উদ্ধার হ'ত না—এরূপ ভাবা ঈশ্বরনিন্দার সমান। মনুষ্য-স্বভাবের ভিতর যে ঐশ্বরিক ভাব অন্তর্নিহিত রয়েছে, তাকে ঐরূপে ভুলে যাওয়া বড় ভয়ানক—ঐ ঐশ্বরিক ভাব কোন-না-কোন সময়ে প্রকাশিত হবেই হবে। মনুষ্য-স্বভাবের মহত্ত্ব কখনও ভুলো না। ঈশ্বর অতীতে যা হয়েছেন, ভবিষ্যতে যা হবেন, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রকাশ আমরাই। 'আমি'ই সেই অনন্ত মহাসমুদ্র—খ্রীষ্ট ও বুদ্ধগণ তারই উপরে তরঙ্গ-মাত্র। তোমার নিজের অন্তরাত্মা ব্যতীত আর কারও কাছে মাথা নত ক'রো না। যতক্ষণ না তুমি নিজেকে সেই দেবদেব ব'লে জানতে পারছ, ততক্ষণ তোমার মুক্তি হ'তে পারে না।

আমাদের সকল অতীত কর্মই বাস্তবিক ভাল, কারণ কর্মগুলিই আমাদের চরম আদর্শ লাভ করিয়ে দেয়। কার কাছে আমি ভিক্ষা ক'রব?—আমিই যথার্থ সত্তা, আর যা কিছু আমার স্বরূপ থেকে ভিন্ন ব'লে প্রতীয়মান হয়, তা স্বপ্নমাত্র। আমি সমগ্র সমুদ্র; তুমি নিজে ঐ সমুদ্রে যে একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গের সৃষ্টি করেছ, সেটাকে 'আমি' ব'লো না। সেটা ঐ তরঙ্গ ছাড়া আর কিছুই নয় ব'লে জেনো। সত্যকাম (অর্থাৎ সত্যলাভের জন্য যাঁর প্রবল আকাঙ্ক্ষা হয়েছে) শুনতে পেলেন—তাঁর অন্তরের বাণী তাঁকে বলছে, 'তুমি অনন্তস্বরূপ,

সেই সর্বব্যাপী সত্তা তোমার ভিতরে রয়েছে।' নিজেকে সংযত কর, আর তোমার যথার্থ আত্মার বাণী শ্রবণ কর।

যে-সকল মহাপুরুষ প্রচারকার্যের জন্য প্রাণপাত ক'রে যান, তাঁরা যে-সকল মহাপুরুষ নির্জনে নীরবে মহাপবিত্র জীবনযাপন করেন, বড় বড় ভাব চিন্তা ক'রে যান এবং ঐরূপে জগতের সাহায্য করেন, তাঁদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অসম্পূর্ণ। ঐ-সকল শান্তিপ্রিয় নির্জনবাসী মহাপুরুষ একের পর এক আবির্ভূত হন—শেষে তাঁদের শক্তিরই চরমফলস্বরূপ এমন এক শক্তিসম্পন্ন পুরুষের আবির্ভাব হয়, যিনি সেই তত্ত্বগুলি চারিদিকে প্রচার ক'রে বেড়ান।

* * *

জ্ঞান স্বতই বর্তমান রয়েছে, মানুষ কেবল সেটা আবিষ্কার করে মাত্র। বেদসমূহই এই চিরন্তন জ্ঞান—যার সহায়তায় ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। ভারতের দার্শনিকগণ উচ্চতম দার্শনিক তত্ত্ব ব'লে থাকেন, আর এই প্রচণ্ড দাবিও ক'রে থাকেন।

* * *

সত্য যা, তা সাহসপূর্বক নির্ভীকভাবে লোকের কাছে বলো,—ঐ সত্য প্রকাশের জন্য ব্যক্তিবিশেষের কষ্ট হ'ল বা না হ'ল, সে দিকে খেয়াল ক'রো না। দুর্বলতাকে আমল দিও না। সত্যের জ্যোতিঃ বুদ্ধিমান্ লোকদের পক্ষেও যদি অতিমাত্রায় প্রখর বোধ হয়, তাঁরা যদি তা সহ্য করতে না পারেন, সত্যের বন্যায় যদি তাঁদের ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তা যাক—যত শীঘ্র যায়, ততই ভাল। ছেলেমানুষী ভাব সব শিশুদের ও বুনো অসভ্যদেরই শোভা পায়; কিন্তু দেখা যায়, ঐসব ভাব কেবল শিশুমহলে বা জঙ্গলেই আবদ্ধ নয়, ঐ-সকল ভাবের অনেকগুলি ধর্মপ্রচারকের আসনেও উঠেছে।

আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ হ'লে আর সম্প্রদায়ের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকা খারাপ। তা থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীনতার মুক্ত বাতাসে দেহপাত কর।

উন্নতি যা কিছু, তা এই ব্যাবহারিক বা আপেক্ষিক জগতেই হয়ে থাকে। মানবদেহই সর্বশ্রেষ্ঠ দেহ এবং মানুষই সর্বোচ্চ প্রাণী, কারণ এই মানবদেহে এই জন্মেই আমরা এই আপেক্ষিক জগতের সম্পূর্ণরূপে বাইরে যেতে পারি, সত্যসত্যই মুক্তির অবস্থা লাভ করতে পারি, আর ঐ মুক্তিই আমাদের চরম লক্ষ্য। শুধু যে আমরা পারি তা নয়, অনেকে সত্যসত্যই ইহজীবনে

মুক্তাবস্থা লাভ করেছেন, পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন। সুতরাং কেউ এ দেহ ত্যাগ ক'রে যতই সূক্ষ্ম—সূক্ষ্মতর দেহ লাভ করুক, সে তখনও এই আপেক্ষিক জগতের ভিতরই রয়েছে, সে আর আমাদের চেয়ে বেশী কিছু করতে পারে না, কারণ মুক্তিলাভ করা ছাড়া আর কি উচ্চাবস্থা লাভ করা যেতে পারে।

দেবতারা (angels) কখনও কোন অন্যায় কাজ করেন না, কাজেই তাঁরা শাস্তিও পান না; সুতরাং তাঁরা মুক্ত হতেও পারেন না। সংসারের ধাক্কাই আমাদের জাগিয়ে দেয়, এই জগৎস্বপ্ন ভাঙবার সাহায্য করে। ঐরূপ ক্রমাগত আঘাতই এই জগতের অসম্পূর্ণতা বুঝিয়ে দেয়, আমাদের এ সংসার থেকে পালাবার—মুক্তিলাভ করবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দেয়।

* * *

কোন বস্তু যখন আমরা অস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করি, তখন আমরা তার এক নাম দিই, আবার সেই জিনিসকেই যখন সম্পূর্ণ উপলব্ধি করি, তখন অন্য নাম দিই। আমাদের নৈতিক প্রকৃতি যত উন্নত হয়, আমাদের উপলব্ধিও তত উৎকৃষ্ট হয়, আমাদের ইচ্ছাশক্তিও তত অধিক বলবতী হয়।

মঙ্গলবার, অপরাহ্ণ

আমরা যে জড় ও চিন্তারাশির ভিতর সামঞ্জস্য দেখতে পাই, তার কারণ উভয়ই এক অজ্ঞাত বস্তুর দুটি দিকমাত্র, সেই জিনিসটাই দুভাগ হয়ে বাহ্য ও আন্তর হয়েছে।

ইংরেজী 'প্যারাডাইস' (Paradise)-শব্দটি সংস্কৃত 'পরদেশ' শব্দ থেকে এসেছে, ঐ শব্দটা পারস্য ভাষায় চলে গিয়েছিল—(ফার-দৌস)-এর শব্দার্থ হচ্ছে দেশের পারে, অথবা অন্য দেশ বা অন্য লোক। প্রাচীন আর্যেরা বরাবরই আত্মায় বিশ্বাস করতেন, তাঁরা মানুষকে কেবল দেহ ব'লে কখনও ভাবতেন না। তাঁদের মতে স্বর্গ নরক—দুই-ই অনিত্য ও সান্ত, কারণ কোন কার্যই কখনও তার কারণ-নাশের পর স্থায়ী হ'তে পারে না, আর কোন কারণই কখনও চিরস্থায়ী নয়; সুতরাং কার্য বা ফলমাত্রের নাশ হবেই। এই উপাখ্যানটিতে[১] সমগ্র বেদান্তদর্শনের সার রয়েছে:

[১] মুণ্ডকোপনিষদ্, ৩।১।১-৩

সোনার মতো পালকযুক্ত দুটি পাখি একটা গাছে বসে আছে। উপরে যে পাখিটা বসে আছে, সে স্থির শান্তভাবে নিজ মহিমায় নিজে বিভোর হয়ে রয়েছে ; আর যে পাখিটা নীচের ডালে রয়েছে, সে সদাই চঞ্চল—ঐ গাছের ফল খাচ্ছে—কখন মিষ্ট ফল, কখন বা কটু ফল। একবার সে একটা অতিরিক্ত কটু ফল খেলে, তখন সে একটু স্থির হয়ে উপরের সেই মহিমময় পাখিটার দিকে চাইলে। কিন্তু আবার সে শীঘ্রই তাকে ভুলে গিয়ে পূর্বের মতো সেই গাছের ফল খেতে লাগলো। আবার একটা কটু ফল খেলে—এইবার সে টুপ টুপ ক'রে লাফিয়ে উপরের পাখিটার দু-এক ডাল কাছে গেল। এইরূপ অনেকবার হ'ল, অবশেষে নীচের পাখিটা একেবারে উপরের পাখিটার জায়গায় গিয়ে ব'সল, আর নিজেকে হারিয়ে ফেলল। সে অমনি বুঝলে যে, দুটো পাখি কোন কালেই ছিল না, সে নিজেই বরাবর শান্ত‌- স্থিরভাবে নিজ মহিমায় নিজে মগ্ন—উপরের পাখিই ছিল।

বুধবার, ৩১শে জুলাই

প্রটেস্টাণ্টধর্ম-সংস্থাপক লুথার ধর্মসাধনের ভিতর থেকে সন্ন্যাস বা ত্যাগ বাদ দিয়ে তার স্থানে কেবল নীতিমাত্র প্রচার ক'রে ধর্মের সর্বনাশ ক'রে গেলেন। নাস্তিক ও জড়বাদীরাও নীতিপরায়ণ হ'তে পারে, কেবল ঈশ্বরবিশ্বাসীরাই ধর্মলাভ করতে পারে।

সমাজ যাদের অসৎ বলে, তারা মহাপুরুষদের পবিত্রতার মূল্য দেয়—সুতরাং তাদের দেখলে তাদের ঘৃণা না ক'রে ঐ কথা ভাবা উচিত। যেমন গরীব লোকের পরিশ্রমের ফলে বড় লোকের বিলাসিতা সম্ভব হয়, আধ্যাত্মিক জগতেও সেইরূপ। ভারতের সাধারণ লোকের যে এত অবনতি দেখা যায়, সেটা মীরাবাঈ, বুদ্ধ প্রভৃতি মহাত্মাদের উৎপন্ন করার জন্য যেন প্রকৃতিকে তার মূল্য ধরে দিতে হয়েছে।

*　　　*　　　*

'আমিই পবিত্রাত্মাদের পবিত্রতা' 'আমিই সকলের মূল, প্রত্যেকে নিজের মতো ক'রে সেটি ব্যবহার ক'রে থাকে, কিন্তু সবই আমি।' 'আমিই সব করছি, তুমি নিমিত্তমাত্র।'[১]

১ গীতা, ১১।৩৩

বেশী কথা ব'লো না, তোমার নিজের ভিতর যে আত্মা রয়েছেন, তাঁকে অনুভব কর, তবেই তুমি জ্ঞানী হবে। এই হ'ল জ্ঞান, আর সব অজ্ঞান। জানবার বস্তু একমাত্র ব্রহ্ম, তিনিই সব।

* * *

সত্ত্ব মানুষকে সুখ ও জ্ঞানের অন্বেষণে বদ্ধ করে, রজঃ বাসনা দ্বারা বদ্ধ করে, তমঃ ভ্রমজ্ঞান আলস্য প্রভৃতি দ্বারা বদ্ধ করে।[1] রজঃ ও তমঃ—এই দুটি নিম্নতর গুণকে সত্ত্বের দ্বারা জয় কর, তারপর সমুদয় ঈশ্বরে সমর্পণ ক'রে মুক্ত হও।

ভক্তিযোগের দ্বারা সাধক অতি শীঘ্র ব্রহ্মোপলব্ধি করেন ও তিন গুণের পারে চলে যান।[2]

ইচ্ছা, চেতনা, ইন্দ্রিয়, বাসনা, রিপু—এইগুলি মিলিত হয়ে যা হয়েছে, তাকে আমরা 'জীবাত্মা' ব'লে থাকি।

প্রথম হচ্ছে প্রতীয়মান আত্মা (দেহ); দ্বিতীয়, মানস আত্মা—যে ঐ দেহটাকে 'আমি' ব'লে মনে করে (এইটি মায়াবদ্ধ ব্রহ্ম); তৃতীয়, যথার্থ আত্মা, যিনি নিত্যশুদ্ধ, নিত্যমুক্ত। তাঁকে আংশিকভাবে দেখলে 'প্রকৃতি' ব'লে বোধ হয়, আবার তাঁকেই পূর্ণভাবে দেখলে সমস্ত প্রকৃতি উড়ে যায়; এমনকি তাঁর স্মৃতি পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে যায়। প্রথম—পরিণামী ও অনিত্য (মরণধর্মী বা ধ্বংসশীল), দ্বিতীয়—সদা পরিবর্তনশীল, কিন্তু প্রবাহরূপে নিত্য (প্রকৃতি), তৃতীয়—কূটস্থ নিত্য (আত্মা)।

* * *

আশা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ কর, এই হ'ল সর্বোচ্চ অবস্থা। আশা করবার কি আছে? আশার বন্ধন ছিঁড়ে ফেলো, নিজের আত্মার উপর দাঁড়াও, স্থির হও; যাই কর না কেন, সব ভগবানে অর্পণ কর, কিন্তু তার ভিতর কোন কপটতা রেখো না।

ভারতের কারও কুশল জিজ্ঞাসা করতে 'স্বস্থ' (যা থেকে 'স্বাস্থ্য' কথাটা এসেছে) এই সংস্কৃত শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 'স্বস্থ' শব্দের অর্থ—স্ব অর্থাৎ

১ গীতা, ১৪।৯

২ গীতা, ১৪।২৬

আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত থাকা। কোন জিনিস দেখেছি, এটা বুঝাতে হ'লে হিন্দুরা ব'লে থাকে, 'আমি একটা পদার্থ দেখেছি।' 'পদার্থ' কি না পদ বা শব্দের অর্থ, অর্থাৎ শব্দপ্রতিপাদ্য ভাববিশেষ। এমন কি এই জগৎপ্রপঞ্চটা তাদের কাছে একটা 'পদার্থ' (অর্থাৎ শব্দের অর্থ)।

* * *

জীবন্মুক্ত সিদ্ধ পুরুষের দেহ আপনা-আপনি ন্যায় কার্যই ক'রে থাকে (তার দ্বারা অন্যায় কার্য হয় না)। তাঁর শরীর কেবল শুভ কার্যই করতে পারে, কারণ তা সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে গেছে। অতীত সংস্কাররূপ যে বেগের দ্বারা তাঁদের দেহচক্র পরিচালিত হ'তে থাকে, তা সব শুভ সংস্কার। মন্দ সংস্কার সব দগ্ধ হ'য়ে গেছে।

* * *

সেই দিনকেই যথার্থ দুর্দিন বলা যায়, যে দিন আমরা ভগবৎ-প্রসঙ্গ না করি ; কিন্তু যে দিন মেঘ-ঝড়-বৃষ্টি হয়, সে দিনকে প্রকৃতপক্ষে দুর্দিন বলা যায় না।[১]

সেই পরম প্রভুর প্রতি ভালবাসাকে যথার্থ 'ভক্তি' বলা যায়। অন্য কোন পুরুষের প্রতি ভালবাসাকে—তিনি যত বড়ই হোন না কেন—ভক্তি বলা যায় না। এখানে 'পরম প্রভু' বলতে পরমেশ্বরকে বুঝাচ্ছে, তোমরা পাশ্চাত্য দেশে ব্যক্তি-ভাবাপন্ন ঈশ্বর (Personal God) বলতে যা বোঝ, তাকে অতিক্রম ক'রে আছে এই ধারণা। 'যা হ'তে এই জগৎপ্রপঞ্চের উৎপত্তি হচ্ছে, যাঁতে এর স্থিতি, আবার যাঁতে লয় হয়, তিনিই ঈশ্বর—নিত্য, শুদ্ধ, সর্বশক্তিমান্, সদামুক্তস্বভাব, দয়াময়, সর্বজ্ঞ, সকল গুরুর গুরু, অনির্বচনীয়-প্রেমস্বরূপ।'

মানুষ নিজের মস্তিষ্ক থেকে ভগবান্‌কে সৃষ্টি করে না ; তবে তার যতদূর শক্তি, সে সেইভাবে তাঁকে দেখতে পারে, আর তার যত ভাল ভাল ধারণা তাঁতে আরোপ করে। এই এক-একটি গুণই ঈশ্বরের সবটাই, আর এই এক-একটি গুণের দ্বারা সবটাকে বোঝানোই বাস্তবিক ব্যক্তি-ঈশ্বরের

১ যদচ্যুত-কথালাপ-রস-পীযূষ-বর্জিতম্।
তদ্দিনং দুর্দিনং মন্যে মেঘাচ্ছন্নং ন দুর্দিনম্॥

(Personal God) দার্শনিক ব্যাখ্যা। ঈশ্বর নিরাকার, অথচ তাঁর সব গুণ রয়েছে। আমরা যতক্ষণ মানবভাবাপন্ন, ততক্ষণ ঈশ্বর, প্রকৃতি ও জীব—এই তিনটি সত্তা আমাদের দেখতে হয়। তা না দেখে থাকতেই পারি না।

কিন্তু ভক্তের পক্ষে এই-সকল দার্শনিক পার্থক্য বাজে কথা মাত্র। সে যুক্তি-বিচার গ্রাহ্যই করে না, সে বিচার করে না—সে দেখে, প্রত্যক্ষ অনুভব করে। সে ঈশ্বরের শুদ্ধ প্রেমে আত্মহারা হ'য়ে যেতে চায়; আর এমন অনেক ভক্ত হয়ে গেছেন, যাঁরা বলেন, মুক্তির চেয়ে ঐ অবস্থাই অধিকতর বাঞ্ছনীয়। যাঁরা বলেন, 'চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি'[১]—আমি সেই প্রেমাস্পদকে ভালবাসতে চাই, তাঁকে সম্ভোগ করতে চাই।

ভক্তিযোগে বিশেষ প্রয়োজন এই যে, অকপটভাবে ও প্রবলভাবে ঈশ্বরের অভাব বোধ করা। আমরা ঈশ্বর ছাড়া আর সবই চাই, কারণ বহির্জগৎ থেকেই আমাদের সাধারণ সব বাসনা পূরণ হয়ে থাকে। যতদিন আমাদের প্রয়োজন বা অভাববোধ জড়জগতের ভিতরেই সীমাবদ্ধ, ততদিন আমরা ঈশ্বরের জন্য কোন অভাববোধ করি না; কিন্তু যখন আমরা এ জীবনে চারদিক থেকে প্রবল ঘা খেতে থাকি, আর ইহজগতের সকল বিষয়েই হতাশ হই, তখনই উচ্চতর কোন বস্তুর জন্য আমাদের প্রয়োজনবোধ হয়ে থাকে, তখনই আমরা ঈশ্বরের অন্বেষণ ক'রে থাকি।

ভক্তি আমাদের কোন বৃত্তিকে ভেঙেচুরে দেয় না, বরং ভক্তিযোগের শিক্ষা এই যে, আমাদের সব বৃত্তিই মুক্তিলাভ করবার উপায়স্বরূপ হ'তে পারে। ঐসব বৃত্তিকেই ঈশ্বরাভিমুখী করতে হবে—সাধারণতঃ যে ভালবাসা অনিত্য ইন্দ্রিয়বিষয়ে নষ্ট করা হয়ে থাকে, সেই ভালবাসা ঈশ্বরকে দিতে হবে।

তোমাদের পাশ্চাত্ত্যে ধর্মের ধারণা হ'তে ভক্তির এইটুকু তফাত যে, ভক্তিতে ভয়ের স্থান নাই—ভক্তি দ্বারা কোন পুরুষের ক্রোধ শান্ত করতে বা কাউকে সন্তুষ্ট করতে হবে না। এমন কি এমন সব ভক্তও আছেন, যাঁরা ঈশ্বরকে তাঁদের সন্তান ব'লে উপাসনা ক'রে থাকেন—এরূপ উপাসনার উদ্দেশ্য এই যে, ঐ উপাসনায় ভয় বা ভয়মিশ্র ভক্তির কোন

১ রামপ্রসাদ

ভাব না থাকে। প্রকৃত ভালবাসায় ভয় থাকতে পারে না, আর যতদিন পর্যন্ত এতটুকু ভয় থাকবে, ততদিন ভক্তির আরম্ভই হ'তে পারে না। আবার ভক্তিতে ভগবানের কাছে ভিক্ষা চাওয়ার, আদান-প্রদানের ভাব কিছুই নাই। ভগবানের কাছে কোন কিছুর জন্য প্রার্থনা ভক্তের দৃষ্টিতে মহা অপরাধ। ভক্ত কখনও ভগবানের নিকট আরোগ্য বা ঐশ্বর্য, এমন কি স্বর্গ পর্যন্ত কামনা করেন না।

যিনি ভগবান্‌কে ভালবাসতে চান, ভক্ত হ'তে চান, তাঁকে ঐ-সব বাসনা একটি পুঁটুলি ক'রে দরজার বাইরে ফেলে দিয়ে ভেতরে ঢুকতে হবে। যিনি সেই জ্যোতির রাজ্যে প্রবেশ করতে চান, তাঁকে এর দরজা দিয়ে ঢুকতে গেলে আগে দোকানদারী ধর্মের পুঁটুলি বাইরে ফেলে আসতে হবে। এ-কথা বলছি না যে, ভগবানের কাছে যা চাওয়া যায়, তা পাওয়া যায় না—সবই পাওয়া যায়, কিন্তু ঐরূপ প্রার্থনা করা অতি নীচু দরের ধর্ম, ভিখারীর ধর্ম।

'উষিত্বা জাহ্নবীতীরে কূপং খনতি দুর্মতিঃ।'

—সে ব্যক্তি বাস্তবিকই মূর্খ, যে গঙ্গাতীরে বাস ক'রে জলের জন্য কুয়া খোঁড়ে।

এই-সব আরোগ্য, ঐশ্বর্য ও ঐহিক অভ্যুদয়ের জন্য প্রার্থনাকে ভক্তি বলা যায় না—এগুলি অতি নিম্নস্তরের কর্ম। ভক্তি এর চেয়ে উঁচু জিনিস। আমরা রাজরাজের সামনে আসবার চেষ্টা করছি। আমরা সেখানে ভিখারীর বেশে যেতে পারি না। যদি আমরা কোন মহারাজার সম্মুখে উপস্থিত হ'তে ইচ্ছা করি, ভিখারীর মতো ছেঁড়া ময়লা কাপড় প'রে গেলে সেখানে কি ঢুকতে দেবে? কখনই নয়। দরোয়ান আমাদের ফটক থেকে বার ক'রে দেবে। ভগবান্ রাজার রাজা—আমরা তাঁর সামনে কখনও ভিক্ষুকের বেশে যেতে পারি না। দোকানদারদের সেখানে প্রবেশাধিকার নেই—সেখানে কেনাবেচা একেবারেই চলবে না। তোমরা বাইবেলেও পড়েছ, যীশু ক্রেতা-বিক্রেতাদের মন্দির থেকে বার ক'রে দিয়েছিলেন।

সুতরাং বলাই বাহুল্য যে, ভক্ত হবার জন্য আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে, স্বর্গাদির কামনা একেবারে দূর ক'রে দেওয়া। এরূপ স্বর্গ এই জায়গারই—এই পৃথিবীরই মতো, না হয় এর চেয়ে একটু ভাল।

খ্রীষ্টানদের স্বর্গের ধারণা এই যে, সেটা একটা তীব্র ভোগের জায়গা। সেটা কি ক'রে ভগবান্ হ'তে পারে? এই যে সব স্বর্গে যাবার বাসনা—এ সুখভোগেরই কামনা। এ বাসনা ত্যাগ করতে হবে। ভক্তের ভালবাসা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও নিঃস্বার্থ হওয়া চাই—নিজের জন্য ইহলোকে বা পরলোকে কোন কিছু আকাঙ্ক্ষা করা হবে না।

সুখদুঃখ, লাভক্ষতি—এ-সকলের বাসনা ত্যাগ ক'রে দিবারাত্র ঈশ্বরোপাসনা কর, এক মুহূর্তও যেন বৃথা নষ্ট না হয়।

(আর সব চিন্তা ত্যাগ ক'রে দিবারাত্র সর্বান্তঃকরণে ঈশ্বরের উপাসনা কর। এইরূপে দিবারাত্র উপাসিত হ'লে তিনি নিজ স্বরূপ প্রকাশ করেন, তাঁর উপাসকদের তাঁর অনুভবে সমর্থ করেন)

বৃহস্পতিবার, ১লা অগস্ট

প্রকৃত গুরু তিনি, আমরা যাঁর আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী। তিনিই সেই প্রণালী, যাঁর মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক প্রবাহ আমাদের মধ্যে প্রবাহিত হয়, তিনিই সমগ্র আধ্যাত্মিক জগতের সঙ্গে আমাদের সংযোগসূত্র। ব্যক্তিবিশেষের উপর অতিরিক্ত বিশ্বাস থেকে দুর্বলতা ও পৌত্তলিকতা আসতে পারে; কিন্তু গুরুর প্রতি প্রবল অনুরাগে খুব দ্রুত উন্নতি সম্ভবপর হয়, তিনি আমাদের ভিতরের গুরুর সঙ্গে সংযোগ ক'রে দেন। যদি তোমার গুরুর ভিতরে যথার্থ সত্য থাকে, তবে তাঁর আরাধনা কর, ঐ গুরুভক্তিই তোমাকে অতি সত্বর চরম অবস্থায় নিয়ে যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্রতা ছিল শিশুর মতো। তিনি জীবনে কখনও টাকা স্পর্শ করেননি, আর তাঁর ভিতরে কাম একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বড় বড় ধর্মাচার্যদের কাছে জড়বিজ্ঞান শিখতে যেও না, তাঁদের সমগ্র শক্তি আধ্যাত্মিক বিষয়ে প্রযুক্ত হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের ভিতর মানুষ-ভাবটা মরে গিছল, কেবল ঈশ্বরত্ব অবশিষ্ট ছিল। বাস্তবিকই তিনি পাপ দেখতে পেতেন না—যে-চোখে মানুষ পাপ বা অন্যায় দেখে, তার চেয়ে তাঁর দৃষ্টি পবিত্রতর ছিল। এইরূপ অল্প কয়েকজন পরমহংসের পবিত্রতাই সমগ্র জগৎটাকে ধারণ ক'রে রেখেছে। যদি এঁদের ধারা লুপ্ত হয়ে যায়, সকলেই যদি জগৎটাকে ত্যাগ ক'রে যান, তা হ'লে জগৎ খণ্ড খণ্ড হয়ে ধ্বংস

হয়ে যাবে। তাঁরা কেবল নিজে মহোচ্চ পবিত্র জীবন যাপন ক'রে লোকের কল্যাণ-বিধান করেন, কিন্তু তাঁরা যে অপরের কল্যাণ করছেন, তা তাঁরা টেরও পান না; তাঁরা নিজেরা আদর্শ জীবনযাপন করেই সন্তুষ্ট থাকেন।

* * *

আমাদের ভিতরে যে জ্ঞানজ্যোতিঃ বর্তমান রয়েছে, শাস্ত্র তার আভাস দিয়ে থাকে, আর তাকে অভিব্যক্ত করবার উপায় ব'লে দেয়, কিন্তু যখন আমরা নিজেরা সেই জ্ঞানলাভ করি, তখনই আমরা ঠিক ঠিক শাস্ত্র বুঝতে পারি। যখন তোমার ভিতরে সেই অন্তর্জ্যোতির প্রকাশ হয়, তখন আর শাস্ত্রে কি প্রয়োজন?—তখন কেবল অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত কর। সমুদয় শাস্ত্রে যা আছে, তোমার নিজের মধ্যেই তা আছে, বরং তার চেয়ে হাজার গুণ বেশী আছে। নিজের উপর বিশ্বাস কখনও হারিও না, এ জগতে তুমি সব করতে পার। কখনও নিজেকে দুর্বল ভেবো না, সব শক্তি তোমার ভিতর রয়েছে।

প্রকৃত ধর্ম যদি শাস্ত্রের উপর বা কোন মহাপুরুষের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে, তবে চুলোয় যাক সব ধর্ম, চুলোয় যাক সব শাস্ত্র। ধর্ম আমাদের নিজেদের ভিতর রয়েছে। কোন শাস্ত্র বা কোন গুরু আমাদের তাঁকে লাভ করবার জন্য সাহায্য ছাড়া আর কিছুই করতে পারেন না। এমন কি এঁদের সহায়তা ছাড়াও আমাদের নিজেদের ভিতরেই সব সত্য লাভ করতে পারি। তথাপি শাস্ত্র ও আচার্যগণের প্রতি কৃতজ্ঞ হও, কিন্তু এঁরা যেন তোমায় বদ্ধ না করেন; তোমার গুরুকে ঈশ্বর ব'লে উপাসনা কর, কিন্তু অন্ধভাবে তাঁর অনুসরণ ক'রো না। তাঁকে যতদূর সম্ভব ভালবাসো কিন্তু স্বাধীনভাবে চিন্তা কর। কোনরূপ অন্ধবিশ্বাস তোমায় মুক্তি দিতে পারে না, তুমি নিজেই নিজের মুক্তিসাধন কর। ঈশ্বরসম্বন্ধে এই একটিমাত্র ধারণা পোষণ কর যে, তিনি আমাদের চিরকালের সহায়।

স্বাধীনতার ভাব এবং উচ্চতম প্রেম—দুই-ই একসঙ্গে থাকা চাই, তা হ'লে এদের মধ্যে কোনটাই আমাদের বন্ধনের কারণ হ'তে পারে না। আমরা ভগবান্‌কে কিছু দিতে পারি না, তিনিই আমাদের সব দিয়ে থাকেন। তিনি সকল গুরুর গুরু। তিনি আমাদের আত্মার আত্মা, আমাদের যথার্থ স্বরূপ। যখন তিনি আমাদের আত্মার অন্তরাত্মা, তখন আমরা যে তাকে ভালবাসব,

এ আর আশ্চর্য কি? আর কাকে বা কোন্ বস্তুকে আমরা ভালবাসতে পারি? আমরা হ'তে চাই সেই স্থির অগ্নিশিখা—যার তাপ নেই, ধোঁয়া নেই! যখন তোমরা কেবল ব্রহ্মকেই দেখবে, তখন আর কার উপকার করতে পারবে? ভগবানের তো আর উপকার করতে পার না? তখন সব সংশয় চলে যায়, সর্বত্র সমত্বভাব এসে যায়। যদি তখন কারও কল্যাণ কর তো নিজেরই কল্যাণ করবে। এইটি অনুভব কর যে, দানগ্রহীতা তোমার চেয়ে বড়, তুমি যে তার সেবা ক'রছ, তার কারণ—তুমি তার চেয়ে ছোট; এ নয় যে, তুমি বড় আর সে ছোট। গোলাপ যেমন নিজের স্বভাবেই সুগন্ধ বিতরণ করে, আর সুগন্ধ দিচ্ছে বলে সে মোটেই টের পায় না, তুমিও সেই ভাবে দিয়ে যাও।

সেই মহান্ হিন্দু সংস্কারক রাজা রামমোহন রায় এইরূপ নিঃস্বার্থ কর্মের অদ্ভুত দৃষ্টান্ত। তিনি তাঁর সমুদয় জীবনটা ভারতের সাহায্যকল্পে অর্পণ করেছিলেন। তিনিই সতীদাহ-প্রথা বন্ধ করেন। সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস, এই সংস্কারকার্য সম্পূর্ণরূপে ইংরেজদের দ্বারা সাধিত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। রাজা রামমোহন রায়ই এই প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করেন এবং একে রহিত করবার জন্য গভর্নমেণ্টের সহায়তালাভে কৃতকার্য হন। যত দিন না তিনি আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন, ততদিন ইংরেজরা কিছুই করেনি। তিনি 'ব্রাহ্মসমাজ' নামে বিখ্যাত ধর্মসমাজও স্থাপন করেন, আর একটি বিশ্ববিদ্যালয়-স্থাপনের জন্য ৩ লক্ষ টাকা চাঁদা দেন। তিনি তারপর সরে এলেন এবং বললেন, 'আমাকে ছেড়ে তোমরা নিজেরাই এগিয়ে যাও।' তিনি নামযশ একদম চাইতেন না, নিজের জন্য কোনরূপ ফলাকাঙ্ক্ষা করতেন না।

বৃহস্পতিবার, অপরাহ্ণ

জগৎপ্রপঞ্চ অনন্তভাবে অভিব্যক্ত হ'য়ে ক্রমাগত চলেছে, যেন নাগরদোলা—আত্মা যেন ঐ নাগরদোলায় চড়ে ঘুরছে। এই ক্রম চিরন্তন। এক একজন লোক ঐ নাগরদোলা থেকে নেমে পড়ছে বটে, কিন্তু চিরকাল সেই একরকম ঘটনাই বার বার ঘটছে। আর এই কারণেই লোকের ভূত-ভবিষ্যৎ সব ব'লে দেওয়া যেতে পারে; কারণ প্রকৃতপক্ষে সবই তো বর্তমান। যখন আত্মা একটা

শৃঙ্খলের ভিতর এসে পড়ে, তখন তাকে সেই শৃঙ্খলের যা কিছু অভিজ্ঞতা তার ভেতর দিয়ে যেতে হবে। ঐরূপ একটা শৃঙ্খল বা শ্রেণী থেকে আত্মা আর একটা শৃঙ্খল বা শ্রেণীতে চলে যায়, আর কোন কোন শ্রেণীতে এলে তারা আপনাদের ব্রহ্মস্বরূপ অনুভব ক'রে একেবারে তা থেকে বেরিয়ে যায়। ঐরূপ শ্রেণীর বা ঘটনা-পরম্পরায় একটি প্রধান ঘটনাকে অবলম্বন ক'রে সমুদয় ঘটনা-শৃঙ্খলটাই টেনে আনা যেতে পারে, আর তার ভিতরের সমুদয় ঘটনাই যথাযথ পাঠ করা যেতে পারে। এই শক্তি সহজেই লাভ করা যায়, কিন্তু এতে বাস্তবিক কোন লাভ নেই, আর ঐ শক্তিলাভের সাধনায় আমাদের সমপরিমাণ আধ্যাত্মিক শক্তি ব্যয় হয়ে যায়। সুতরাং ও-সব বিষয়ের চেষ্টা ক'রো না, ভগবানের উপাসনা কর।

শুক্রবার, ২রা অগস্ট

ভগবদ্-উপলব্ধির জন্য প্রথমে নিষ্ঠা দরকার।

'সব্‌সে রসিয়ে সবসে বসিয়ে সব্‌কা লীজিয়ে নাম।
হাঁ জী হাঁ জী কর্‌তে রহিয়ে বৈঠিয়ে আপনা ঠাম॥'

—সকলের সঙ্গে আনন্দ কর, সকলের সঙ্গে বস, সকলের নাম লও, অপরের কথায় 'হাঁ, হাঁ' করতে থাকো, কিন্তু নিজের ভাব কোন মতে ছেড়ো না। এর চেয়ে উচ্চতর অবস্থা—অপরের ভাবে নিজেকে যথার্থ ভাবিত করা। যদি আমিই সব হই, তবে আমার ভাইয়ের সঙ্গে যথার্থভাবে এবং কার্যতঃ সহানুভূতি করতে পারব না কেন? যতক্ষণ আমি দুর্বল, ততক্ষণ আমাকে নিষ্ঠা ক'রে একটা রাস্তা ধরে থাকতে হবে; কিন্তু যখন আমি সবল হবো, তখন অপর সকলের মতো অনুভব করতে পারব, তাদের সকলের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহানুভূতি করতে পারব।

প্রাচীন কালের লোকের ভাব ছিল—অপর সকল ভাব নষ্ট ক'রে একটা ভাবকে প্রবল করা। আধুনিক ভাব হচ্ছে—সকল বিষয়ে সামঞ্জস্য রেখে উন্নতি করা। একটা তৃতীয় পন্থা হচ্ছে—মনের বিকাশ করা ও তাকে সংযত করা, তারপর যেখানে ইচ্ছা তাকে প্রয়োগ কর—তাতে ফল খুব শীঘ্র হবে। এইটি হচ্ছে যথার্থ আত্মোন্নতির উপায়। একাগ্রতা শিক্ষা কর, আর যে দিকে ইচ্ছা তাকে প্রয়োগ কর। এরূপ করলে তোমার কিছুই ক্ষতি

হবে না। যে সমগ্রটাকে পায়, সে অংশটাকেও পায়। দ্বৈতবাদ অদ্বৈতবাদের অন্তর্ভুক্ত।

'আমি প্রথমে তাকে দেখলাম, সেও আমায় দেখলে; আমিও তার প্রতি কটাক্ষ করলাম, সেও আমার প্রতি কটাক্ষ করলে'—এইরূপ চলতে লাগলো। শেষে দুটি আত্মা এমন সম্পূর্ণভাবে মিলিত হয়ে গেল যে, তারা প্রকৃতপক্ষে এক হয়ে গেল।[1]

*　　*　　*

সমাধির দু-টি ভাব আছে: এক ভাবে আমি নিজেরই ধ্যান করি, আর এক ভাবে বাইরের বস্তু ধ্যান করি। তারপর ধ্যানের ধ্যাতা ধ্যেয় অভেদ হয়ে যায়।

প্রত্যেক বিশেষ বিশেষ ভাবের সঙ্গে তোমাকে সহানুভূতিসম্পন্ন হ'তে হবে, তারপর একেবারে উচ্চতম অদ্বৈতভাবে লাফিয়ে যেতে হবে। নিজে সম্পূর্ণ মুক্ত অবস্থা লাভ ক'রে তারপর ইচ্ছা করলে নিজেকে আবার সীমাবদ্ধ করতে পারো। প্রত্যেক কাজে নিজের সমুদয় শক্তি প্রয়োগ কর। খানিকক্ষণের জন্য অদ্বৈতভাব ভুলে দ্বৈতবাদী হবার শক্তিলাভ করতে হবে, আবার যখন খুশী যেন ঐ অদ্বৈতভাব আশ্রয় করতে পারা যায়।

*　　*　　*

কার্য-কারণ সব মায়া, আর আমরা যত বড় হবো, ততই বুঝব যে, ছোট ছেলেদের পরীর গল্প এখন যেমন আমদের কাছে বোধ হয়, তেমনি যা কিছু আমরা দেখছি, সবই ঐরূপ অসংবদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে কার্য-কারণ ব'লে কিছু নেই, আর আমরা কালে তা জানতে পারব। সুতরাং যদি পার তো যখন কোন রূপক গল্প শুনবে, তখন তোমার বুদ্ধিবৃত্তিকে একটু নামিয়ে এনো, মনে মনে ঐ গল্পের পূর্বাপর সঙ্গতির বিষয়ে প্রশ্ন তুলো না। হৃদয়ে রূপক-বর্ণনা ও সুন্দর কবিত্বের প্রতি অনুরাগের বিকাশ কর, তারপর সমুদয় পৌরাণিক বর্ণনাগুলিকে কবিত্ব মনে ক'রে উপভোগ কর। পুরাণ-চর্চার সময় ইতিহাস

১ তুলনীয়: পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল।
... ...
দুঁহু মন মনোভব পেশল জানি।—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা

ও যুক্তিবিচারের দৃষ্টি নিয়ে এসো না। ঐ-সব পৌরাণিক ভাবগুলি তোমার মনের ভিতর দিয়ে প্রবাহাকারে চলে যাক। তোমার চোখের সামনে তাকে মশালের মতো ঘোরাও, কে মশালটা ধরে রয়েছে—এ প্রশ্ন ক'রো না, তা হলেই একটা আলোকের চক্র দেখতে পাবে, এতে যে সত্যের কণা অন্তর্নিহিত রয়েছে, তা তোমার মনে থেকে যাবে।

পুরাণ-লেখকেরা সকলেই, তাঁরা যা যা দেখেছিলেন বা শুনেছিলেন, সেইগুলি রূপকভাবে লিখে গেছেন। তাঁরা কতকগুলি প্রবাহাকার-চিত্র এঁকে গেছেন। তাঁর ভিতর থেকে কেবল তার প্রতিপাদ্য বিষয়টা বার করবার চেষ্টা ক'রে ছবিগুলিকে নষ্ট ক'রে ফেলো না। সেগুলিকে যথাযথ গ্রহণ কর, সেগুলি তোমার উপর কাজ করুক। এদের ফলাফল দেখে বিচার কর—তাদের মধ্যে যেটুকু ভাল আছে সেটুকুই নাও।

* * *

তোমার নিজের ইচ্ছাশক্তিই তোমার প্রার্থনায় উত্তর দিয়ে থাকে—তবে বিভিন্ন ব্যক্তির মনের ধর্মসম্বন্ধীয় বিভিন্ন ধারণা অনুসারে সেটা বিভিন্ন আকারে প্রকাশ পায়। আমরা তাকে বুদ্ধ, যীশু, জিহোবা, আল্লা বা অগ্নি, যেমন ইচ্ছা নাম দিতে পারি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই হচ্ছে আমাদের 'আমি' বা আত্মা।

* * *

আমাদের ধারণার ক্রমে উৎকর্ষ হ'তে থাকে, কিন্তু ঐ ধারণা যে-সকল রূপকাকারে আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়, তাদের কোন ঐতিহাসিক মূল্য নেই। আমাদের অলৌকিক দর্শনসমূহ অপেক্ষা মুশার অলৌকিক দর্শনে ভুলের সম্ভাবনা অধিক, কারণ আমাদের অধিকতর জ্ঞান এবং মিথ্যা ভ্রম দ্বারা প্রতারিত হবার সম্ভাবনা আমাদের অনেক কম।

যতদিন না আমাদের হৃদয়রূপ শাস্ত্র খুলছে, ততদিন শাস্ত্রপাঠ বৃথা। তখন ঐ শাস্ত্রগুলি আমাদের হৃদয়শাস্ত্রের সঙ্গে যতটা মেলে, ততটাই তাদের সার্থকতা। শক্তি কি, তা শক্তিমান্ ব্যক্তিই বুঝতে পারে, হাতিই সিংহকে বুঝতে পারে, ইঁদুর কখন সিংহকে বুঝতে পারে না। আমরা যতদিন না যীশুর সমান হচ্ছি, ততদিন আমরা কেমন ক'রে যীশুকে বুঝব? দুখানা পাউরুটিতে ৫০০০ লোক খাওয়ানো, অথবা ৫ খানা পাউরুটিতে দুজন লোক

খাওয়ানো—এই দুই-ই মায়ার স্বপ্নরাজ্যে। এদের মধ্যে কোনটাই সত্য নয়, সুতরাং এই দুটোর কোনটাই অপরটির দ্বারা বাধিত হয় না। মহত্ত্বই কেবল মহত্ত্বের আদর করতে পারে, ঈশ্বরই ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে পারেন। স্বপ্ন সেই স্বপ্নদ্রষ্টাই—তা ছাড়া আর কিছু নয়, তার অন্য কোন ভিত্তি নেই। ঐ স্বপ্ন ও স্বপ্নদ্রষ্টা পৃথক বস্তু নয়। সমগ্র সঙ্গীতটার ভিতর 'সোঽহম্, সোঽহম্' এই এক সুর বাজছে, অন্যান্য সুরগুলি তারই ওলটপালট মাত্র, সুতরাং তাতে মূল সুরের—মূল তত্ত্বের কিছু এসে যায় না। জীবন্ত শাস্ত্র আমরাই, আমরা যে-সব কথা বলেছি, সেগুলিই শাস্ত্র ব'লে পরিচিত। সবই জীবন্ত ঈশ্বর, জীবন্ত খ্রীষ্ট—ঐভাবে সব দর্শন কর। মানুষকে অধ্যয়ন কর, মানুষই জীবন্ত কাব্য। জগতে এ পর্যন্ত যত বাইবেল, খ্রীষ্ট বা বুদ্ধ হয়েছেন, সব আমাদেরই আলোকে আলোকিত। এই আলোক ব্যতীত ঐগুলি আমাদের পক্ষে আর জীবন্ত থাকবে না, মৃত হয়ে যাবে। তোমার নিজ আত্মার উপর দাঁড়াও।

মৃতদেহের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহারই কর না, তাতে সে ক্ষুব্ধ হয় না। আমাদের দেহকে ঐরূপ মৃতবৎ ক'রে ফেলতে হবে, আর দেহের সঙ্গে যে আমাদের অভিন্ন ভাব রয়েছে, সেটা দূর ক'রে ফেলতে হবে।

শনিবার, ৩রা অগস্ট

যে-সকল ব্যক্তি এই জন্মেই মুক্তিলাভ করতে চায়, তাদের এক জন্মেই হাজার বছরের জীবন যাপন করতে হয়। তারা যে যুগে জন্মেছে, সেই যুগের ভাবের চেয়ে তাদের অনেক এগিয়ে যেতে হয়; কিন্তু সাধারণ লোক কোন-রকমে হামাগুড়ি দিয়ে অগ্রসর হ'তে পারে। খ্রীষ্ট ও বুদ্ধগণের উৎপত্তি এইরূপেই।

* * *

একদা এক হিন্দু রানী ছিলেন, তাঁর ছেলেরা এই জন্মেই মুক্তিলাভ করুক—এ বিষয়ে তাঁর এত আগ্রহ হয়েছিল যে, তিনি নিজেই তাদের লালন-পালনের সম্পূর্ণ ভার নিয়েছিলেন। তাঁদের শৈশবে যখন তিনি তাদের দোল দিয়ে দিয়ে ঘুম পাড়াতেন, তখন সর্বদা তাদের কাছে এই একটি গান গাইতেন—'তত্ত্বমসি, তত্ত্বমসি'—তুমি সেই আত্মা, তুমি সেই ব্রহ্ম। তাদের তিনজন

সন্ন্যাসী হ'য়ে গেল, কিন্তু চতুর্থ পুত্রকে রাজা করবার জন্য অন্যত্র নিয়ে গিয়ে মানুষ করা হ'তে লাগলো। বিদায় দেবার সময় মা তাকে এক টুকরা কাগজ দিয়ে বললেন, 'বড় হ'লে প'ড়ো এতে কি লেখা আছে।' সেই কাগজখানাতে লেখা ছিল—'ব্রহ্ম সত্য, আর সব মিথ্যা। আত্মা কখন মরেন না, কখন মারেনও না। নিঃসঙ্গ হও, অথবা সৎসঙ্গে বাস কর।' যখন রাজপুত্র বড় হ'য়ে লেখাটি পড়লেন, তিনিও তখনই সংসারত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন।

ত্যাগ কর, সংসার ত্যাগ কর। আমরা এখন যেন একপাল কুকুর— রান্নাঘরে ঢুকে পড়েছি, এক টুকরা মাংস খাচ্ছি, আর ভয়ে এদিক ওদিক চেয়ে দেখছি, পাছে কেউ এসে আমাদের তাড়িয়ে দেয়। তা না হয়ে রাজার মতো হও—জেনো যে, সমুদয় জগৎ তোমার। যতক্ষণ না তুমি সংসার ত্যাগ ক'রছ, যতক্ষণ সংসার তোমায় বাঁধতে থাকবে; ততক্ষণ ঐ ভাবটি তোমার আসতেই পারে না। যদি বাইরে ত্যাগ করতে না পারো, মনে মনে সব ত্যাগ কর। অন্তরের অন্তর থেকে সব ত্যাগ কর। বৈরাগ্যসম্পন্ন হও। এই হ'ল যথার্থ আত্মত্যাগ—এ না হ'লে ধর্মলাভ অসম্ভব। কোন প্রকার বাসনা ক'রো না; কারণ যা বাসনা করবে তাই পাবে। আর সেইটাই তোমার ভয়ানক বন্ধনের কারণ হবে, যেমন সেই গল্পে আছে—এক ব্যক্তি তিনটি বর লাভ করেছিল এবং তার ফলে তার সর্বাঙ্গে নাক[১] হয়েছিল, বাসনা করলে ঠিক সেই রকম হয়। যতক্ষণ না আমরা আত্মরত ও আত্মতৃপ্ত হচ্ছি, ততক্ষণ মুক্তিলাভ করতে পারছি না। 'আত্মাই আত্মার মুক্তিদাতা, অন্য কেউ নয়।'

[১] এই : একজন গরীব লোক এক দেবতার কাছে বর পেয়েছিল। দেবতা সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'তুমি এই পাশা নাও। এই পাশা নিয়ে যে-যে কামনা ক'রে তিনবার ফেলবে, সেই তিনটি কামনাই তোমার পূর্ণ হবে।' সে অমনি আহ্লাদে আটখানা হয়ে বাড়ি গিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগল—কি বর চাওয়া যায়। স্ত্রী বললে, 'ধনদৌলত চাও।' কিন্তু স্বামী বললে, 'দেখ, আমাদের দুজনেরই নাক খাঁদা, তাই দেখে লোকে আমাদের বড় ঠাট্টা করে, অতএব প্রথমবার পাশা ফেলে সুন্দর নাক প্রার্থনা করা যাক। টাকায় তো আর শরীরের কুরূপ দূর হয় না।' স্ত্রীর মত কিন্তু প্রথমে টাকা হোক। শেষে দুজনে পাশা নিয়ে কাড়াকাড়ি বাধল। অবশেষে স্বামী রেগে গিয়ে এই বলে পাশা ফেললে—'আমাদের কেবল সুন্দর নাক হোক, নাক—আর কিছুই চাই না।' আশ্চর্য, যেমন পাশা ফেলা অমনি তাদের সর্বাঙ্গে রাশি রাশি সুন্দর সুন্দর নাক হ'ল। তখন তারা দেখলে এ কি বিপদ হ'ল। তখন দ্বিতীয়বার পাশা ফেলে বললে, 'নাক চলে যাক।' অমনি সব নাক চলে গেল—সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিজেদের খাঁদা নাকও চলে গেল। দুটি বর তো হয়ে গেছে, এখন বাকি আছে তৃতীয় বর। তখন তারা ভাবলে—যদি এইবার পাশা ফেলে ভাল নাক পাই, লোকে

এইটি অনুভব করতে শিক্ষা কর যে, তুমি অন্য সকলের দেহেও বর্তমান —এইটি জানবার চেষ্টা কর যে, আমরা সকলেই এক। আর সব বাজে জিনিস ছেড়ে দাও। ভাল মন্দ কাজ যা করেছ, সেগুলি সম্বন্ধে একদম ভেবো না—সেগুলি থু থু ক'রে উড়িয়ে দাও। যা করেছ, করেছ। কুসংস্কার দূর ক'রে দাও। সম্মুখে মৃত্যু এলেও দুর্বলতা আশ্রয় ক'রো না।

অনুতাপ ক'রো না—পূর্বে যে-সব কাজ করেছ, সে-সব নিয়ে মাথা ঘামিও না; এমন কি—যে-সব ভাল কাজ করেছ, তাও স্মৃতিপথ থেকে দূর ক'রে দাও। আজাদ (মুক্ত) হও। দুর্বল, কাপুরুষ ও অজ্ঞ ব্যক্তিরা কখনও আত্মাকে লাভ করতে পারে না। তুমি কোন কর্মের ফলকে নষ্ট করতে পার না—ফল আসবেই আসবে; সুতরাং সাহসী হয়ে তার সম্মুখীন হও, কিন্তু সাবধান, যেন পুনর্বার সেই কাজ ক'রো না। সকল কর্মের ভার ভগবানের উপর ফেলে দাও, ভাল-মন্দ—সব দাও। নিজে ভালটা রেখে কেবল মন্দটা তাঁর ঘাড়ে চাপিও না। যে নিজেকে নিজে সাহায্য করে, ভগবান্ তাকেই সাহায্য করেন।

* * *

বাসনা-মদিরা পান ক'রে সমস্ত জগৎ মত্ত হয়েছে। 'যেমন দিবা ও রাত্রি কখন একসঙ্গে থাকতে পারে না, সেইরূপ বাসনা ও ভগবান্ দুই কখন একসঙ্গে থাকতে পারে না।'[১] সুতরাং বাসনা ত্যাগ কর।

* * *

'খাবার, খাবার' ব'লে চেঁচানো এবং খাওয়া, 'জল, জল' বলে চেঁচানো এবং জল পান করা—এই দুটোর ভিতর আকাশ-পাতাল তফাত; সুতরাং কেবল 'ঈশ্বর, ঈশ্বর' ব'লে চেঁচালে কখনও ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির আশা করতে পারা যায় না। আমাদের ঈশ্বরলাভ করবার চেষ্টা ও সাধন করতে হবে।

অবশ্য আমাদের খাঁদা নাকের বদলে ভাল নাক হবার কারণ জিজ্ঞাসা করবে—তাদের অবশ্য সব কথা বলতে হবে। তখন তারা আমাদের আহাম্মক ব'লে এখনকার চেয়ে বেশী ঠাট্টা করবে; বলবে যে, এরা এমন তিনটি বর পেয়েও নিজেদের অবস্থার উন্নতি করতে পারলে না। কাজেই তৃতীয়বার পাশা ফেলে তারা তাদের পুরাতন খাঁদা নাকই ফিরিয়ে নিলে। গল্পটিতে বোঝা গেল: কিছু বাসনা ক'রো না; যা চাইবে, তা পাবে; সঙ্গে সঙ্গে দারুণ বন্ধনে বাঁধা পড়বে।

১ 'জহাঁ রাম তহাঁ কাম নহীঁ, জহাঁ কাম তহাঁ নহীঁ রাম।
দুহুঁ একসাথ মিলত নহীঁ, রব রজনী এক ঠাম॥'—তুলসীদাস

সমুদ্রের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেলেই তরঙ্গ অসীমত্ব লাভ করতে পারে, কিন্তু তরঙ্গরূপে নয়। তারপর সমুদ্রস্বরূপ হয়ে গিয়ে আবার তরঙ্গাকার ধারণ করতে পারে ও যত বড় ইচ্ছা তত বড় তরঙ্গ হ'তে পারে। নিজেকে তরঙ্গপ্রবাহ ব'লে মনে ক'রো না; জেনো যে তুমি মুক্ত।

প্রকৃত দর্শনশাস্ত্র হচ্ছে কতকগুলি প্রত্যক্ষানুভূতিকে প্রণালীবদ্ধ করা। যেখানে বুদ্ধিবিচারের শেষ, সেইখানেই ধর্মের আরম্ভ। সমাধি বা ঈশ্বর-ভাবাবেশ যুক্তিবিচারের চেয়ে ঢের বড়, কিন্তু ঐ অবস্থায় উপলব্ধ সত্যগুলি কখনও যুক্তিবিচারের বিরোধী হবে না। যুক্তিবিচার মোটা হাতিয়ারের মতো, তা দিয়ে শ্রমসাধ্য কাজগুলি করতে পারা যায়, আর সমাধি বা ঈশ্বর-ভাবাবেশ (inspiration) উজ্জ্বল আলোকের মতো সমগ্র সত্য দেখিয়ে দেয়। কিন্তু আমাদের ভিতর একটা কিছু করবার ইচ্ছা বা প্রেরণা আসাকেই ঈশ্বরভাবাবেশ (inspiration) বলতে পারা যায় না।

* * *

মায়ার ভিতর উন্নতি করা বা অগ্রসর হওয়াকে একটি বৃত্ত ব'লে বর্ণনা করা যেতে পারে—এতে এই হয় যে, যেখান থেকে তুমি যাত্রা করেছিলে, ঠিক সেইখানে এসে পৌছবে। তবে প্রভেদ এই যে, যাত্রা করবার সময় তুমি অজ্ঞান ছিলে, আর যখন সেখানে ফিরে আসবে, তখন তুমি পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেছ। ঈশ্বরোপাসনা, সাধু-মহাপুরুষদের পূজা, একাগ্রতা, ধ্যান, নিষ্কাম কর্ম—মায়ার জাল কেটে বেরিয়ে আসবার এই-সব উপায়; তবে প্রথমেই আমাদের তীব্র মুমুক্ষুত্ব থাকা চাই। যে জ্যোতিঃ দপ্‌ ক'রে প্রকাশ হয়ে আমাদের হৃদয়ান্ধকার দূর ক'রে দেবে, তা আমাদের ভিতরেই রয়েছে—এ হচ্ছে সেই জ্ঞান, যা আমাদের স্বভাব বা স্বরূপ (ঐ জ্ঞানকে আমাদের 'জন্মগত অধিকার' বলা যেতে পারে না, কারণ প্রকৃতপক্ষে আমাদের জন্মই নেই)। কেবল যে মেঘগুলো ঐ জ্ঞানসূর্যকে ঢেকে রেখেছে, সেইগুলো আমাদের দূর ক'রে দিতে হবে।

ইহলোকে বা স্বর্গে সর্বপ্রকার ভোগ করবার বাসনা ত্যাগ কর (ইহামুত্র-ফলভোগ-বিরাগ)। ইন্দ্রিয় ও মনকে সংযত কর (দম ও শম)। সর্ব-প্রকার দুঃখ সহ্য কর, মন যেন জানতেই না পারে যে, তোমার কোনরূপ দুঃখ এসেছে (তিতিক্ষা)। মুক্তি ছাড়া আর সব ভাবনা দূর ক'রে দাও, গুরু

ও তাঁর উপদেশে বিশ্বাস রাখো। তুমি যে নিশ্চয়ই মুক্ত হ'তে পারবে, এটিও বিশ্বাস কর (শ্রদ্ধা)। যাই হোক না কেন, সর্বদা বলো 'সোঽহম্, সোঽহম্'। খেতে বেড়াতে, কষ্টে পড়েও বলো 'সোঽহম্, সোঽহম্'; মনকে অবিরত ভাবে বলো—এই যে জগৎপ্রপঞ্চ দেখছি, কোন কালে এর অস্তিত্ব নেই, কেবল আমি মাত্র আছি (সমাধান)। দেখবে—একদিন দপ্ ক'রে জ্ঞানের প্রকাশ হ'য়ে বোধ হবে—জগৎ শূন্যমাত্র, কেবল ব্রহ্মই আছেন। মুক্ত হবার জন্য প্রবল ইচ্ছাসম্পন্ন হও (মুমুক্ষুত্ব)।[১]

আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধব সব পুরানো অন্ধকূপের মতো; আমরা ঐ অন্ধকূপে পড়ে কর্তব্য, বন্ধন প্রভৃতি নানা স্বপ্ন দেখে থাকি—ঐ স্বপ্নের আর শেষ নেই। কাউকে সাহায্য করতে গিয়ে আর ভ্রমের সৃষ্টি ক'রো না। এ যেন বটগাছের মতো ক্রমাগত ঝুরি নামিয়ে বাড়তেই থাকে। যদি তুমি দ্বৈতবাদী হও, তবে ঈশ্বরকে সাহায্য করতে যাওয়াই তোমার মূর্খতা। আর যদি অদ্বৈতবাদী হও, তবে তুমি তো স্বয়ংই ব্রহ্মস্বরূপ—তোমার আবার কর্তব্য কি? তোমার স্বামী, ছেলেপুলে, বন্ধুবান্ধব—কারও প্রতি কিছু কর্তব্য নেই।[২] যা হচ্ছে হয়ে যাক, চুপচাপ ক'রে পড়ে থাকো।

"রামপ্রসাদ বলে ভব-সাগরে বসে আছি ভাসিয়ে ভেলা;
যখন আসবে জোয়ার উজিয়ে যাব, ভাটিয়ে যাব ভাটার বেলা॥"

শরীর মরে মরুক—আমার যে একটা দেহ আছে, এটা তো একটা পুরানো উপকথা বই আর কিছুই নয়। চুপচাপ ক'রে থাকো, আর জানো, আমি ব্রহ্ম।

কেবল বর্তমান কালই বিদ্যমান—আমরা চিন্তায় পর্যন্ত অতীত ও ভবিষ্যতের ধারণা করতে পারি না; কারণ চিন্তা করতে গেলেই তাকে বর্তমান ক'রে ফেলতে হয়। সব ছেড়ে দাও, তার যেখানে যাবার ভেসে যাক। এই সমগ্র জগৎটাই একটা ভ্রমমাত্র; এটা যেন তোমায় আর প্রতারিত করতে না পারে। জগৎটা যা নয়, তুমি তাকে তাই ব'লে জেনেছ, অবস্তুতে

---

১ সাধন-চতুষ্টয়ের সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত

২ অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক স্তর হইতে স্বামীজী এই কথা বলিতেছেন, এই অবস্থা শরীর ও অহংবোধকে অতিক্রম করিয়া। যে এত উচ্চে উঠে নাই, সাধনার জন্যই তাহার কর্তব্য প্রয়োজন। যে শরীর ও অহংকারের অধীন নয়, সেই কর্তব্যের ঊর্ধ্বে।

বস্তু জ্ঞান করেছ, এখন এটা বাস্তবিক যা, একে তাই ব'লে জানো। যদি দেহটা কোথাও ভেসে যায়, যেতে দাও; দেহ যেখানেই যাক না কেন, কিছু গ্রাহ্য ক'রো না। কর্তব্যের নিদারুণ ধারণা ভীষণ কালকূট-স্বরূপ, জগৎ ধ্বংস ক'রে ফেলছে।

স্বর্গে গেলে একটা বীণা পাবে, আর তাই বাজিয়ে যথাসময়ে বিশ্রাম-সুখ অনুভব করবে—এর জন্য অপেক্ষা ক'রো না। এইখানেই একটা বীণা নিয়ে আরম্ভ ক'রে দাও না কেন? স্বর্গে যাবার জন্য অপেক্ষা করা কেন? ইহলোকটাকেই স্বর্গ ক'রে ফেলো। স্বর্গে বিবাহ করা নেই, বিবাহ দেওয়াও নেই—তাই যদি হয়, এখনই তা আরম্ভ ক'রে দাও না কেন? এইখানেই বিবাহ তুলে দাও না কেন? সন্ন্যাসীর গৈরিক বসন মুক্তপুরুষের চিহ্ন। সংসারিত্বরূপ ভিক্ষুকের বেশ ফেলে দাও। মুক্তির পতাকা—গৈরিক বস্ত্র ধারণ কর।

রবিবার, ৪ঠা অগস্ট

'অজ্ঞ ব্যক্তিরা যাঁকে না জেনে উপাসনা করছে, আমি তোমার নিকট তাঁরই কথা প্রচার করছি।'

এই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই সকল জ্ঞাত বস্তুর চেয়ে আমাদের অধিক জ্ঞাত। তিনিই সেই এক বস্তু, যাঁকে আমরা সর্বত্র দেখছি। সকলেই তাদের নিজ আত্মাকে জানে; সকলেই—এমন কি পশুরা পর্যন্ত জানে যে 'আমি আছি'। আমরা যা কিছু জানি, সব আত্মারই বহিঃক্ষেপ বিস্তার-স্বরূপ। ছোট ছোট ছেলেদের শেখাও, তারাও এ তত্ত্ব ধারণা করতে পারে। অজ্ঞাতসারে হলেও প্রত্যেক ধর্ম এই আত্মাকেই উপাসনা ক'রে এসেছে, কারণ আত্মা ছাড়া আর কিছু নেই।

আমরা এই জীবনটাকে এখানে যেমন ভাবে জানি, তার প্রতি এরূপ অশোভন আসক্তি সমুদয় অনিষ্টের মূল। এই থেকেই যত সব প্রতারণা চুরি হ'য়ে থাকে। এরই জন্য লোকে টাকাকে দেবতার আসন দেয়, আর তা থেকেই যত পাপ ও ভয়ের উৎপত্তি। কোন জড়বস্তুকে মূল্যবান্ ব'লে মনে ক'রো না, আর তাতে আসক্ত হ'য়ো না। তুমি যদি কিছুতে, এমন কি জীবনে পর্যন্ত আসক্ত না হও, তা হ'লে আর কোন ভয় থাকবে না। 'মৃত্যোঃ স'

মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি'[১]—যিনি এই জগতে নানা দেখেন, তিনি মৃত্যুর পর মৃত্যুকে প্রাপ্ত হন, বারবার তিনি মৃত্যুর কবলে পড়েন। আমরা যখন সবই এক দেখি, তখন আমাদের শারীরিক মৃত্যুও থাকে না, মানসিক মৃত্যুও থাকে না। জগতের সকল দেহই আমার, সুতরাং আমার দেহ চিরকাল থাকবে; কারণ গাছপালা, জীবজন্তু, চন্দ্রসূর্য, এমন কি সমগ্র জগদ্ব্রহ্মাণ্ডই আমার দেহ—ঐ দেহের আর নাশ হবে কি ক'রে? প্রত্যেক মন, প্রত্যেক চিন্তাই যে আমার—তবে মৃত্যু আসবে কি ক'রে? আত্মা কখন জন্মানও না, মরেনও না—যখন আমরা এইটি প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করি, তখন সকল সন্দেহ উড়ে যায়; 'আমি আছি,' 'আমি অনুভব করি,' 'আমি ভালবাসি'—'অস্তি, ভাতি, প্রিয়'—এগুলির উপর কখনই সন্দেহ করা যেতে পারে না। আমার ক্ষুধা ব'লে কিছু থাকতে পারে না, কারণ জগতে যে-কেউ যা-কিছু খাচ্ছে, তা আমিই খাচ্ছি। যদি একগাছা চুল উঠে যায়, আমরা মনে করি না যে আমরা মরে গেলাম। সেই রকম যদি একটা দেহের মৃত্যু হয়, সে তো ঐ একগাছা চুল উঠে যাওয়ারই মতো।

* * *

সেই জ্ঞানাতীত বস্তুই ঈশ্বর—তিনি বাক্যের অতীত, চিন্তার অতীত, জ্ঞানের অতীত।...তিনটে অবস্থা আছে—পশুত্ব (তমঃ), মনুষ্যত্ব (রজঃ) ও দেবত্ব (সত্ত্ব)। যাঁরা সর্বোচ্চ অবস্থা লাভ করেন, তাঁরা অস্তিমাত্র বা সৎস্বরূপ হ'য়ে থাকেন। তাঁদের পক্ষে কর্তব্য একেবারে শেষ হয়ে যায়, তাঁরা কেবল মানুষকে ভালবাসেন, আর চুম্বকের মতো অপরকে তাঁদের দিকে আকর্ষণ করেন। এরই নাম মুক্তি। তখন আর চেষ্টা ক'রে কোন সৎকার্য করতে হয় না, তখন তুমি যে কাজ করবে তাই সৎকার্য হয়ে যাবে। ব্রহ্মবিৎ সকল দেবতার চেয়েও বড়। যীশুখ্রীষ্ট যখন মোহকে জয় ক'রে বলেছিলেন, 'শয়তান, আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যা', তখনই দেবতারা তাঁকে পূজা করতে এসেছিলেন। ব্রহ্মবিৎকে কেউ কিছু সাহায্য করতে পারে না, সমগ্র জগৎ-প্রপঞ্চ তাঁর সামনে প্রণত হয়ে থাকে, তাঁর সকল বাসনাই পূর্ণ হয়, তাঁর আত্মা অপরকে পবিত্র ক'রে থাকে। অতএব যদি ঈশ্বরলাভের কামনা কর, তবে ব্রহ্মবিদের পূজা কর। যখন আমরা তিনটি দেবানুগ্রহ—মনুষ্যত্ব,

১ কঠ উপ., ২।১।১০

মুমুক্ষুত্ব ও মহাপুরুষসংশ্রয় লাভ করি, তখনই বুঝতে হবে মুক্তি আমাদের করতলগত।'[১]

*   *   *

চিরকালের জন্য দেহের মৃত্যুর নামই নির্বাণ। এটা নির্বাণ-তত্ত্বের 'না'-এর দিক, এতে বলে—আমি এটা নই, ওটা নই। বেদান্ত আর একটু অগ্রসর হয়ে 'হাঁ'-এর দিকটা বলেন—ওরই নাম মুক্তি। 'আমি সৎ-চিৎ-আনন্দ, সোঽহম্—আমিই সেই'—এই হ'ল বেদান্ত—নিখুঁতভাবে তৈরী একটি খিলানের যেন শীর্ষপ্রস্তর।

বৌদ্ধধর্মের মহাযান সম্প্রদায়ের বেশীর ভাগ লোকই মুক্তিতে বিশ্বাসী—তারা যথার্থই বৈদান্তিক। কেবল সিংহলবাসীরাই নির্বাণের 'বিনাশ' অর্থ গ্রহণ করে।

কোনরূপ বিশ্বাস বা অবিশ্বাস 'আমি'কে নাশ করতে পারে না। যার অস্তিত্ব বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে এবং অবিশ্বাসে উড়ে যায়, তা ভ্রমমাত্র। আত্মাকে কিছুই স্পর্শ করতে পারে না। 'আমি আমার আত্মাকে নমস্কার করি।' 'স্বয়ংজ্যোতিঃ আমি নিজেকেই নমস্কার করি, আমি ব্রহ্ম।' এই দেহটা যেন একটা অন্ধকার ঘর; আমরা যখন ঐ ঘরে প্রবেশ করি, তখনই তা আলোকিত হয়ে ওঠে, তখনই তা জীবন্ত হয়। আত্মার এই স্বপ্রকাশ জ্যোতিকে কিছুই স্পর্শ করতে পারে না, একে কোনমতেই নষ্ট করা যায় না। একে আবৃত করা যেতে পারে, কিন্তু কখনও নষ্ট করা যায় না।

*   *   *

বর্তমান যুগে ভগবান্‌কে অনন্তশক্তিস্বরূপিণী জননীরূপে উপাসনা করা কর্তব্য। এতে পবিত্রতার উদয় হবে, আর এই মাতৃপূজায় আমেরিকার মহাশক্তির বিকাশ হবে। এখানে (আমেরিকায়) কোন মন্দির (পৌরোহিত্য-শক্তি) কাউকে দাবিয়ে রাখছে না, অপেক্ষাকৃত গরীব দেশগুলোর মতো এখানে কেউ কষ্টভোগ করে না। নারীজাতি শত শত যুগ ধরে দুঃখকষ্ট সহ্য করেছে, তাই তাদের ভিতর অসীম ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের বিকাশ হয়েছে। তারা একটা ভাব আঁকড়ে ধরে থাকে, সহজে ছাড়তে চায় না। এই জন্যই

১ বিবেকচূড়ামণি, ৩

সকল দেশে তারা এমন কি কুসংস্কারপূর্ণ ধর্মসমূহের এবং পুরোহিতদের পৃষ্ঠ-পোষকস্বরূপ হয়ে থাকে, আর এইটেই পরে তাদের স্বাধীনতার কারণ হবে। বৈদান্তিক হয়ে আমাদের বেদান্তের এই মহান্ ভাবকে জীবনে পরিণত করতে হবে। জনসাধারণকেও ঐ ভাব দিতে হবে—এটা কেবল স্বাধীন আমেরিকাতেই কাজে পরিণত করা যেতে পারে। ভারতে বুদ্ধ, শঙ্কর ও অন্যান্য মহামনীষী ব্যক্তিরা এই-সকল ভাব প্রচার করেছিলেন, কিন্তু জন-সাধারণ সেগুলি ধরে রাখতে পারেনি। এই নূতন যুগে জনসাধারণ বেদান্তের আদর্শানুযায়ী জীবনযাপন করবে, আর মেয়েদের দ্বারাই এটা কাজে পরিণত হবে।

"যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে,
মন, তুমি দেখ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে।
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, আয় মন বিরলে দেখি,
রসনারে সঙ্গে রাখি, সে যেন 'মা' ব'লে ডাকে। (মাঝে মাঝে)
কুবুদ্ধি কুমন্ত্রী যত, নিকট হ'তে দিয়ো নাকো,
জ্ঞান-নয়নে প্রহরী রেখো, সে যেন সাবধানে থাকে।"

যত কিছু প্রাণী জীবনধারণ করছে, তুমি সে-সকলের পারে। তুমি আমার জীবনের সুধাকরস্বরূপ, আমার আত্মারও আত্মা।

রবিবার, অপরাহ্ন

দেহ যেমন মনের হাতে একটা যন্ত্রবিশেষ, মনও তেমনি আত্মার হাতে একটা যন্ত্রস্বরূপ। জড় হচ্ছে বাইরের গতি, মন হচ্ছে ভিতরের গতি। কালেই সমুদয় পরিবর্তন বা পরিণামের আরম্ভ ও সমাপ্তি। আত্মা যদি অপরিণামী হন, তিনি নিশ্চিত পূর্ণস্বরূপ; আর যদি পূর্ণস্বরূপ হন, তবে তিনি অনন্তস্বরূপ; আর অনন্তস্বরূপ হ'লে অবশ্যই তিনি অদ্বিতীয়; কারণ দুটি অনন্ত আর থাকতে পারে না, সুতরাং আত্মা 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'ই হ'তে পারেন। যদিও আত্মাকে বহু ব'লে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি এক। যদি কোন ব্যক্তি সূর্যের অভিমুখে চলতে থাকে, প্রতি পদক্ষেপে সে এক একটা বিভিন্ন সূর্য দেখবে বটে, কিন্তু বস্তুতঃ সবগুলি তো সেই একই সূর্য।

'অস্তিভাবই' হচ্ছে সর্বপ্রকার একত্বের ভিত্তিস্বরূপ; আর ঐ ভিত্তিতে যেতে পারলেই পূর্ণতা লাভ হয়। যদি সব রঙকে এক রঙে পরিণত করা সম্ভব হ'ত, তবে চিত্রবিদ্যাই লোপ পেয়ে যেত। সম্পূর্ণ একত্ব হচ্ছে বিশ্রাম বা লয়; আমরা ব'লে থাকি—সকল প্রকাশই এক ঈশ্বর থেকে হয়েছে। তাও-বাদী[১], কংফুছ (Confucius)-মতাবলম্বী, বৌদ্ধ, হিন্দু, য়াহুদী, মুসলমান, খ্রীষ্টান ও জরতুষ্ট্র-শিষ্যগণ (Zoroastrians) সকলেই প্রায় একপ্রকার ভাষায় এই মহৎ নীতি প্রচার করছেন, 'তুমি অপরের কাছ থেকে যেরূপ ব্যবহার চাও, অপরের প্রতি ঠিক সেইরূপ ব্যবহার কর'—কিন্তু হিন্দুরাই কেবল এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন; কারণ তাঁরা এর যুক্তি দেখতে পেয়েছিলেন। মানুষ অপর সকলকেই অবশ্য ভালবাসবে; কারণ সেই অপর সকলে যে সে নিজে, সেই এক বস্তুই রয়েছেন কিনা।

জগতে যত বড় বড় ধর্মাচার্য হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কেবল লাওৎসে বুদ্ধ ও যীশুই উক্ত নীতিরও উপরে গিয়ে শিক্ষা দিয়ে গেছেন—'তোমার শত্রুদেরও উপকার কর, যারা তোমায় ঘৃণা করে, তাদেরও ভালবাসো।'

তত্ত্বসমূহ পূর্ব থেকেই রয়েছে; সেগুলি আমরা সৃষ্টি করি না, আবিষ্কার করি মাত্র। ধর্ম কেবল প্রত্যক্ষানুভূতি। বিভিন্ন মতামত—প্রণালী মাত্র, ওগুলি ধর্ম নয়। জগতের যত ধর্ম, সব বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন প্রয়োজন-অনুযায়ী ধর্মেরই বিভিন্ন প্রয়োগমাত্র। শুধু মতবাদ কেবল বিরোধ বাধিয়ে দেয়; দেখ না, কোথায় ঈশ্বরের নামে লোকের শান্তি হবে—তা না হয়ে জগতে যত রক্তপাত হয়েছে, তার অর্ধেক ঈশ্বরের নাম নিয়ে হয়েছে। একেবারে মূলে যাও; স্বয়ং ঈশ্বরকেই জিজ্ঞাসা কর—তাঁর স্বরূপ কি? যদি তিনি কোন উত্তর না দেন, বুঝতে হবে তিনি নেই। কিন্তু জগতের সকল ধর্মই বলে যে, তিনি উত্তর দিয়ে থাকেন।

তোমার নিজের যেন কিছু বলবার থাকে, তা না হ'লে অপরে কি বলেছে, তার কোনরূপ ধারণা করতে পারবে কেন? পুরাতন কুসংস্কার নিয়ে পড়ে থেকো না, সর্বদাই নূতন সত্যসমূহের জন্য প্রস্তুত হও। 'মূর্খ তারা, যারা তাদের পূর্বপুরুষদের খোঁড়া কুয়ার নোনতা জল খাবে, কিন্তু অপরের খোঁড়া

---

১ খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে চীনদেশে লাওৎজে-প্রবর্তিত ধর্মসম্প্রদায়। ইঁহাদের মত প্রায় বেদান্তের মতো। 'তাও'-এর ধারণা অনেকটা বেদান্তের নির্গুণ ব্রহ্মসদৃশ।

কুয়ার বিশুদ্ধ জল খাবে না।' আমরা যতক্ষণ না নিজেরা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করছি, ততক্ষণ তাঁর সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারি না। প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বভাবতঃ পূর্ণস্বরূপ। মহাপুরুষেরা তাঁদের এই পূর্ণ স্বরূপকে প্রকাশ করেছেন, আমাদের ভিতর এখনও ওটা অব্যক্তভাবে রয়েছে। আমরা কি ক'রে বুঝব যে, মুশা ঈশ্বর দর্শন করেছিলেন, যদি আমরাও তাঁকে দেখতে না পাই? যদি ঈশ্বর কখনও মুশার কাছে এসে থাকেন তো আমার কাছেও আসবেন। আমি একেবারে সোজাসুজি তাঁর কাছে যাব, তিনি যেন আমার সঙ্গে কথা কন। বিশ্বাসকে ভিত্তি ব'লে আমি গ্রহণ করতে পারি না—সেটা নাস্তিকতা ও ঘোর ঈশ্বরনিন্দা। যদি ঈশ্বর দু-হাজার বছর আগে আরবের মরুভূমিতে কোন ব্যক্তির সঙ্গে কথা ব'লে থাকেন, আজ আমার সঙ্গেও তিনি কথা কইতে পারেন। তা না হ'লে কি ক'রে জানব, তিনি মরে যাননি? যে কোন পথে হোক, ঈশ্বরের কাছে এস—কিন্তু আসা চাই। তবে আসবার সময় যেন কাউকে ঠেলে ফেলে দিও না।

জ্ঞানী ব্যক্তিরা অজ্ঞান ব্যক্তিদের করুণা করবেন। যিনি জ্ঞানী, তিনি একটা পিঁপড়ের জন্য পর্যন্ত নিজের দেহ ত্যাগ করতে ইচ্ছুক থাকেন, কারণ তিনি জানেন দেহটা কিছুই নয়।

সোমবার, ৫ই অগস্ট

প্রশ্ন এই: সর্বোচ্চ অবস্থা লাভ করতে গেলে কি সমুদয় নিম্নতর সোপান দিয়ে যেতে হবে, না একেবারে লাফিয়ে সেই অবস্থায় যাওয়া যেতে পারে? আধুনিক মার্কিন বালক আজ যে বিষয়টা পঁচিশ বছরে শিখে ফেলতে পারে, তার পূর্বপুরুষদের সে-বিষয় শিখতে এক-শ বছর লাগত। আধুনিক হিন্দু এখন বিশ বছরে সেই অবস্থায় আরোহণ করে, যে-অবস্থা লাভ করতে তার পূর্বপুরুষদের আটহাজার বছর লেগেছিল। শরীরের দৃষ্টি থেকে দেখলে দেখা যায়, গর্ভে ভ্রূণ সেই প্রাথমিক জীবাণুর (amœba) অবস্থা থেকে আরম্ভ ক'রে নানা অবস্থা অতিক্রম ক'রে শেষে মানুষরূপ ধারণ করে। এই হ'ল আধুনিক বিজ্ঞানের শিক্ষা। বেদান্ত আরও অগ্রসর হয়ে বলেন, আমাদের শুধু মানব-জাতির সমগ্র অতীত জীবনটা যাপন করলেই হবে না, সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যৎ জীবনটাও যাপন করতে হবে। যিনি

প্রথমটি করেন, তিনি শিক্ষিত ব্যক্তি; যিনি দ্বিতীয়টি করতে পারেন, তিনি 'জীবন্মুক্ত'।

কাল বা সময় কেবল আমাদের চিন্তার পরিমাপক মাত্র, আর চিন্তার গতি অভাবনীয়ভাবে দ্রুত। আমরা কত দ্রুত ভাবী জীবনটা যাপন করতে পারি, তার কোন সীমা নির্দেশ করা যেতে পারে না। সুতরাং মানবজাতির সমগ্র ভবিষ্যৎ জীবন নিজ জীবনে অনুভব করতে কতদিন লাগবে, তা নির্দিষ্ট ক'রে বলতে পারা যায় না। এক মুহূর্তে হ'তে পারে, কারও বা পঞ্চাশ জন্ম লাগতে পারে। এটা বাসনা বা ইচ্ছার তীব্রতার উপর নির্ভর করছে। সুতরাং শিষ্যের প্রয়োজন অনুযায়ী উপদেশও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হওয়া দরকার। জ্বলন্ত আগুন সকলের জন্যই রয়েছে—তাতে জল, এমন কি বরফের চাঙড় পর্যন্ত নিঃশেষ ক'রে দেয়। একরাশ ছট্‌রা দিয়ে বন্দুক ছোড়, অন্ততঃ একটাও লাগবে। লোককে একেবারে এক রাশ সত্য দিয়ে দাও, তারা তার মধ্যে যেটুকু নিজের উপযোগী তা নিয়ে নেবে। অতীত বহু জন্মের ফলে সংস্কার গঠিত হয়েছে, শিষ্যের প্রবণতা অনুযায়ী তাকে উপদেশ দাও। জ্ঞান, যোগ, ভক্তি ও কর্ম—এর মধ্যে যে-কোন একটি ভাবকে মূল ভিত্তি কর; কিন্তু অন্যান্য ভাবগুলিও সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা দাও। জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তি দিয়ে সামঞ্জস্য করতে হবে, যোগপ্রবণ প্রকৃতিকে যুক্তিবিচারের দ্বারা সামঞ্জস্য করতে হবে, আর কর্ম—তত্ত্বকে কাজে পরিণত করার সাধনা যেন সকল পথেরই অঙ্গস্বরূপ হয়। যে যেখানে আছে, তাকে সেইখান থেকে ঠেলে এগিয়ে দাও, ধর্মশিক্ষা যেন ধ্বংসমূলক না হয়ে সর্বদা গঠনমূলক হয়।

মানুষের প্রত্যেক প্রবৃত্তিই তার অতীতের কর্ম সমষ্টির পরিচায়ক। এটি যেন সেই রেখা বা ব্যাসার্ধ, যেটি ধ'রে মানুষকে চলতে হবে। সকল ব্যাসার্ধ অবলম্বন করেই কেন্দ্রে যাওয়া যায়। অপরের স্বাভাবিক প্রবণতা উলটে দেবার এতটুকু চেষ্টাও ক'রো না, তাতে গুরু এবং শিষ্য উভয়েই পেছিয়ে যায়। যখন তুমি 'জ্ঞান' শিক্ষা দিচ্ছ, তখন তোমাকে জ্ঞানী হ'তে হবে, আর শিষ্য যে-অবস্থায় রয়েছে, তোমাকে মনে মনে ঠিক সেইখানে যেতে হবে। অন্যান্য যোগেও এইরূপ। প্রত্যেকটি বৃত্তি এমন ভাবে বিকশিত করতে হবে যে; যেন সেটি ছাড়া আমাদের অন্য কোন বৃত্তিই নেই—এই হচ্ছে তথাকথিত সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নতিসাধনের যথার্থ রহস্য, অর্থাৎ গভীরতার সঙ্গে উদারতা অর্জন

কর, কিন্তু গভীরতা হারিয়ে উদারতা চেও না। আমরা অনন্তস্বরূপ; আমাদের মধ্যে কোন কিছুর ইতি করা যেতে পারে না। সুতরাং আমরা সবচেয়ে নিষ্ঠাবান্ মুসলমানের মতো গভীর, অথচ ঘোরতম নাস্তিকের মতো উদার-ভাবাপন্ন হ'তে পারি।

এটি কার্যে পরিণত করার উপায় হচ্ছে মনকে কোন বিষয়বিশেষে প্রয়োগ করা নয়, আদত মনটারই বিকাশ করা ও তাকে সংযত করা। তা হলেই তুমি তাকে যে দিকে ইচ্ছা ফেরাতে পারবে। এইরূপে তোমার গভীরতা ও উদারতা দুই-ই লাভ হবে। জ্ঞান এমনভাবে উপলব্ধি কর যে, জ্ঞানই যেন একমাত্র রয়েছে। তারপর ভক্তিযোগ, রাজযোগ, কর্মযোগ নিয়েও ঐ ভাবে সাধন কর। তরঙ্গ ছেড়ে দিয়ে সমুদ্রের দিকে যাও, তবেই তোমার ইচ্ছামত তরঙ্গ উৎপন্ন করতে পারবে। তোমার নিজের মনরূপ হ্রদকে সংযত কর, তা না হ'লে তুমি অপরের মনরূপ হ্রদের তত্ত্ব কখনও জানতে পারবে না।

তিনিই প্রকৃত আচার্য, যিনি তাঁর শিষ্যের প্রবণতা অনুযায়ী নিজের সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করতে পারেন। প্রকৃত সহানুভূতি ব্যতীত আমরা কখনই ঠিক ঠিক শিক্ষা দিতে পারি না। মানুষ যে দায়িত্বপূর্ণ প্রাণী—এ ধারণা ছেড়ে দাও; কেবল পূর্ণতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরই দায়িত্বজ্ঞান আছে। অজ্ঞান ব্যক্তিরা মোহমদিরা পান ক'রে মাতাল হয়েছে, তাদের সহজ অবস্থা নেই। তোমরা জ্ঞানলাভ করেছ—তোমাদের তাদের প্রতি অনন্তধৈর্যসম্পন্ন হ'তে হবে। তাদের প্রতি ভালবাসা ছাড়া অন্য কোন প্রকার ভাব রেখো না; তারা যে-রোগে আক্রান্ত হ'য়ে জগৎটাকে ভ্রান্ত দৃষ্টিতে দেখছে, আগে সেই রোগ নির্ণয় কর; তারপর যাতে তাদের সেই রোগ সেরে যায়, আর তারা ঠিক ঠিক দেখতে পায়, সে বিষয়ে সাহায্য কর। সর্বদা স্মরণ রেখো যে, মুক্ত বা স্বাধীন পুরুষেরই কেবল স্বাধীন ইচ্ছা আছে—বাকি সকলেই বন্ধনের ভিতর রয়েছে—সুতরাং তারা যা করছে, তার জন্য তারা দায়ী নয়। ইচ্ছা যখন ইচ্ছারূপে প্রকাশিত, তখন তা বদ্ধ। জল যখন হিমালয়ের চূড়ায় গলতে থাকে, তখন স্বাধীন বা উন্মুক্ত, কিন্তু নদীরূপ ধারণ করলেই তটের দ্বারা বদ্ধ হয়ে যায়; তথাপি তার প্রাথমিক বেগই তাকে শেষে সমুদ্রে নিয়ে যায়, সেখানে ঐ জল আবার পূর্বের স্বাধীনতা ফিরে পায়। প্রথমটা যেন 'মানবের পতন' (Fall of Man) ও দ্বিতীয়টি যেন 'পুনরুত্থান' (Resurrection)।

একটা পরমাণু পর্যন্ত স্থির হয়ে থাকতে পারে না যতক্ষণ না সেটি মুক্তাবস্থা লাভ করছে।

কতকগুলি কল্পনা অন্য কল্পনাগুলির বন্ধন ভাঙতে সাহায্য করে। সমগ্র জগৎটাই কল্পনা, কিন্তু এক রকমের কল্পনাসমষ্টি অপর প্রকারের কল্পনাসমষ্টিকে নষ্ট ক'রে দেয়। যে-সব কল্পনা বলে—জগতে পাপ দুঃখ মৃত্যু রয়েছে, সে-সব কল্পনা বড় ভয়ানক; কিন্তু আর এক রকমের কল্পনা বলে—'আমি পবিত্রস্বরূপ, ঈশ্বর আছেন, জগতে দুঃখ নাই,' এইগুলিই শুভ কল্পনা, আর এগুলিই অন্যান্য কল্পনার বন্ধন ভাঙতে সাহায্য করে। সগুণ ঈশ্বরই মানবের সর্বোচ্চ কল্পনা, যা আমাদের বন্ধন-শৃঙ্খলের পাবগুলি সব ভেঙে দিতে পারে।

'ওঁ তৎ সৎ' অর্থাৎ একমাত্র সেই নির্গুণ ব্রহ্মই মায়ার অতীত, কিন্তু সগুণ ঈশ্বরও নিত্য। যতদিন নায়াগারা-প্রপাত রয়েছে, ততদিন তাতে প্রতিফলিত রামধনুও রয়েছে; কিন্তু এদিকে প্রপাতের জলরাশি ক্রমাগত প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে। ঐ জলপ্রপাত জগৎপ্রপঞ্চস্বরূপ, আর রামধনু সগুণ ঈশ্বরস্বরূপ; এই দুইটিই নিত্য। যতক্ষণ জগৎ রয়েছে, ততক্ষণ জগদীশ্বর অবশ্যই আছেন। ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করছেন, আবার জগৎ ঈশ্বরকে সৃষ্টি করছে—দুই-ই নিত্য। মায়া সৎও নয়, অসৎও নয়। নায়াগারা-প্রপাত ও রামধনু উভয়ই অনন্ত কালের জন্য পরিমাণশীল—এরা মায়ার মধ্য দিয়ে দৃষ্ট ব্রহ্ম। জরথুষ্ট্রীয় ও খ্রীষ্টানেরা মায়াকে দু-ভাগে ভাগ ক'রে ভাল অর্ধেকটাকে 'ঈশ্বর' ও মন্দ অর্ধেকটাকে 'শয়তান' নাম দিয়েছেন। বেদান্ত মায়াকে সমষ্টি বা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন এবং তার পশ্চাতে ব্রহ্মরূপ এক অখণ্ড বস্তুর সত্তা স্বীকার করেন।

* * *

মহম্মদ দেখলেন, খ্রীষ্টধর্ম সেমিটিক ভাব থেকে দূরে চলে যাচ্ছে, ঐ সেমিটিক ভাবের মধ্যে থেকেই খ্রীষ্টধর্মের কিরূপ হওয়া উচিত—তার যে একমাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাস করা উচিত—এইটিই তাঁর উপদেশের বিষয়। 'আমি ও আমার পিতা এক'—এই আর্যোচিত উপদেশের উপর তিনি বড়ই বিরক্ত ছিলেন, ঐ উপদেশে তিনি ভয় পেতেন। প্রকৃতপক্ষে মানব থেকে নিত্য পৃথক্ জিহোবা-সম্বন্ধীয় দ্বৈত ধারণার চেয়ে ত্রিত্ববাদ (Trinity) অনেক উন্নত। যে ভাব-পরম্পরা ক্রমশঃ ঈশ্বর ও মানবের একত্বজ্ঞান এনে দেয়,

অবতারবাদ তার প্রথম ভাব। লোকে প্রথম বোঝে, ঈশ্বর একজন মানবের দেহে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তার পর দেখে বিভিন্ন সময়ে তিনি বিভিন্ন মানবদেহে আবির্ভূত হয়েছেন, অবশেষে দেখতে পায়—তিনি সব মানুষের ভিতর রয়েছেন। অদ্বৈতবাদ সর্বোচ্চ অবস্থা, একেশ্বরবাদ তার চেয়ে নীচের স্তর। বিচারযুক্তির চেয়েও কল্পনা তোমায় শীঘ্র ও সহজে সেই সর্বোচ্চ অবস্থায় নিয়ে যাবে।

অন্ততঃ কয়েকজন লোক কেবল ঈশ্বরলাভের জন্য চেষ্টা করুক, আর সমগ্র জগতের জন্য ধর্ম জিনিসটা রক্ষা করুক। 'আমি জনক রাজার মত নির্লিপ্ত' ব'লে ভান ক'রো না। তুমি জনক বটে, কিন্তু মোহ বা অজ্ঞানের জনকমাত্র।[১] অকপট হ'য়ে বলো, 'আমি আদর্শ কি তা বুঝতে পারছি বটে, কিন্তু এখনও আমি তার কাছে এগোতে পারছি না।' বাস্তবিক ত্যাগ না ক'রে ত্যাগ করবার ভান ক'রো না। যদি বাস্তবিকই ত্যাগ কর, তবে দৃঢ়ভাবে ঐ ত্যাগকে ধরে থাক। লড়াইয়ে এক-শ লোকের পতন হোক না, তবু তুমি পতাকা তুলে নাও এবং এগিয়ে যাও ; যে পড়ে পড়ুক না কেন, তা সত্ত্বেও ঈশ্বর সত্য। যুদ্ধে যার পতন হবে, সে যেন অপরের হাতে পতাকাটি দিয়ে যায়—যাতে সে ঐ পতাকা বহন ক'রে নিয়ে যেতে পারে। পতাকা কখনও ভূলুণ্ঠিত হ'তে পারে না।

* * *

বাইবেলে আছে—প্রথমে ভগবানের রাজ্য অন্বেষণ কর, আর যা কিছু তা তোমাকে দিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু আমি বলি, যখন ধুয়ে পুঁছে পরিষ্কার হলাম, তখন আবার অশুচিতা আমাতে জুড়ে দেবার কি দরকার? তাই বলি, প্রথমেই স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ কর, আর বাকি যা কিছু সব চলে যাক। তোমাতে নূতন কিছু আসুক—এ কামনা ক'রো না, বরং সব কিছু ত্যাগ করতে পারলেই খুশী হও। ত্যাগ কর, আর জেনো যে তুমি দেখতে না পেলেও সফলতা লাভ তুমি করবেই। যীশু বারটি জেলে শিষ্য রেখেছিলেন, কিন্তু ঐ অল্প ক-টি লোকেই প্রবল রোমক সাম্রাজ্য উড়িয়ে দিয়েছিল।

১ 'জনক' শব্দটির অর্থ জন্মদাতা, মিথিলার রাজারও নাম 'জনক' ; তিনি জনগণের জন্য রাজ্যপালন করিতেন এবং মনে মনে সবই ত্যাগ করিয়াছিলেন।

ঈশ্বরের বেদীতে পৃথিবীর মধ্যে পবিত্রতম ও সর্বোৎকৃষ্ট যা কিছু, তাই বলিস্বরূপ অর্পণ কর। যিনি ত্যাগের চেষ্টা কখন করেন না, তাঁর চেয়ে যিনি চেষ্টা করেন, তিনি অনেক ভাল। একজন ত্যাগীকে দেখলে—তার ফলে হৃদয় পবিত্র হয়। ঈশ্বরকে লাভ ক'রব—কেবল তাঁকেই চাই—এই ব'লে দৃঢ়পদে দাঁড়াও, দুনিয়ার যা হবার হোক ; ঈশ্বর ও সংসার—এই দুই-এর মধ্যে কোন আপস করতে যেও না। সংসার ত্যাগ কর, কেবল তা হলেই দেহবন্ধন থেকে মুক্ত হ'তে পারবে। আর ঐরূপে দেহে আসক্তি চলে যাবার পর দেহত্যাগ হলেই তুমি 'আজাদ' বা মুক্ত হ'লে। মুক্ত হও, শুধু দেহের মৃত্যু আমাদের কখনও মুক্ত করতে পারে না। বেঁচে থাকতে থাকতেই আমাদের নিজ চেষ্টায় মুক্তিলাভ করতে হবে। তবেই যখন দেহপাত হবে, তখন সেই মুক্ত পুরুষের আর পুনর্জন্ম হবে না।

সত্যকে সত্যের দ্বারাই বিচার করতে হবে, অন্য কিছুর দ্বারা নয়। লোকের হিত করাই সত্যের কষ্টিপাথর নয়। সূর্যকে দেখবার জন্য আর মশালের দরকার করে না। যদি সত্য সমগ্র জগৎকে ধ্বংস করে, তা হলেও তা সত্যই—ঐ সত্য ধরে থাকো।

ধর্মের বাহ্য অনুষ্ঠানগুলি করা সহজ—এগুলিই সাধারণকে আকর্ষণ করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাহ্য অনুষ্ঠানে কিছু নেই।

'মাকড়সা যেমন নিজের ভিতর থেকে জাল বিস্তার করে, আবার তাকে নিজের ভিতর গুটিয়ে নেয়, সেইরূপ ঈশ্বরই এই জগৎপ্রপঞ্চ বিস্তার করেন, আবার নিজের ভিতর টেনে নেন!'[১]

মঙ্গলবার, ৬ই অগস্ট

আমি না থাকলে বাইরে 'তুমি' থাকতে পারে না। এই থেকে কতকগুলি দার্শনিক এই সিদ্ধান্ত করলেন যে 'আমাতে' ছাড়া বাহ্য জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। 'তুমি' কেবল 'আমা'তেই রয়েছ। অপরে আবার ঠিক এর বিপরীত তর্ক ক'রে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে, 'তুমি' না থাকলে 'আমার' অস্তিত্ব

১ মুণ্ডক উপ, ১।১।৭

প্রমাণই হ'তে পারে না। তাঁদের পক্ষেও যুক্তির বল সমান। এই দুটো মতই আংশিক সত্য—খানিকটা সত্য, খানিকটা মিথ্যা। দেহ যেমন জড় ও প্রকৃতির উপাদানে গঠিত, চিন্তাও তাই। জড় ও মন উভয়ই একটা তৃতীয় পদার্থে অবস্থিত—এক অখণ্ড বস্তু আপনাকে দু-ভাগ ক'রে ফেলেছে। এই এক অখণ্ড বস্তুর নাম 'আত্মা'।

সেই মূল সত্তা যেন 'ক', সেটিই মন ও জড় উভয়রূপে নিজেকে প্রকাশ করছে। এই পরিদৃশ্যমান জগতে এর গতি কতকগুলি নির্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বন ক'রে হয়ে থাকে, সেগুলিকেই আমরা নিয়ম বলি। এক অখণ্ড সত্তা-রূপে তা মুক্তস্বভাব, বহু দেখলে সেটি নিয়মের অধীন। তথাপি এই বন্ধন সত্ত্বেও আমাদের ভিতর একটা মুক্তির ধারণা সদাসর্বদা বর্তমান রয়েছে, এরই নাম নিবৃত্তি অর্থাৎ 'আসক্তি ত্যাগ করা'। আর বাসনাবশে যে-সব জড়ত্ববিধায়িনী শক্তি আমাদের সাংসারিক কার্যে বিশেষভাবে প্রবৃত্ত করে, তাদেরই নাম প্রবৃত্তি।

সেই কাজটাকেই নীতিসঙ্গত বা সৎকর্ম বলা যায়, যা আমাদের জড়ের বন্ধন থেকে মুক্ত করে; তার বিপরীত যা, তা অসৎ কর্ম। এই জগৎ-প্রপঞ্চকে অনন্ত বোধ হচ্ছে, কারণ এর মধ্যে সব জিনিসই চক্রগতিতে চলেছে; যেখান থেকে এসেছে, সেইখানেই ফিরে যাচ্ছে। বৃত্তের রেখাটি বর্ধিত হয়ে আবার নিজের সঙ্গে মিলে যায়, সুতরাং এখানে—এই সংসারে—কোনখানে বিশ্রাম বা শান্তি নেই। এই সংসার বৃত্ত থেকে আমাদের বেরুতেই হবে। মুক্তিই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য—একমাত্র গতি।

* * *

মন্দের কেবল আকার বদলায়, কিন্তু তার গুণগত কোন পরিবর্তন হয় না। প্রাচীনকালে যার শক্তি ছিল, সেই শাসন ক'রত, এখন ধূর্ততা শক্তির স্থান অধিকার করেছে। দুঃখকষ্ট আমেরিকায় যত তীব্র, ভারতে তত নয়; কারণ এখানে (আমেরিকায়) গরীব লোক নিজেদের দুরবস্থার সঙ্গে অপরের অবস্থার খুব বেশী প্রভেদ দেখতে পায়।

ভাল মন্দ এই দুটো অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত—একটাকে নিতে গেলে অপরটাকে নিতেই হবে। এই জগতের শক্তিসমষ্টি যেন একটা হ্রদের মতো—ওতে যেমন তরঙ্গের উত্থান আছে, ঠিক তদনুযায়ী একটা পতনও আছে। সমষ্টিটা

সম্পূর্ণ এক—সুতরাং একজনকে সুখী করা মানেই আর এক জনকে অসুখী করা। বাইরের সুখ জড়সুখ মাত্র, আর তার পরিমাণ নির্দিষ্ট। সুতরাং এককণা সুখও পেতে গেলে, তা অপরের কাছ থেকে কেড়ে না নিয়ে পাওয়া যায় না। কেবল যা জড়জগতের অতীত সুখ, তা কারও কিছু হানি না ক'রে পাওয়া যেতে পারে। জড়সুখ কেবল জড়দুঃখের রূপান্তর মাত্র।

যারা ঐ তরঙ্গের উত্থানাংশে জন্মেছে ও সেইখানে রয়েছে, তারা তার পতনাংশটা—আর তাতে কি আছে, তা দেখতে পায় না। কখনও মনে ক'রো না, তুমি জগৎকে ভাল ও সুখী করতে পারো। ঘানির বলদ তার সামনে বাঁধা খড়ের গোছা পাবার জন্য চেষ্টা করে বটে, কিন্তু কোন কালে তার কাছে পৌঁছতে পারে না, কেবল ঘানি ঘোরাতে থাকে মাত্র। আমরাও এইরূপে সুখরূপ আলেয়ার অনুসরণ করছি—সর্বদাই সেটা আমাদের সামনে থেকে সরে যাচ্ছে, আর আমরা শুধু প্রকৃতির ঘানিই ঘোরাচ্ছি। এইরূপ ঘানি টানতে টানতে আমাদের মৃত্যু হ'ল, তারপরে আবার ঘানি টানা আরম্ভ হবে। যদি আমরা অশুভকে দূর ক'রে দিতে পারতাম, তা হ'লে আমরা কখনই কোন উচ্চতর বস্তুর আভাস পর্যন্ত পেতাম না; আমরা তা হ'লে সন্তুষ্ট হয়ে থাকতাম, কখনও মুক্ত হবার জন্য চেষ্টা করতাম না। যখন মানুষ বুঝতে পারে, জড়জগতে সুখ অন্বেষণের সকল প্রচেষ্টা একেবারে নিরর্থক, তখনই ধর্মের আরম্ভ। মানুষের যত রকম জ্ঞান আছে, সবই ধর্মের অঙ্গমাত্র।

মানবদেহে ভাল-মন্দ এমন সামঞ্জস্য ক'রে রয়েছে যে, তাইতেই মানুষের এ উভয় থেকে মুক্তিলাভ করবার ইচ্ছার সম্ভাবনা রয়েছে।

মুক্ত যে, সে কোনকালেই বদ্ধ হয়নি। মুক্ত কি ক'রে বদ্ধ হ'ল, এই প্রশ্নটাই অযৌক্তিক। যেখানে কোন বন্ধন নেই, সেখানে কার্যকারণ-ভাবও নেই। 'স্বপ্নে আমি একটা শেয়াল হয়েছিলাম, আর একটা কুকুর আমায় তাড়া করেছিল'—এখন আমি কি ক'রে প্রশ্ন করতে পারি যে কুকুর কেন আমায় তাড়া করেছিল? শেয়ালটা স্বপ্নেরই একটা অংশ, আর কুকুরটাও ঐ সঙ্গে আপনা হতেই এসে জুটল; কিন্তু দুই-ই স্বপ্ন, বাইরে এদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। আমরা যাতে এই বন্ধনের বাইরে যেতে পারি, বিজ্ঞান ও ধর্ম দুই-ই আমাদের সে-বিষয়ে সাহায্য করতে চেষ্টা করছে। তবে ধর্ম বিজ্ঞানের

চেয়ে প্রাচীন, আর আমাদের এই কুসংস্কার রয়েছে যে, ধর্ম বিজ্ঞানের চেয়ে পবিত্র। এক হিসাবে পবিত্রও বটে, কারণ ধর্ম নীতি বা চরিত্রকে (morality) তার একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ ব'লে মনে করে, কিন্তু বিজ্ঞান তা করে না।

'পবিত্রাত্মারা ধন্য, কারণ তাঁরা ঈশ্বরকে দর্শন করবেন।' যদি সব শাস্ত্র এবং সব অবতার লুপ্ত হয়ে যায়, তথাপি এই একটিমাত্র বাক্য সমগ্র মানবজাতিকে রক্ষা করবে। অন্তরের এই পবিত্রতা থেকেই ঈশ্বরদর্শন হবে। সমগ্র বিশ্বসঙ্গীতে এই পবিত্রতাই ধ্বনিত হচ্ছে। পবিত্রতায় কোন বন্ধন নেই। পবিত্রতা দ্বারা অজ্ঞানের আবরণ দূর ক'রে দাও, তা হলেই আমাদের যথার্থ স্বরূপের প্রকাশ হবে, আর আমরা জানতে পারব—আমরা কোন কালে বদ্ধ হইনি। নানাত্ব-দর্শনই জগতের মধ্যে সব চেয়ে বড় পাপ—সবকিছুকেই আত্মরূপে দর্শন কর ও সকলকেই ভালবাসো। ভেদভাব সব একেবারে দূর ক'রে দাও।

* * *

পিশাচপ্রকৃতি লোকও ক্ষত বা পোড়া ঘায়ের মতো আমার দেহেরই একটা অংশ। যত্ন ক'রে তাকে ভাল ক'রে তুলতে হবে। দুষ্ট লোককেও ক্রমাগত সাহায্য করতে থাকো, যতক্ষণ না সে সম্পূর্ণ সেরে যাচ্ছে এবং আবার সুস্থ ও সুখী হচ্ছে।

আমরা যতদিন আপেক্ষিক বা দ্বৈতভূমিতে রয়েছি, ততদিন আমাদের বিশ্বাস করবার অধিকার আছে যে, এই আপেক্ষিক জগতের বস্তু দ্বারা আমাদের অনিষ্ট হ'তে পারে, আবার ঠিক সেই ভাবে সাহায্যও পেতে পারি। এই সাহায্য-ভাবের সূক্ষ্মতম ভাবকেই আমরা ঈশ্বর বলি। ঈশ্বর বলতে আমাদের এই ধারণা আসে যে, আমরা যত প্রকার সাহায্য পেতে পারি, তিনি তার সমষ্টিস্বরূপ।

যা-কিছু আমাদের প্রতি করুণাসম্পন্ন, যা-কিছু কল্যাণকর, যা-কিছু আমাদের সহায়ক, ঈশ্বর সেই সকলের সার সমষ্টিস্বরূপ। ঈশ্বরসম্বন্ধে আমাদের এই একমাত্র ধারণা থাকা উচিত। আমরা যখন নিজেদের আত্মরূপে ভাবি, তখন আমাদের কোন দেহ নেই, সুতরাং 'আমি ব্রহ্ম, বিষও আমার কিছু ক্ষতি করতে পারে না'—এই কথাটাই একটা অসম্ভব বাক্য। যতক্ষণ আমাদের দেহ রয়েছে, আর সেই দেহটাকে আমরা দেখছি, ততক্ষণ আমাদের

ঈশ্বরোপলব্ধি হয়নি। নদীটাই যখন লুপ্ত হ'ল, তখন তার ভিতরের ছোট আবর্তটা কি আর থাকতে পারে? সাহায্যের জন্য কাঁদো দেখি, তা হ'লে সাহায্য পাবে—আর অবশেষে দেখবে, সাহায্যের জন্য কান্নাও চলে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে সাহায্যদাতাও চলে গেছেন; খেলা শেষ হয়ে গেছে, বাকি রয়েছেন কেবল আত্মা।

একবার এইটি হয়ে গেলে ফিরে এসে যেমন খুশী খেলা কর। তখন আর এই দেহের দ্বারা কোন অন্যায় কাজ হ'তে পারে না; কারণ যতদিন না আমাদের ভিতরে কুপ্রবৃত্তিগুলো সব পুড়ে যাচ্ছে, ততদিন মুক্তিলাভ হবে না; যখন ঐ অবস্থালাভ হয়, তখন আমাদের সব ময়লা পুড়ে যায়, আর অবশিষ্ট থাকে নির্ধূম শিখা, তাপ নেই—আলো আছে।[১]

তখন প্রারব্ধ আমাদের দেহটাকে চালিয়ে নিয়ে যায়, কিন্তু তার দ্বারা তখন কেবল ভাল কাজই হ'তে পারে, কারণ মুক্তিলাভ হবার পূর্বে সব মন্দ চলে গেছে। চোর ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে মরবার সময় তার প্রাক্তনকর্মের ফল-লাভ করলে। পূর্বজন্মে সে যোগী ছিল, যোগভ্রষ্ট হওয়াতে তাকে জন্মাতে হয়; এ জন্মেও পতন হওয়াতে তাকে চোর হ'তে হয়েছিল। কিন্তু পূর্ব জন্মে সে যে শুভকর্ম করেছিল, তার ফল ফ'লল। তার যখন মুক্তিলাভ হবার সময় হ'ল, তখনই তার যীশুখ্রীষ্টের সঙ্গে দেখা হ'ল, আর তাঁর এক কথায় সে মুক্ত হয়ে গেল।

বুদ্ধ তাঁর প্রবলতম শত্রুকেও মুক্তি দিয়েছিলেন, কারণ সে ব্যক্তি তাঁকে এত দ্বেষ ক'রত যে, ঐ দ্বেষবশে সে সর্বদা তাঁর চিন্তা ক'রত। ক্রমাগত বুদ্ধের চিন্তায় তার চিত্তশুদ্ধি-লাভ হয়েছিল, আর সে মুক্তিলাভ করবার উপযুক্ত হয়েছিল। অতএব সর্বদা ঈশ্বরের চিন্তা কর, ঐ চিন্তার দ্বারা তুমি পবিত্র হয়ে যাবে।

* * *

(এই ভাবেই শেষ হইয়া গেল আমাদের প্রিয়তম গুরুদেবের 'দিব্যবাণী', পরদিন স্বামীজী সহস্রদ্বীপোদ্যান হইতে নিউইয়র্কে ফিরিয়া যান।)

১ 'জ্যোতিরিব অধূমকঃ' কঠ উপ., ২।১।১৩ ; 'দগ্ধেন্ধনমিবানলম্'—শ্বেতাশ্ব. উপ., ৬।১৯

ভক্তিপ্রসঙ্গে

কাশ্মীরের পথে স্বামীজী, ১৮৯৮

নারদভক্তি-সূত্র

১৮৯৫ খৃঃ শরৎকালে মিঃ স্টার্ডির সহযোগিতায় স্বামীজী কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত।

[নারদীয় ভক্তি-সূত্র দশটি অনুবাকে বিভক্ত, ইহাতে মোট ৮৪টি সূত্র আছে। অনুবাক্ অনুসারে সূত্রসংখ্যা যথাক্রমে—৬, ৮, ১০, ৯, ৯, ৮, ৭, ৯, ৭, ১১। স্বামীজী কয়েকটি সূত্র একসঙ্গে গ্রথিত করিয়াছেন, কয়েকটি বাদ দিয়াছেন। এখানে পাঁচটি পরিচ্ছেদে মোট ৬২টি সূত্রের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। আমরা এখানে ইংরেজী অনুবাদে ব্যক্ত ভাব ও পরিচ্ছেদ-বিভাগ অনুসরণ করিয়াছি।]

প্রথম পরিচ্ছেদ

১। ঈশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক ভালবাসার নাম ভক্তি।

২। ইহা প্রেমামৃত।

৩। ইহা লাভ করিলে মানুষ পূর্ণ হয়, অমর হয়, চিরতৃপ্তির অধিকারী হয়।

৪। ইহা লাভ করিলে মানুষ আর কিছুই চায় না এবং দ্বেষ- ও অভিমান-শূন্য হয়।

৫। ইহা জানিয়া মানুষ আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ হয়, শান্ত হয়, এবং একমাত্র ভগবদ্‌বিষয়েই আনন্দ পাইয়া থাকে।

৬। কোন বাসনাপূরণের জন্য ইহাকে ব্যবহার করা চলে না, কারণ ইহা সর্ববিধ বাসনার নিবৃত্তি-স্বরূপ।

৭। 'সন্ন্যাস' বলিতে লৌকিক ও শাস্ত্রীয়—এই উভয়বিধ উপাসনারই ত্যাগ বুঝায়।

৮। যাহার সমগ্র সত্তা ঈশ্বরে নিবদ্ধ, সেই-ই ভক্তিপথের সন্ন্যাসী; যাহা কিছু তাহার ভগবদ্‌ভক্তির বিরোধী, তাহাই সে ত্যাগ করে।

৯। অন্য সব আশ্রয় তাগ করিয়া সে একমাত্র ভগবানের শরণাগত হয়।

১০। জীবন সুদৃঢ় না হওয়া পর্যন্ত শাস্ত্রবিধি মানিয়া চলিতে হয়;

১১। নতুবা মুক্তির নামে অসদাচরণে বিপদ আছে।

১২। ভক্তিতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইলে দেহরক্ষার জন্য যাহা প্রয়োজন, তদতিরিক্ত সমস্ত লৌকিক আচরণই পরিত্যক্ত হয়।

১৩। ভক্তির অনেক সংজ্ঞা আছে; কিন্তু নারদের মতে ভক্তির চিহ্ন এইগুলি: যখন সকল চিন্তা, সকল বাক্য, সকল কর্ম ভগবানে সমর্পিত হয়, ভগবানকে স্বল্পক্ষণ বিস্মৃত হইলেও যখন অতি গভীর দুঃখের উদয় হয়, বুঝিতে হইবে তখন প্রেম-সঞ্চার শুরু হইয়াছে।

১৪। যেমন, এই প্রেম গোপীদের ছিল।

১৫। কারণ ভগবানকে প্রেমাস্পদরূপে উপাসনা করিলেও তাঁহার ভগবৎস্বরূপ তাঁহারা কখনও বিস্মৃত হন নাই।

১৬। এরূপ না হইলে তাঁহারা অসতীত্ব-রূপ পাপের ভাগী হইতেন।

১৭। ইহাই ভক্তির সর্বোচ্চ রূপ। কারণ মানুষের সব ভালবাসায় প্রতিদানে কিছু পাইবার আকাঙ্ক্ষা থাকে, কিন্তু ইহাতে তাহা নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১। কর্ম, জ্ঞান এবং যোগ (রাজযোগ) অপেক্ষা ভক্তি মহত্তর। কারণ ভক্তিই ভক্তির ফল, উপায় ও উদ্দেশ্য।

২। খাদ্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভে বা খাদ্যবস্তুর দর্শনে যেমন মানুষের ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না, সেইরূপ যতক্ষণ পর্যন্ত না ভগবানের প্রতি প্রেমের উদয় হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ভগবানের সম্বন্ধে জ্ঞান, এমনকি ভগবদ্দর্শন হইলেও মানুষ পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। সেইজন্য ভক্তিই শ্রেষ্ঠ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১। যাহা হউক, সিদ্ধ ভক্তগণ ভক্তি সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছেন:

২। যে ভক্তিলাভ করিতে চায়, তাহাকে ইন্দ্রিয়-সুখভোগ, এমনকি মানুষের সঙ্গ পর্যন্ত অবশ্যই ত্যাগ করিতে হইবে।

৩। দিবারাত্র সে একমাত্র ভক্তির বিষয় ছাড়া আর অন্য কিছুই চিন্তা করিবে না।

৪। যেখানে ভগবানের কীর্তন ও আলোচনা হয়, সেখানে তাহার যাওয়া উচিত।

৫। প্রধানতঃ মুক্ত মহাপুরুষের কৃপাতেই ভক্তিলাভ হয়।

৬। মহাপুরুষের সঙ্গলাভ দুর্লভ এবং আত্মার মুক্তিবিধানে তাহা অমোঘ।

৭। ভগবৎকৃপায় এরূপ গুরুলাভ হয়।

৮। ভগবান্ ও ভগবানের অন্তরঙ্গ ভক্তের মধ্যে কোন ভেদ নাই।

৯। অতএব এরূপ মহাপুরুষদের কৃপালাভের চেষ্টা কর।

১০। অসৎসঙ্গ সর্বদা বর্জনীয়।

১১। কারণ উহা কাম-ক্রোধ বাড়াইয়া দেয়, মায়ায় বদ্ধ করে, উদ্দেশ্যকে ভুলাইয়া দেয়, ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা (অধ্যবসায়) নাশ করে এবং সব কিছুই ধ্বংস করিয়া দেয়।

১২। এই বিপত্তিগুলি প্রথমে ক্ষুদ্র তরঙ্গের আকারে আসিতে পারে, কিন্তু অসৎসঙ্গ এগুলিকে সমুদ্রাকারে পরিণত করে।

১৩। সকল আসক্তি যে ত্যাগ করিয়াছে, যে মহাপুরুষের সেবা করে, সংসারের সব বন্ধন ছিন্ন করিয়া যে একাকী বাস করে, যে গুণাতীত, ভগবানের উপর যে সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল, সে-ই মায়ার পারে যাইতে পারে।

১৪। যে কর্মফল ত্যাগ করে, যে সর্বকর্ম, সুখ-দুঃখরূপ দ্বন্দ্ব, এমনকি শাস্ত্রজ্ঞানও পরিত্যাগ করে, সে-ই নিরবচ্ছিন্ন ভগবৎপ্রেমের অধিকারী হয়।

১৫। সে ভবনদী পার হয়, এবং অপরকেও পার হইতে সাহায্য করে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১। প্রেমের স্বরূপ বর্ণনার অতীত—অনির্বচনীয়।

২। মূক যেমন যাহা আস্বাদন করে, তাহা কথায় প্রকাশ করিতে পারে না, কিন্তু তাহার ভাবই তাহা প্রকাশ করিয়া দেয়, তেমনি মানুষ এই প্রেমের কথা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারে না, তবে তাহার আচরণে উহা প্রকাশ পায়।

৩। বিরল কোন ব্যক্তির জীবনে এই প্রেমের প্রকাশ ঘটে।

৪। সর্বগুণাতীত, সমস্ত বাসনার অতীত, চিরবর্ধমান, চিরবিচ্ছেদহীন, সূক্ষ্মতম অনুভূতি প্রেম।

৫। যখন মানুষ এই প্রেমভক্তি লাভ করে, তখন সে সর্বত্রই এই প্রেমের রূপ দর্শন করে, উহার কথাই শ্রবণ করে, উহাই কীর্তন করে এবং চিন্তা করে।

৬। গুণ ও অবস্থানুসারে এই প্রেম বিভিন্নভাবে নিজেকে বিকশিত করে।

৭। তম (মূঢ়তা, আলস্য), রজ (চঞ্চলতা, কর্মপ্রবণতা), সত্ত্ব (শান্তি, পবিত্রতা)—এগুলি গুণ; আর্ত (দুঃখী), অর্থার্থী (কোন কিছুর অভিলাষী), জিজ্ঞাসু (সত্যানুসন্ধী), জ্ঞানী (জ্ঞাতা)—এগুলি বিভিন্ন অবস্থা।

৮। ইহাদের মধ্যে শেষোক্তগুলি পূর্বোক্তগুলি অপেক্ষা উচ্চতর।

৯। ভক্তিই উপাসনার সহজতম পথ।

১০। ইহা স্বতঃ-প্রমাণ, প্রমাণের জন্য অন্য কোন কিছুর অপেক্ষা রাখে না।

১১। শান্তি ও পরমানন্দই ইহার প্রকৃতি।

১২। ভক্তি কখনও কাহারও বা কোন কিছুর অনিষ্ট করিতে চায় না, এমন কি প্রচলিত উপাসনা-পদ্ধতিরও নয়।

১৩। ভোগ-বিষয়ক, ঈশ্বরের প্রতি সন্দেহ-বিষয়ক, বা নিজের শত্রু-বিষয়ক প্রসঙ্গ কদাপি শুনিতে নাই।

১৪। অহঙ্কার, দম্ভ প্রভৃতি অবশ্যই পরিহার্য।

১৫। এইসব রিপুকে যদি দমন করিতে না পারো, তবে ঈশ্বরের দিকে এগুলির মোড় ফিরাইয়া দাও, সর্বকর্ম তাঁহাতে সমর্পণ কর।

১৬। প্রেম, প্রেমিক ও প্রেমাস্পদকে এক ভাবিয়া, নিজেকে ভগবানের চিরভৃত্য বা চিরবধূ ভাবিয়া ভগবানের সেবা কর, তাঁহাকে প্রেমনিবেদন এইভাবেই করিতে হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১। যে প্রেম ভগবানে একাগ্র, তাহাই শ্রেষ্ঠ।

২। ভগবৎপ্রসঙ্গ করিতে গেলে তাঁহাদের (এরূপ একনিষ্ঠ প্রেমিকদের) কথা কণ্ঠে রুদ্ধ হয়, তাঁহারা কাঁদিয়া ফেলেন; তীর্থকে তাঁহারাই পবিত্র

করেন ; তাঁহাদের কর্ম শুভ ; তাঁহারা সদ্গ্রন্থকে অধিকতর সদ্ভাবাপন্ন করিয়া তুলেন ; কারণ তাঁহারা ভগবানের সঙ্গে একাত্ম।

৩। কেহ যখন ভগবানকে এতখানি ভালবাসে, তখন তাঁহার পূর্বপুরুষগণ আনন্দ করেন, দেবগণ নৃত্য করেন, আর পৃথিবী একজন গুরুলাভ করে।

৪। এরূপ প্রেমিকের নিকট বংশ, লিঙ্গ, জ্ঞান, আকার, জন্ম ও সম্পদের কোন ভেদ থাকে না।

৫। কারণ এ-সবই তো ভগবানের।

৬। তর্ক বর্জনীয়।

৭। কারণ ইহার কোন শেষ নাই, কোন সন্তোষজনক ফললাভও ইহাতে হয় না।

৮। প্রেমভক্তি বর্ধিত হয়, এমন গ্রন্থ পাঠ কর এবং এমন কর্ম কর।

৯। সুখ-দুঃখের, লাভ-লোকসানের সকল বাসনা ত্যাগ করিয়া দিবারাত্র ভগবানের পূজা কর। একটি মুহূর্তও বৃথা নষ্ট করিও না।

১০। অহিংসা, সত্যনিষ্ঠা, পবিত্রতা, দয়া ও দেবভাব সর্বদা পোষণ করিবে।

১১। অন্য সব চিন্তা ত্যাগ করিয়া সমস্ত মন দিয়া দিবারাত্র ভগবানের পূজা করা উচিত। এভাবে রাত্রিদিন উপাসনা করিলে ভক্তের নিকট ভগবান্ প্রকাশিত হন, এবং ভক্তকে উপলব্ধির সামর্থ্য দান করেন।

১২। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে প্রেম অপেক্ষা মহত্তর কিছু নাই। জগতের সব ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ভয় পরিহার করিয়া, প্রাচীন মহাপুরুষদের পন্থা অনুসরণ করিয়া আমরা এভাবে এই প্রেমভক্তির কথা প্রচার করিতে সাহসী হইয়াছি।

ভক্তিযোগ-প্রসঙ্গে

দ্বৈতবাদী বলে, সর্বদা দণ্ডহস্তে শাসন করিতে উদ্যত একজন ঈশ্বরকে না ভাবিলে তুমি নীতিমান্ হইতে পার না। ব্যাপারটা কি রকম? ধর একটি ঘোড়া আমাদের নীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবে। আর ঘোড়াটি ছ্যাকরা গাড়ির হতভাগ্য ঘোড়া, সে চাবুক ভিন্ন এক পাও অগ্রসর হয় না—এইটি তাহার স্বভাবে পরিণত হইয়াছে। এই ঘোড়ার বক্তৃতার বিষয় হইল 'মানুষ', তাহার মতে মানুষমাত্রই নীতিহীন। কেন? কারণ মানুষকে নিয়মিতভাবে চাবুক মারা হয় না। কিন্তু চাবুকের ভয় মানুষকে আরও নীতিহীন করিয়া তোলে।

তোমরা সকলে বলো যে, ঈশ্বর বলিয়া একটি সত্তা আছেন এবং তিনি সর্বব্যাপী। চক্ষু বন্ধ কর এবং চিন্তা করিতে থাকো—ঈশ্বর কিরূপ। তুমি কি দেখিবে? যখনই তোমার মনে ঈশ্বরের সর্বব্যাপিত্বের ভাবটি আনিবার চেষ্টা করিবে, তখনই সাগর, নীল আকাশ, বিস্তৃত বিশাল উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ কিংবা এরূপ কোন বস্তু দেখিবে, যাহা তুমি পূর্বে দেখিয়াছ,—তাহারই চিন্তা মনে উঠিতেছে। যদি তাই হয়, সর্বব্যাপী ভগবান্ সম্বন্ধে তোমার কোনই ধারণা নাই। সর্বব্যাপিত্ব তোমার কাছে একটা অর্থহীন শব্দ। ঈশ্বরের অন্যান্য বিশেষণের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তা বা সর্বজ্ঞত্ব সম্বন্ধেও আমাদের কি ধারণা আছে? কিছুই নাই। উপলব্ধিই ধর্ম; যতক্ষণ না তুমি ঈশ্বর-ভাবটি নিজের জীবনে উপলব্ধি করিতেছ, ততক্ষণ আমি তোমাকে যথার্থ ঈশ্বরোপাসক বলিব না। উপলব্ধির আগে ইহা শুধু কথার কথা ছাড়া আর কিছুই নয়। মস্তিষ্কে যতই মত, দর্শন, ও নীতি-পুস্তকের রাশি সঞ্চিত রাখ না কেন, তাহাতে কিছুই যায় আসে না। তুমি কি উপলব্ধি করিয়াছ, জীবনে ঐগুলি কতটা পরিণত করিয়াছ, তাহাই বিচার্য।

মায়ার আবরণের ভিতর দিয়া দেখিলে নির্গুণ ব্রহ্মকেই সগুণ ঈশ্বররূপে দেখা যায়। ব্রহ্মকে যখন পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দর্শন করি, তখন তাঁহাকে একমাত্র সগুণ ভগবান্‌রূপেই দেখিতে পারি। আসল কথা পরমাত্মাকে

কখনও বিষয়ীভূত করা যাইতে পারে না। জ্ঞাতা নিজেকে কি করিয়া জানিবেন? তবে তিনি যেন নিজের ছায়াকে প্রক্ষেপ করিতে পারেন এবং যদি বলিতে চাও, ইহাকে 'বিষয়ীভূত করা' বলিতে পারো। সুতরাং সেই ছায়ার যে সর্বোচ্চ রূপ, নিজেকে বিষয়ীভূত করিবার যে প্রচেষ্টা, তাহাই সগুণ ঈশ্বর। আত্মা হইতেছেন শাশ্বত কর্তা; সেই আত্মাকে জ্ঞেয়রূপে রূপান্তরিত করিবার জন্য আমরা নিরন্তর চেষ্টা করিতেছি; এবং আমাদের এই প্রচেষ্টা হইতে দৃশ্যজগতের ও যাহাকে আমরা জড় বলি তাহার ও অন্যান্য সবকিছুর উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু এইগুলি অত্যন্ত দুর্বল প্রচেষ্টা এবং আমাদের কাছে আত্মার জ্ঞেয়রূপে যে সর্বোচ্চ প্রকাশ সম্ভব, তাহা সগুণ ঈশ্বর। এই জ্ঞেয়ই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ-উদ্‌ঘাটনের প্রচেষ্টা। সাংখ্যমতে প্রকৃতি এই-সব অভিজ্ঞতা পুরুষ বা জীবাত্মাকে দিতেছে। জীব তাহার প্রকৃত স্বরূপ জানিতে পারিবে। অদ্বৈত বেদান্তমতে জীব নিজেকে জানিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। দীর্ঘ সংগ্রামের পর সে দেখে জ্ঞাতা সর্বদা জ্ঞাতাই থাকেন; এবং তখনই অনাসক্তি আসে এবং জীব মুক্ত হয়।

যখন কোন সাধক সেই পূর্ণ অবস্থায় উপনীত হন, তখন তিনি সগুণ ঈশ্বরের সারূপ্য লাভ করেন; 'আমি এবং আমার পিতা এক'। তিনি জানেন তিনি পরব্রহ্মের সহিত অভিন্ন এবং সগুণ ঈশ্বরের ন্যায় নিজেকে প্রক্ষেপ করেন। তিনি খেলা করেন, যেমন অতি পরাক্রান্ত রাজাও মাঝে মাঝে পুতুল লইয়া খেলা করেন।

স্থিতির বন্ধনকে ভাঙিয়া ফেলিবার জন্য কতকগুলি কল্পনা বাকি কল্পনাগুলির বন্ধন ছিন্ন করিতে সাহায্য করে। সমস্ত জগৎটাই একটা কল্পনা। এক শ্রেণীর কল্পনা আর এক শ্রেণীর কল্পনার উপশম ঘটায়। এই জগতে পাপ, দুঃখ এবং মৃত্যু আছে—এই-জাতীয় কল্পনাগুলি মারাত্মক। কিন্তু আর এক জাতীয় কল্পনা আছেঃ তুমি পবিত্র, ভগবান্ আছেন, দুঃখ নাই। এগুলিই ভাল এবং কল্যাণকর, বন্ধন-মোচনের সহায়ক। সগুণ ভগবান্‌ই সর্বোচ্চ কল্পনা, যাহা শৃঙ্খলের সব গ্রন্থি ভাঙিয়া ফেলিতে পারে।

'ভগবান্, তুমি ইহা রক্ষা কর এবং উহা আমাকে দাও; ভগবান্, আমি এই ক্ষুদ্র প্রার্থনা নিবেদন করিতেছি, পরিবর্তে তুমি আমার দৈনন্দিন জীবনের অভাব পূরণ করিয়া দাও; হে ভগবান্, আমার মাথা-ধরা সারাইয়া

দাও ইত্যাদি'—এইরূপ প্রার্থনা ভক্তি নয়। এইগুলি ধর্মের নিম্নতম সোপান, কর্মের নিম্নতম রূপ। যদি কোন মানুষ দেহকে তৃপ্ত করিতে—দেহের ক্ষুধা মিটাইতেই সমস্ত মানসিক শক্তি নিয়োগ করে, তাহা হইলে তাহার সহিত পশুর কি প্রভেদ? ভক্তি উচ্চতর বস্তু, স্বর্গৈষণা অপেক্ষাও উচ্চতর। স্বর্গ বলিতে খুব বেশী মাত্রায় ভোগ করিবার স্থান বুঝায়। তাহা কি করিয়া ভগবান্ হইতে পারে?

একমাত্র মূঢ় ব্যক্তিরাই ইন্দ্রিয়-ভোগের পশ্চাতে ধাবিত হয়। ইন্দ্রিয়-কেন্দ্রিক জীবন যাপন করা সহজ। পান-ভোজন-ক্রিয়ারূপ পুরাতন অভ্যস্ত পথে ভ্রমণ করা কঠিন নয়। কিন্তু আধুনিক দার্শনিকরা বলিতে চান, 'এই অনায়াস-সাধ্য ভাবগুলি গ্রহণ কর এবং সেগুলির উপরই ধর্মের ছাপ দিয়া দাও।' এই ধরনের মতবাদ বিপজ্জনক। ইন্দ্রিয়-ভোগে মৃত্যু। আধ্যাত্মিক স্তরে যে জীবন, তাহাই যথার্থ জীবন। অন্য ভোগভূমির জীবন মৃত্যুরই নামান্তর। আমাদের এই জাগতিক জীবনকে একটি শব্দে বর্ণনা করা যাইতে পারে—উহা হইল 'অভ্যাসের ব্যায়ামাগার'। যথার্থ জীবন উপভোগ করিতে হইলে আমাদিগকে ইহার উর্ধ্বে উঠিতে হইবে।

যতক্ষণ ছোঁয়াছুঁয়ি তোমার ধর্ম, এবং রান্নার হাঁড়ি তোমার ইষ্ট, ততক্ষণ তুমি আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না। ধর্মে ধর্মে যে দ্বন্দ্ব—তাহা অর্থহীন, কেবল কথার সংঘর্ষ মাত্র। প্রত্যেকেই ভাবে, 'ইহা আমার মৌলিক চিন্তা'; এবং সে চায়—সব কিছুই তাহার মতানুসারে চলুক। এই ভাবেই ধর্মবিরোধের সূত্রপাত।

অপরকে সমালোচনা করিবার সময় আমরা সর্বদা নির্বোধের মতো নিজের চরিত্রের একটি মাত্র বিশেষ উজ্জ্বল দিকটিকেই সমগ্র জীবন বলিয়া ধরিয়া লই এবং উহার সহিত অপরের চরিত্রের অনুজ্জ্বল দিকটি তুলনা করি। এ-ভাবে ব্যক্তিগত চরিত্র বিচার করিবার সময় আমরা ভুল করিয়া বসি।

গোঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা একটি ধর্মের অতি দ্রুত প্রচার হয় নিঃসন্দেহ; কিন্তু সেই ধর্মেরই প্রচার দৃঢ় ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, যে-ধর্ম প্রত্যেককে তাহার মতের স্বাধীনতা দেয় এবং এইরূপে তাহাকে উচ্চতর সোপানে উন্নীত করে, যদিও এই প্রক্রিয়ার গতি শ্লথ। সর্বপ্রথম দেশকে (ভারতবর্ষ) আধ্যাত্মিক ভাবে প্লাবিত কর, তাহার পর অন্যান্য ভাবগুলি

আসিবে। ধর্ম ও অধ্যাত্মজ্ঞান-দান শ্রেষ্ঠ দান, কারণ ইহা অসংখ্য জন্মপ্রাপ্তিরূপ বন্ধন মোচন করে। ইহার পর পার্থিব জ্ঞান-দান, ইহার সাহায্যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দিকে মানুষের চক্ষু খুলিয়া যায়। তৃতীয় দান জীবন-দান এবং চতুর্থ অন্ন-দান।

সাধন করিতে করিতে যদি শরীরের পতন হয়, তবে তাহাই হউক। তাহাতে কি আসে যায়? নিরন্তর সৎসঙ্গের দ্বারা কাল পূর্ণ হইলে ঈশ্বরানুভূতি হইবে। একটা সময় আসে, যখন মানুষ বুঝিতে পারে যে, মানবসেবার জন্য এক ছিলিম তামাক সাজা লক্ষ লক্ষ ধ্যান জপ অপেক্ষা বড় কাজ। যে এক ছিলিম তামাক ঠিকভাবে সাজিতে পারে, সে ধ্যানও ঠিকমত করিতে পারে।

দেবতারা উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত পরলোকগত জীবাত্মা ছাড়া আর কিছুই নন। তাঁহাদের নিকট হইতে আমরা সাহায্য পাইতে পারি।

তিনিই আচার্য, যাঁহার ভিতর দিয়া ঐশী শক্তি ক্রিয়া করে। যে-শরীরের মাধ্যমে আচার্যত্ব লাভ হয়, তাহা অপর সাধারণ লোকের শরীর হইতে ভিন্ন। সে-শরীরকে ঠিকভাবে রাখিবার জন্য একটি বিশেষ যোগ বা বিজ্ঞান আছে। আচার্যের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অত্যন্ত কোমল ও মন অতি সংবেদনশীল, ফলে তিনি সুখ ও দুঃখ তীব্রভাবে অনুভব করিতে সমর্থ হন। বস্তুতঃ তিনি অ-সাধারণ।

জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, হৃদয়বান্ মানুষই জয়লাভ করে এবং ব্যক্তিত্বই সকল সাফল্যের গোপন রহস্য।

নদীয়ার অবতার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে মহাভাবের যেমন বিকাশ হইয়াছিল, তেমনটি আর কোথাও হয় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ একটি শক্তি। কখনও মনে করিও না যে, এটি বা ওটি তাঁহার মত ছিল। কিন্তু তিনি একটি শক্তি, সেই শক্তি এখনও তাঁহার শিষ্যদের ভিতর মূর্ত হইয়া আছে এবং জগতে কার্য করিতেছে। ভাবের দিক দিয়া তিনি এখনও বাড়িয়া চলিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ একই দেহে জীবন্মুক্ত ও আচার্য ছিলেন।

ভক্তিযোগের উপদেশ

রাজযোগ এবং শারীরিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিয়াছি। এখন ভক্তিযোগ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, কোন একটি যোগই অপরিহার্য নয়। আমি তোমাদের নিকট অনেকগুলি পদ্ধতি এবং আদর্শ উপস্থাপিত করিতে চাই, যাহাতে তোমরা নিজ নিজ প্রকৃতির উপযোগী একটি বাছিয়া লইতে পারো; একটি উপযোগী না হইলে অপরটি হয়তো হইতে পারে।

(আমরা আমাদের চরিত্রের আধ্যাত্মিক, মানসিক এবং ব্যাবহারিক—প্রত্যেকটি দিকের সমভাবে উন্নতি করিয়া একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বে পরিণত হইতে চাই) বিভিন্ন জাতি ও ব্যক্তির মধ্যে কোন একটি ভাবের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা তদতিরিক্ত কোন ভাব বুঝিতে পারে না। একটি ভাবেই তাহারা এরূপ অভ্যস্ত হয় যে, অন্য কোনটির প্রতি তাহাদের দৃষ্টি যায় না। সর্বতোমুখী হওয়াই আমাদের প্রকৃত আদর্শ। বস্তুতঃ জাগতিক দুঃখের কারণ—আমরা এতদূর একদেশদর্শী যে, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে পারি না। মনে কর, কোন ব্যক্তি ভূগর্ভস্থ খনি হইতে সূর্যকে নিরীক্ষণ করিল, সে সূর্যকে একভাবে দেখিবে। এক ব্যক্তি ভূপৃষ্ঠ হইতে দেখিল, একজন কুয়াশার ভিতর দিয়া এবং একজন পর্বতের উপর হইতে নিরীক্ষণ করিল। প্রত্যেকের নিকট সূর্যের বিভিন্ন রূপ প্রতিভাত হইবে। নানারূপে প্রতীয়মান হইলেও প্রকৃতপক্ষে সূর্য একই। দৃষ্টি বিভিন্ন হইলেও বস্তু এক, এবং তাহা হইল সূর্য।

প্রত্যেক মানুষের স্বভাব অনুযায়ী একটি বিশেষ প্রবণতা থাকে। সে ঐ প্রবণতা অনুযায়ী কোন আদর্শ এবং আদর্শে উপনীত হইবার কোন পথ গ্রহণ করে। লক্ষ্য কিন্তু সর্বদাই সকলের জন্য এক। রোম্যান ক্যাথলিকরা গভীর ও আধ্যাত্মিক, কিন্তু উদারতা হারাইয়াছে। ইউনিট্যারিয়ানরা উদার, কিন্তু তাঁহাদের আধ্যাত্মিকতা নাই, তাঁহারা ধর্মের উপর পুরোপুরি গুরুত্ব দেন না। (আমরা চাই—রোম্যান ক্যাথলিকদের গভীরতা এবং ইউনিট্যারিয়ানদের উদারতা। আমরা আকাশের মতো উদার এবং সমুদ্রের

মতো গভীর হইব; আমাদের মধ্যে থাকিবে অতিশয় ঐকান্তিক উৎসাহ, অতীন্দ্রিয়বাদীর গভীরতা এবং অজ্ঞেয়বাদীর উদারতা।

আত্মাভিমানী ব্যক্তির নিকট 'পরধর্ম-সহিষ্ণুতা' শব্দটি এক অপ্রীতিকর মনোভাবের সহিত যুক্ত হইয়া রহিয়াছে। সে-নিজেকে উচ্চাসনে বসাইয়া স্বজাতীয়দের করুণার চোখে দেখিয়া থাকে। উহা মনের এক ভয়াবহ অবস্থা। আমরা সকলেই একই পথে একই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছি, কেবল ভিন্ন ভিন্ন মানসিক প্রবৃত্তি অনুযায়ী বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিতেছি। আমাদের মধ্যে বহুভাবের সমাবেশ থাকিবে। চরিত্রে আমরা অবশ্যই বিকাশশীল হইব। আমাদের কেবল অপরের মতগুলি সহ্য করিলেই চলিবে না, উহা অপেক্ষা কঠিনতর কার্য করিতে হইবে—আমাদিগকে সহানুভূতিশীল হইতে হইবে, অপরের অবলম্বিত পথে প্রবেশ করিয়া তাহার আকাঙ্ক্ষা ও ঈশ্বরান্বেষণ-প্রচেষ্টার সহিত সমভাবাপন্ন হইতে হইবে। প্রত্যেক ধর্মেই দুইটি ভাব আছে—ইতিবাচক ও নেতিবাচক। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যখন আপনারা খ্রীষ্টধর্মের অবতারবাদ, ত্রিত্ববাদ, যীশুর মাধ্যমে মুক্তিলাভ ইত্যাদি বলেন, তখন আমি আপনাদের সহিত একমত। আমি বলিব, অতি উত্তম, আমিও উহা সত্য বলিয়া জানি। কিন্তু যখনই আপনারা বলিতে থাকিবেন, 'আর কোন প্রকৃত ধর্ম নাই, ঈশ্বরের আর কোন প্রকাশ নাই', তখন আমি বলিব—থামুন, আমি আপনাদের সঙ্গে একমত নই। প্রত্যেক ধর্মেরই প্রচার করিবার, মানুষকে শিক্ষা দিবার মতো বাণী আছে। কিন্তু যখনই উহা প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করে, অন্যকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করে, তখনই উহা নেতিবাচক ও ভয়াবহ মনোভাব অবলম্বন করে এবং কোথা হইতে আরম্ভ করিবে, কোথায় বা শেষ করিবে—জানে না।

শক্তি মাত্রই আবর্তিত হয়। মনুষ্যনামধারী শক্তি অনন্ত ঈশ্বর হইতে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছে এবং তাঁহার কাছেই ফিরিয়া আসিবে। ঈশ্বর-সমীপে প্রত্যাবর্তনের জন্য দুইটি পন্থার একটিকে গ্রহণ করিতে হইবে—প্রকৃতির সঙ্গে মন্থর গতিতে ভাসিয়া চলা, অথবা অন্তর্নিহিত শক্তির সাহায্যে গতিপথে থামিয়া যাওয়া। এই শক্তিকে অপ্রতিহত গতিতে চলিতে দিলে উহা আমাদিগকে চক্রাকার পথে ঈশ্বর-সমীপে লইয়া যাইবে, প্রবলবেগে ঘুরিয়া দাঁড়াইবে এবং সোজা পথে ঈশ্বর দর্শন করাইবে। যোগীরা ইহাই অভ্যাস করিয়া থাকেন।

আমি বলিয়াছি, প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার প্রকৃতি অনুযায়ী আদর্শ নিরূপণ করিবে। এই আদর্শকে তাহার 'ইষ্ট' বলা হয়। ইহাকে অবশ্যই পবিত্র—অতএব গোপনীয় রাখিতে হইবে এবং ঈশ্বরের উপাসনা করিলে ইষ্টভাবেই করিবে। ঐ বিশিষ্ট পন্থা নিরূপণের উপায় কি? ইহা অতীব দুরূহ, কিন্তু উপাসনায় অধ্যবসায়ী হইলে উহা আপনা হইতে প্রকাশ পাইবে। মানুষের নিকট ভগবানের তিনটি বিশেষ দান আছে—মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্ব, মহাপুরুষ-সংশ্রয়।

সগুণ ঈশ্বর ব্যতিরেকে আমাদের ভক্তিভাব আসিতে পারে না। প্রেমিক এবং প্রেমাস্পদ উভয়েরই প্রয়োজন। ঈশ্বরকে অনন্তগুণসম্পন্ন মানব বলা যাইতে পারে। তিনি এরূপ হইতে বাধ্য, কারণ যতক্ষণ আমরা মনুষ্যদেহধারী, আমাদের ঈশ্বরও মনুষ্যরূপী হইবেন। সগুণ ঈশ্বরের চিন্তা না করিয়া আমরা পারি না। ভাবিয়া দেখুন, জগতের কোন বস্তুকেই আমরা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তুরূপে চিন্তা করিতে পারি না। সর্বত্রই আমরা বস্তুর সঙ্গে স্বীয় মনকে সংযুক্ত করিয়া লই। বস্তুতঃ প্রকৃত চেয়ার হইতেছে চেয়ার ও মনের উপর চেয়ার-বস্তুটির প্রতিক্রিয়ার সংযোগ। প্রতিটি বস্তুকে প্রথমে মনের দ্বারা রঞ্জিত করিতে হইবে, তবেই উহা যথার্থরূপে দৃষ্ট হইবে। উদাহরণ-স্বরূপ—সাদা, চারকোনা, উজ্জ্বল, শক্ত বাক্সটি কেহ তিনটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে দেখিল, কেহ চারিটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে, অপর একজন পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে দেখিল। শেষোক্ত ব্যক্তিই বস্তুর পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপ দেখিতে পাইবে। প্রত্যেকে ক্রমে ক্রমে একটি অধিক গুণ-সমন্বিত দেখিতে পাইল। এইরূপে যদি কোন ব্যক্তি ছয়টি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সেই একই বাক্সটি দেখে, সে উহাতে অতিরিক্ত আর একটি গুণ দেখিতে পাইবে।

আমি প্রেম ও জ্ঞান দেখিতে পাইতেছি বলিয়াই জানি যে, জগৎ-কারণ সেই প্রেম ও জ্ঞান প্রকাশ করিতেছেন। যাহা আমার মধ্যে প্রেম সৃষ্টি করিল, তাহা কিরূপে প্রেমশূন্য হইতে পারে? জগৎ-কারণকে আমরা মনুষ্যগুণবর্জিত চিন্তা করিতে পারি না। সাধনার প্রথম সোপান হিসাবে ঈশ্বরকে পৃথগ্‌ভাবে দেখার আবশ্যকতা আছে। ঈশ্বরকে তিনভাবে চিন্তা করা যায়: নিম্নতম ভাব—যখন আমরা ঈশ্বরকে আমাদেরই মতো দেহধারী দেখিতে পাই, রোমক শিল্পকলা দেখুন; উচ্চতর ভাব—যখন ঈশ্বরের

মধ্যে মানবের গুণাবলী আরোপ করি এবং এইভাবে চলিতে থাকি। সর্বশেষ উচ্চতম ভাব—তাঁহাকে ঈশ্বররূপে দেখি।

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, এই সকল ধাপেই আমরা ঈশ্বর এবং কেবল ঈশ্বরকেই দেখিতেছি। সেখানে কোন মিথ্যা কল্পনা বা ভ্রান্তি নাই। যেমন সূর্য বিভিন্ন দূরত্ব হইতে দৃষ্ট হইলেও তাহা সূর্যই, চন্দ্র বা অন্য কোন পদার্থ নয়।

আমরা ঈশ্বরকে আমাদেরই অনুরূপ না দেখিয়া পারি না—তাঁহাকে আমাদের অপেক্ষা অনন্তগুণসম্পন্ন দেখিলেও আমাদেরই মতো ধরিয়া লই। আমরা নিরপেক্ষ অনন্ত ঈশ্বরের চিন্তা করিতে চেষ্টা করিলেও তাঁহাকে ভালবাসিবার জন্য আপেক্ষিক ভূমিতে নামিয়া আসি।

প্রত্যেক ধর্মেই ভগবানের প্রতি ভক্তি দুই ভাগে বিভক্ত; এক প্রকারের ভক্তি—মূর্তি আচার-অনুষ্ঠান ও শব্দের মাধ্যমে এবং অন্যরূপ ভক্তি প্রেমের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই জগতে আমরা নানা নিয়মে বদ্ধ, আর এই নিয়ম ভঙ্গ করিয়া আমরা মুক্ত হইবার জন্য সর্বদা চেষ্টা করিতেছি, প্রকৃতিকে অমান্য করিতে এবং পদদলিত করিতে সর্বদা চেষ্টা করিতেছি। উদাহরণস্বরূপ প্রকৃতি আমাদের বাসস্থান দেয় না, আমরা উহা নির্মাণ করিয়া লই। প্রকৃতি আমাদিগকে অনাবৃতভাবেই সৃষ্টি করিয়াছে, আমরা বস্ত্রদ্বারা নিজেদের আবৃত করিয়াছি। মানুষের লক্ষ্য হইল মুক্ত হওয়া; যে পরিমাণে আমরা প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিতে অসমর্থ, সেই পরিমাণে আমাদের কষ্ট ভোগ করিতেই হইবে। নিয়মের বাহিরে যাইবার জন্যই আমরা প্রথমে নিয়ম মানিয়া চলি, নিয়ম মানিয়া না চলাই হইল সমগ্র জীবনের সংগ্রাম। এই কারণেই আমি 'ক্রিশ্চান সায়ান্টিস্ট'দের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া থাকি; তাঁহারা মানবের স্বাধীনতা ও আত্মার দেবত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়া থাকেন। আত্মা সর্বপ্রকার পারিপার্শ্বিকতার উর্ধ্বে। 'এই জগৎ আমার পিতার রাজ্য, আমিই ইহার উত্তরাধিকারী'—এই ভাবটি মানুষকে গ্রহণ করিতে হইবে। 'আমার নিজ আত্মা সকলকে জয় করিতে পারে।'

মুক্তি লাভ করিবার পূর্বে আমাদিগকে নিয়মের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। বাহিরের সাহায্য, প্রণালী, আচার-অনুষ্ঠান, মত, পথ প্রভৃতির নির্দিষ্ট স্থান রহিয়াছে এবং যতদিন না আমরা সাধনায় দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ হই, ততদিন এগুলি আমাদের সাহায্য করিবে এবং শক্তি দিবে। পরে

আর ঐগুলির প্রয়োজন থাকে না। এগুলি যেন আমাদের ধাত্রীস্থানীয়, অতএব শৈশবে অপরিহার্য। গ্রন্থাদিও ধাত্রীর কাজই করিয়া থাকে, কিন্তু আমাদের চেষ্টা করিয়া সেই অবস্থায় উপনীত হইতে হইবে, যেখানে মানুষ উপলব্ধি করিবে, সে তাহার শরীরের প্রভু। গাছ-গাছড়া, ঔষধ প্রভৃতির প্রভাব আমাদের উপর ততক্ষণই থাকে, যতক্ষণ আমরা ঐগুলির সাহায্য স্বীকার করি; সবল হইলে বাহিরের নিয়ম-পদ্ধতির কোন আবশ্যকতা থাকে না।

ভক্তিপথে শব্দের কার্যকারিতা

দেহ মনেরই স্থূল রূপ মাত্র। মন কতকগুলি সূক্ষ্ম স্তর আর দেহ কতকগুলি স্থূল স্তরের দ্বারা গঠিত। মনের উপর পূর্ণ আধিপত্য লাভ করিতে সমর্থ হইলে মানুষ দেহকেও বশীভূত করিতে পারে। প্রত্যেক মনের যেমন বিশেষ দেহ থাকে, তেমনি প্রত্যেক শব্দের একটি বিশেষ চিন্তা বা ভাব আছে। ক্রুদ্ধ হইলে আমরা সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ ব্যবহার করি—'আহাম্মক,' 'মূর্খ' ইত্যাদি; আবার দুঃখিত হইলে কোমল হ্রস্ব স্বরবর্ণ উচ্চারণ করি—'আহা!' এগুলি অবশ্য ক্ষণিক মনোভাব মাত্র, কিন্তু প্রেম, শান্তি, স্থৈর্য, আনন্দ, পবিত্রতা প্রভৃতি সকল ধর্মেই কতকগুলি চিরন্তন মনোভাব আছে। ঐ-সকল ভাব প্রকাশ করিবার বিশিষ্ট শব্দরাশি আছে। মানুষের উচ্চতম ভাবরাশির একমাত্র প্রতীক হইতেছে শব্দ। শব্দ চিন্তা হইতে জাত। আবার এই শব্দগুলি হইতে চিন্তারাশি বা ভাবরাশি জাত। এখানেই শব্দের সাহায্য প্রয়োজন। এরূপ শব্দগুলির প্রত্যেকটি শব্দ যেন এক-একটি প্রতীক। এ-সকল রহস্যপূর্ণ পবিত্র শব্দরাশি আমরা জানি এবং বুঝিতে পারি, কিন্তু কেবল গ্রন্থাদিতে পড়িলেই ঐগুলি আমাদের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না। শব্দগুলি ভাবপূর্ণ হইলে এবং সাধনা করিয়া যিনি স্বয়ং ভগবানের স্পর্শ লাভ করিয়াছেন এবং এখনও ভাগবত জীবন যাপন করেন, এরূপ ব্যক্তির স্পর্শ থাকিলে ঐগুলি ফলপ্রদ হয়। একমাত্র তিনিই ঐ ভাব-প্রবাহকে গতিদান করিতে সমর্থ। খ্রীষ্ট-দ্বারা চালিত প্রবাহ-পথেই শক্তিসঞ্চারের কার্য চলিয়া আসিতেছে। যাঁহার মধ্যে এই শক্তি-সঞ্চারের ক্ষমতা আছে, তিনিই গুরু। উত্তম আচার্যদের ঐ শব্দ-

প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না, যেমন যীশুখ্রীষ্টের। সাধারণ আচার্যগণও শব্দের মাধ্যমে এই শক্তি সঞ্চার করিয়া থাকেন।

অপরের দোষ দেখিবে না। দোষ দেখিয়া কাহাকেও বিচার করা যায় না। এ যেন ভূমিতে পতিত পচা অপক্ক অপরিণত আপেলগুলি দেখিয়া গাছটির বিচার করা। এইভাবে মানুষের ত্রুটিবিচ্যুতি দ্বারা তাহার চরিত্রের বিচার হইতে পারে না। স্মরণ রাখিতে হইবে, দুষ্টলোক পৃথিবীর সর্বত্রই একরূপ। চোর এবং হত্যাকারী এশিয়া, আমেরিকা ও ইওরোপে সমভাবেই দেখা যায়। তাহারা নিজেদের লইয়া একটি স্বতন্ত্র জাতি সৃষ্টি করিয়াছে। সৎ, পবিত্র ও সবল ব্যক্তিদের মধ্যেই বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। অপরের মধ্যে অসাধুতা দেখিবার চেষ্টা করিও না। অজ্ঞতা ও দুর্বলতাই হইল অসাধুতা। মানুষকে দুর্বল বলিয়া লাভ কি? সমালোচনা আর ধ্বংসমূলক আলোচনা নিষ্ফল। মানুষকে উচ্চতর কিছু দিতে হইবে। তাহাদের মহৎ স্বভাব এবং জন্মগত অধিকার সম্বন্ধে অবহিত কর। আরও অধিক লোক কেন ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হয় না? কারণ খুব কম লোকই পঞ্চেন্দ্রিয়াতিরিক্ত কোন আনন্দের সংবাদ রাখে। অধিকাংশ ব্যক্তিই স্বীয় অন্তর্জগতের ব্যাপার—চক্ষু থাকিতেও দেখিতে পায় না, কর্ণ থাকিতেও শুনিতে পায় না।

এখন আমরা দেখিব—প্রেমের সহিত উপাসনা কি। বলা হয় যে, 'গির্জায় অর্থাৎ কোন সম্প্রদায়ে জন্মানো ভাল, কিন্তু সেখানে মরা ভাল নয়।' চারাগাছ চারিপার্শ্বের বেড়া হইতে সহায়তা এবং আশ্রয় লাভ করে, কিন্তু কালে সেই বেড়া তুলিয়া না লইলে বৃক্ষটি সবল হইতে বা বাড়িতে পারিবে না। বাহ্য পূজা যে একটি প্রয়োজনীয় সোপান, তাহা আমরা দেখিয়াছি, কিন্তু ধীরে ধীরে ক্রমোন্নতির সঙ্গে সেই সোপান অতিক্রম করিয়া উচ্চতর অবস্থায় আরোহণ কর। ঈশ্বরে পরিপূর্ণ প্রেম হইলে তিনি যে সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান্—এ-সব বড় বড় বিশেষণের কথা আর চিন্তা করিও না। আমরা ঈশ্বরের নিকট কিছুই চাই না বলিয়া তাঁহার গুণাবলী লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন বোধ করি না। ভগবানের প্রতি প্রেমই আমাদের একমাত্র কাম্য, কিন্তু তখনও সগুণ ঈশ্বরের ভাব আমাদিগকে অনুসরণ করিতে থাকে, আমরা মনুষ্যভাবের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারি না, লাফ দিয়া দেহভাবের বাহিরে যাইতে পারি না; সুতরাং আমরা যেভাবে পরস্পরকে ভালবাসি, ঈশ্বরকেও সেইভাবে ভালবাসিব।

মানব-প্রেমের পাঁচটি স্তর আছে:

১. অতি সাধারণ এবং নিম্নতম ক্রম হইল—'শান্ত' প্রেম, তখন আমরা আশ্রয়, আহার ও সর্ববিধ প্রয়োজনের জন্য পিতার উপর নির্ভর করি।

২. দাস্যপ্রেম: যে-প্রেম আমাদিগকে সেবার প্রেরণা দেয়। ভৃত্য যেমন প্রভুকে সেবা করে—মানুষ ভগবান্‌কে সেইভাবে সেবা করিবার আকাঙ্ক্ষা করে। এই সেবার ভাব অন্যান্য ভাবের উপরে প্রাধান্য বিস্তার করে; তখন প্রভু সৎ কি অসৎ, দয়ালু কি নির্দয়, সে-সম্বন্ধে আমরা উদাসীন হইয়া যাই।

৩. সখ্য-প্রেম: বন্ধুর প্রতি বন্ধুর ভালবাসা, সমানে সমানে ভালবাসা, সঙ্গীর প্রতি সঙ্গীর ভালবাসা, খেলার সাথীর প্রতি খেলার সাথীর ভালবাসা। মানুষ তখন ভগবান্‌কে নিজ সহচর বলিয়া অনুভব করে।

৪. বাৎসল্য-প্রেম: ভগবান্‌কে সন্তানভাবে দেখা। ভারতে এই বাৎসল্য-ভাবটি পূর্বোক্ত সখ্য এবং শান্ত প্রেম হইতে উচ্চতর গণ্য হইয়া থাকে, কারণ ইহাতে ভয়ের বিন্দুমাত্র স্থান নাই।

৫. মধুর-প্রেম: স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে প্রেম; ভালবাসার জন্যই ভালবাসা —ভগবান্‌ই শ্রেষ্ঠ প্রেমাস্পদ।

এই মধুর-ভাবটি সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে: চারি চক্ষুর মিলন হওয়ায় দুটি আত্মার মধ্যে পরিবর্তন ঘটিতে লাগিল; প্রেম দুই আত্মার মধ্যবর্তী হইয়া দুইকে এক করিয়া দিল।

যখন কোন ব্যক্তি শেষোক্ত পূর্ণ প্রেমের অধিকারী হয়, তখন তাহার সমস্ত বাসনা চলিয়া যায়। পূজাপদ্ধতি আচার-অনুষ্ঠান গির্জা—কোন কিছুরই সে অপেক্ষা রাখে না। সকল ধর্মের লক্ষ্য—মুক্তির বাসনা পর্যন্ত ত্যাগ, জন্ম মৃত্যু এবং অন্যান্য বন্ধন হইতে মুক্তির ভাবও ত্যাগ করিতে হয়। সেই উচ্চতম প্রেমে স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ নাই, কারণ শ্রেষ্ঠ প্রেমে পরিপূর্ণ একত্ব-বোধ হয়; স্ত্রী-পুরুষ-জ্ঞানে শারীরিক ভেদবুদ্ধি থাকে। সুতরাং মিলন একমাত্র আত্মাতেই সম্ভব। আমাদের দেহবোধ যতই ক্ষীণ হইবে, প্রেম ততই পূর্ণ হইবে; অবশেষে যাবতীয় দেহজ্ঞান দূরীভূত হইয়া দুটি আত্মা এক হইয়া যাইবে। প্রেমকে আমরা চিরদিন ভালবাসি। রূপ অতিক্রম করিয়া প্রেম অরূপকে দর্শন করে। লোকে বলে—'প্রেমিক

ইথিওপের ললাটে হেলেনের সৌন্দর্য দেখিয়া থাকে।' ইথিওপ একটি ইঙ্গিত মাত্র। এই ইঙ্গিতের উপর মানুষ স্বীয় প্রেম অর্পণ করে। শুক্তি যখন উত্তেজক পদার্থগুলি পরিত্যাগ করে, তখন দেখিতে পায়, মধ্যে যে বস্তু রহিয়াছে, উহা উত্তেজক পদার্থগুলিকে সুন্দর মুক্তাতে পরিণত করে; মানুষও তেমনি প্রেমের বিস্তার করে; প্রেমই মানুষের সর্বোচ্চ আদর্শ এবং এই আদর্শই চিরদিন স্বার্থশূন্য, সুতরাং মানুষ প্রেমকেই ভালবাসে। ভগবান্ প্রেম-স্বরূপ। আমরা ভগবান্‌কে ভালবাসি অর্থাৎ প্রেমকেই ভালবাসি। প্রেম আমরা প্রত্যক্ষ করি মাত্র। প্রেমকে ব্যক্ত করা যায় না। মূক ব্যক্তি মাখন আস্বাদন করিলেও মাখনের গুণাগুণ ব্যক্ত করিতে পারে না। মাখন মাখনই এবং যাহারা মাখন আস্বাদ করে নাই, তাহাদের নিকট ইহার গুণাবলী প্রকাশ করা যায় না। প্রেমের জন্যই প্রেম—ইহা যাহারা প্রেম অনুভব করে নাই, তাহাদিগের নিকট প্রকাশ করা যায় না।

প্রেমকে একটি ত্রিভুজের সহিত তুলনা করা যায়। উহার প্রথম কোণটি হইল—প্রেম কখনও যাচ্ঞা করে না, কোন কিছু প্রার্থনা করে না। দ্বিতীয় কোণ—প্রেমের মধ্যে ভয়ের স্থান নাই; তৃতীয় এবং চরম কোণ—প্রেমের জন্যই প্রেম। প্রেমের প্রভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি সূক্ষ্মতর এবং উন্নততর হয়। জাগতিক সম্পর্কে চরম প্রেম দুর্লভ, কারণ মানবীয় প্রেম প্রায় সর্বদাই পারস্পরিক এবং সাপেক্ষ। কিন্তু ঈশ্বর-প্রেম এক অবিচ্ছিন্ন ধারার মতো, উহাকে কোন কিছুই ব্যাহত বা রুদ্ধ করিতে পারে না। মানুষ যখন ঈশ্বরকে তাহার শ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে ভালবাসে—ভিক্ষুকের মতো নয় অথবা কোন আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য নয়, তখন সেই প্রেম চরম ক্রমবিকাশের স্তরে উপনীত হইয়া জগতে এক মহাশক্তিরূপে পরিণত হয়। এ-সকল অবস্থায় পৌঁছিতে সুদীর্ঘ সময় লাগে। আমাদের স্বভাবগত ভাবের সাহায্যেই আমাদিগকে প্রথমে অগ্রসর হইতে হইবে। কেহ সেবার ভাব লইয়া জন্মায়, কেহ বা মাতৃ-প্রেম লইয়া জন্মগ্রহণ করে। যে ভাবেই হউক, ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক-স্থাপনে আমাদের নিজ নিজ প্রকৃতির সুযোগ লইতে হইবে।

জগতের কল্যাণ-সাধন

আমাকে প্রশ্ন করা হয়—তোমাদের ধর্ম সমাজের কোন্ কাজে লাগে? সমাজকে সত্য-পরীক্ষার কষ্টিপাথর করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা অত্যন্ত

অযৌক্তিক। সমাজ আমাদের ক্রমোন্নতির একটি সোপান মাত্র—ইহা অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। নতুবা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের গুণাগুণ এবং প্রয়োজনীয়তাও শিশুর প্রয়োজনের মাপকাঠিতে বিচার করিতে হয়। ইহা অত্যন্ত আসুরিক। সামাজিক অবস্থা চিরস্থায়ী হইলে উহা শিশুর চিরকাল শিশু থাকার অনুরূপ হইবে। শিশু কখনই পূর্ণ মানব হইতে পারিবে না; ব্যবহারের বা অর্থের দিক হইতে শব্দগুলি পরস্পরবিরুদ্ধ, সুতরাং নির্দোষ সমাজও অসম্ভব। মানুষকে শৈশব অবস্থার ভিতর দিয়াই বড় হইতে হইবে। কোন একটি বিশেষ অবস্থায় সমাজ ভাল হইতে পারে, কিন্তু উহাই আমাদের চরম লক্ষ্য হইতে পারে না; কারণ সমাজ অবিরত পরিবর্তনশীল প্রবাহ মাত্র। দম্ভ এবং অহমিকাপূর্ণ বর্তমান বণিক-সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য। এ-সবই 'লর্ড মেয়রের প্রদর্শনী'র মতো।

জগৎ ব্যক্তির মধ্য দিয়া চিন্তাশক্তির বিকাশ প্রত্যক্ষ করিতে চায়। আমার গুরুদেব বলিতেন—'তুমি তোমার নিজের হৃদয়পদ্ম প্রস্ফুটিত করিতেছ না কেন? অলিকুল আপনা হইতে আসিবে।' জগতে এখন ভগবদ্‌ভাবে তন্ময় লোকের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। প্রথমে নিজের উপর বিশ্বাসবান্ হও, তাহা হইলেই ভগবানে বিশ্বাস আসিবে। জগতের ইতিহাস হইল—পবিত্র, গম্ভীর, চরিত্রবান্ এবং শ্রদ্ধাসম্পন্ন কয়েকটি মানুষের ইতিহাস। আমাদের তিনটি বস্তুর প্রয়োজন—অনুভব করিবার হৃদয়, ধারণা করিবার মস্তিষ্ক এবং কাজ করিবার হাত। প্রথমে নির্জনে থাকিয়া নিজেকে উপযুক্ত যন্ত্রে পরিণত করিতে হইবে। নিজেকে একটি তড়িৎ-উৎপাদক যন্ত্র করিয়া তুলিতে হইবে। প্রথমে জগতের লোকের জন্য অনুভব কর। যখন সকলেই কাজের জন্য প্রস্তুত, তখন হৃদয়বান্ ব্যক্তি কোথায়? কোথায় সেই হৃদয়বত্তা, যাহা ইগনেসিয়াস লয়লাকে সৃষ্টি করিয়াছিল? তোমার বিনয় এবং প্রেম পরীক্ষা করিয়া দেখ। যাহার ঈর্ষা আছে, সে বিনয়ী বা প্রেমিক হইতে পারে না। ঈর্ষা এক বীভৎস এবং ভয়ঙ্কর পাপ। ইহা মানুষের মধ্যে রহস্যজনকভাবে প্রবেশ করে। নিজেকে প্রশ্ন কর—ঈর্ষা এবং হিংসায় তোমার কোন প্রতিক্রিয়া হয় কি? হিংসা এবং ঈর্ষার জন্য জগতে বার বার বহু আরব্ধ সৎকার্য বিনষ্ট হইয়াছে। যদি তুমি পবিত্র হও, যদি তুমি বলবান্ হও, তাহা হইলে তুমি একাই সমগ্র জগতের সমকক্ষ হইতে পারিবে।

সৎকর্ম-সাধনের দ্বিতীয় অঙ্গ—ধারণার জন্য মস্তিষ্ক, ইহা শুষ্ক সাহারা-মরুতুল্য, কারণ বুদ্ধি একা কিছুই করিতে সমর্থ হয় না, যদি উহার পশ্চাতে হৃদয়বত্তা না থাকে। প্রেম অবলম্বন কর, প্রেম কোন কালে ব্যর্থ হয় না। প্রেম থাকিলে মস্তিষ্ক ধারণা করিতে পারিবে, হস্ত সৎকর্ম করিতে পারিবে। ঋষিরা ধ্যান-ধারণা করিয়া ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন। 'যাহাদের হৃদয় পবিত্র, তাহারা ঈশ্বর দর্শন করিবে।' সকল মহাপুরুষই ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন বলিয়া দাবি করেন। হাজার হাজার বৎসর পূর্বে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ দর্শন হইয়াছে, এবং অতীন্দ্রিয় একত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, এবং আমরা এখন সেই গৌরবোজ্জ্বল চিত্রের পরিকল্পনাটি পূর্ণ করিতে পারি মাত্র।

বাহ্যপূজা

১০ই এপ্রিল, ১৯০০ খৃঃ আমেরিকার সান ফ্রান্সিস্কো শহরে প্রদত্ত বক্তৃতা

আপনাদের মধ্যে যাঁহারা বাইবেল পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন, ইহুদি-জাতির সমগ্র ইতিহাস এবং চিন্তাধারার মূলে রহিয়াছেন দুই শ্রেণীর শিক্ষক—পুরোহিত ও ধর্মগুরুগণ। পুরোহিতগণ রক্ষণশীলতার এবং ধর্মগুরুগণ প্রগতিশীলতার প্রতীক। মোট কথা এই সমাজে ক্রমে ক্রমে গোঁড়া আনুষ্ঠানিকতা প্রবেশ করে, বাহ্য আচার সব কিছুকে অধিকার করিয়া বসে। প্রত্যেক দেশ এবং প্রত্যেক ধর্মের ক্ষেত্রেই ইহা সত্য। তারপর কয়েকজন সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষ নূতন দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া আবির্ভূত হন। তাঁহারা নূতন ভাব ও নূতন আদর্শ প্রচার করেন এবং সমাজকে গতিশীল করিয়া তুলেন। কয়েকপুরুষ যাইতে না যাইতেই শিষ্যগণ নিজ নিজ গুরুর প্রচারিত ভাবসমূহের প্রতি এত বেশী অনুরক্ত হইয়া পড়ে যে, ঐগুলি ছাড়া তাহারা অন্য কিছু দেখিতে পায় না। এই যুগের সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল এবং উদার মতাবলম্বী প্রচারকগণও কয়েক বৎসরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গোঁড়া পুরোহিতে পরিণত হইবেন। আবার প্রগতিবাদী মনীষিগণও—কাহারও মধ্যে সামান্য প্রগতি দেখিলে উহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে আরম্ভ করিবেন। তাঁহাদের চিন্তাধারা অতিক্রম করিয়া সমাজ অগ্রসর হউক—ইহা তাঁহারা চাহিবেন না। যাহা কিছু যেভাবে চলিতেছে, ঐভাবে চলিলেই তাঁহারা সন্তুষ্ট।

প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক ধর্মের প্রাথমিক নীতিগুলির মধ্যে যে শক্তি কাজ করে, তাহা ধর্মের বাহ্যরূপে প্রকাশিত হয়।…নীতি বা গ্রন্থ, কতকগুলি নিয়ম, বিশেষ প্রকারে অঙ্গ-সঞ্চালন, দাঁড়ানো বা বসিয়া পড়া—এ-সবই উপাসনার পর্যায়ভুক্ত। অধিকসংখ্যক লোক যাহাতে ধারণা করিতে পারে, সে-জন্য পূজা স্থূল রূপ পরিগ্রহ করে। প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ লোকই ভাবকে কখনও ভাবরূপে পূজা করে না। ইহা এখনও সম্ভব হইয়া উঠে নাই। ভবিষ্যতে যে কোনদিন হইবে, তাহাও মনে হয় না। এই শহরের কয় সহস্র ব্যক্তি ঈশ্বরকে একটি ভাবরূপে পূজা করিবার জন্য প্রস্তুত? অতি সামান্যই। মানুষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে বাস করে, তাই ঐরূপ করিতে পারে না। মানুষকে

আরও পূর্ব হইতে ধর্ম-ভাব দিতে হইবে। তাহাকে স্থূলভাবে কিছু করিতে বলোঃ কুড়িবার উঠিতে এবং কুড়িবার বসিতে বলো, সে উহা বুঝিবে। তাহাকে এক নাসারন্ধ্র দিয়া শ্বাস গ্রহণ করিতে এবং অপর রন্ধ্র দিয়া নিঃশ্বাস ফেলিতে বলো—সে উহা বুঝিবে। নিছক ভাবগত আদর্শ মানুষ মোটেই গ্রহণ করিতে পারে না। ইহা তাহাদের দোষ নয়।…ঈশ্বরকে ভাবরূপে পূজা করার শক্তি যদি তোমার থাকে, তবে উত্তম। কিন্তু এমন এক সময় ছিল, যখন তুমি উহা পারিতে না।…লোকেরা যদি স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে ধর্ম সম্বন্ধে ধারণাগুলি অপরিণত এবং ধর্মের বহিরঙ্গগুলি স্থূল ও অমার্জিত হইয়া পড়ে। লোকেরা যদি মার্জিত ও শিক্ষিত হয়, তাহাদের বাহ্য অনুষ্ঠানগুলি আরও সুন্দর হয়। বাহ্য অনুষ্ঠানাদি থাকিবে, সেগুলি শুধু কালের প্রয়োজনে পরিবর্তিত হইবে।

ইহা আশ্চর্য যে, মুসলমান ধর্ম বাহ্যপূজার যে ভাবে বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে, পৃথিবীতে অন্য কোন ধর্ম কখনও সেরূপ করে নাই।…চিত্র, স্থাপত্য বা সঙ্গীত মুসলমানদের থাকিতে পারিবে না, কেন-না এইগুলি বাহ্যপূজার সহায়ক। জনসাধারণের সঙ্গে পুরোহিতের কখনও যোগাযোগ হইবে না, হইলেই পার্থক্যের সৃষ্টি হইবে। এইভাবে কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু তবু পয়গম্বরের দেহত্যাগের পর দুই শতাব্দী যাইতে না যাইতেই সাধু-সন্তের পূজা প্রবর্তিত হইল। এইখানে সাধুর পায়ের অঙ্গুষ্ঠ! ঐখানে তাঁহার গাত্রচর্ম!—এইভাবে চলিতে লাগিল। বাহ্যপূজা আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অন্যতম সোপান এবং আমাদিগকে উহার মধ্য দিয়াই যাইতে হইবে।

সুতরাং বাহ্যপূজার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা না করিয়া উহার যেটুকু ভাল, তাহা গ্রহণ করা উচিত, এবং অন্তর্নিহিত ভাবগুলি বিবেচনা করিয়া দেখা কর্তব্য। অবশ্য সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের পূজা বলিতে গাছ-পাথরের পূজাই বুঝায়। প্রত্যেক অমার্জিত ও অশিক্ষিত ব্যক্তিই যে-কোন পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া উহাতে নিজস্ব ভাব যোগ করিয়া দিবে, তাহাতেই তাহার সাহায্য হইবে। সে একখণ্ড অস্থি বা পাথর পূজা করিতে পারে। বাহ্যপূজার এই সকল অপরিণত অবস্থায় মানুষ কিন্তু কখনও পাথরকে পাথর হিসাবে বা গাছকে গাছ হিসাবে পূজা করে নাই,—সাধারণ বুদ্ধি দ্বারাই তোমরা এটুকু জানো। পণ্ডিতেরা অনেক সময় বলেন—মানুষ গাছ-পাথরের পূজা করিত।

এ-সবই অর্থহীন। মানবজাতি যে-সকল নিম্নস্তরের পূজানুষ্ঠানের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছে, বৃক্ষ-পূজা ঐগুলির অন্যতম। প্রকৃতপক্ষে কখনই মানুষ ভাব ছাড়া অন্য কিছুরই পূজা করে নাই। মানুষ ভাবস্বরূপ এবং ভাব ব্যতীত অন্য কিছুই অনুভব করিতে পারে না। দেবভাবে পূর্ণ মনুষ্যমন সূক্ষ্মভাবকে জড়বস্তুরূপে উপাসনা করার মতো এত বড় ভুল কখনও করিতে পারে না। এই ক্ষেত্রে মানুষ পাথর বা গাছকে ভাবরূপেই চিন্তা করিয়াছে। সে কল্পনা করিয়াছে যে, সেই পরম সত্তার কিছুটা এই পাথর বা গাছে রহিয়াছে এবং ইহাদের মধ্যে আত্মা আছেন। বৃক্ষপূজা এবং সর্পপূজা সর্বদা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। জ্ঞান-বৃক্ষ আছে। বৃক্ষ অবশ্যই থাকিবে এবং সর্পের সহিত ঐ বৃক্ষ কোন-না-কোন ভাবে জড়িত থাকিবে। এগুলি প্রাচীনতম পূজা-পদ্ধতি। সেখানেও দেখিবে, কোন বিশেষ প্রস্তর বা বিশেষ বৃক্ষই পূজিত হইয়াছে—পৃথিবীর যাবতীয় বৃক্ষ এবং যাবতীয় প্রস্তরকে পূজা করা হয় নাই।

বাহ্যপূজার উন্নততর সোপানে ঈশ্বরের বা পূর্বপুরুষদের প্রতিমূর্তিকে পূজা করা হয়। লোকে মৃত ব্যক্তিগণের প্রতিকৃতি এবং ঈশ্বরের কাল্পনিক প্রতিমা নির্মাণ করে। পরে তাহারা ঐগুলি পূজা করে।

আরও উন্নততর পূজা—মৃত সাধু-সন্ত, সজ্জন বা সতী-সাধ্বীদের পূজা। লোকে তাঁহাদের দেহাবশেষ পূজা করে। তাহারা ঐ দেহাবশেষের মধ্যে সাধু-মহাপুরুষগণের উপস্থিতি অনুভব করে এবং মনে করে যে, তাঁহারা তাহাদিগকে সাহায্য করিবেন। তাহারা বিশ্বাস করে যে, ঐ সাধু-মহাপুরুষগণের অস্থি স্পর্শ করিলে তাহাদের রোগ সারিবে। দেহাস্থিটিই যে তাহাদিগকে নিরাময় করিবে তাহা নয়, দেহাস্থির মধ্যে যিনি আছেন, তিনিই তাহাদের রোগ আরোগ্য করিবেন।

এ-সবই নিম্নাঙ্গের পূজা, তথাপি এগুলি পূজা। আমাদিগকে ঐগুলি অতিক্রম করিতে হইবে। বুদ্ধি-বিচারের দিক দিয়া দেখিলে শুধু ঐগুলি যথেষ্ট বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু অন্তরের দিক দিয়া আমরা এগুলি ছাড়িতে পারি না। যদি তুমি কোন ব্যক্তির নিকট হইতে সাধু-মহাপুরুষদের প্রতিমূর্তিগুলি সরাইয়া লও এবং তাহাকে কোন মন্দিরে যাইতে না দাও, তাহা হইলে সে মনে মনে ঐগুলি স্মরণ করিবে। সে উহা না করিয়া পারিবে না। একজন অশীতিবর্ষ বৃদ্ধ আমাকে বলিয়াছিলেন যে, ভগবানের বিষয় ভাবিতে

গেলেই মেঘের উপর উপবিষ্ট দীর্ঘশ্মশ্রুবিশিষ্ট একজন বৃদ্ধ ছাড়া অন্য কাহারও কথা তাঁহার মনে উদিত হয় না। ইহা দ্বারা কি প্রতীত হয়? তাঁহার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় নাই। কোন আধ্যাত্মিক শিক্ষাই তিনি পান নাই এবং মানবিক ভাব ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করিতে তিনি অক্ষম।

বাহ্য উপাসনার আরও একটি উন্নততর সোপান আছে—প্রতীক-উপাসনা। বাহ্যবস্তু সেখানেও বর্তমান, কিন্তু তাহা বৃক্ষ প্রস্তর বা সাধু-মহাত্মাদের স্মৃতিচিহ্ন নয়। ঐগুলি প্রতীক। পৃথিবীতে সর্বপ্রকার প্রতীকই বর্তমান। বৃত্ত অনন্তের একটি মহৎ প্রতীক।...ইহার পর সমচতুর্ভুজ; সুপরিচিত ক্রুশ-প্রতীক এবং ইংরেজী S ও Z পরস্পরকে আড়াআড়িভাবে কাটিয়াছে—এরূপ দুইটি আঙুল প্রভৃতি রহিয়াছে।

কেহ কেহ মনে করে, এই প্রতীকগুলির কোন সার্থকতা নাই।...আবার কেহ কেহ অর্থহীন কোন জাদুমন্ত্র চায়। যদি তুমি উহাদিগকে সহজ সরল সত্য কথা বলো, তবে উহারা গ্রহণ করিবে না।...মানুষের স্বভাবই এই—তাহারা তোমাকে যত কম বুঝে, ততই তোমাকে ভাল ও বড় মনে করে। প্রত্যেক দেশে সব যুগেই এরূপ উপাসকেরা কতগুলি জ্যামিতিক চিত্র এবং প্রতীক দ্বারা বিভ্রান্ত হয়। একদা জ্যামিতি সকল বিজ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল। অধিকাংশ লোকই এই বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিল। তাহাদের বিশ্বাস ছিল, জ্যামিতিবিদ্ একটি সমচতুর্ভুজ অঙ্কিত করিয়া উহার চারি কোণে অর্থহীন জাদুমন্ত্রবিশেষ বলিলেই সমগ্র পৃথিবী ঘুরিতে শুরু করিবে, স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হইবে এবং ভগবান্ অবতরণ করিয়া লাফাইতে থাকিবেন ও মানুষের ক্রীতদাস হইয়া পড়িবেন। দলে দলে এইরূপ উন্মাদ দিবারাত্র এ-সকল বিষয় একাগ্রমনে পড়ে। এ-সবই ব্যাধিবিশেষ। ইহাদের চিকিৎসক প্রয়োজন। দার্শনিকদের জন্য এ-সব নয়।

আমি কৌতুক করিতেছি, কিন্তু এজন্য খুবই দুঃখিত। সমস্যাটি ভারতে অত্যন্ত গুরুতর। এইগুলি জাতির ধ্বংস, অবনতি এবং অবৈধ বলপ্রয়োগের লক্ষণ। তেজ, বীর্য, জীবনীশক্তি, আশা, স্বাস্থ্য এবং যাহা কিছু মঙ্গলকর তাহার লক্ষণই হইল শক্তি। যতদিন শরীর থাকিবে, ততদিন দেহ, মন এবং বাহুতে বল থাকা আবশ্যক। এই-সব অর্থহীন জাদুমন্ত্রবিশেষ দ্বারা অধ্যাত্ম-শক্তি অর্জনের চেষ্টা বিশেষ ভয়ের কারণ—ইহাতে জীবন-নাশের ভয়ও আছে।

প্রতীক-উপাসনা বলিতে আমি ঐগুলি বলি নাই। কিন্তু এই প্রতীকোপাসনায় কিছু সত্য নিহিত আছে। কিছু সত্য ব্যতিরেকে কোন মিথ্যাই দাঁড়াইতে পারে না। কোন বস্তুর বাস্তব সত্তা না থাকিলে উহার অনুকরণও হইতে পারে না।

বিভিন্ন ধর্মে প্রতীক-পূজা বর্তমান। এমন সব প্রতীক আছে, যেগুলি সুন্দর, শক্তিপ্রদ, বলিষ্ঠ এবং ছন্দোময়। ভাবিয়া দেখ, লক্ষ লক্ষ লোকের উপর ক্রুশের কি আশ্চর্য প্রভাব! অর্ধচন্দ্ররূপ প্রতীকের কথা ধর। এই একটি প্রতীকের যে কি আকর্ষণী শক্তি, সে-কথা চিন্তা করিয়া দেখ। পৃথিবীতে সর্বত্রই সুন্দর ও চমৎকার প্রতীকসমূহ বর্তমান। এই প্রতীকসকল ভাব প্রকাশ করে এবং কতগুলি বিশেষ মানসিক অবস্থার সৃষ্টি করে। সচরাচর প্রতীকগুলি বিশ্বাস ও ভালবাসার প্রচণ্ড শক্তি স্ফুরণ করে।

প্রোটেস্টাণ্টদের সঙ্গে ক্যাথলিকদের তুলনা করিয়া দেখ। বিগত চারশত বৎসরের মধ্যে এই দুইটি সম্প্রদায়ের কোন্‌টি হইতে অধিকসংখ্যক সাধক ও শহীদ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? ক্যাথলিকদের ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গীভূত আলোক, ধূপধুনা, মোমবাতি, যাজকদের পোশাক প্রভৃতির একটা স্বকীয় প্রভাব রহিয়াছে। প্রোটেস্টাণ্ট ধর্ম অতি কঠোর এবং গদ্যময়। প্রোটেস্টাণ্টরা অনেক বিষয়ে জয়যুক্ত হইয়াছে, কয়েকটি দিকে ক্যাথলিকদের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে স্বাধীনতা দিয়াছে, সুতরাং তাহাদের ধারণাগুলি স্পষ্টতর এবং অধিকতর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-ভিত্তিক। এই পর্যন্ত ঠিক থাকিলেও তাহারা অনেক কিছু হারাইয়াছে।...গির্জার মধ্যে চিত্রগুলির কথাই ধরা যাক। এগুলি কবিত্ব-শক্তিকে ভাষা দিবার একটি প্রচেষ্টা, কবিতার যদি প্রয়োজন থাকে, তবে কেন আমরা উহা গ্রহণ করিব না? অন্তরাত্মা যাহা চাহিতেছে, তাহা অন্তরাত্মাকে দিব না কেন? আমাদিগকে সঙ্গীতও গ্রহণ করিতে হইবে। প্রেসবিটেরিয়ানরা আবার সঙ্গীতেরও বিরোধী, খ্রীষ্টধর্মাবলম্বিগণের মধ্যে উহারা যেন মুসলমান। সমস্ত কবিতা ধ্বংস হউক! সমস্ত অনুষ্ঠান বিলুপ্ত হউক! তারপর তাহারা আবার সঙ্গীত সৃষ্টি করে, সঙ্গীত ইন্দ্রিয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করে। আমি দেখিয়াছি, কিরূপে তাহারা বক্তৃতামঞ্চের উপর আলোকের জন্য সমবেতভাবে চেষ্টা করে।

বহির্জগতে রূপায়িত কবিতায় ও ধর্মে অন্তঃকরণ পূর্ণ হউক। কেন না হইবে? বাহ্য উপাসনার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পার না—বার বার ইহা সমাজে জয়লাভ করিবে।...ক্যাথলিকরা যাহা করে, তাহা যদি তোমার রুচিসম্মত না হয়, তবে ইহা অপেক্ষা আরও ভাল কিছু কর। কিন্তু আমরা আরও ভাল কিছু করিতেও পারিব না, অথচ যে কবিত্ব পূর্ব হইতে বিদ্যমান, তাহাও গ্রহণ করিব না—এটি এক ভয়ঙ্কর অবস্থা। জীবনে কবিত্ব থাকা একান্ত আবশ্যক। তুমি পৃথিবীতে একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক হইতে পারো, কিন্তু দর্শনশাস্ত্র জগতের শ্রেষ্ঠ কাব্য। ইহা শুষ্ক অস্থি নয়, ইহা সমস্ত বস্তুর সার। যাহা নিত্য সত্তা, তাহা দ্বৈতভাবাপন্ন যে-কোন বস্তু অপেক্ষা অধিকতর কবিত্বপূর্ণ।

পাণ্ডিত্যের স্থান নাই; অধিকাংশের পক্ষেই পাণ্ডিত্য পথের একটি বাধা।...একজন পৃথিবীর সমস্ত গ্রন্থাগারের যাবতীয় পুস্তক পড়িয়াও মোটেই ধার্মিক না হইতে পারে, আর একজন হয়তো নিরক্ষর হইয়াও ধর্ম প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে সমর্থ। নিজের প্রত্যক্ষ অনুভূতিতেই সমগ্র ধর্ম নিহিত। আমি যখন 'মনুষ্যত্ব-লাভের বা মানুষ-গড়ার ধর্ম'—এই শব্দকয়টি ব্যবহার করি, তখন আমি ঐগুলি দ্বারা কোন পুস্তক, অনুশাসন বা মতবাদের কথা বুঝি না। যে-ব্যক্তি সেই অনন্ত সত্তার এতটুকুও তাহার অন্তরে অনুভব করিয়াছে বা ধারণা করিয়াছে, আমি তাহার কথাই বলি।

আমি সারাজীবন যাঁহার পদতলে বসিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছি, যাঁহার কয়েকটি মাত্র ভাব শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিতেছি, তিনি কোনক্রমে তাঁহার নিজের নাম লিখিতে পারিতেন। আমি সমগ্র পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু সারা জীবনে আমি তাঁহার মতো আর একজনকেও দেখিলাম না। তাঁহার সম্বন্ধে ভাবিলে নিজেকে নির্বোধ বলিয়া মনে হয়, কেন-না আমি বই পড়িতে চাই, অথচ তিনি কোনদিনই বই পড়েন নাই। অন্যের উচ্ছিষ্ট তিনি কখনও গ্রহণ করিতে চাহিতেন না অর্থাৎ অন্যের চিন্তাধারাকে কোনদিন তিনি নকল করিবার চেষ্টা করেন নাই। এই কারণে তিনি নিজেই নিজের বই ছিলেন। সারা জীবন জ্যাক (Jack) কি বলিল, জন (John) কি বলিয়াছে—তাহাই বলিয়া আসিতেছি; নিজে কিছুই বলিলাম না। জন পঁচিশ বৎসর পূর্বে এবং জ্যাক পাঁচ বৎসর পূর্বে যাহা বলিয়াছে, তাহা

জানিয়া তোমার কী লাভ হইয়াছে? তোমার নিজের কি বলিবার আছে, তাহা বলো।

মনে রাখিও—পাণ্ডিত্যের কোন মূল্য নাই। পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে তোমাদের সকলেরই ধারণা ভুল। মনকে বলিষ্ঠ ও সুনিয়ন্ত্রিত করার মধ্যেই জ্ঞানের একমাত্র মূল্য। আমি অবাক হইতেছি যে, অনন্ত কাল ধরিয়া এই গলাধঃকরণের দ্বারা আমাদের বদহজম হইতেছে না কেন! আমাদের এইখানেই থামিয়া যাবতীয় পুস্তক পুড়াইয়া ফেলা প্রয়োজন এবং নিজেদের অন্তরে চিন্তা করা কর্তব্য। তোমরা অনেক বিষয়ে কথা বলো এবং তোমাদের 'ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য'কে হারাইবার আশঙ্কায় চঞ্চল হইয়া ওঠ। এই অন্তহীন গলাধঃকরণের দ্বারা প্রতি মুহূর্তেই তোমরা ব্যক্তিত্ব হারাইতেছ। আমি যাহা শিক্ষা দিতেছি, তাহা যদি তোমাদের মধ্যে কেহ শুধু বিশ্বাস করে, তাহা হইলে আমি দুঃখিত হইব; তোমাদের মধ্যে যদি স্বাধীন চিন্তাশক্তি উদ্দীপিত করিতে পারি, তবেই আমি বিশেষ আনন্দিত হইব।···আমার উদ্দেশ্য—নরনারীকে বলা, মেষগুলিকে নয়। 'নরনারী' বলিতে আমি 'মানুষ' বুঝি। তোমরা ক্ষুদ্র মানুষ নও যে, পথের নোংরা ন্যাকড়া টানিয়া আনিয়া খেলার পুতুল তৈরি করিবে।

এই জগৎ একটি শিক্ষার স্থান! মানুষ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াছে। মিঃ ব্ল্যাঙ্ক যাহা বলিয়াছেন, তাহা সে সবই জানে! কিন্তু ব্ল্যাঙ্ক কিছুই বলেন নাই! আমাকে নির্বাচনের ক্ষমতা দেওয়া হইলে আমি অধ্যাপককে বলিতাম, 'বাহিরে যাও! তোমার কোন প্রয়োজন নাই!' এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধকে যে-কোন উপায়ে মনে রাখিবে! তোমার চিন্তা যদি ভুল হয় হউক, তুমি সত্য লাভ করিলে কি না করিলে তাহাতে কিছুই আসে যায় না। মূল কথাটি হইল মনকে নিয়ন্ত্রিত করা। যে-সত্য তুমি অপরের নিকট হইতে লইয়া গলাধঃকরণ করিবে, তাহা তোমার নিজস্ব হইবে না। আমার মুখে সত্য শুনিয়া তাহা শিক্ষা দিতে পার না এবং আমার মুখে শুনিয়াও কোন সত্য তুমি শিখিতে পার না। কেহ কাহাকেও শিখাইতে পারে না। সত্য অনুভব করিয়া নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী তাহা কার্যে পরিণত করিতে হইবে।···নিজেদের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া, নিজেদের চিন্তা করিয়া, নিজেদের আত্মা উপলব্ধি করিয়া, সকলকেই শক্তিমান্ হইতে

হইবে। কারাগারে আবদ্ধ সৈনিকদের মতো একসঙ্গে উঠা, একসঙ্গে বসা, একই খাদ্য খাওয়া, একসঙ্গে মাথা নাড়িয়া অন্যের প্রচারিত মতবাদ গলাধঃকরণ করা প্রভৃতিতে কোন ফল নাই। বৈচিত্র্যই জীবনের লক্ষণ। সমতাই (একই রকম চিন্তা করা) মৃত্যুর লক্ষণ।

একবার একটি ভারতীয় শহরে অবস্থানকালে এক বৃদ্ধ আমার নিকট আসিয়া বলিল, 'স্বামীজী, আমার পথ নির্দেশ করুন।' আমি দেখিলাম যে, লোকটি আমার সম্মুখের টেবিলটির মতো একেবারে জড় হইয়া গিয়াছে; মানসিক এবং আধ্যাত্মিক দিক দিয়া তাহার প্রকৃত মৃত্যু হইয়াছিল। আমি বলিলাম, 'তোমাকে যাহা নির্দেশ দিব, তাহা পালন করিবে কি? তুমি কি চুরি করিতে পারো? তুমি মদ খাইতে পারো? মাংস খাইতে পারো?' লোকটি চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, 'এ আপনি আমাকে কি শিক্ষা দিতেছেন?' আমি তাহাকে বলিলাম, 'এই দেওয়ালটি কি কখনও চুরি করিয়াছে? ইহা কি কখনও মদ খাইয়াছে?' লোকটি উত্তর দিল, 'না, মহাশয়।' মানুষই চুরি করে, মদ খায়, আবার ঈশ্বরত্ব লাভ করে।

'বন্ধু, আমি জানি, তুমি একটি দেওয়াল মাত্র নও। কিছু একটা কর! কিছু একটা কর!' আমি অনুভব করিয়াছিলাম, লোকটি চুরি করিলে তাহার আত্মা মুক্তির দিকে অগ্রসর হইবে। তোমাদের যে ব্যক্তিত্ব আছে, তাহা কিরূপে বুঝিব?—তোমরা তো একসঙ্গে উঠ, একসঙ্গে বসো এবং একই কথা বলো। ইহা মৃত্যুর পথ জানিবে। তোমার আত্মার জন্য কিছু কর। যদি ইচ্ছা হয়, তবে অন্যায় কর, কিন্তু একটা কিছু কর! আমাকে তোমরা এখন বুঝিতে না পারিলেও ক্রমে বুঝিতে পারিবে। আত্মা যেন বার্ধক্যগ্রস্ত হইয়াছে, উহার উপর মরিচা ধরিয়াছে। এই মরিচা ঘষিয়া মাজিয়া ছাড়াইতে হইবে, তবেই আমরা অগ্রসর হইতে পারিব। জগতে এত অন্যায় কেন, তাহা তোমরা এখন বুঝিতেছ। এই মরিচা হইতে নিজেদের মুক্ত করিবার জন্যই গৃহে ফিরিয়া এ-বিষয়ে চিন্তা কর।

আমরা জাগতিক বস্তুসকলের জন্য প্রার্থনা করি। কোন উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত আমরা ব্যবসায়ী বুদ্ধি লইয়া ভগবানের পূজা করি। খাওয়া-পরার জন্য আমরা প্রার্থনা করি। পূজা উত্তম। কিছু না করার চেয়ে কিছু একটা করা ভাল। 'নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল।' অত্যন্ত ধনী এক যুবক রোগাক্রান্ত হইল, অমনি সে আরোগ্যলাভের জন্য গরীবদের দান করিতে

আরম্ভ করিল। ইহা ভাল কাজ, কিন্তু ইহা ধর্ম নয়, আধ্যাত্মিকতা নয়, ইহা জাগতিক ব্যাপার। কোন্‌টা জাগতিক এবং কোন্‌টা জাগতিক নয়? যখন উদ্দেশ্য ইহজীবন, এবং ভগবান্ সেই উদ্দেশ্য-লাভের উপায়রূপে ব্যবহৃত হন, তখন তাহা জাগতিক। আবার যেখানে ঈশ্বর-লাভই উদ্দেশ্য এবং জাগতিক জীবন সেই লক্ষ্যে পৌঁছিবার উপায় রূপে ব্যবহৃত হয়, সেখানেই অধ্যাত্ম জীবনের আরম্ভ। সুতরাং যে-ব্যক্তি এই জাগতিক জীবনে প্রাচুর্য কামনা করে, তাহার নিকট এই জীবনের স্থায়িত্ব তাহার ঈপ্সিত স্বর্গ বলিয়া বিবেচিত হয়। সে পরলোকগত ব্যক্তিদের দেখিতে চায় এবং তাহাদের সহিত আবার সুখে দিন কাটাইতে চায়।

যে-সকল মহিলা প্রেতাত্মাদের সম্মুখে আনিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন মিডিয়াম বা মাধ্যম। দেখিতে দীর্ঘাকার তবু তিনি মাধ্যম। বেশ! এই মহিলা আমাকে খুবই পছন্দ করিতেন এবং তাহার নিকট যাইবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। প্রেতাত্মারা সকলেই আমার প্রতি বিনম্র ছিল। আমার অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হইয়াছিল। বুঝিতেই পারিতেছ, ইহা ছিল মধ্যরাত্রে প্রেতশক্তি-বাদীদের বৈঠক। মাধ্যম বলিল, '...আমি একজন প্রেতকে এখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিতেছি। প্রেত আমাকে বলিতেছে যে, ঐ বেঞ্চের উপর একজন হিন্দু ভদ্রলোক বসিয়া আছেন।' আমি দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলাম, 'তোমাকে এই কথা বলিবার জন্য কোন প্রেতাত্মার সাহায্য প্রয়োজন হয় না।'

সেখানে একজন সুশিক্ষিত, বুদ্ধিমান্ এবং বিবাহিত যুবক উপস্থিত ছিল। সে তাহার মাতাকে দেখিবার জন্য আসিয়াছিল। মাধ্যম বলিল, 'অমুকের মা এখানে আসিয়াছেন।' যুবকটি তাহার মায়ের বিষয় আমাকে বলিতেছিল—তাহার মা মৃত্যুকালে খুবই ক্ষীণদেহ হইয়া পড়েন। কিন্তু পর্দার অন্তরাল হইতে যে-মা বাহির হইল! তোমরা যদি তাহাকে দেখিতে! যুবকটি কি করে, তাহা দেখিতে চাহিলাম। আমি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম যে, যুবকটি লাফাইয়া সেই প্রেতাত্মাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল, 'মাগো, তুমি প্রেত-লোকে গিয়া অপরূপ হইয়াছ!' আমি বলিলাম, 'আমি ধন্য যে, আমি এইখানে উপস্থিত আছি। এইসব ঘটনা মানুষের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমার অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া দিয়াছে।'

বাহ্য উপাসনার প্রসঙ্গে আবার বলি, ইহজীবন এবং জাগতিক সুখের লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্য ঈশ্বরকে উপাসনা করা অতি নিম্নস্তরের পূজা। ...অধিকাংশ লোকই দেহের এই মাংসপিণ্ড এবং ইন্দ্রিয়ের সুখ অপেক্ষা উচ্চতর কোন চিন্তা করিতে পারে না। এই বেচারারা এই জীবনেই যে-সুখের সন্ধান করে, সে-সুখ পাশব সুখ...। তাহারা প্রাণিখাদক। তাহারা তাহাদের সন্তান-সন্ততিদের ভালবাসে। ইহাই কি মানুষের সব গৌরব? আমরা আবার সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরকে পূজা করি! কি জন্য? কেবল এই সব জাগতিক বস্তু পাইবার জন্য এবং সর্বদা ঐগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য।...ইহার অর্থ এই যে, আমরা এখনও পশুপক্ষীর জীবনের উর্ধ্বে উঠিতে পারি নাই। পশুপক্ষীর চেয়ে আমরা মোটেই উন্নততর নই। আমরা উন্নততর কিছু জানিও না। আমাদিগকে ধিক্! আমাদের আরও উচ্চতর শিক্ষা পাওয়া উচিত। পশুপক্ষীদের সহিত আমাদের তফাত এই যে, আমাদের মতো তাহাদের ঈশ্বর বলিয়া কিছু নাই।...পশুদের মতো আমাদেরও পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে, কিন্তু তাহাদের ইন্দ্রিয়গুলি আরও তীক্ষ্ণ। একটি কুকুর যেরূপ তৃপ্তি সহকারে একখণ্ড হাড় চিবায়, আমরা একগ্রাস অন্ন তেমন তৃপ্তির সহিত খাই না। আমাদের অপেক্ষা তাহাদের জীবনে আনন্দ বেশী। সুতরাং আমরা পশুদের চেয়ে একটু নিকৃষ্ট।

তোমরা কেন এমন কিছু হইতে চাহিবে, যাহাতে প্রকৃতির কোন শক্তি তোমাদের উপর অধিকতর কার্যকরী হইবে? ইহা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ চিন্তনীয় বিষয়। কি তোমাদের কাম্য—এই জীবন, এই ইন্দ্রিয়সুখ, এই শরীর অথবা অনন্তগুণ শ্রেষ্ঠ এবং উচ্চতর কোন কিছু বস্তু, এমন একটি অবস্থা যাহার কোন চ্যুতি নাই, যেখানে কোন পরিবর্তন নাই?

অতএব ইহা দ্বারা কি প্রতীত হয়? তোমরা বলো, 'হে প্রভু, অন্ন দাও, অর্থ দাও, আমার রোগ নিরাময় কর, ইহা কর, তাহা কর!' যখনই তোমরা এইরূপ প্রার্থনা কর, তখনই 'আমি জড়বস্তু, জড়জগৎই আমার লক্ষ্য'—এই ভাবে নিজেদের সম্মোহিত করিয়া থাকো। প্রত্যেকবারই যখন তোমরা জাগতিক অভিলাষ পূরণের জন্য উদ্যোগী হও, ততবারই তোমরা বলিতে থাকো—'আমরা জড়দেহ মাত্র, আমরা আত্মা নই।'...

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, এইগুলি সব স্বপ্ন মাত্র। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, এইগুলি অদৃশ্য হইয়া যাইবে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, সৃষ্টিতে মৃত্যু—সেই

মহান্ মৃত্যু আছে, যাহা সব ভ্রান্তি, সব স্বপ্ন, এই দেহবাদিতা, এই মর্মবেদনার অবসান ঘটাইয়া দেয়। কোন স্বপ্নই চিরস্থায়ী হইতে পারে না—শীঘ্র অথবা বিলম্বে ইহা অবশ্যই শেষ হইবে। স্বপ্নকে চিরস্থায়ী করিতে পারে, এমন কেহ নাই। আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেছি যে, তিনি এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। তবুও বলিব, এই প্রকারের উপাসনার সার্থকতা আছে। এভাবে চলিতে থাকো। প্রার্থনা একেবারে না করা অপেক্ষা কোন কিছুর জন্য প্রার্থনা করা ভাল। এই সোপানগুলি অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। এগুলি প্রাথমিক শিক্ষা। মন ক্রমশঃ ইন্দ্রিয়, দেহ, এই জাগতিক ভোগসুখের ঊর্ধ্বে কোন বস্তুর বিষয় চিন্তা করিতে আরম্ভ করে।

মানুষ কিরূপে ইহা করে? প্রথমে মানুষ চিন্তাশীল হয়। তুমি যখন কোন একটি সমস্যা চিন্তা করিতে থাকো, তখন সেখানে চিন্তারই এক অপূর্ব আনন্দ আসে, ইন্দ্রিয়ের ভোগসুখ বলিয়া কিছু থাকে না।...এই আনন্দই মানুষকে মনুষ্যত্বের দিকে লইয়া যায়।...একটি মহৎ ভাবের বিষয় চিন্তা কর। চিন্তা যতই গাঢ় হইবে এবং মন সংযত হইবে, তখন তোমার দেহের বিষয় আর মনে উদিত হইবে না। তোমার ইন্দ্রিয়গুলির কাজ বন্ধ হইয়া যাইবে। তখন তুমি সমস্ত দেহ-জ্ঞানের ঊর্ধ্বে চলিয়া যাইবে। তখন ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া যাহা কিছু প্রকাশিত হইতেছিল, সবই ঐ একটি ভাবে কেন্দ্রীভূত হইবে। ঠিক সেই মুহূর্তে তুমি পশু অপেক্ষা উন্নত। সেই সময় দেহাতীত এমন একটি অনুভূতি, এমন একটি প্রত্যক্ষ উপলব্ধি তুমি লাভ করিবে, যাহা কেহই তোমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে পারিবে না।...মনের লক্ষ্য সেখানে—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে নয়।

এইরূপে এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ হইতে আরম্ভ করিয়া তুমি অন্য অনুভূতির রাজ্যে একটু একটু করিয়া প্রবেশাধিকার লাভ করিবে। তখন এই জগৎ বলিয়া তোমার নিকট আর কিছুই থাকিবে না। যখন তুমি সেই আত্মার একটু আভাস পাইবে, তখন তোমার ইন্দ্রিয়-বোধ, তোমার ভোগাকাঙ্ক্ষা, তোমার দেহাসক্তি তোমার নিকট হইতে চলিয়া যাইবে। সেই ভাবরাজ্যের আভাস একের পর এক তোমার নিকট উদ্‌ঘাটিত হইবে। তোমার যোগ সম্পূর্ণ হইবে এবং আত্মা তোমার নিকট আত্মারূপেই প্রতিভাত হইবে। তখনই তুমি ঈশ্বরকে আত্মারূপে উপাসনা করিতে আরম্ভ করিবে। তখনই

তুমি বুঝিতে পারিবে যে, উপাসনা কোন স্বার্থসাধনের নিমিত্ত নয়। অন্তরের অন্তরে এই পূজা ছিল ভালবাসা, যাহা অসীম হইয়াও সসীম; ঈশ্বরের পাদপদ্মে ইহা অন্তরের চিরন্তন আত্মনিবেদন—সর্বস্ব অর্পণ। সেখানে কেবল 'তুমি', 'আমি' নই। 'আমি' সেখানে মৃত—'তুমি'ই সেখানে বর্তমান, 'আমি' নাই। সেখানে আমি ধন, সৌন্দর্য, এমন কি পাণ্ডিত্যও কামনা করি না। আমি মুক্তি চাই না। যদি তোমার অভিপ্রেত হয়, তবে বিশ হাজারবার নরকে গমন করিব। আমি কেবল একটি বস্তু কামনা করি: হে ঈশ্বর, তুমি আমার প্রেমাস্পদ হও।

উপাসক ও উপাস্য

[১৯০০ খৃঃ ৯ই এপ্রিল আমেরিকায় সান ফ্রান্সিস্কো শহরে প্রদত্ত। সাঙ্কেতিক লিপিকার ও অনুলেখিকা আইডা আনসেল যেখানে স্বামীজীর বক্তৃতার কোন কথা বুঝিতে পারেন নাই, সেখানে··· চিহ্ন দেওয়া আছে। ( ) বন্ধনীর মধ্যেকার অংশ অনুলেখিকা কর্তৃক স্বামীজীর বাক্যের পরিপূরক হিসাবে বসানো হইয়াছে।]

মানব-প্রকৃতির যে দিকটি অধিকতর বিশ্লেষণাত্মক, আমরা উহার আলোচনা করিতেছিলাম।[১] এখন আমরা আবেগ-প্রধান দিকটি দেখিব।··· পূর্বেরটি মানুষকে গ্রহণ করে একটি সীমাহীন সত্তারূপে—নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্ব হিসাবে; অপরটিতে মানুষ একটি সীমাবদ্ধ জীব।···কয়েক ফোঁটা চোখের জল বা কয়েকটি দীর্ঘশ্বাসের জন্য প্রথমটির অপেক্ষা করিবার সময় নাই; দ্বিতীয়টি কিন্তু ঐ অশ্রুবিন্দু না মুছিয়া দিয়া ঐ বেদনার ক্ষত আরোগ্য না করিয়া অগ্রসর হইতে পারে না। প্রথমটি বৃহৎ—এত বৃহৎ ও চমৎকার যে, সময়ে সময়ে ঐ বিস্তার আমাদিগকে স্তম্ভিত করে। অপরটি অতি সাধারণ, কিন্তু তবুও বড় সুন্দর এবং আমাদের হৃদয়গ্রাহী। প্রথমটি আমাদিগকে এত উঁচুতে লইয়া যায় যে, আমাদের ফুসফুস যেন ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হয়। সেই বায়ুমণ্ডলে আমরা নিঃশ্বাস লইতে পারি না। অপরটি যেখানে আমরা আছি, আমাদিগকে সেইখানেই রাখিয়া দেয় এবং জীবনের নানা বিষয় (সীমায়িতভাবে) দেখিবার চেষ্টা করে। একটি কোন কিছুই গ্রহণ করিবে না, যতক্ষণ না উহাতে বুদ্ধির দেদীপ্যমান ছাপ দেওয়া হইতেছে; অন্যটি দাঁড়াইয়া আছে বিশ্বাসের উপর; যাহা সে দেখিতে পায় না, তাহা সে মানিয়া লয়। দুইটিরই প্রয়োজন আছে। পাখি কখনও একটি মাত্র ডানায় উড়িতে পারে না।··

আমরা এমন মানুষ দেখিতে চাই, যিনি সামঞ্জস্যভাবে গড়িয়া উঠিয়াছেন··· উদারহৃদয়, উন্নতমনা (কর্মে নিপুণ)। প্রয়োজন এইরূপ ব্যক্তির, যাঁহার অন্তঃকরণ জগতের দুঃখ-কষ্ট তীব্রভাবে অনুভব করে।···আর (আমরা চাই)

১ সান ফ্রান্সিস্কোতে পূর্বে প্রদত্ত 'একাগ্রতা' এবং 'ধর্মের রূপায়ণ' প্রভৃতি কয়েকটি বক্তৃতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

এমন মানুষ, যিনি যে শুধু অনুভব করিতে পারেন তাহা নয়, পরন্তু বস্তুনিচয়ের অর্থ ধরিতে পারেন, যিনি প্রকৃতি এবং বুদ্ধির মর্মস্থলে গভীরভাবে ডুব দেন। (আমাদের দরকার) এমন মানুষের, যিনি সেখানেও থামেন না, (কিন্তু) যিনি (সেই অনুভবকে বাস্তব কর্মে) রূপায়িত করিতে ইচ্ছুক। মস্তিষ্ক, হৃদয় এবং হাত—এই তিনটির এই প্রকার সমন্বয় আমাদের কাম্য। জগতে অনেক লোক-শিক্ষক আছেন, কিন্তু দেখিতে পাইবে, (তাঁহাদের অধিকাংশই) একদেশী। কাহারও দৃষ্টি বুদ্ধিবৃত্তির প্রখর মধ্যাহ্নসূর্যের উপর, অন্য কিছুই তাঁহার চোখে পড়ে না। অপর কেহ বা শুনেন প্রেমের সুমধুর গীতি এবং ইহা ছাড়া আর কিছুতে কান দিতে পারেন না। আবার আর একজন আছেন কাজে (ডুবিয়া), তাঁহার অনুভূতি বা চিন্তার সময় নাই। এরূপ একজন মহামানব কেন (চাও) না—যিনি যেমন কর্মী, তেমনি জ্ঞানী, আবার সমান-ভাবে প্রেমিক ? ইহা কি অসম্ভব ?—নিশ্চয়ই নয়। ভবিষ্যতের মানুষ হইবেন এই প্রকৃতির। বর্তমানকালে (কেবল মাত্র) অল্প কয়েকজনই এইরূপ আছেন। (ইহাদের সংখ্যা বাড়িয়া চলিবে) যতদিন না সারা পৃথিবী এই ধরনের মানুষে পূর্ণ হয়।

আমি তোমাদিগকে এতদিন মেধা (এবং) বিচারের সম্বন্ধে বলিয়াছি। সমগ্র বেদান্ত আমরা শুনিলাম : মায়ার যবনিকা টুটিয়া যায়, ঘন মেঘ সরিয়া গিয়া সূর্যালোক আমাদের উপর দীপ্তি পায়। এ যেন হিমালয়ের উত্তুঙ্গদেশ অধিরোহণের চেষ্টা, মেঘের রাজ্যের ওপারে অদৃশ্য যে শৃঙ্গগুলি রহিয়াছে—সেখানে পৌঁছিতে হইবে। এখন আমরা অন্য দিকটি পর্যবেক্ষণ করিতে চাই —অতি সুরম্য উপত্যকাগুলি—প্রকৃতির নয়নাভিরাম সৌন্দর্য ! (আমরা আলোচনা করিব) ভালবাসা—যাহা সংসারের জ্বালাযন্ত্রণা সত্ত্বেও আমাদিগকে ধরিয়া রাখে, সেই প্রেম—যাহার জন্য আমরা দুঃখের শিকল গড়িয়াছি, যাহার জন্য মানুষ অনন্তকাল স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছে আত্মবলিদান এবং সন্তুষ্টচিত্তে সহ্য করিয়া চলিয়াছে উহার কষ্ট। সেই অনন্ত অনুরাগ, যাহার জন্য মানুষ নিজের হাতে বন্ধন পরে, দুর্গতি ভোগ করে—তাহাই এখন আমাদের অনুসন্ধানের বিষয়। অপরটি আমরা যে ভুলিয়া যাইব, তাহা নয়। হিমালয়ের হিমবাহ কাশ্মীরের ধান্যক্ষেত্রের সহিত মিতালি করুক। বজ্রের গুরুগর্জনের সহিত মিশিয়া যাক পাখির কাকলি।

যাহা কিছু অতি পরিপাটি ও মনোহর, তাহা লইয়াই আমাদের বর্তমান আলোচনা। পূজাপ্রবৃত্তি তো সর্বত্রই আছে, প্রত্যেক জীবে। প্রত্যেকেই ভগবানের আরাধনা করে। যে নামই দেওয়া যাক না কেন, তিনিই সকলের পূজা পাইতেছেন। পৃথিবীর ধুলোকাদায়—যেমন সুন্দর পদ্মফুলের, যেমন জীবনেরও আরম্ভ, উপাসনার আদিও সেইরূপ।…(প্রথমে) খানিকটা ভয়ের ভাব থাকে, পার্থিব লাভের দিকে আকাঙ্ক্ষা থাকে। ভিখারীর পূজা। এগুলি পূজাবৃত্তির প্রারম্ভিক। (উহার অবসান) ঈশ্বরকে ভালবাসিয়া এবং মানুষের মধ্যে ভগবান্‌কে উপাসনা করিয়া।

ভগবান্ আছেন কি? এমন একজন কেহ আছেন কি, যাঁহাকে ভালবাসা যায়, যিনি ভালবাসা গ্রহণ করিতে সমর্থ? পাথরকে ভালবাসিয়া বেশী কিছু লাভ নাই। আমরা তাহাই ভালবাসি, যাহা ভালবাসা বুঝিতে পারে, যাহা আমাদের অনুরাগ আকর্ষণ করিতে পারে। উপাসনার বেলাও এইরূপ। আমাদের এই পৃথিবীতে কেহ একখণ্ড শিলাকে (শিলা বলিয়া) পূজা করিয়াছে, এমন কথা কখনও বলিও না। সে সর্বদাই উপাসনা করিয়াছে (পাথরটির মধ্যে সর্বব্যাপী সত্তাকে)।

আমাদের ভিতর সেই বিশ্বপুরুষ রহিয়াছেন, আমরা সন্ধান পাই। (কিন্তু) তিনি যদি আমাদের হইতে পৃথক্ না হন, তাহা হইলে আমরা উপাসনা করিব কিভাবে? আমি তো শুধু 'তোমাকে' পূজা করিতে পারি, 'আমাকে' নয়। কেবল 'তোমারই' নিকট প্রার্থনা করিতে পারি, 'আমার' কাছে নয়। 'তুমি' বলিয়া কেহ আছে কি?

একই বহু হন। আমরা যখন একেকে দেখি, তখন মায়ার মধ্য দিয়া প্রতিবিম্বিত সঙ্কীর্ণ যাহা কিছু সব অদৃশ্য হইয়া যায়, কিন্তু বহুত্ব যে অর্থহীন নয়, ইহাও সম্পূর্ণ ঠিক। বহুকে অবলম্বন করিয়াই আমরা একে পৌছাই।…

ব্যক্তি-ঈশ্বর কেহ আছেন কি—যে-ঈশ্বর চিন্তা করেন, বুঝিতে পারেন, আমাদিগকে চালিত করেন?—আছেন। নির্বিশেষ ঈশ্বরের এইসব গুণের কোনটিই থাকিতে পারে না। তোমরা প্রত্যেকেই এক-একটি 'ব্যক্তি'। তুমি চিন্তা কর, ভালবাসো, ঘৃণা কর; (তুমি) ক্রুদ্ধ বা দুঃখিত হও ইত্যাদি; কিন্তু তবুও তুমি হইতেছ নৈর্ব্যক্তিক, সীমাহীন। একাধারে (তুমি) সগুণ এবং নির্গুণ। ব্যক্তি এবং ব্যক্তিহীন—দুটি দিকই তোমার

রহিয়াছে। ঐ (নৈর্ব্যক্তিক সত্তা) ক্রোধ প্রকাশ ক'রিতে পারে না, (কিংবা) দুঃখিত (বা) ক্লিষ্ট হইতে পারে না, এমন কি দুঃখকষ্টের চিন্তাও করিতে পারে না। নৈর্ব্যক্তিক সত্তা চিন্তা করিতে পারে না, জানিতে পারে না। উহা স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ। পক্ষান্তরে ব্যক্তিসত্তার জ্ঞান আছে, চিন্তা, মৃত্যু প্রভৃতি আছে। যিনি সর্বগত পরম, স্বভাবতই তাঁহার দুইটি দিক থাকিতে বাধ্য। একটি বস্তুসমূহের অনন্ত সত্তার (নির্ণায়ক), অপরটি তাঁহার ব্যক্তিভাব—আমাদের সকলের আত্মার আত্মা। তিনি সকল প্রভুর প্রভু। তিনিই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিতেছেন, তাঁহারই নির্দেশে ইহা বর্তমান রহিয়াছে।···

সেই অনন্ত—চিরশুদ্ধ, চির (মুক্ত)···তিনি কিন্তু বিচারক নন। ভগবান্ কখনও (একজন) বিচারপতি হইতে পারেন না। তিনি সিংহাসনের উপর বসিয়া ভাল এবং মন্দের বিচার করেন না।···তিনি শাসক নন, সেনাপতি নন, (কিংবা) অধিনায়কও নন। অসীম করুণাময়, অনন্ত প্রেমময় তিনি—সগুণ (ঈশ্বর)।

অপর একটি দিক হইতে দেখ। তোমার দেহের প্রতি জীবকোষে (cell) একটি আত্মা রহিয়াছে, যাহা জীবকোষটি সম্বন্ধে সচেতন। উহা একটি পৃথক্ বস্তু। উহার নিজস্ব একটি ইচ্ছা আছে, স্বকীয় একটি ছোট কর্মক্ষেত্র আছে। সমস্ত (জীবকোষ) মিলিয়া গোটা ব্যক্তিটি গঠিত। (অনুরূপভাবে) বিশ্বজগতের যিনি সগুণ ঈশ্বর, তিনি হইলেন এইসব (বহু ব্যক্তির) সমষ্টি।

আর একদিক দিয়া বিচার কর। তুমি—অর্থাৎ আমি যেমন তোমায় দেখি—হইলে তোমার সর্বগত সত্তার যেটুকু আমার দৃষ্টিতে সীমাবদ্ধ হইয়া অনুভূত, সেইটুকু। আমার চোখ এবং ইন্দ্রিয়নিচয় দিয়া তোমাকে দেখিব বলিয়া তোমাকে আমি খণ্ডিত করিয়া লইয়াছি। তোমার যেটুকু আমার চোখের দ্বারা দেখা সম্ভব, ততটুকুই আমি দেখি। আমার মন তোমার যতটা ধারণা করিতে পারে, ততটুকুই আমি 'তুমি' বলিয়া জানি, তাহার বেশী নয়। এইভাবেই আমি সর্বগত নৈর্ব্যক্তিককে অনুশীলন করিতে গিয়া (তাঁহাকে সগুণরূপে দেখি), যতক্ষণ আমাদের দেহ আছে, মন আছে, ততক্ষণ আমরা সর্বদা এই ত্রি-সত্তাকে দেখি—ঈশ্বর, প্রকৃতি এবং আত্মা।

এই তিন সর্বদাই এক অবিভাজ্য সত্তায় থাকিতে বাধ্য…প্রকৃতি রহিয়াছে, মানবাত্মাসমূহ রহিয়াছে। আবার রহিয়াছেন তিনি—যাঁহাতে প্রকৃতি এবং মানবাত্মাসমূহ (অবস্থিত)।

বিশ্বাত্মা শরীর ধারণ করিয়াছেন। আমার আত্মা হইল ঈশ্বরের একটি অংশ। ঈশ্বর আমাদের চক্ষুর চক্ষু, প্রাণের প্রাণ, মনের মন, আত্মার আত্মা। ইহাই সগুণ ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের ধারণাযোগ্য উচ্চতম আদর্শ।

তুমি যদি দ্বৈতবাদী না হইয়া একত্ববাদী হও, তাহা হইলেও তোমার ব্যক্তি-ঈশ্বর থাকিতে পারে।…এক অদ্বিতীয় রহিয়াছেন। সেই এক নিজেকে ভালবাসিতে চাহিলেন। সেই কারণে এক হইতে তিনি সৃষ্টি করিলেন (বহু)।…বৃহৎ 'আমি'-কে, সত্য 'আমি'-কে পূজা করিতেছে ক্ষুদ্র 'আমি'। অতএব সব মতেই 'ব্যক্তি' (ঈশ্বর) রাখা চলে।

কেহ কেহ এমন অবস্থার মধ্যে জন্মগ্রহণ করে যে, তাহারা অন্যান্য অপেক্ষা সুখী হয়। ন্যায়পরায়ণ কাহারও রাজত্বে এইরূপ কেন হইবে? পৃথিবীতে মৃত্যু রহিয়াছে কেন? এই-সকল কঠিন প্রশ্ন আমাদের মনে উঠে। (এই সমস্যাসমূহের) কখনও সমাধান হয় নাই। কোন দ্বৈতভূমি হইতে উহাদের মীমাংসা হইতে পারে না। বস্তুসমূহ যথার্থই যেভাবে আছে, ঠিক সেভাবেই ঐগুলি দেখিবার জন্য আমাদিগকে দার্শনিক বিচারে ফিরিয়া যাইতে হইবে। আমরা আমাদের নিজেদের কর্ম হইতেই কষ্ট ভোগ করিতেছি। এজন্য ঈশ্বর দায়ী নন। আমরা যাহা করি, তাহা আমাদেরই দোষ, অন্য কাহারও নয়। ঈশ্বরকে দোষারোপ কেন?…

অমঙ্গল কেন রহিয়াছে? যে একটিমাত্র উপায়ে (এই সমস্যার) মীমাংসা করিতে পারো, তাহা হইল—(এই কথা বলা যে, ঈশ্বর) ভাল ও মন্দ দুই-এরই কারণ। সগুণ ঈশ্বরবাদের একটি প্রকাণ্ড সমস্যা এই যে, যদি বলো ভগবান্ শুধু সৎ—অসৎ নন, তাহা হইলে তুমি নিজেই তোমার নিজের যুক্তির ফাঁদে আটকাইয়া পড়িবে। কি করিয়া জানিলে (একজন) ভগবান্ আছেন? বলা হয় (যে, তিনি) এই বিশ্বজগতের পিতা; আরও বলা হয়—তিনি মঙ্গলময়। কিন্তু পৃথিবীতে অমঙ্গলও তো রহিয়াছে, তবে তিনি অমঙ্গলস্বরূপই বা হইবেন না কেন?…সেই সমস্যা।

ভাল বলিয়া কিছু নাই, মন্দও নাই। আছেন শুধু ভগবান্।...ভাল কি, তাহা তুমি কিরূপে জানো? তুমি নিজে (উহা) অনুভব কর। (মন্দ কি, তাহারও জ্ঞান কি ভাবে হয়?) যদি মন্দ আসে, তুমি উহা অনুভব কর।... ভাল এবং মন্দ আমাদেরই অনুভব দ্বারা আমরা জানিয়া থাকি। এমন কেহ নাই যে, শুধু ভালই অনুভব করে—তাহার অনুভূতি শুধু সুখকর। এমন কেহও নাই, যে শুধু অপ্রীতিকর ভাবগুলিই অনুভব করে।...

অভাব এবং উদ্বেগই সকল দুঃখের কারণ, সুখেরও। অভাব কি বাড়িয়া চলিতেছে, না কমিতেছে? জীবন কি সহজ হইতেছে, না জটিল? নিশ্চয়ই জটিল। অভাবসমূহ ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। যাঁহারা তোমাদের প্রপিতামহ ছিলেন, তাঁহাদের তোমাদের মতো এত পোশাক বা অর্থের দরকার ছিল না। তাঁহাদের বৈদ্যুতিক গাড়ি ছিল না, রেলরাস্তাও তাঁহারা দেখেন নাই। আর এইজন্যই তাঁহাদের পরিশ্রম করিতে হইত কম। যখন এই-সব জিনিসের প্রয়োজন হয়, সঙ্গে সঙ্গে অভাবও আসে, খাটুনিও বাড়ে। আকাঙ্ক্ষা যত বাড়ে, প্রতিযোগিতাও ততই বাড়ে।

অর্থসংগ্রহ খুবই শ্রমসাধ্য। অর্থ রক্ষা করা আরও কঠিন কাজ। কিছু বিত্তসঞ্চয়ের জন্য তোমাদিগকে সারা পৃথিবীর সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, (আর) উহা রক্ষা করিতে সমস্ত জীবন ধরিয়া চলিবে সংগ্রাম। (অতএব) গরীবের চেয়ে ধনীর দুশ্চিন্তা বেশী।...এই তো ব্যাপার!—

জগতের সর্বত্রই ভাল ও মন্দ রহিয়াছে। কখন কখন মন্দের মধ্য দিয়া ভাল আসে সত্য, কিন্তু অন্য সময়ে আবার ভালও মন্দ হইয়া দাঁড়ায়। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি কোন না কোন সময়ে অমঙ্গল সৃষ্টি করে। কোন ব্যক্তি মদ্যপান আরম্ভ করুক। (প্রথমে) কিছু খারাপ হয় না, কিন্তু সে যদি ক্রমাগত মদ্যপান করিতে থাকে, তবে তাহার অনিষ্ট হইবে।...কেহ ধনী পিতামাতার ঘরে জন্মগ্রহণ করিল; বেশ ভাল। কিন্তু সে বুদ্ধিহীন হইল, কখনও তাহার শরীর বা মস্তিষ্ক খাটাইল না। ইহা শুভ হইতে অশুভের উৎপত্তি। আবার জীবনের প্রতি আমাদের যে নিবিড় ভালবাসা, সেই কথা চিন্তা কর। আমরা কতই না ছুটাছুটি, লাফালাফি করি! কয়েক মুহূর্তের তো জীবন। কত কঠোর পরিশ্রম করি! একেবারে অসমর্থ শিশু হইয়া আমরা জন্মিয়াছি। জিনিসগুলি বুঝিয়া উঠিতে আমাদের বহু বৎসর

কাটিয়া যায়। অবশেষে ষাট বা সত্তর বৎসরে আমাদের চোখ খোলে এবং তখন আদেশ আসে—'বেরিয়ে যাও!' এই তো অবস্থা!

আমরা দেখিলাম—ভাল ও মন্দ আপেক্ষিক শব্দ। যাহা আমার কাছে ভাল, তাহা তোমার পক্ষে মন্দ। আমার যাহা নৈশ আহার, তাহা তুমি যদি খাও তো কাঁদিতে আরম্ভ করিবে, আর আমি হাসিয়া উঠিব।...আমরা দুজনে (হয়তো) নাচিতেছি, কিন্তু আমি আনন্দের সঙ্গে আর তুমি যাতনার সহিত।...একই বস্তু আমাদের জীবনের কোন এক সময়ে শুভ, অন্য সময়ে অশুভ। কি করিয়া বলিতে পারো, ভাল ও মন্দ সবই পূর্ব হইতে প্রস্তুত থাকে এবং এটি সর্বৈব ভাল আর ঐটি সর্বৈব মন্দ?

এখন প্রশ্ন এই, ভগবান্ যদি চিরদিন সৎই হন, তাহা হইলে এই-সব শুভ ও অশুভের জন্য দায়ী কে? খ্রীষ্টান এবং মুসলমানগণ বলেন, শয়তান বলিয়া একজন ভদ্রলোক আছেন। কিন্তু কি করিয়া বলো—দুইজন ভদ্রলোক কাজ করিতেছেন? একজনেরই থাকা চাই; যে-আগুনে শিশু পুড়িয়া যায়, তাহাতে খাবারও তৈরী হয়। কি করিয়া বলিবে, আগুন ভাল বা মন্দ? কি করিয়া বলিবে, উহা দুই বিভিন্ন ব্যক্তির সৃষ্টি? (তথাকথিত) সমস্ত অশুভ তবে কে সৃষ্টি করিল? অন্য কোন সমাধান নাই। তিনিই পাঠাইতেছেন মৃত্যু ও জীবন, মড়ক ও মহামারী এবং সব কিছু। ঈশ্বর যদি এইরূপ হন, তাহা হইলে তিনিই শুভ, তিনিই অশুভ; তিনিই সুন্দর, তিনিই ভীষণ; তিনিই জীবন এবং তিনিই মৃত্যু।

এইরূপ ঈশ্বরকে কি করিয়া উপাসনা করা যাইবে? আমরা ক্রমশঃ (বুঝিতে) পারিব, মানুষ ভীষণের পূজা কি ভাবে শিখিতে পারে, তখনই মানুষ শান্তি পাইবে। মনের শান্তি যদি নষ্ট হইয়া থাকে, দুশ্চিন্তার হাত হইতে নিষ্কৃতি যদি না পাইয়া থাকো তো সর্বপ্রথম কর্তব্য—ঘুরিয়া দাঁড়ানো এবং ভীষণের সম্মুখীন হওয়া। উহার মুখোস ছিঁড়িয়া ফেলো, দেখিতে পাইবে সেই একই (ঈশ্বর) রহিয়াছেন। তিনিই সগুণ ঈশ্বর—যাহা কিছু ভাল (প্রতীয়মান) এবং যাহা কিছু মন্দ (আপাতপ্রতীতিতে)। আর কেহ নাই। দুই জন প্রভু যদি থাকিতেন, তাহা হইলে প্রকৃতি এক মুহূর্তও টিকিয়া থাকিতে পারিত না। প্রকৃতিতে অপর কেহ নাই। সবই একতান। ঈশ্বরের লীলা একদিকে, আর শয়তানের অপরদিকে—এরূপ হইলে সমগ্র সৃষ্টির

ভিতর একটি চরম (বিশৃঙ্খলা) উপস্থিত হইত। নিয়ম ভাঙিবার সাধ্য কাহার আছে? এই গ্লাসটি যদি আমি ভাঙিয়া ফেলি, ইহা পড়িয়া যাইবে। একটি পরমাণুকে যদি কেহ স্থানচ্যুত করিতে সমর্থ হয়, অপর প্রত্যেকটি পরমাণুর স্থিতিবৈষম্য ঘটিবে।...নিয়ম কখনও লঙ্ঘন করা যায় না। প্রত্যেকটি পরমাণু নিজ স্থানে রহিয়াছে। প্রত্যেকটি ওজন করিয়া, মাপ করিয়া বসানো আছে এবং নিজ নিজ (উদ্দেশ্য) পূর্ণ করিতেছে। ঈশ্বরের বিধানে বাতাস বহিতেছে, সূর্য কিরণ দিতেছে। তাঁহার শাসনে জগৎ-সমূহ যথাযথ সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। তাঁহারই আদেশে মৃত্যু পৃথিবীতে শিকার-সন্ধানে রত। একবার ভাবিয়া দেখ তো দুই বা তিনজন ঈশ্বর জগতে মল্লযুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামিয়াছেন। ইহা হইতেই পারে না।

আমরা এখন দেখিতে পাইলাম—আমাদের জগৎস্রষ্টা সগুণ ঈশ্বর থাকিতে পারেন, তিনি দয়াময় এবং নিষ্ঠুরও।...তিনি মঙ্গল, তিনিই অমঙ্গল। তাঁহার স্মিত হাস্য দেখিতে পাই, আবার ভ্রুকুটিও দেখিতে পাই। আর তাঁহার বিধান অতিক্রম করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। তিনিই হইলেন এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা।)

সৃষ্টির অর্থ কি? শূন্য হইতে কোন কিছুর আবির্ভাব হইতে পারে? ছয় হাজার বৎসর আগে ঈশ্বর স্বপ্নোত্থিত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিলেন (এবং) তাহার পূর্বে কোন কিছুই ছিল না—ইহা কী? ঈশ্বর তখন কি করিতেছিলেন? তিনি কি আরামে ঘুমাইতেছিলেন? ভগবান্ হইলেন জগৎ-কারণ আর কার্য দেখিয়া আমরা কারণকে জানিতে পারি। কার্য যদি না থাকে, তাহা হইলে কারণ কারণই নয়। কারণ সর্বদা কার্যের মধ্য দিয়াই পরিজ্ঞাত।... সৃষ্টি অনন্ত।...সৃষ্টির আদি কাল বা দেশের মাধ্যমে চিন্তা করা যায় না।

কেন তিনি এই সৃষ্টি করেন? কারণ তিনি ইহা পছন্দ করেন—কারণ তিনি মুক্ত।...তুমি আমি নিয়মের অধীন, কেন-না আমরা (শুধু) কতিপয় নির্দিষ্ট পথেই কাজ করিতে পারি, অন্য পথে নয়। 'হাত না থাকিলেও তিনি সব কিছু ধরিতে পারেন, পদবিহীন হইয়াও দ্রুত চলিয়া যান'।[১] দেহ নাই, তথাপি তিনি সর্বব্যাপী।

১ 'অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা...'—শ্বেতাশ্বতর উপ., ৩।১৯

'চক্ষু যাঁহাকে দেখিতে পায় না, কিন্তু যিনি সকলের চক্ষুতে দৃষ্টিশক্তির নিদান, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে।'[১] তোমরা অন্য কিছুর উপাসনা করিতে পার না। সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরই এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ধরিয়া আছেন। যাহাকে বলা হয় 'নিয়ম', উহা তাঁহার ইচ্ছার অভিব্যক্তি। নিয়মসমূহ দ্বারা তিনি জগৎ পরিচালনা করিতেছেন।

এ পর্যন্ত (আমরা আলোচনা করিয়াছি) ঈশ্বর ও প্রকৃতি—শাশ্বত ঈশ্বর, চিরন্তন প্রকৃতি। কোন আত্মারই (কখনও) সৃষ্টি হয় নাই। আত্মার বিনাশও নাই। কেহই তাহার নিজের মৃত্যু কল্পনা করিতে পারে না। আত্মা অসীম, নিত্য বর্তমান। উহা মরিবে কিরূপে? উহা শরীর পরিবর্তন করে। যেমন কোন ব্যক্তি তাহার পুরাতন জীর্ণ পরিচ্ছদ ছাড়িয়া দিয়া নূতন অব্যবহৃত পোশাক পরিধান করে, ঠিক সেইরূপ শীর্ণ শরীর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া একটি নূতন দেহ গ্রহণ করা হয়।[২]

আত্মার স্বরূপ কি? আত্মা সর্বশক্তিধর এবং সর্বব্যাপী। চৈতন্যের দৈর্ঘ্যও নাই বা প্রস্থ কিংবা ঘনত্বও নাই।...উহা এখানে বা সেখানে—ইহা কি করিয়া বলা যায়? এই শরীরটি নষ্ট হইলে (আত্মা) অপর একটি দেহের (মাধ্যমে) কাজ করিবে। আত্মা যেন একটি বৃত্ত, যাহার পরিধি কোথাও নাই, কিন্তু উহার কেন্দ্র হইল দেহে। ঈশ্বর এমন একটি বৃত্ত, যাহার পরিধি কোথাও নাই বটে, কিন্তু কেন্দ্র সর্বত্র। আত্মা স্বভাবতই আনন্দময়, শুদ্ধ, পূর্ণ; উহার প্রকৃতি যদি অশুচি হইত, তাহা হইলে উহা কখনও শুদ্ধ হইতে পারিত না।...আত্মার স্বরূপই হইল নিষ্কলুষ; এই জন্যই তো মানুষের পক্ষে পবিত্র হওয়া সম্ভব। আত্মা (স্বভাবতই) আনন্দঘন; তাই বলিয়াই তো উহা আনন্দলাভ করিতে পারে। আত্মা শান্তিস্বরূপ; (এই কারণেই উহার পক্ষে শান্তি অনুভব করা সম্ভবপর)।...

আমাদের মধ্যে যাহারা নিজেদের এই দেহবুদ্ধির স্তরে দেখিতেছি, তাহাদের সকলকেই ঈর্ষা, কলহ ও কষ্টের সহিত জীবিকার জন্য কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়, আর তারপর আসে মৃত্যু। ইহা হইতে বুঝা যায় যে,

---

১ 'যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যতি।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।—কেনোপনিষৎ, ১।৭

২ বাসাংসি জীর্ণানি......। গীতা, ২।২২

আমাদের যাহা হওয়া উচিত, আমরা তাহা নই। আমরা স্বাধীন নই, সম্পূর্ণ শুদ্ধ নই, ইত্যাদি। আত্মা যেন অবনত হইয়াছেন। অতএব আত্মার প্রয়োজন—বিস্তার।...

কিভাবে ইহা করা যায়? নিজে নিজেই উহা সিদ্ধ করিতে পারিবে কি?—না। কোন ব্যক্তির মুখ যদি ধূলিধূসরিত হইয়া থাকে, উহা কি ধূলি দিয়া পরিষ্কার করা চলে?...মাটিতে একটি বীজ পুঁতিলাম, উহা হইতে গাছ হইল, গাছ হইতে আবার বীজ, বীজ হইতে অন্য একটি গাছ—এইরূপ চলিতে থাকিবে। মুরগী হইতে ডিম, আবার ডিম হইতে মুরগী। যদি কিছু ভাল কাজ কর, উহার ফল তোমাকে পাইতে হইবে,—পুনরায় জন্মগ্রহণ, দুঃখভোগ। এই অন্তহীন শৃঙ্খলে যদি একবার আটকাইয়া যাও আর থামিতে পারিবে না। ঘুরিতেই থাকিবে,...উপরে এবং নীচে, ঊর্ধ্বলোক এবং অধোলোকের (দিকে) এবং এই-সব (দেহসমূহ)। নিষ্কৃতির পথ নাই।

তবে এই-সকল হইতে ত্রাণের উপায় কি এবং এখানে কিই বা তোমার চাই? একটি ভাব হইল—দুঃখ হইতে অব্যাহতি। আমরা প্রত্যেকেই দুঃখ হইতে নিস্তার পাইবার জন্য দিবারাত্র চেষ্টা করিতেছি।...কর্মের দ্বারা ইহা হইবার নয়। কর্ম কর্মই বাড়ায়। যদি এমন কেহ থাকেন, যিনি নিজে মুক্ত এবং আমাদিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত, তবেই ইহা সম্ভবপর। প্রাচীন ঋষির ঘোষণা—'হে মর্ত্যলোকবাসী ও ঊর্ধ্বলোকনিবাসী অমৃতের সন্তানগণ, তোমরা সকলে শোন—আমি রহস্য আবিষ্কার করিয়াছি। যিনি সকল অন্ধকারের পারে, আমি তাঁহাকে জানিয়াছি। এই সংসার-মহাসমুদ্র আমরা পার হই কেবল তাঁহারই কৃপায়।'[১]

ভারতবর্ষে জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ধারণা এইরূপ: স্বর্গ আছে, নরক আছে, মর্ত্যলোক আছে; কিন্তু এইগুলি চিরন্তন নয়। যদি আমার নরকে গতি হয়, উহা নিত্যকালের জন্য নয়। যেখানেই থাকি না কেন, একই যন্ত্রণা চলিতে থাকিবে। সমস্যা হইল—এই-সব যন্ত্রণা অতিক্রম করা যায় কিরূপে? যদি আমি স্বর্গে যাই, হয়তো কিছুটা বিশ্রাম মিলিবে। কিন্তু হয়তো কোন অপকর্ম করিয়া বসিলাম, তখন তো শাস্তি পাইতে হইবে,

১ শ্বেতাশ্ব. উপ., ২।৫

স্বর্গবাস চিরস্থায়ী হইতে পারে না।…ভারতীয় আদর্শ স্বর্গে যাওয়া নয়। এই পৃথিবী হইতে মুক্তি লাভ কর। নরকেও পড়িও না, স্বর্গকেও তুচ্ছ কর। লক্ষ্য কি?—মুক্তি। তোমাদের প্রত্যেককেই মুক্ত হইতে হইবে। আত্মার মহিমা আবৃত হইয়া আছে। উহাকে পুনরায় অনাবৃত করিতে হইবে। আত্মা তো আছেনই—সর্বত্রই আছেন। কোথায় যাইবেন?…কোথায়ই বা যাইতে পারেন? যদি এমন কোন স্থান থাকিত, যেখানে ইনি নাই, তবেই তো সেখানে যাইবার কথা উঠিত। ইনি সদা-বর্তমান—(এইটি) যদি হৃদয়ঙ্গম কর, তাহা হইলে চিরকালের জন্য পরিপূর্ণ সুখ (আসিবে)। আর জন্ম মৃত্যু নয়।…আর রোগ নয়, দেহ নয়। দেহ (টি) নিজেই তো কঠিনতম ব্যাধি।…

আত্মা আত্মা (-রূপে) দাঁড়াইয়া থাকিবেন। চৈতন্য চৈতন্যরূপে জীবিত থাকিবেন। ইহা কিভাবে সম্পাদন করা যাইবে? যিনি স্বভাবতই নিত্য-বর্তমান, শুদ্ধ ও পূর্ণ, আত্মার (মধ্যে সেই পরমেশ্বরকে) আরাধনা করিয়া। এই জগতে সর্বশক্তিমান্ দুইজন থাকিতে পারেন না। (কল্পনা কর) দুই বা তিনজন ঈশ্বর (আছেন); একজন সংসার সৃষ্টি করিবেন, অপর জন বলিবেন, 'আমি সংসার ধ্বংস করিব।' ইহা কখনও ঘটিতে (পারে না)। ভগবান্ একজনই হওয়া চাই। আত্মা যখন পূর্ণতা লাভ করেন, তখন তিনি প্রায় সর্বশক্তিমান্ (ও) সর্বজ্ঞ (হইয়া যান)। ইনিই উপাসক। উপাস্য কে?—সেই পরমেশ্বর স্বয়ং, যিনি সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ ইত্যাদি। আর সর্বোপরি তিনি প্রেম-স্বরূপ। (আত্মা) কিরূপে এই পূর্ণতা লাভ করিবে? —উপাসনা দ্বারা।

দিব্য প্রেম

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্রান্সিস্কো অঞ্চলে ১০ই এপ্রিল ১৯০০ খৃঃ প্রদত্ত

(প্রেমকে একটি ত্রিকোণের প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করা যাইতে পারে। প্রথম কোণটি এই যে,) প্রেম কোন প্রশ্ন করে না। ইহা ভিক্ষুক নয়। ...ভিখারীর ভালবাসা ভালবাসাই নয়। প্রেমের প্রথম লক্ষণ হইতেছে ইহা কিছুই চায় না, (বরং ইহা) সবই বিলাইয়া দেয়। ইহাই হইল প্রকৃত আধ্যাত্মিক উপাসনা, ভালবাসার মাধ্যমে উপাসনা! ঈশ্বর করুণাময় কি না, এই প্রশ্ন আর উঠে না। তিনি ঈশ্বর, তিনি আমার প্রেমাস্পদ। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান্ এবং অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন কি না, তিনি সান্ত কিংবা অনন্ত, এ-সব আর জিজ্ঞাস্য নয়। যদি তিনি মঙ্গল বিতরণ করেন ভালই, যদি অমঙ্গল করেন, তাহাতেই বা কি আসে যায়? কেবল ঐ একটি—অনন্ত প্রেম ছাড়া তাঁহার অন্যান্য সবগুণই তিরোহিত হয়।

ভারতবর্ষে একজন প্রাচীন সম্রাট্ ছিলেন। তিনি একবার শিকারে বাহির হইয়া বনের মধ্যে জনৈক বড় যোগীর সাক্ষাৎ পান। সাধুর উপর তিনি এতই সন্তুষ্ট হইলেন যে, তাঁহাকে রাজধানীতে আসিয়া কিছু উপহার লইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। (প্রথমে) সাধু রাজী হন নাই, (কিন্তু) বারংবার সম্রাটের পীড়াপীড়িতে অবশেষে যাইতে স্বীকার করিলেন। তিনি (প্রাসাদে) উপস্থিত হইলে সম্রাট্‌কে জানানো হইল। সম্রাট্ বলিলেন, 'এক মিনিট অপেক্ষা করুন, আমি আমার প্রার্থনা শেষ করিয়া লই।' সম্রাট প্রার্থনা করিতেছিলেন, 'প্রভু, আমাকে আরও ধন দাও—আরও (জমি-যায়গা, স্বাস্থ্য), আরও সন্তান-সন্ততি।' সাধু উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ঘরের বাহিরে যাইবার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রাজা বলিলেন, 'কই, আপনি আমার উপহার তো গ্রহণ করিলেন না?' যোগী উত্তর দিলেন, 'আমি ভিক্ষুকের নিকট ভিক্ষা করি না। এতক্ষণ পর্যন্ত আপনি নিজেই অধিক ভূসম্পত্তি, টাকাকড়ি, আরও কত কি প্রার্থনা করিতেছিলেন, আপনি আর আমাকে কি দিবেন? আগে নিজের অভাবগুলি মিটাইয়া নিন।'

প্রেম কখনও যাচ্ঞা করে না, ইহা সব সময় দিয়াই যায়।…যখন একটি যুবক তাহার প্রিয়তমাকে দেখিতে যায়,…তাহাদের মধ্যে বেচাকেনার সম্বন্ধ থাকে না; তাহাদের সম্বন্ধ হইতেছে প্রেমের, আর প্রেম ভিক্ষুক নয়। (এইরূপে) আমরা বুঝিতে পারি যে, প্রকৃত আধ্যাত্মিক উপাসনার অর্থ ভিক্ষা নয়। যখন আমরা সমস্ত চাওয়া—'প্রভু, আমাকে এটা দাও, ওটা দাও'—শেষ করিয়াছি তখনই ধর্মজীবন আরম্ভ হইবে।

দ্বিতীয়টি (ত্রিকোণ-স্বরূপ প্রেমের দ্বিতীয় কোণ) এই,—প্রেমে ভয় নাই। তুমি আমাকে কাটিয়া টুকরা টুকরা করিতে পারো, তবু আমি তোমাকে ভালবাসিতেই (থাকিব)। মনে কর, তোমাদের মধ্যে একজন মা—শরীর খুব দুর্বল—দেখিলে, রাস্তায় একটি বাঘ তোমার শিশুটিকে ছিনাইয়া লইতেছে। বলতো, তুমি তখন কোথায় থাকিবে? জানি, তুমি ঐ ব্যাঘ্রটির সম্মুখীন হইবে। অন্য সময়ে পথে একটি কুকুর পড়িলেই তোমাকে পলাইতে হয়, কিন্তু এখন তুমি বাঘের মুখে ঝাঁপ দিয়া তোমার শিশুটিকে কাড়িয়া লইবে। ভালবাসা ভয় মানে না। ইহা সমস্ত মন্দকে জয় করে। ঈশ্বরকে ভয় করা ধর্মের সূত্রপাত মাত্র, উহার পর্যবসান হইল প্রেমে। সমস্ত ভয় যেন তখন মরিয়া গিয়াছে।

তৃতীয়টি (ত্রিকোণাত্মক প্রেমের তৃতীয় কোণ) এই—প্রেম নিজেই নিজের লক্ষ্য। ইহা কখনই অপর কোন কিছুর 'উপায়' হইতে পারে না। যে বলে, 'আমি তোমাকে ভালবাসি এই-সব পাইবার জন্য', সে ভালবাসে না। প্রেম কখনই কোন উদ্দেশ্য-সাধনের উপায় নয়; ইহা নিশ্চিতভাবে পূর্ণতম সিদ্ধি। প্রেমের সীমা এবং আদর্শ কি? ঈশ্বরে পরম অনুরাগ—ইহাই সব। কেন মানুষ ঈশ্বরকে ভালবাসিবে? এই 'কেন'র কোন উত্তর নাই, কেন-না ভালবাসা তো কোন অভীষ্টসিদ্ধির জন্য নয়। ভালবাসা আসিলে উহাই মুক্তি, উহাই পূর্ণতা, উহাই স্বর্গ। আর কি চাই? অন্য আর কি প্রাপ্তব্য থাকিতে পারে? প্রেম অপেক্ষা মহত্তর আর কি তুমি পাইতে পারো?

আমরা সকলে প্রেম অর্থে যাহা বুঝি, আমি তার কথা বলিতেছি না। একটুখানি ভাবপ্রবণ ভালবাসা দেখিতে বেশ সুন্দর। পুরুষ নারীকে ভালবাসিল, আর নারী পুরুষের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। কিন্তু দেখাও তো যায় যে, পাঁচ মিনিটের মধ্যে জন (John) জেনকে (Jane) পদাঘাত

করিল এবং জেনও জনকে লাথি মারিতে ছাড়িল না। ইহা বৈষয়িকতা, ভালবাসাই নয়। যদি জন বাস্তবিকই জেনকে ভালবাসিত, তবে সেই মুহূর্তেই সে পূর্ণ হইয়া যাইত। (তাহার প্রকৃত) স্বরূপই প্রেম; সে স্বয়ংপূর্ণ। জন কেবলমাত্র জেনকে ভালবাসিয়া যোগের সমুদয় শক্তি পাইতে পারে, (যদিও) সে হয়তো ধর্মের, মনস্তত্ত্বের বা ঈশ্বরসম্বন্ধীয় মতবাদসমূহের একটি অক্ষরও জানে না। আমি বিশ্বাস করি, যদি কোন পুরুষ ও নারী পরস্পরকে যথার্থ ভালবাসিতে পারে, তাহা হইলে যোগিগণ যে-সকল বিভূতি লাভ করিয়াছেন বলিয়া দাবি করেন, এই দম্পতীও সেই-সকল শক্তি (অর্জন করিতে সমর্থ হইবে,) যেহেতু প্রেম যে স্বয়ং ঈশ্বর। সেই প্রেমস্বরূপ ভগবান্ সর্বত্র বিরাজমান এবং (সেইজন্য) তোমাদেরও মধ্যে এই ভালবাসা রহিয়াছে, তোমরা জানো বা না জানো।

একদিন সন্ধ্যার সময় আমি একটি যুবককে একটি তরুণীর জন্য অপেক্ষা করিতে দেখিয়াছিলাম।…মনে করিলাম, যুবককে পরীক্ষা করিবার ইহা একটি উপযুক্ত অবসর। সে তাহার প্রেমের গভীরতার মধ্য দিয়া অতীন্দ্রিয় দর্শন ও দূর-শ্রবণের ক্ষমতা লাভ করে। ষাট কি সত্তর বার যুবকটি একবারও ভুল করে নাই, এবং তরুণী ছিল দুইশত মাইল দূরে। (সে বলিত) 'এইভাবে তরুণী সাজগোজ করিয়াছে।' (কিংবা) 'ঐ সে চলিয়া যাইতেছে।' আমি ইহা নিজের চোখে দেখিয়াছি।

ইহাই হইতেছে প্রশ্ন: তোমার স্বামী কি ঈশ্বর নন? তোমার সন্তান কি ঈশ্বর নয়? তুমি যদি তোমার পত্নীকে ঠিক ঠিক ভালবাসিতে পারো, জগতের সকল ধর্মের ভাবই তোমাতে ফুটিয়া উঠিবে। তোমার মধ্যেই তুমি লাভ করিবে ধর্মের ও যোগের সমস্ত রহস্য। কিন্তু ভালবাসিতে পারো কি? প্রশ্ন তো ইহাই। তুমি বলো, 'মেরী, আমি তোমায় ভালবাসি…অহো, আমি তোমার জন্য মরিতে পারি।' (কিন্তু যদি তুমি) দেখ, মেরী অপর এক ব্যক্তিকে চুম্বন করিতেছে, তুমি তাহার গলা কাটিতে চাহিবে। আবার মেরী যদি জনকে অন্য একটি মেয়ের সহিত কথা বলিতে দেখে, তবে সে রাত্রে ঘুমাইতে পারিবে না এবং জনের জীবন নরকের ন্যায় দুর্বিষহ করিয়া তুলিবে। ইহার নাম 'ভালবাসা' নয়। ইহা যৌন ক্রয়-বিক্রয়। ইহাকে 'প্রেম' বলা অতীব নিন্দার্হ। সংসারের মানুষ দিবা-রাত্র ঈশ্বর ও ধর্মের কথা বলিয়া থাকে—

তেমনি প্রেমের কথাও। প্রত্যেক বিষয়কে একটি ভণ্ডামিতে পরিণত করা—ইহাই তো তোমরা করিতেছ! সকলেই প্রেমের কথা বলে, (তবু) সংবাদ-পত্রের স্তম্ভে (আমরা পড়ি) প্রত্যেক দিন বিবাহ-বিচ্ছেদের কাহিনী। যখন তুমি জনকে ভালবাসো, তখন কি তাহার জন্যই তাহাকে ভালবাসো, অথবা তোমার জন্য? (যদি তুমি তোমার নিজের জন্য তাহাকে ভালবাসো), তাহা হইলে জনের নিকট হইতে কিছু আশা কর। (যদি তাহার জন্যই তাহাকে ভালবাসো), তবে জনের কাছ হইতে তুমি কিছুরই প্রত্যাশা রাখ না। সে তাহার ইচ্ছানুযায়ী যাহা খুশি করিতে পারে, (এবং) তুমি তাহাকে একইভাবে ভালবাসিবে।)

এই তিনটি বিন্দু, তিনটি কোণ লইয়া (প্রেম)-ত্রিভুজ। প্রেম ব্যতীত দর্শনশাস্ত্র শুষ্ক হাড়ের মতো, মনস্তত্ত্ব একপ্রকার মতবাদ-বিশেষ এবং কর্ম শুধুই পণ্ডশ্রম। (প্রেম থাকিলে) দর্শন হইয়া যায় কবিতা, মনোবিজ্ঞান হয় (মরমী অনুভূতি) আর কর্ম সৃষ্টির মাঝে মধুরতম বলিয়া পরিগণিত হয়। (কেবলমাত্র) গ্রন্থ-অধ্যয়নে (লোকে) শুষ্ক হইয়া যায়। কে বিদ্বান্? যে অন্ততঃ একবিন্দু প্রেমও অনুভব করিতে পারে। ঈশ্বরই প্রেম এবং প্রেমই ঈশ্বর। আর ঈশ্বর তো সব স্থানেই রহিয়াছেন। ভগবান্ প্রেমস্বরূপ এবং সর্বত্র বিরাজমান—এইটি যে অনুভব করে, সে বুঝিতে পারে না যে, সে মাথায় ভর করিয়া বা পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছে—যেমন যে লোক এক বোতল মদ খাইয়াছে, সে জানে না যে, সে কোথায় রহিয়াছে।...যদি আমরা দশ মিনিট ভগবানের জন্য কাঁদি, পরবর্তী দুই মাস আমরা কোথায় আছি—সে জ্ঞান আমাদের থাকিবে না।...আহারের সময়ও আমরা মনে রাখিতে পারিব না, কি খাইতেছি—তাহাও জানিব না। ঈশ্বরকেও ভালবাসিবে, আবার সর্বদা বেশ ব্যবসা-বুদ্ধি থাকিবে—ইহা (কি করিয়া) সম্ভবপর?... প্রেমের সেই সর্বজয়ী সর্বব্যাপী শক্তি কিরূপে আসিতে পারে?...

মানুষ বিচারশীল নয়। তাহারা সকলেই পাগল। শিশুরা (পাগল) খেলায়, তরুণ তরুণীকে লইয়া, বৃদ্ধেরা তাহাদের অতীতের চর্বিত-চর্বণে।[১] কেহ বা পাগল অর্থের পিছনে। কেহ কেহ তবে ঈশ্বরের জন্য পাগল হইবে

[১] 'বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তঃ' ইত্যাদি, মোহমুদ্গরঃ—শঙ্করাচার্য, ১৩

না কেন? জন (John) জেনের (Jane) জন্য যেরূপ পাগল হইয়া ছুটিতেছে, ঈশ্বরের প্রেমের জন্য সেইরূপ উন্মাদ হও। কোথায়, এমন লোক কোথায়? (অনেকে) বলে, 'আমি কি এইটি ছাড়িব? অমুকটা ত্যাগ করিব?' একজন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,' বিবাহ কি করিব না?' না, কোন বিষয়ই ছাড়িতে যাইও না। বিষয়ই তোমাকে ছাড়িয়া যাইবে। অপেক্ষা কর, তুমি সব কিছুই ভুলিবে।

(সম্পূর্ণরূপে) ভগবৎপ্রেমে পরিণত হওয়া—এখানেই প্রকৃত উপাসনা। রোম্যান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ে সময় সময় ইহার কিছু আভাস পাওয়া যায়; সেই সব অত্যাশ্চর্য সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীগণ অলৌকিক ভগবৎপ্রেমে কিরূপ আত্মহারা হইয়া বেড়াইতেছেন! এইরূপ প্রেমই লাভ করিতে হইবে। ঐশ্বরিক প্রেম এই প্রকার হওয়াই উচিত—কিছুই না চাহিয়া, কিছুই অন্বেষণ না করিয়া।

প্রশ্ন হইয়াছিল—কিভাবে উপাসনা করিতে হইবে? তোমার সমস্ত বিষয়-সম্পদ, তোমার সকল পরিজন, সন্তান-সন্ততি—সব কিছু অপেক্ষা প্রিয়তর ভাবিয়া ঈশ্বরকে উপাসনা কর। (তাঁহাকে উপাসনা কর) যেন তুমি স্বয়ং ভালবাসাকেই ভালবাসিতেছ। এমন একজন আছেন, যাঁহার নাম 'অনন্ত প্রেম'—ইহাই ঈশ্বরের একমাত্র সংজ্ঞা। যদি এই…বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হইয়া যায়, কিছুমাত্র ভাবিও না। যতক্ষণ অনন্তপ্রেমস্বরূপ তিনি রহিয়াছেন, ততক্ষণ আমাদের ভাবনা কিসের? উপাসনার অর্থ কি, (তোমরা) দেখিলে তো? অন্য সব চিন্তা অবশ্যই চলিয়া যায়। ঈশ্বর ছাড়া সমস্তই তিরোহিত হয়। সন্তানের প্রতি পিতা বা মাতার যে ভালবাসা, স্বামীর উপর স্ত্রীর যে প্রেম, পত্নীর প্রতি স্বামীর যে ভালবাসা, বন্ধুর প্রতি বন্ধুর যে আকর্ষণ—এই-সব প্রেম একত্র ঘনীভূত করিয়া ঈশ্বরকে দিতে হইবে। যদি কোন নারী কোন পুরুষকে ভালবাসে, তবে সে পর-পুরুষকে ভালবাসিতে পারে না। যদি কোন পুরুষ কোন নারীকে ভালবাসে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে অন্য কোন (নারীকে) ভালবাসা সম্ভব নয়। ইহাই হইল ভালবাসার ধর্ম।

আমার গুরুদেব বলিতেন, 'মনে কর এই ঘরের মধ্যে এক থলে মোহর রহিয়াছে, আর পাশের ঘরে একটি চোর আছে—সে ঐ মোহরের থলের কথা জানে। চোরটি কি ঘুমাইতে পারিবে? নিশ্চয়ই নয়। সব সময়েই সে

পাগল হইয়া ভাবিতে থাকিবে, কি উপায়ে মোহরগুলি আত্মসাৎ করা যায়।'... (এইরূপে) কোন লোক যদি ভগবান্‌কে ভালবাসে, তবে সে কি করিয়া অন্য কিছুকে ভালবাসিবে? ঈশ্বরের বিপুল প্রেমের সম্মুখে অন্য কিছু দাঁড়াইবে কিরূপে? উহার কাছে সব কিছুই অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। সেই প্রেমকে লাভ করিবার জন্য—বাস্তব করিয়া তুলিবার জন্য, উহা অনুভব করিয়া উহাতেই অবস্থান করিবার জন্য পাগল হইয়া ছুটাছুটি না করিয়া মন থামিতে পারে কি?

আমরা এইভাবে ঈশ্বরকে ভালবাসিব: 'আমি ধন চাই না, (বন্ধুবান্ধব বা সৌন্দর্য চাই না) বিষয়-সম্পত্তি, বিদ্যা, এমন কি মুক্তিও চাই না। যদি ইহাই তোমার ইচ্ছা হয় আমাকে সহস্র মৃত্যুর কবলে পাঠাইয়া দাও। আমার শুধু এই প্রার্থনা যে, আমি যেন তোমাকে ভালবাসিতে পারি, আর যেন কেবল ভালবাসার জন্যই ভালবাসি। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদিগের বিষয়ের প্রতি যে টান, সেইরূপ তীব্র ভালবাসা যেন আমার হৃদয়ে আসে, কিন্তু কেবল সেই চিরসুন্দরের জন্য। ঈশ্বরকে বন্দনা! প্রেমময় ঈশ্বরকে বন্দনা!' ঈশ্বর ইহা ছাড়া অন্য কিছু নন। অনেক যোগী যে-সব অদ্ভুত ক্ষমতা দেখাইতে পারেন, তিনি সেগুলি গ্রাহ্য করেন না। ক্ষুদ্র জাদুকরেরা ক্ষুদ্র কৌশল প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ঈশ্বর শ্রেষ্ঠ জাদুকর; তিনি সমুদয় জাদুবিদ্যা দেখাইতে পারেন। কে জানে কত ব্রহ্মাণ্ড (আছে,) কে ভ্রূক্ষেপ করে?...

আর একটি উপায় আছে। সব কিছু জয় করিতে, সমস্ত কিছু দমন করিতে—শরীর (এবং) মন উভয়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে হইবে।... কিন্তু (ভক্ত বলেন) 'সব কিছু জয় করিবার সার্থকতা কি? আমার কাজ ঈশ্বরকে লইয়া।'

একজন যোগী ছিলেন, খুব ভক্ত! গলক্ষত-রোগে তিনি যখন মুমূর্ষু তখন অপর একজন যোগী—দার্শনিক—তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। (শেষোক্ত) যোগী বলিলেন, 'দেখুন, আপনি আপনার ক্ষতের উপর মন একাগ্র করিয়া উহা সারাইয়া ফেলুন না কেন?' তৃতীয় বার যখন এইরূপ বলা হইল, তখন (সেই পরমযোগী) উত্তর দিলেন, 'তুমি কি ইহা সম্ভব মনে কর, যে-মন সম্পূর্ণরূপে আমি ভগবান্‌কে নিবেদন করিয়াছি, (তাহা এই হাড়মাসের খাঁচায় টানিয়া আনিব?)' যীশুখ্রীষ্ট তাঁহার সাহায্যের জন্য

দেবসেনাদলকে আহ্বান করিতে সম্মত হন নাই। 'এই ক্ষুদ্র শরীর কি এতই মূল্যবান্ যে, ইহাকে দুই বা তিন দিন বেশী বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য আমি বিশ হাজার দেবদূতকে ডাকিয়া আনিব?'

(জাগতিক দিক হইতে) এই শরীরই আমার সর্বস্ব। ইহাই আমার জগৎ, আমার ভগবান্। আমি শরীর। দেহে চিমটি কাটিলে আমি মনে করি, আমাকেই কাটিলে। যদি মাথা ধরিল তো মুহূর্তে আমি ভগবান্‌কে ভুলিয়া যাই। আমি দেহের সহিত এমনই জড়িত! ঈশ্বর এবং সব কিছুকেই নামাইয়া আনিতে হইবে আমার এই সর্বোচ্চ লক্ষ্য—দেহের জন্য। এই দৃষ্টিকোণ হইতে যীশুখ্রীষ্ট যখন ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় মরণ বরণ করিলেন এবং (তাঁহার সাহায্যের জন্য) দেবদূতগণকে ডাকিলেন না, তখন তিনি মূর্খের কাজ করিয়াছিলেন; তাঁহাদিগকে নামাইয়া আনিয়া ক্রুশ হইতে মুক্তিলাভ করা তাঁহার অবশ্য কর্তব্য ছিল। কিন্তু যিনি প্রেমিক, তাঁহার নিকট এই দেহ কিছুই নয়; তাঁহার দিক হইতে দেখিলে—কে এই অকিঞ্চিৎকর জিনিসের জন্য মাথা ঘামাইবে? এই শরীর থাকে কি যায়—বৃথা চিন্তায় কি লাভ? রোম্যান সৈন্যগণের ভাগ্য-নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত বস্ত্রখণ্ডের চেয়ে এর দাম বেশী নয়।

(জাগতিক দৃষ্টি) ও প্রেমিকের দৃষ্টিতে আকাশ-পাতাল তফাত। ভালবাসিয়া যাও। যদি কেহ ক্রুদ্ধ হয়, তোমাকেও যে ক্রুদ্ধ হইতে হইবে, এমন কোন কারণ নাই। যদি কেহ নিজেকে হীন করিয়া ফেলে, তোমাকেও যে সেই হীন স্তরে নামিতে হইবে, তার কি মানে?··· 'অন্য লোক বোকামি করিয়াছে বলিয়া আমিও রাগ করিব? অশুভকে প্রতিরোধ করিও না।' ঈশ্বরপ্রেমিকগণ এইরূপই বলিয়া থাকেন। জগৎ যাহাই করুক, যে ভাবেই ইহা চলুক, (তাঁহাদের উপর) ইহা কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না।

জনৈক যোগী অলৌকিক শক্তি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, 'দেখ, আমার কী শক্তি! আকাশের দিকে তাকাও; আমি ইহাকে মেঘ দিয়া ঢাকিয়া দিব।' বৃষ্টি আরম্ভ হইল। (কেহ) বলিল, 'প্রভু, অদ্ভুত আপনার শক্তি! কিন্তু আমাকে তাহাই শিক্ষা দিন, যাহা পাইলে আমি আর কোন কিছু চাহিব না।'···শক্তিরও ঊর্ধ্বে যাওয়া—কিছুই চাই না, শক্তিলাভেও বাসনা নাই! (ইহার তাৎপর্য) শুধু বুদ্ধির দ্বারা জানা যায়

না।...হাজার হাজার বই পড়িয়াও তুমি জানিতে সমর্থ হইবে না...যখন আমরা ইহা বুঝিতে আরম্ভ করি, সমুদয় জগৎ-রহস্য যেন আমাদের সম্মুখে খুলিয়া যায়।...একটি ছোট মেয়ে তাহার পুতুল লইয়া খেলিতেছে—সব সময় সে নতুন নতুন স্বামী পাইতেছে, কিন্তু যখন তাহার সত্যকারের স্বামী আসে, তখন (চিরদিনের জন্য) সে তাহার পুতুল-স্বামীগুলি দূরে ফেলিয়া দেয়। ...জগতের সব কিছু সম্বন্ধে ঐ একই কথা। (যখন) প্রেমসূর্য উদিত হয়, তখন এই-সব খেলার শক্তি-সূর্য—এই-সমস্ত (কামনা-বাসনা) অন্তর্হিত হয়। শক্তি লইয়া আমরা কি করিব? যেটুকু শক্তি তোমার আছে, তাহা হইতেও যদি অব্যাহতি পাও তো ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও। ভালবাসিতে আরম্ভ কর। ক্ষমতার মোহ নিশ্চয়ই কাটানো চাই। আমার ও ভগবানের মধ্যে প্রেম ছাড়া আর কিছুই যেন খাড়া না হয়। ভগবান্ প্রেমস্বরূপ, আর কিছুই নন; আদিতে প্রেম, মধ্যে প্রেম—অন্তেও প্রেম।

এক রানীর সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে। তিনি রাস্তায় রাস্তায় (ভগবৎপ্রেমের বিষয়) প্রচার করিতেন। ইহাতে তাঁহার স্বামী ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে দেশের সর্বত্র অত্যন্ত নির্যাতন করিয়া তাড়া করিতেন। রানী তাঁহার ভগবৎপ্রেম বর্ণনা করিয়া গান গাহিতেন। তাঁহার গানগুলি সর্বত্র গীত হয়। 'চোখের জলে আমি (প্রেমের অক্ষয়লতা পুষ্ট করিয়াছি'[১]) ইহাই চরম, মহান্ (লক্ষ্য)। ইহা ব্যতীত আর কি আছে? (লোকে) ইহা চায়, উহা চায়। তাহারা সবাই পাইতে ও সঞ্চয় করিতে চায়। এই জন্যই এত কম লোক (প্রেম) বুঝিতে পারে, এত কম লোক ইহা লাভ করিতে পারে। তাহাদিগকে জাগাও এবং বলো। তাহা হইলে তাহারা এ-বিষয়ে আরও কিছু সঙ্কেত পাইবে।

প্রেম স্বয়ং শাশ্বত, অন্তহীন ত্যাগ-স্বরূপ। তোমাকে সব কিছু ছাড়িতে হইবে। কিছুই তোমার অধিকারে রাখা চলিবে না। প্রেম লাভ করিলে তোমার আর কিছুরই প্রয়োজন হইবে না।...'চিরকালের জন্য কেবল তুমিই আমার ভালবাসার ধন থাকিও।' প্রেম ইহাই চায়। 'আমার প্রেমাস্পদের অধরোষ্ঠের একটি মাত্র চুম্বন! আহা, যে তোমার চুম্বনের সৌভাগ্য লাভ

১ আঁসুয়ন জল সীঁচ সীঁচ প্রেমবেলী বোঈ—মীরাবাঈ

করিয়াছে, তাহার সমস্ত দুঃখ যে চলিয়া গিয়াছে। একটি মাত্র চুম্বনে মানুষ এত সুখী হয় যে, অন্য বস্তুর উপর ভালবাসা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া যায়। সে শুধু তোমারই স্তুতিতে মগ্ন থাকে, আর একমাত্র তোমাকেই দেখে।'[১] মানবীয় ভালবাসাতেও (দিব্য প্রেমের সত্তা লুকানো থাকে।) গভীর প্রেমের প্রথমক্ষণে সমস্ত জগৎ যেন এক সুরে তোমার হৃদয়-বীণার সঙ্গে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে। বিশ্বের প্রত্যেকটি পাখি যেন তোমারই প্রেমের গান গাহিয়া থাকে, প্রতিটি ফুল যেন তোমার জন্যই ফুটিয়া থাকে। চিরন্তন অসীম প্রেম হইতেই (মানবীয়) ভালবাসা উদ্ভূত।

ঈশ্বরপ্রেমিক কোন কিছুকে ভয় করিবেন কেন? দস্যু-তস্করের, দুঃখ-দুর্বিপাকের—এমন কি নিজের জীবনের ভয়ও তাঁহার নাই।…প্রেমিক অনন্ত নরকে যাইতেও প্রস্তুত, কিন্তু উহা কি নরক থাকিবে? স্বর্গ, নরক—এই-সব ধারণা ত্যাগ করিয়া আমাদিগকে উচ্চতর প্রেম আস্বাদন করিতে হইবে।… শত শত লোক প্রেমের অনুসন্ধানে তৎপর, কিন্তু উহা আসিলে ভগবান্ ছাড়া আর সবই অদৃশ্য হইয়া যায়।

অবশেষে প্রেম, প্রেমাস্পদ এবং প্রেমিক এক হইয়া যায়। ইহাই লক্ষ্য।…আত্মা ও মানুষের মধ্যে এবং আত্মা ও ঈশ্বরের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে কেন?…কেবল এই প্রেম উপভোগ করিবার জন্য। (ঈশ্বর নিজেকে ভালবাসিতে চাহিলেন, সেই জন্য তিনি নিজেকে নানা ভাগে বিভক্ত করিলেন।…প্রেমিক বলেন, 'সৃষ্টির সমগ্র তাৎপর্য ইহাই।' আমরা সকলেই এক। 'আমি ও আমার পিতা এক।' এইক্ষণে ঈশ্বরকে ভালবাসিবার জন্য আমি পৃথক্—হইয়াছি।…কোন্‌টি ভাল—চিনি হওয়া, না চিনি খাওয়া? চিনি হওয়া—তাহাতে আর কী আনন্দ? চিনি খাওয়া—ইহাই হইল প্রেমের অনন্ত উপভোগ)

প্রেমের সমগ্র আদর্শ—(ঈশ্বরকে) আমাদের পিতা, মাতা, সখা, সন্তানভাবে (ভাবিবার প্রণালী—ভক্তিকে দৃঢ় করিবার এবং গভীরতরভাবে তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিবার জন্য।) স্ত্রী-পুরুষের মধ্যেই ভালবাসার তীব্র অভিব্যক্তি। ঈশ্বরকে এইভাবেও ভালবাসিতে হইবে। নারী তাহার পিতাকে ভালবাসে,

[১] তুলনীয়ঃ, শ্রীমদ্ভাগবত, গোপীগীতা, ১০

মাতা-সন্তান-বন্ধুকেও ভালবাসে, কিন্তু পিতা, মাতা, সন্তান বা বন্ধুর কাছে সে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে পারে না। কেবল একজনের কাছে তাহার গোপনীয় কিছুই থাকে না। এইরূপ পুরুষের পক্ষেও।...পতি-পত্নীর সম্পর্ক সর্বাঙ্গীণ। এই সম্পর্কে অন্য সব ভালবাসা একীভূত হইয়াছে। পত্নী স্বামীর মধ্যে পিতা, মাতা, সন্তান সবই পায়। স্বামীও পত্নীর মধ্যে মাতা, কন্যা প্রভৃতি সব কিছু লাভ করে। স্ত্রী-পুরুষের এই সর্বগ্রাসী পরিপূর্ণ প্রেম ঈশ্বরের দিকে পরিচালিত করিতে হইবে—যে-প্রেম নারী সম্পূর্ণ নির্ভয়ে লজ্জা না করিয়া, রক্তের সম্বন্ধ না মানিয়া তাহার প্রিয়তমকে নিবেদন করে। কোন অন্ধকার নাই। তাহার নিজের নিকট হইতে যেমন গোপন করিবার কিছু নাই, সেইরূপ তাহার প্রেমাস্পদের নিকটেও গোপনীয় বলিতে কিছুই থাকে না। এইরূপ প্রেম (ঈশ্বরের উপর) আসা চাই। এই বিষয়গুলি ধারণা করা অত্যন্ত কঠিন। তোমরা ধীরে ধীরে এই-সব বুঝিতে পারিবে, তখন সমস্ত যৌনভাবও দূরে চলিয়া যাইবে। 'তাতল সৈকতে বারিবিন্দুসম' এই জীবন ও ইহার সকল সম্পর্কগুলি।

তিনি স্রষ্টা ইত্যাদি—এই-সমস্ত ধারণা তো বালকদিগের উপযুক্ত। তিনি আমার প্রিয়, আমার জীবন—ইহাই আমার অন্তরের ধ্বনি হউক।...

'আমার একমাত্র আশা আছে। লোকে তোমাকে বলে জগতের প্রভু।[১] ভালমন্দ, ছোটবড় সবই তুমি। আমিও তোমার এই জগতের অংশ এবং তুমিও আমার প্রিয়। আমার শরীর, মন, আত্মা তোমারই পূজাবেদীতলে। হে প্রিয়, আমার এই উপহারগুলি প্রত্যাখ্যান করিও না।'

১ তুহুঁ জগতনাথ, জগতে কহায়সি, নহি মুহি জগত কি বার।—বিদ্যাপতি

প্রেমের ধর্ম

১৮৯৫ খৃঃ ১৬ই নভেম্বর লণ্ডনে প্রদত্ত ভাষণের অনুলিপি

অনুভূতির গভীরে উপনীত হ'তে প্রতীক-উপাসনা এবং অনুষ্ঠানাদির মধ্য দিয়ে যাবার প্রয়োজন মানুষের আছে বলেই ভারতবর্ষে আমরা ব'লে থাকি, 'কোন ধর্মমতের গণ্ডীর মধ্যে জন্মানো ভাল, কিন্তু সেই মত নিয়েই মরা ভাল নয়।' চারাগাছকে রক্ষা করার জন্য বেড়ার আবশ্যকতা আছে, কিন্তু চারা যখন বৃক্ষে পরিণত হয়, তখন বেড়াই আবার বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং প্রাচীন পদ্ধতিগুলি সমালোচনা ও নিন্দা করার কোন প্রয়োজন নেই। আমরা ভুলে যাই যে, ধর্মের ক্রমবিকাশ অবশ্যই থাকবে।

আমরা প্রথমে সগুণ ঈশ্বরের চিন্তা করি, এবং তাঁকে স্রষ্টা, সর্বশক্তিমান্, সর্বজ্ঞ ইত্যাদি ব'লে বিশেষিত ক'রে থাকি। কিন্তু প্রেমের সঞ্চার হ'লে ঈশ্বর শুধু প্রেমস্বরূপ হয়ে যান। ঈশ্বর কী—তা নিয়ে প্রেমিক ভক্ত মাথা ঘামায় না, কারণ সে তাঁর কাছে কিছুই চায় না। জনৈক ভারতীয় সাধক বলেছেন, 'আমি তো আর ভিক্ষুক নই।' আর সে ভয়ও করে না। ভগবানকে মানুষেরই মতো ভালবাসো।

ভক্তিভাবাশ্রিত কয়েকটি সাধনপ্রণালীর উল্লেখ এখানে করা যাচ্ছে। (১) শান্ত: সহজ শান্তিপূর্ণ অনুরাগ—পিতৃত্ব ও সাহায্যের একটা ভাব মিশ্রিত; (২) দাস্য: সেবাভাবের আদর্শ; ঈশ্বর প্রভু বা অধ্যক্ষ বা সম্রাটরূপে দণ্ড ও পুরস্কারদানে রত; (৩) বাৎসল্য: ঈশ্বরে সন্তান-ভাব। ভারতবর্ষে মা কখনই শাস্তি দেন না। এ-সব অবস্থার প্রত্যেকটিতে উপাসক ঈশ্বরের এক-একটি আদর্শ গ্রহণ ক'রে তদনুযায়ী সাধন করে। তারপর (৪) ভগবান্ হন সখা; সখ্যভাবে কোন ভয় নেই। এতে সমতা ও অন্তরঙ্গতার ভাবও আছে। অনেক হিন্দুসাধক ঈশ্বরকে সখা ও খেলার সাথী জ্ঞানে উপাসনা করে। তারপর (৫) মধুর-ভাব: মধুরতম প্রেম, পতি-পত্নীর প্রেম। সেণ্ট টেরেসা এবং ভাবাবিষ্ট সাধকগণ—এর দৃষ্টান্ত। পারসীকদের মধ্যে কান্তাভাবে এবং হিন্দুদের মধ্যে পতিরূপে ঈশ্বরকে ভজনা করার রীতি আছে। মহীয়সী রানী মীরাবাঈএর কথা আমাদের মনে পড়ে;

তিনি ভগবান্‌কে পতি ব'লে প্রচার করতেন। অনেকের মত এত চরমে পৌঁছেছে যে, তাহাদের কাছে ঈশ্বরকে 'সর্বশক্তিমান্' বা 'পিতা' বলা যেন অধর্ম। এ-ভাবের উপাসনার ভাষা প্রণয়মূলক। এমনকি কেউ কেউ অবৈধ প্রণয়ের ভাষাও ব্যবহার ক'রে থাকেন। কৃষ্ণ ও ব্রজগোপিকাদের কাহিনী এই পর্যায়ভুক্ত। তোমাদের হয়তো ধারণা যে, এই ভাবের উপাসনায় সাধকের অত্যন্ত অধোগতি হয়। তা হয়ও বটে। তথাপি অনেক বড় বড় সাধকের জীবনে উন্নতিও হয়েছে এই ভাবের মধ্য দিয়ে। এমন কোন মানবীয় বিধান নেই, যার অপব্যবহার হয়নি। ভিখারী আছে ব'লে কি তুমি রান্না বন্ধ রাখবে? চোরের ভয়ে তুমি কি নিঃস্ব হয়েই কাটাবে? 'হে প্রিয়তম, তোমার অধরের একটি চুম্বনের একবার মাত্র আস্বাদন আমাকে পাগল ক'রে তুলেছে!'

এই ভাবে আরাধনার ফলে কেউ বেশীদিন কোন সম্প্রদায়ভুক্ত থাকতে বা আচার-অনুষ্ঠানাদি মেনে চলতে পারে না। ভারতে ধর্ম মুক্তিতে পর্যবসিত হয়। কিন্তু এ মুক্তিও ত্যাগ করতে হয়, তখন শুধু প্রেমের জন্যই প্রেম।

সর্বশেষে আসে নির্বিশেষ প্রেম—আত্মা। একটি পারসী কবিতায় বর্ণিত আছে, জনৈক প্রণয়ী তার প্রণয়িনীর ঘরের দরজায় ঘা দিল। প্রেমিকা জিজ্ঞাসা ক'রল 'কে তুমি?' প্রেমিক উত্তর দিল, 'তোমারই প্রিয়তম অমুক।' প্রেমিকা শুধু ব'লল, 'আমি তো এমন কাউকে চিনি না! তুমি চলে যাও!'…এভাবে চতুর্থবারও যখন প্রশ্ন ক'রল, তখন প্রেমিক বলে উঠল, 'প্রিয়তম, আমি তো তুমিই, অতএব দরজা খোল।' অবশেষে দরজা খুলে গেল।

প্রেমিকার ভাষায় অনুরাগ বর্ণনা ক'রে জনৈক মহান্ সাধক বলেছেন: 'চার চোখের মিলন হ'ল। দুটি আত্মায় যেন কি পরিবর্তন হয়ে গেল। এখন আর আমি বলতে পারি না—তিনি পুরুষ এবং আমি নারী, অথবা তিনি নারী এবং আমি পুরুষ। শুধু এটুকুই স্মৃতিতে আছে যে, আমরা দু-টি আত্মাই ছিলাম। অনুরাগের আবির্ভাবে এক হয়ে গেছি।'[১]

১ রায় রামানন্দ-সংবাদ—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

সর্বোচ্চ প্রেমে শুধু আত্মারই মিলন। অন্য যত রকম ভালবাসা, সবই দ্রুত বিলীয়মান। শুধু আত্মিক প্রেমই স্থায়ী হয়, এবং ক্রমশঃ বেড়ে যায়।

প্রেম দেখে আদর্শটি। এটি ত্রিভুজের তৃতীয় কোণ। ঈশ্বর কারণ, স্রষ্টা ও পিতা। প্রেম হচ্ছে চরম পরিণতি। কুঁজো সন্তানের জন্য মা আক্ষেপ করেন, কিন্তু দিন কয়েক লালন-পালনের পরই তাকে স্নেহ করেন এবং সব চেয়ে সুন্দর মনে করেন। কৃষ্ণাঙ্গ ইথিওপের ললাটে প্রেমিক সুন্দরী হেলেনেরই রূপ দেখে। এ-সব ব্যাপার আমরা সাধারণতঃ উপলব্ধি করতে পারি না। ইথিওপের ললাট উপলক্ষ্য মাত্র; প্রেমিক তো দেখে হেলেনকেই। উপলক্ষ্যের উপর তার আদর্শটি প্রক্ষেপ করা হয়, এবং আদর্শ তাকে আবৃত করে—শুক্তি যেমন বালুকণাকে মুক্তায় রূপান্তরিত করে। ঈশ্বর হচ্ছেন আদর্শ, যাঁর ভিতর দিয়ে মানুষ সব কিছু দেখতে পারে।

সুতরাং আমরা প্রেমকেই ভালবাসছি। এই প্রেম মুখে প্রকাশ করা যায় না। কোন বাক্যই তা উচ্চারণ করতে পারে না। এ বিষয়ে আমরা মৌন।

ইন্দ্রিয়গুলি প্রেমে অতিশয় উন্নত হয়। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, মানবীয় ভালবাসা গুণ-মিশ্রিত। অন্যের মনোভাবের উপর তা নির্ভরশীলও বটে। প্রেমের এই পারস্পরিক নির্ভরতাকে ব্যক্ত করার শব্দ ভারতীয় ভাষাগুলিতে আছে। সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের ভালবাসা হচ্ছে স্বার্থযুক্ত; তাতে শুধু ভালবাসা পাবার সুখই আছে। আমরা ভারতবর্ষে বলি, 'একজন গাল পেতে দিচ্ছে, আর একজন চুম্বন করছে।' পারস্পরিক প্রেম এর উর্ধ্বে। কিন্তু এও থাকে না। যথার্থ প্রেম সর্বস্ব-ত্যাগে। এ-অবস্থায় আমরা অন্যকে দেখতে অথবা আমাদের আবেগকে প্রকাশ করবার মতো কিছু করতেও চাই না। দেওয়াটাই যথেষ্ট। এভাবে মানুষকে ভালবাসা প্রায় অসম্ভব, কিন্তু ঈশ্বরকে ভালবাসা সম্ভব।

বালকেরা রাস্তায় ঝগড়া করতে করতে যদি ভগবানের নামে শপথ করে, ভারতবর্ষে তাতে কোন ঈশ্বরনিন্দা হয় না। আমরা বলি, আগুনে হাত দাও—তুমি অনুভব কর আর নাই কর, তোমার হাত পুড়বেই। তেমনি ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করলে কল্যাণ ছাড়া আর কিছু হবে না।

ঈশ্বরনিন্দার ভাবটি এসেছে ইহুদীদের কাছ থেকে; ইহুদীরা পারসীকদের আনুগত্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিল। ঈশ্বর বিচারকর্তা ও শাস্তা—এ-ভাবটি মন্দ

না হলেও নিম্নস্তরের ও স্থূল। ত্রিভুজের তিনটি কোণ: প্রেম কিছু চায় না; প্রেমে কোন ভয় নাই; প্রেম সর্বদাই উচ্চতম আদর্শের জন্য।

'সেই প্রেমময় ভগবান্ যদি বিশ্বভুবন জুড়ে না থাকতেন, তবে কে-ই বা এক মুহূর্ত বাঁচতে পারত, কে-ই বা এক মুহূর্ত ভালবাসতে পারত?'

আমরা অনেকেই দেখতে পাব যে, শুধু কর্ম করতেই আমরা জন্মেছি। ফলাফল ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ ক'রব। ভগবানের প্রীতির জন্যই কাজ করা হয়েছে। বিফল হলেও দুঃখ করবার কিছু নাই। ভগবানের প্রীতির জন্যই তো যত কিছু কর্ম।

নারীর মধ্যে মাতৃ-ভাবটি খুব পরিস্ফুট। ঈশ্বরকে তাঁরা সন্তানভাবে উপাসনা করেন; যা কিছু করেন তার জন্য কিছুই চান না।

ক্যাথলিক এই-সব গভীর তত্ত্বের অনেক কিছুই শেখায়, এবং একটু সংকীর্ণ হলেও অতিশয় ধর্মনিষ্ঠ। আধুনিক সমাজে প্রোটেস্টাণ্ট মত উদার হলেও অগভীর। সত্য কতখানি মঙ্গল করেছে, তা দ্বারা সত্যের বিচার করা—একটি শিশুকে কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মূল্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার মতোই অসঙ্গত।

সমাজ হবে প্রগতিশীল। নিয়মকে অতিক্রম ক'রে নিয়মের ঊর্ধ্বে যেতে হবে। প্রকৃতিকে জয় করার প্রয়োজনেই আমরা তাকে স্বীকার করি। ত্যাগের অর্থই হচ্ছে—কেউই ঈশ্বর ও ধন-দেবতার উপাসনা একসঙ্গে করতে পারে না।

তোমাদের বিচার-বুদ্ধি ও প্রেম গভীর কর। তোমাদের হৃদয়-পদ্ম ফুটিয়ে তোল—মৌমাছি আপনিই এসে জুটবে। প্রথমে নিজের উপর বিশ্বাস রাখো,—তারপর ঈশ্বরে বিশ্বাস আসবে। মুষ্টিমেয় শক্তিধর মানুষই পৃথিবী তোলপাড় ক'রে দিতে পারে। চাই পরের জন্য অনুভব করার সহানুভূতিশীল হৃদয়, উদ্ভাবনকারী মস্তিষ্ক, এবং কর্ম করার উপযোগী দৈহিক শক্তি। বুদ্ধ প্রাণি-বর্গের জন্যও আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। নিজেকে কর্ম করার যোগ্য যন্ত্র ক'রে তোল। কিন্তু ঈশ্বরই কর্ম করেন, তুমি কর না। একজনের মধ্যেই সমগ্র বিশ্ব রয়েছে। জড়বস্তুর একটি কণার মধ্যেই জগতের সমগ্র শক্তি নিহিত আছে। হৃদয় ও মস্তিষ্কের যদি বিরোধ দেখ, তবে হৃদয়কেই অনুসরণ কর।

পূর্বে বিধান ছিল প্রতিযোগিতা, আজকের বিধান হচ্ছে সহযোগিতা। আগামীকাল কোন বিধি-বিধানই থাকবে না। ঋষিরা তোমায় সাধুবাদ

করুন, অথবা জগৎ তোমায় ধিক্কার দিক, ভাগ্য-লক্ষ্মী তোমার প্রতি প্রসন্না হোন অথবা দারিদ্র্য ও বস্ত্রহীনতা তোমায় ভ্রূকুটি করুক, একদিন হয়তো বনের লতাপাতা আহার করবে, আবার পরদিনই পঞ্চাশ উপকরণের বিরাট ভোজে অংশ গ্রহণ করবে, ডাইনে বাঁয়ে লক্ষ্য না ক'রে এগিয়ে যাও !'[১]

[স্বামীজী তারপর প্রশ্নোত্তরে পওহারী বাবার কথা উল্লেখ করেন—কিভাবে সেই যোগী নিজের বাসনপত্রগুলি নিয়ে চোরের পিছনে ছুটেছিলেন এবং তার পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলেছিলেন, 'প্রভু, আমি জানতুম না যে, তুমি এসেছিলে ! দয়া ক'রে বাসনগুলি গ্রহণ কর। এগুলি তোমার ! আমি তোমার সন্তান, আমাকে ক্ষমা কর।'

স্বামীজী আরও বলেন, কিভাবে এক বিষধর সাপ সেই যোগীকে দংশন করে এবং সন্ধ্যার দিকে সুস্থ বোধ ক'রে তিনি বলতে থাকেন, 'আমার প্রিয়তমের কাছ থেকে দূত এসেছিল !']

১ নীতিশতকম্—ভর্তৃহরি

বিল্বমঙ্গল[1]

'ভক্তমাল' নামক একখানা ভারতীয় গ্রন্থ হইতে এই কাহিনীটি গৃহীত। এক গ্রামে জনৈক ব্রাহ্মণ যুবক বাস করিত। অন্য গ্রামের এক দুশ্চরিত্রা নারীর প্রতি সে প্রণয়াসক্ত হয়। গ্রাম দুইটির মধ্যে একটি বড় নদী ছিল। প্রত্যহ খেয়া-নৌকায় নদী পার হইয়া যুবক তাহার নিকট যাইত। একদিন যুবককে পিতৃশ্রাদ্ধাদির কার্যে নিযুক্ত থাকিতে হয়; এজন্য ঐকান্তিক ব্যাকুলতা সত্ত্বেও সেদিন সে মেয়েটির কাছে যাইতে পারিল না। হিন্দু-সমাজের এই অবশ্য করণীয় অনুষ্ঠান তাহাকে সম্পন্ন করিতে হইয়াছিল। যুবক ছটফট করিতে থাকিলেও তাহার কোন উপায় ছিল না। অনুষ্ঠান শেষ করিতে রাত্রি হইয়া গেল।

তখন ভীষণ গর্জন করিয়া ঝড় উঠিয়াছে। বৃষ্টি নামিল, প্রচণ্ড তরঙ্গাঘাতে নদী বিক্ষুব্ধ হইল। নদী পার হওয়া বিপজ্জনক, তথাপি যুবক নদীতীরে উপস্থিত হইল। খেয়াঘাটে নৌকা নাই; এ দুর্যোগে মাঝিরা নদী পার হইতে ভয় পায়। যুবক কিন্তু যাইবার জন্য অস্থির; মেয়েটির প্রেমে সে পাগল। সুতরাং তাহাকে যাইতেই হইবে। একখণ্ড কাঠ ভাসিয়া আসিতেছিল, তাই ধরিয়া সে নদী পার হইল। অপর তীরে পৌছিয়া কাষ্ঠখণ্ডটি টানিয়া উপরে উঠাইল এবং প্রণয়িনীর গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল। গৃহদ্বার বন্ধ; যুবক দ্বারে করাঘাত করিলেও ঝড়ের প্রচণ্ড শব্দে কেহই তাহা শুনিতে পাইল না। সুতরাং সে গৃহ-প্রাচীরের চতুর্দিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে যাহা দেখিতে পাইল, সেটিকেই প্রাচীর-লম্বিত রজ্জু বলিয়া মনে করিল।

'অহো! প্রিয়া আমার আরোহণের জন্য রজ্জু রাখিয়া দিয়াছে!'—মনে মনে এই বলিয়া যুবক সযত্নে সেটিকে ধরিল। সেই রজ্জুর সাহায্যে সে প্রাচীরে আরোহণ করিল এবং অপর দিকে পৌছিয়া পা ফসকাইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। একটা শব্দ শুনিয়া গৃহবাসিগণ জাগিয়া উঠিল। ঘরে বাহিরে আসিয়া

[1] যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালে স্বামী রাঘবানন্দ কর্তৃক মিস এস্. ই. ওয়াল্ডোর কাগজপত্রের মধ্যে প্রাপ্ত।

মেয়েটি যুবককে মূর্ছিত অবস্থায় দেখিতে পাইল এবং তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিল। যুবকের দেহ হইতে একটা উৎকট দুর্গন্ধ পাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'ব্যাপার কি? তোমার গায়ে এমন দুর্গন্ধ কেন? কি ক'রে আঙিনার ভেতরে এলে?' যুবক উত্তর করিল, 'কেন, আমার প্রেমিকা কি প্রাচীরে একটা দড়ি ঝুলিয়ে রাখেনি?' স্ত্রীলোকটি হাসিয়া বলিল, 'প্রেমিকা আবার কে? অর্থোপার্জনই আমাদের উদ্দেশ্য। তুমি কি মনে কর, তোমার জন্য আমি দড়ি ঝুলিয়ে রেখেছিলাম? কি উপায়ে তুমি নদী পার হ'লে?' 'কেন, একটি কাষ্ঠখণ্ড ধরেছিলাম।' মেয়েটি বলিল, 'চল, একবার দেখে আসি।'

যে রজ্জুর কথা বলা হইয়াছে, উহা ছিল একটা বিষধর গোখুরা সাপ, তাহার সামান্য স্পর্শেই মৃত্যু নিশ্চিত। সাপটার মাথা ছিল একটা গর্তের মধ্যে। সাপের গর্তে প্রবেশ করার সময় যুবক দড়ি মনে করিয়া তাহার লেজটা ধরিয়াছিল। প্রেমে পাগল হইয়াই সে এই কাজ করিয়াছিল। সাপের মুখ গর্তের মধ্যে এবং দেহ বাহিরে থাকিলে যদি কেহ তাহার লেজ ধরে, তবে সাপ তাহার মুখ গর্তের বাহিরে আনে না। এইজন্যই যুবক লেজ ধরিয়া প্রাচীর আরোহণ করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু যুবক খুব জোরের সহিত লেজ টানিতে থাকায় সাপটির মৃত্যু ঘটিয়াছিল।

স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞাসা করিল, 'কাষ্ঠখণ্ডটি কোথা পেলে?' উত্তর হইল, 'কেন, নদীতে ভেসে আসছিল।' বস্তুতঃ উহা ছিল একটি গলিত শব; নদীস্রোতে ভাসিয়া যাইবার সময় কাষ্ঠখণ্ড মনে করিয়া যুবক উহা ধরিয়াছিল। এখন বুঝা গেল, তাহার দেহে কেন ঐ দুর্গন্ধ। মেয়েটি যুবকের দিকে চাহিয়া বলিল, 'প্রেমে আমার কখনও বিশ্বাস ছিল না; আমরা কখনও প্রেমে বিশ্বাস করি না। কিন্তু এ যদি প্রেম না হয়, তবে—ভগবান্ রক্ষা করুন! প্রেম কি তা আমরা জানি না; কিন্তু বন্ধু! আমার মতো একজন নারীকে তুমি হৃদয় দান করলে কেন? কেন তোমার হৃদয় ভগবান্‌কে উৎসর্গ করলে না? এরূপ করলে তুমি সিদ্ধিলাভ করবে।'—এই কথায় যুবকের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল! ক্ষণেকের জন্য তাহার অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া গেল। 'ভগবান্ কি আছেন?' 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বন্ধু, আছেন বই কি!'

যুবক সেই স্থান ত্যাগ করিল, এবং চলিতে চলিতে এক অরণ্যে প্রবেশ করিয়া সেখানে সাশ্রুনয়নে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিল, 'প্রভু, আমি

তোমাকে চাই। আমার এ প্রেম-প্রবাহ ক্ষুদ্র মানব-হৃদয়ে ধরে না। আমি সেই প্রেমের সাগরকে ভালবাসিতে চাই, যেখানে আমার প্রেমের এই প্রবল প্রবাহিণী গিয়া মিশিতে পারে; আমার প্রেমের এই বেগবতী নদী তো আর ক্ষুদ্র জলাশয়ে প্রবেশ করিতে পারে না, ইহা চায় অনন্ত সাগর। প্রভু, তুমি যেখানেই থাকো, আমার কাছে এস।'

এইভাবে বহু বৎসর বনে কাটাইয়া তাহার মনে হইল, সে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সে শহরে আসিল। একদিন সে নদীতীরে একটি স্নানের ঘাটে বসিয়াছিল, এমন সময় ঐ শহরের এক বণিকের সুন্দরী যুবতী পত্নী পরিচারিকা-সহ সেই স্থান দিয়া চলিয়া গেল। বৃদ্ধের সেই পুরাতন ভাবটি আবার জাগিয়া উঠিল, সুন্দরীর সুন্দর মুখখানি তাহাকে আবার আকর্ষণ করিল। যোগী নির্নিমেষ নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইল এবং যুবতীকে তাহার গৃহ পর্যন্ত অনুসরণ করিল। মুহূর্তমধ্যে যুবতীর স্বামী আসিয়া উপস্থিত হইল এবং গৈরিকধারী সন্ন্যাসীকে দেখিয়া বলিল, 'মহারাজ, ভেতরে আসুন। আমি আপনার জন্য কি করতে পারি?' যোগী উত্তর করিলেন, 'আমি আপনার নিকটে একটি ভয়ানক বস্তুর প্রার্থী।' 'মহারাজ, যে-কোন বস্তু চাইতে পারেন, আমি গৃহস্থ; যে যা চায়, আমি তাকে তাই দিতে প্রস্তুত।' সন্ন্যাসী বলিলেন, 'আমি আপনার পত্নীর সঙ্গে দেখা করতে চাই।' গৃহস্থ বলিল, 'হা ভগবান্, এ কি! আমি তো পবিত্র, আমার স্ত্রীও পবিত্র; প্রভু সকলের রক্ষক। মহারাজ, স্বাগতম্, ভেতরে আসুন।' সন্ন্যাসী ভিতরে আসিতেই গৃহস্বামী স্ত্রীর নিকট তাহার পরিচয় দিল। স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমি আপনার জন্য কি করতে পারি?' সন্ন্যাসী তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'মা, আপনার চুল থেকে দুটো কাঁটা আমাকে দেবেন কি?' 'এই নিন্।' সন্ন্যাসী সেই কাঁটা দুটি নিজের দুই চোখে সজোরে বিঁধিয়া দিয়া বলিলেন, 'দূর হ, দুর্বৃত্ত নয়ন-যুগল। এখন থেকে তোরা আর সম্ভোগ করতে পারবি না। যদি দেখতেই চাস, তবে অন্তশ্চক্ষু দিয়ে দেখ্—সেই ব্রজের রাখালকে। এখন অন্তশ্চক্ষুই তোর সর্বস্ব।'

এইভাবে সন্ন্যাসী পুনরায় বনে ফিরিয়া গেলেন এবং আবার দিনের পর দিন ভগবানের কাছে কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার মধ্যে প্রেমের যে উদ্দাম প্রবাহ বহিতেছিল, তাহাই সত্যলাভের জন্য সংগ্রাম করিতে লাগিল; পরিশেষে

তিনি সিদ্ধিলাভ করিলেন। তাঁহার হৃদয়রূপ প্রেম-প্রবাহিণীর গতি ঠিক পথে পরিচালিত হইয়া তাঁহাকে রাখালরাজের নিকট পৌছাইয়া দিল।

কাহিনীতে এইরূপ বর্ণিত আছে, কৃষ্ণরূপে ভগবান্ তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন। পরে একবার মাত্র তাঁহার অনুতাপ আসিয়াছিল যে, তিনি চক্ষু হারাইয়া—কেবল অন্তর্দৃষ্টিই লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি প্রেমবিষয়ক কয়েকটি মনোরম কবিতা লিখিয়াছেন। সকল সংস্কৃত গ্রন্থেই লেখকেরা প্রথমে গুরুবন্দনা করেন। তাই বিল্বমঙ্গল সেই নারীকেই তাঁহার প্রথম গুরু বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন।

বাল-গোপালের কাহিনী

একদিন শীতের অপরাহ্নে—পাঠশালায় যাবার জন্য প্রস্তুত হ'তে হ'তে গোপাল নামে একটি ব্রাহ্মণ-বালক তার মাকে ডেকে ব'লল, 'মা, বনের পথ দিয়ে একা একা পাঠশালায় যেতে আমার বড় ভয় করে। অন্য সব ছেলেদের সঙ্গে হয় চাকর, না-হয় আর কেউ আসে। পাঠশালায় পৌছে দেবার জন্যও আসে, আবার বাড়ি নিয়ে যেতেও আসে। আমায় কেন কেউ সঙ্গে ক'রে বাড়ি নিয়ে আসে না, মা?'

একটি গ্রাম্য-পাঠশালার ছাত্র গোপাল। সকালে-বিকালে তার পাঠশালা ব'সত। বিকালের ছুটির পর, শীতের দিনে, বাড়ি আসতে আসতে পথেই সন্ধ্যা হয়ে যেত। তাছাড়া পাঠশালার পথটিও নিবিড় বনের মধ্য দিয়ে এঁকে বেঁকে গিয়েছে। কাজেই অন্ধকারে একলাটি ঐ পথে আসতে গোপালের ভয় ক'রত।

গোপালের মা বিধবা। শৈশবেই তার পিতার মৃত্যু হয়েছিল। নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের মতো অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, যজন-যাজন নিয়েই গোপালের বাবার দিন কাটত, সংসারের সুখ-সমৃদ্ধির দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল না। আবার তাঁর মৃত্যুর পর দুঃখিনী বিধবা তার মা যেন বিষয়-ব্যাপার থেকে আরও দূরে সরে গিয়েছিলেন, যদিও সে-সবের সঙ্গে যোগাযোগ কোনদিনই তাঁর বেশী ছিল না। তখন ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রে, নিষ্ঠার সঙ্গে ধ্যান-উপাসনা, যম-নিয়ম প্রভৃতি পালন ক'রে চরম-মুক্তিদাতা যে মৃত্যু, তারই জন্য ধৈর্য সহকারে তিনি অপেক্ষা করছিলেন। অন্তরে আশা ছিল—মৃত্যুর পরপারে, অন্তহীন জীবনের পথে, যিনি তাঁর ভালো-মন্দের সাথী, সুখ-দুঃখের অংশভাগী সেই দয়িতের সঙ্গে আবার মিলিত হবেন।...

নিজের একটি পর্ণকুটিরেই তিনি বাস করতেন। তাঁর স্বামী যখন বেঁচে ছিলেন, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত হিসাবে একখণ্ড ধানজমি কেউ তাঁকে দান করেছিল। সে-জমিতে যে ধান উৎপন্ন হ'ত—বিধবার প্রয়োজনের পক্ষে তাই ছিল যথেষ্ট। এ-ছাড়া, কুটিরটিকে ঘিরে আরও কিছু জমি ছিল। সেখানে বাঁশ-ঝাড় ছিল, কয়েকটি নারকেল গাছ ছিল, আর ছিল দু-চারটি আম ও লিচুর চারা। গ্রাম-

বাসীদের সাহায্যে সেগুলি থে:কও প্রচুর ফলমূল পাওয়া যেত। এরও উপর আর যা লাগত, তার জন্য প্রতিদিন অনেকটা সময় তিনি চরকায় সুতো কাটতেন।…

প্রভাতের প্রথম স্বর্ণ-কিরণ তালগাছের চূড়ায় চূড়ায় প্রতিফলিত হবার বহুপূর্বে তিনি ঘুম থেকে উঠতেন। তখনও প্রভাতী পাখির কল-কাকলি শুরু হ'ত না। একটি সামান্য মাদুর আর তার উপর বিছানো একখানা কম্বল—এই ছিল তাঁর শয্যা। সেই দীন শয্যাটিতে বসে অতি প্রত্যূষ থেকে তিনি নাম-গান আরম্ভ করতেন। পুণ্যশ্লোকা নারীদের পূত চরিতকথা কীর্তন করতেন, ঋষিদের প্রণাম জানাতেন, আর জপ করতেন। জপ করতেন মানুষের পরমাশ্রয় নারায়ণের নাম, করুণাময় মহাদেবের নাম, আর জগত্তারিণী তারাদেবীর নাম। সর্বোপরি অন্তরের সর্ব-আকূতি নিবেদন করতেন প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর দেবতা—শ্রীকৃষ্ণের কাছে, যিনি করুণায় বিগলিত হয়ে মানুষের শিক্ষার জন্য, ত্রাণের জন্য বাল-গোপালমূর্তিতে মর্ত্যধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সে প্রার্থনার ফলে তাঁর অন্তরে এক বিচিত্র আনন্দানুভূতি জেগে উঠত। মনে হ'ত তিনি যেন নিজস্বামীর সহিত একত্র হয়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হবার বাঞ্ছিত পথে আরও একটি দিন এগিয়ে গেলেন।

কুটিরের অনতিদূরে ছিল একটি নদী। দিবারম্ভের পূর্বেই সেই নদীতে তাঁর স্নান হয়ে যেত। স্নানকালে তাঁর প্রার্থনা ছিল—'হে দেবতা, নদীর নির্মলজলে স্নান ক'রে দেহটি আমার যেমন পবিত্র হ'ল—স্নিগ্ধ হ'ল, তোমার করুণায় আমার অন্তরটিও যেন তেমনি পবিত্র—তেমনি স্নিগ্ধ হয়ে যায়।'

তারপর সদ্যোধৌত শুদ্ধ একটি শ্বেতবস্ত্র পরিধান ক'রে তিনি পুষ্প-চয়ন করতেন, সুগন্ধ চন্দন প্রস্তুত করতেন বৃত্তাকৃতি চন্দন-পাটায়, এবং তুলসীপত্র আহরণ ক'রে পূজার উদ্দেশ্যে ছোট ঠাকুরঘরটিতে প্রবেশ করতেন। সে ঘরে তাঁর বাল-গোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। একটি রেশমী চন্দ্রাতপের নীচে, সুদৃশ্য দারু-নির্মিত সিংহাসনে, ভেলভেটের কোমল গদির উপরে, প্রায় পুষ্পাবৃত অবস্থায় থাকত শ্রীকৃষ্ণের সেই ধাতুনির্মিত বাল-গোপাল মূর্তিটি।

মায়ের প্রাণ শ্রীভগবান্‌কে পুত্ররূপে কল্পনা করেই শুধু তৃপ্তিলাভ ক'রত। তাঁর স্বামী জীবিতকালে কতদিন কতবার বেদোক্ত সেই নিরাকার, নিরবয়ব, নৈর্ব্যক্তিক দেবতার বর্ণনা তাঁকে শুনিয়েছেন। সর্ব-অন্তর দিয়ে সে-সব অনবদ্য

কাহিনী তিনি শ্রবণ করতেন, অকুণ্ঠচিত্তে ধ্রুব সত্য ব'লে সেগুলি বিশ্বাস করতেন। কিন্তু হায়! শিক্ষাহীন ও শক্তিহীন এক নারীর পক্ষে সে বিরাটকে ধারণা করা কিরূপে সম্ভব? তাছাড়া শাস্ত্রে তো এ-কথাও লিপিবদ্ধ রয়েছে—যে যে-ভাবে আমাকে ভজনা করে, সে সে-ভাবেই আমাকে লাভ ক'রে থাকে। মানুষ যুগে যুগে আমারই প্রদর্শিত পথ অনুসরণ ক'রে থাকে।—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যা পার্থ সর্বশঃ॥

এবং ঐ ভাবটিতেই তাঁর অন্তর ভরে যেত, অতিরিক্ত আর কিছু প্রার্থনীয় ছিল না।

এইভাবেই কাটছিল তাঁর জীবন। হৃদয়ের সকল ভক্তি, বিশ্বাস ও প্রেম বাল-গোপাল শ্রীকৃষ্ণে তিনি সমর্পণ করেছিলেন এবং সে সমর্পণটি বিশেষভাবে তাঁর ক্ষুদ্র ধাতু-বিগ্রহটিকে ঘিরেই নিয়ত লূতা-তন্তুর মতো আবর্তিত হ'ত। তাছাড়া ভগবানের এ-বাণীটিও তার শোনা ছিল—

'রক্তমাংসের তৈরী মানুষকে তুমি যেমন সেবা করো, আমাকেও তেমনি প্রেম পবিত্রতা দিয়ে সেবা কর। আমি সেই সেবা গ্রহণ ক'রব।'

সুতরাং সেবাই তিনি করতেন; যে-ভাবে নিজ প্রভুকে মানুষ সেবা করে, যে-ভাবে সেবা করে গুরুকে, সর্বোপরি তাঁর নয়নের নিধি পুত্রকে, একমাত্র সন্তানকে তিনি যেভাবে সেবা করতেন—শ্রীকৃষ্ণকেও তেমনিভাবেই সেবা করতেন। প্রতিদিন ধাতুমূর্তিটিকে তিনি স্নান করাতেন, সাজাতেন, ধূপধুনা দিতেন তার সামনে। কিন্তু ভোগ বা নৈবেদ্য? হায়, দরিদ্র বিধবার সে সামর্থ্য কোথায়? দুঃখে তাঁর চোখে জল আসত, আর সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করতেন স্বামীর কাছে শোনো সেই শাস্ত্রবচন, ভগবানের সেই অভয়-উক্তি—পত্র, পুষ্প, ফল, জল—ভক্তির সঙ্গে যে আমাকে যা-কিছু দান করে, আমি তাই গ্রহণ ক'রে থাকি।—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥

সুতরাং তাঁর প্রার্থনা ছিল এই মন্ত্রে: হে দেবতা, এই বিপুলা পৃথিবীতে কত বিচিত্র কুসুম তোমারই প্রীতির জন্য নিয়ত ফুটে উঠছে, তবু আমার তুচ্ছ

বনফুল ক-টি তুমি গ্রহণ কর। তুমি বিশাল বিশ্বের অন্নদাতা, তথাপি আমার সামান্য ফলের নৈবেদ্য গ্রহণ কর। আমি শক্তিহীন, শিক্ষাহীন। তুমিই আমার দেবতা, আমার প্রাণের রাখাল, আমার পুত্র। তুমি কৃপা ক'রে আমার পূজা-অর্চনা সার্থক কর, আমার প্রেম কামনাহীন কর।...

পূজার ফল ব'লে যদি কিছু থাকে, তবে সে ফলও তুমিই গ্রহণ কর। আমাকে দাও প্রেম, শুধু প্রেম—যে-প্রেম অন্য কোন প্রতিদানের প্রত্যাশা রাখে না, প্রেম ভিন্ন আর কিছু আকাঙ্ক্ষা করে না।

হয়তো অকস্মাৎ কোনদিন গ্রামের বাউল-বৈরাগী মায়ের ক্ষুদ্র আঙিনাটিতে এসে দাঁড়ায় এবং প্রভাতী সুরে গান ধরে—

শোনরে মানুষ ভাই,
প্রেমের কথা কয়ে যাই
(আমি) জ্ঞানের ডাকে ভয় করিনে—
প্রেমের ডাকে করি ভয়,
আমার আসন কাঁপে
প্রেমের ডাকে,
প্রেমাশ্রুতে হই উদয়।
নিত্যমুক্ত যেই ভগবান
নিরবয়ব ব্রহ্ম যেই,
প্রেমের দায়ে নররূপে
তারি খেলা দেখতে পাই;
তারি লীলা জানতে পাই।
বৃন্দাবনের কুঞ্জছায়ে
জ্ঞানের কিবা প্রকাশ ছিল?
রাখাল বালক গোপ-বালিকা
শাস্ত্র কবে পড়েছিল?
কিন্তু তারা প্রেমিক ছিল,
ছিল ভালবাসায় ভরা,
তাইতো তাদের প্রেমের পাশে
আমি চির রইনু ধরা।

এমনি ক'রে তাঁর মাতৃহৃদয় যেন ভাগবত সত্তার মধ্যেই নিজের পুত্রটিকে লাভ করেছিল এবং দেব-গোপালের নামানুসারে পুত্রের নামও তিনি রেখেছিলেন—গোপাল। তাকে অবলম্বন করেই এ-জগতের বুকে নিজের মনটিকে ধরে রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। নতুবা পার্থিব-বন্ধনহীন তাঁর মন মুহুর্মুহুঃ জাগতিক সব কিছুর উর্ধ্বে ধাবিত হ'ত। এ মাটির পৃথিবীতে তাঁর যে প্রাত্যহিক জীবন, তা ছিল যেন অনেকটা কলের মতো, নিষ্প্রাণ যন্ত্রের মতো। বস্তুতঃ তাঁর চলা-ফেরা, তাঁর চিন্তা সুখ, এক কথায় তাঁর সমগ্রজীবনটুকু কি ঐ ক্ষুদ্র বালকটিকে ঘিরেই আবর্তিত ছিল না? হ্যাঁ, তাই ছিল।

বৎসরের পর বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে, আর তিনি তাঁর মাতৃহৃদয়ের সকল কোমলতা দিয়ে ঐ শিশুর জীবনের ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করেছেন। আজ সে পাঠশালায় যাবার মতো বড় হয়েছে, পাঠশালায় সে যাবে। তাই ছাত্রজীবনের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো সংগ্রহ করবার জন্য মার কত দীর্ঘদিনব্যাপী কঠোর পরিশ্রম!

প্রয়োজন অবশ্য খুব বেশী ছিল না। যে-দেশে মাটির প্রদীপে একছটাক তেল ঢেলে আর একটা কাপড়ের সলতে লাগিয়ে আলো জেলে প্রফুল্ল চিত্তে মানুষ বিদ্যাচর্চায় দিন কাটায়, যেখানে ঘাসের তৈরী একটি মাদুর ভিন্ন আর কোন আসবাব-পত্রেরই প্রয়োজন হয় না, সে-দেশের ছাত্রজীবনের প্রয়োজন খুব বেশী হবার কথাও নয়। তবু সামান্য যে দু-চারটি জিনিসের প্রয়োজন ছিল, তা সংগ্রহ করতেই দরিদ্র বিধবাকে বহুদিন পরিশ্রম করতে হয়েছিল।

দিনের পর দিন চরকায় সূতা কেটে গোপালের জন্য একখানা পরবার কাপড় এবং একখানা গায়ে দেবার চাদর তাঁকে সংগ্রহ করতে হয়েছিল। সংগ্রহ করতে হয়েছিল মাদুর-জাতীয় ছোট একটি আসন, যার উপর দোয়াত, খাগের কলম প্রভৃতি রেখে গোপাল লিখবে এবং পরে যেটিকে গুটিয়ে বগল-দাবা ক'রে পাঠশালায় যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে যাবে, আর ফিরবার সময় সঙ্গে নিয়ে আসবে।

তারপর যে-শুভদিনটিতে গোপালের বিদ্যারম্ভ হ'ল, সে প্রথম অ, আ লিখতে চেষ্টা ক'রল—সে-দিনটি দুঃখিনী মায়ের কাছে যে কী আনন্দের দিন ছিল, তা মা ভিন্ন অন্যের পক্ষে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। কিন্তু আজ? আজ তাঁর মনে একটি গভীর বিষাদের ছায়া পড়েছে। বনপথ দিয়ে একা

যেতে-আসতে গোপাল ভয় পাচ্ছে, কে তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে? এর আগে কোনদিন নিজের বৈধব্যের নিঃসঙ্গতা ও দারিদ্র্য এমন ক'রে তিনি ভাবেননি, অনুভব করেননি। মুহূর্তের জন্য চতুর্দিক যেন অন্ধকারে ঢেকে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর মনে পড়ল ভগবানের সেই চিরন্তন আশ্বাসবাণী—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥

একান্তভাবে—অনন্যচিন্ত হয়ে যে ব্যক্তি আমার উপর নির্ভর করে, আমি তার সকল ভার স্বয়ং বহন ক'রে থাকি।

আর তাঁর বিশ্বাসী মন ঐ আশ্বাস-বাণীতেই একটি আশ্রয় খুঁজে পেল।···

তারপর চোখের জল মুছে ছেলেকে বললেন, ভয় কি বাবা! ঐ বনে আমার আর একটি ছেলে থাকে, তারও নাম গোপাল। সে তোমার বড় ভাই। বনভূমির অন্ধকার পথে যখন তুমি ভয় পাবে, তখন তোমার দাদাকে ডেকো।'

বিশ্বাসী মায়ের পুত্র গোপাল। সেও তাই সকল অন্তর দিয়েই মার কথা বিশ্বাস ক'রল।···

তারপর সেদিন অপরাহ্নে—পাঠশালা থেকে ফেরবার পথে অরণ্যভূমির নিবিড়তায় ভয় পেয়েই মায়ের নির্দেশ অনুসারে বালক তার বনের ভাইটিকে ডাক দিল—'গোপাল-দাদা, তুমি কি এখানে আছ? মা বলেছেন, তুমি এই বনে থাকো; বলেছেন, তোমাকে ডাকতে। একলাটি আমার বড় ভয় করছে, ভাই!'

তখন দূর বনান্তরাল থেকে শব্দ ভেসে এল—'ভয় নেই ভাই, এই তো আমি রয়েছি। ভয় কিসের, তুমি বাড়ি যাও।'

সেদিন থেকে, এমনি ক'রে দিনের পর দিন গোপাল তার বনের দাদাকে ডাকে, আর একই স্বর শুনতে পায়। বাড়ি এসে মাকে সে-সব কথা সে বলে, আর মা বিস্ময়ে প্রেমে মুগ্ধ হয়ে শোনেন সে কাহিনী। তারপর একদিন মা তাকে বললেন—'বাবা, এরপর যখন তোমার রাখাল দাদার সঙ্গে কথা হবে, তখন তাকে বলো সে যেন তোমাকে দেখা দেয়।'···

পরদিন যথাকালে বনপথে যাবার সময় গোপাল তার ভাইকে ডাক দিল এবং পূর্বের মতো উত্তরও এল বন থেকে। কিন্তু এবার মার কথা-

মত গোপাল তার দাদাকে দেখা দেবার জন্য একান্ত অনুরোধ ক'রল। ব'লল, 'গোপাল দাদা, তোমাকে তো কোনদিন আমি দেখিনি। আজ আমাকে দেখা দাও।'

তখন উত্তর শোনা গেল, 'ভাই, এখন বড় ব্যস্ত আছি। আজ আমি আসতে পারব না।' কিন্তু গোপাল ছাড়বে না; সে বার বার কাতরভাবে অনুরোধ করতে লাগলো। তখন অকস্মাৎ বনের ছায়াচ্ছন্ন প্রদেশ থেকে বেরিয়ে এল বনের রাখাল। পরনে গোপালকের বেশ, মাথায় ছোট্ট মুকুট—তাতে বসানো শিখিপুচ্ছ, হাতে বাঁশের বাঁশী।

দুইটি বালকই তখন মহাখুশী। একসঙ্গে তারা খেলা ক'রল, গাছে উঠল, ফল কুড়ালো, ফুল কুড়ালো—বনের গোপাল আর দুঃখিনী মায়ের গোপাল—দু-টি ভাই। খেলতে খেলতে পাঠশালার সময় প্রায় উত্তীর্ণ হয়ে এল এবং গোপাল একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও পাঠশালার পথে চলে গেল।

সেদিন তার পাঠ প্রায় ভুল হয়ে গেছে। সমগ্র অন্তর উৎসুক হয়ে রয়েছে কেবল বনে ফিরে রাখাল দাদার সঙ্গে আবার খেলা করবার প্রবল আকাঙ্ক্ষায়।…

এইভাবে কয়েকমাস সময় কেটে গেল। দিনের পর দিন সন্তানের বিচিত্র কাহিনী শুনতেন মা, আর ভগবানের অপার করুণার কথা চিন্তা ক'রে নিজের দৈন্য বৈধব্য প্রভৃতি সব কিছু ভুলে যেতেন। দুঃখকে মনে মনে গ্রহণ করতেন ভগবানের অনন্ত আশীর্বাদ ব'লে।

এরপর পাঠশালার গুরুমশায়ের গৃহে একটি শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠানের দিন এল। সে-কালে গ্রাম্য-পাঠশালার পণ্ডিতগণ একাই অনেকগুলি ছেলেকে লেখাপড়া শেখাতেন। নির্ধারিত বেতন হিসাবেও তাঁরা বিশেষ কিছু গ্রহণ করতেন না। কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াকর্ম উপস্থিত হ'লে ছাত্রেরা নানা উপঢৌকন দিত শিক্ষককে এবং সে-সবের উপর তাঁরা অনেকাংশে নির্ভরও করতেন।

কাজেই গোপালের গুরুমশায়ও ছাত্রদের কাছে অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপঢৌকনের জন্য অনুরোধ জানালেন এবং প্রত্যেক ছাত্র সাধ্যমত সে অনুরোধ রক্ষাও ক'রল। কেউ দিল অর্থ, কেউ দিল অন্য কোন দ্রব্য-সামগ্রী। কিন্তু দুঃখিনী বিধবার পুত্র গোপাল? হায়, উপঢৌকনের সামগ্রী সে কোথায়

পাবে? তাই অন্য পড়ুয়ারা একটু বিদ্রূপের হাসি হেসে—কে কি দেবে, তার বিবরণ গোপালকে শুনিয়ে শুনিয়ে ব'লে বেড়াতে লাগলো।

সে রাত্রে মনে গভীর দুঃখ নিয়ে গোপাল মাকে সব কথা ব'লল। ব'লল,—'গুরুমশায়ের জন্য কিছু দিতেই হবে।' কিন্তু মায়ের তো কোন সম্বলই নেই, কি দেবেন তিনি?

অবশেষে তিনি স্থির করলেন, যা চিরদিন ক'রে এসেছেন জীবনের সর্বাবস্থায়, আজও তাই করবেন, রাখালরূপী শ্রীকৃষ্ণের উপর নির্ভর করবেন। তাঁর কাছেই চাইবেন, যদি কিছু প্রয়োজন হয়। সুতরাং ছেলেকে বললেন, সে যেন তার বনের রাখাল-দাদার কাছে গুরুমশায়ের জন্য কিছু চেয়ে নেয়।

পরদিন বনের পথে রাখাল-দাদার সঙ্গে যথানিয়মে গোপালের দেখা হ'ল, দুজনে কিছুক্ষণ খেলাধূলাও ক'রল। তারপর বিদায় নেবার কালে গোপাল তার দুঃখের কথা জানালো রাখাল-দাদাকে, অনুরোধ ক'রল গুরুমশায়কে দেবার মতো কিছু উপহার সে যেন তাকে দেয়।

রাখাল ব'লল, 'ভাই গোপাল, আমি সামান্য বনের রাখাল। মাঠে মাঠে গোরু চরাই। আমার তো টাকা-পয়সা নেই, ভাই। তবে তোমার রাখাল-দাদার উপহারস্বরূপ এই ছোট ক্ষীরের বাটিটি তুমি নাও, এইটি তোমার গুরুমশায়কে উপহার দিও।'

গোপালের তখন আনন্দ আর ধরে না। একে তো গুরুমশায়ের জন্য কিছু উপহার হাতে পেয়েই সে খুশী, তার উপর সে-উপহার এসেছে রাখাল-দাদার কাছ থেকে। অতি দ্রুত সে পাঠশালায় চলে গেল। পাঠশালার অন্যান্য ছাত্রেরা তখন সার দিয়ে দাঁড়িয়ে এক এক ক'রে গুরুমশায়ের হাতে তাদের উপহার তুলে দিচ্ছে। গোপালও কম্পিতবক্ষে সারের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালো। ভিন্ন ভিন্ন ছাত্রের হাতে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ভাল ভাল উপহার ছিল, সুতরাং পিতৃহীন দরিদ্র বালকের তুচ্ছ উপহারের দিকে কেউ তাকিয়েও দেখল না।

সে-তাচ্ছিল্যে গোপাল যেন দমে গেল, দুঃখে তার চোখে জল এল। অবশেষে হঠাৎ গুরুমশায়ের চোখ প'ড়ল তার দিকে। তিনি তখন তার হাত থেকে ক্ষীরের পাত্রটি নিয়ে অন্য একটি বৃহৎ পাত্রে ঢেলে দিলেন। কিন্তু একি! মুহূর্তে সে শূন্যপাত্র আবার ক্ষীরে পূর্ণ হয়ে গেল! আবার

ঢাললেন, আবারও পূর্ণ হ'ল! এমনি যতবার তিনি ঢালেন, ততবারই পাত্রটি মুহূর্তে ভরে ওঠে!

উপস্থিত সকলে তো একেবারে স্তম্ভিত। গুরুমশায় তখন দু-হাতে গোপালকে কোলে তুলে নিলেন। বললেন, 'এ-পাত্র তুই কোথায় পেলি, বাবা?'

গোপাল তখন পণ্ডিতমশায়ের কাছে তার বনের রাখাল-দাদার কাহিনী আনুপূর্বিক বর্ণনা ক'রল। কেমন ক'রে সে তাঁকে প্রতিদিন ডাকে এবং সাড়া পায়; কেমন ক'রে প্রতিদিন দু-জনে তারা খেলা করে এবং কেমন ক'রে ঐ ক্ষীরের ছোট পাত্রটিও রাখাল-দাদার হাত থেকেই সে পেয়েছে।

সব কথা শুনে গুরুমশায় তখনই তার সঙ্গে বনে গিয়ে সেই অদ্ভুত রাখাল-বালককে দেখতে চাইলেন এবং গোপালও মহানন্দে তাঁকে নিয়ে চ'লল। বনস্থলীতে গিয়ে অন্যদিনের মতো আজও সে তার দাদাকে ডাকলো, কিন্তু সেদিন কোন উত্তর শোনা গেল না। গোপাল বার বার ডাকতে লাগলো, তবু কোন জবাব এল না। তখন অতি করুণ স্বরে গোপাল ব'লল, 'রাখাল-দাদা, আজ তুমি আমার ডাকে সাড়া দিচ্ছ না? তুমি উত্তর না দিলে এঁরা যে মনে করবেন, আমি মিথ্যা কথা বলছি।'

তখন অতিদূর বনপ্রদেশ থেকে একটি স্বর ভেসে এল—এক অশরীরী শব্দ, কে যেন বলছে, 'ভাই, তোমার আর তোমার মায়ের ভক্তি-বিশ্বাসের টানেই আমি তোমার কাছে যাই। কিন্তু তোমার গুরুমশায়ের এখনও অনেক দেরী, তাঁকে ব'লো সে-কথা।'

শিষ্যের সাধনা

১৯০০ খৃঃ ২৯শে মার্চ স্যান ফ্রান্সিস্কো শহরে প্রদত্ত।

আমার বক্তব্য বিষয়—শিষ্যত্ব। জানি না, আমার বক্তব্য আপনারা কি ভাবে গ্রহণ করিবেন। আপনাদের পক্ষে এই ভাব গ্রহণ করা কিছু কঠিন হইবে—আমাদের দেশের গুরু-শিষ্যের আদর্শ ও এদেশের গুরু-শিষ্যের আদর্শের মধ্যে অনেক প্রভেদ। ভারতবর্ষের এক প্রাচীন প্রবাদবাক্য আমার মনে পড়িতেছে: গুরু মিলে লাখ লাখ, চেলা নাহি মিলে এক। এই প্রবাদ-বাক্যটি সত্য বলিয়াই মনে হয়। আধ্যাত্মিকতা লাভের পথে শিষ্যের মনোভাবই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যথার্থ মনোভাব থাকিলে জ্ঞানলাভ সহজেই ঘটিয়া থাকে।

সত্যলাভ করিতে হইলে শিষ্যের কি কি গুণ থাকা প্রয়োজন? জ্ঞানী মহাপুরুষগণ বলেন, এক নিমেষেই সত্যলাভ করা যায়—ইহা তো শুধু জানার ব্যাপার। স্বপ্ন ভাঙিয়া যায়—ভাঙিতে কতক্ষণ লাগে? এক মুহূর্তেই স্বপ্ন শেষ হইয়া যায়। ভ্রান্তি দূর হইতে কতক্ষণ লাগে? চক্ষের পলক মাত্র। যখন সত্যকে জানিতে পারি, তখন কেবল মিথ্যাজ্ঞান তিরোহিত হয়, আর কিছুই হয় না। রজ্জুকে সর্প ভাবিয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি—ইহা রজ্জু। সমগ্র ঘটনাটি আধ সেকেণ্ডের ব্যাপার মাত্র। 'তুমিই সেই'—তুমিই সত্যস্বরূপ—ইহা জানিতে কতক্ষণ লাগে? যদি আমরা ব্রহ্মই এবং সর্বদাই ব্রহ্মস্বরূপ, তবে ইহা না জানাই সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য। ইহা জানিতে পারাই তো স্বাভাবিক। আমরা বরাবর কি ছিলাম, বর্তমানেই বা আমাদের স্বরূপ কি, তাহা জানিতে নিশ্চয়ই যুগযুগান্ত লাগিবে না।

তবু এই স্বতঃসিদ্ধ সত্যটি উপলব্ধি করা কঠিন বলিয়া মনে হয়। ইহার অতি ক্ষীণ আভাস লাভ করিতেই যুগযুগান্ত কাটিয়া যায়। ঈশ্বরই জীবন; ঈশ্বরই সত্য। এ-বিষয়ে আমরা গ্রন্থ লিখিয়া থাকি; আমাদের অন্তরের অন্তরে আমরা ইহা অনুভব করি যে, ঈশ্বর ব্যতীত আর সবই মিথ্যা; আজ এ-কথা অনুভব করি, কাল এ-ভাব থাকিবে না, তবু সারাজীবন আমাদের অধিকাংশই পূর্বে যেমন ছিলাম সেইরূপই থাকিয়া যাই। আমরা অসত্যকে

আঁকড়াইয়া থাকি এবং সত্যের প্রতি বিমুখ হই। আমরা সত্যলাভ করিতে চাই না। আমরা চাই না যে, কেহ আমাদের স্বপ্ন ভাঙিয়া দেয়। তবেই দেখিতেছ, কেহ গুরুর প্রয়োজন বোধ করে না। শিখিতে চায় কে? কিন্তু যদি কেহ মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিয়া সত্য উপলব্ধি করিতে চায়, যদি কেহ গুরুর নিকট সত্যলাভ করিতে চায়, তাহাকে খাঁটি শিষ্য হইতেই হইবে।

শিষ্য হওয়া সহজ নয়; তাহার জন্য অনেক প্রস্তুতি প্রয়োজন। অনেক নিয়ম পালন করিতে হয়। বৈদান্তিকগণ চারিটি প্রধান সাধনের কথা বলিয়াছেন। প্রথম সাধন এই—যে-শিষ্য সত্য জানিতে চায়, তাহাকে ইহ-পরজীবনে সমস্ত লাভের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে হইবে।

আমরা যাহা দেখিতেছি, তাহা সত্য নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মনের মধ্যে কোনরূপ বাসনা থাকে, ততক্ষণ যাহা দেখি তাহা সত্য নয়। ঈশ্বরই সত্য, জগৎ সত্য নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মনে সংসারের জন্য বিন্দুমাত্র আসক্তি থাকে, ততক্ষণ সত্য লাভ হইবে না। 'আমার চারিদিকে জগৎ ধ্বংস হইয়া যাক—আমি ভ্রূক্ষেপ করি না'—পরলোক সম্বন্ধেও ঠিক এই প্রকার মনোভাব পোষণ করিতে হইবে; আমি স্বর্গে যাইতে চাই না। স্বর্গ কি?—এই জগতেরই অনুবৃত্তিমাত্র। যদি স্বর্গ না থাকিত—এই অসার পার্থিব জীবনের কোন অনুবৃত্তি যদি না থাকিত, আমরা আরও ভাল হইতাম; যে ক্ষণিকের মিথ্যা স্বপ্নে আমরা মগ্ন, সে-স্বপ্ন আরও শীঘ্র ভাঙিয়া যাইত। স্বর্গে যাইয়া আমরা শুধু আমাদের দুঃখজনক মোহকে দীর্ঘতর করিয়া তুলি।

স্বর্গে যাইয়া কি লাভ হইবে? দেবতা হইয়া অমৃত পান করিবেন, আর বাতব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়িবেন। পৃথিবী অপেক্ষা সেখানে দুঃখ যেমন কম, সত্যও তেমনি কম। অতিশয় দরিদ্র অপেক্ষা ধনী ব্যক্তি অনেক কম সত্য বুঝিতে পারে। 'ধনী ব্যক্তির স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা অপেক্ষা সূচের ছিদ্র দিয়া উটের যাতায়াত করা বরং সহজ।'[১] নিজের ধন-ঐশ্বর্য ক্ষমতা সুখ-সুবিধা ও বিলাস-ব্যসন ব্যতীত ধনী ব্যক্তির অন্য কিছু চিন্তা করিবার সময় নাই। ধনী ব্যক্তিরা অতি অল্পই ধার্মিক হয়। কেন? কারণ তাহারা মনে করে, ধার্মিক হইলে জীবনে আর তাহাদের কোন আমোদ-প্রমোদ থাকিবে

১ N. T. Matt., XIX, 24.

না। ঠিক তেমনি স্বর্গে ধার্মিক হইবার আশা খুবই কম। আরাম ও ভোগ সেখানে অত্যন্ত বেশী—স্বর্গের অধিবাসীরা তাহাদের আমোদ-প্রমোদ ত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক।

অনেকে বলেন, স্বর্গে আর অশ্রুপাত করিতে হইবে না। যে-লোক কখনও কাঁদে না, আমি তাহাকে বিশ্বাস করি না। দেহের যেখানে হৃদয় থাকা উচিত, তাহার সেইখানে একটি বৃহৎ কঠিন প্রস্তরখণ্ড রহিয়াছে। ইহা তো স্পষ্টই বোঝা যায় যে, স্বর্গবাসীদের বেশী সহানুভূতি নাই। স্বর্গবাসীর সংখ্যা তো অনেক, আর আমরা এই ভয়ানক পৃথিবীতে দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। ইচ্ছা করিলে তাঁহারা আমাদের টানিয়া তুলিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা তো ঐরূপ কিছুই করেন না। তাঁহারা কাঁদেন না। স্বর্গে কোন দুঃখ-কষ্ট নাই, সুতরাং তাঁহারা কাহারও দুঃখ গ্রাহ্য করেন না। তাঁহারা অমৃত পান করেন, নৃত্য চলিতে থাকে—সুন্দরী পত্নী লইয়া নানাবিধ সুখে তাঁহাদের দিন কাটে।

এ-সকলের উর্ধ্বে উঠিয়া শিষ্যকে বলিতে হইবে, 'ইহজীবনে আমার কোন কিছুই কাম্য নয়, স্বর্গ বলিয়া যদি কিছু থাকে, সেখানেও আমি যাইতে চাই না। শরীরের সহিত তাদাত্ম্যমূলক কোন প্রকার ইন্দ্রিয়-জীবন আমি চাই না। বর্তমানে আমার ধারণা—এই বিপুল মাংসস্তূপ দেহটাই আমি। আমি বিশ্বাস করিতে চাই না যে, আমি সত্যই ঐরূপ।'

পৃথিবী ও স্বর্গ ইন্দ্রিয়দ্বারা সীমাবদ্ধ। ইন্দ্রিয় না থাকিলে এই পৃথিবীকে তুমি গ্রাহ্যই করিতে না। স্বর্গও একটা জগৎ। পৃথিবীতে স্বর্গে অন্তরীক্ষে যাহা কিছু আছে, সব মিলিয়া একটি নাম—পৃথিবী বা সংসার।

সুতরাং শিষ্য অতীত ও বর্তমানকে জানিয়া, ভবিষ্যতের বিষয় চিন্তা করিয়া উন্নতি কাহাকে বলে, সুখ কাহাকে বলে—এগুলি সব জানিয়া বুঝিয়া ত্যাগ করিবে এবং একমাত্র সত্যের সন্ধান করিবে। ইহাই প্রথম শর্ত বা সাধন।

দ্বিতীয় সাধন এই যে, শিষ্যকে অবশ্যই অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়সমূহ সংযত রাখিতে সমর্থ হইতে হইবে এবং অন্যান্য অধ্যাত্ম সম্পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে।

শরীরের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত দৃশ্যমান যন্ত্রগুলি বহিরিন্দ্রিয়; অন্তরিন্দ্রিয়-গুলি আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাহিরে। বাহিরে আমাদের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি রহিয়াছে, ভিতরে অনুরূপ অন্তরিন্দ্রিয় রহিয়াছে। আমরা সর্বদা

উভয়প্রকার ইন্দ্রিয়গুলির আজ্ঞাধীন হইয়া আছি। ইন্দ্রিয়সমূহের সহিত ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়গুলির যোগাযোগ রহিয়াছে। যদি ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়গুলি কাছে আসে, ইন্দ্রিয়সমূহ আমাদিগকে ঐগুলি গ্রহণ করিতে বাধ্য করে। আমাদের নিজস্ব পছন্দ বা স্বাধীনতা নাই। প্রকাণ্ড একটি নাসিকা রহিয়াছে। সামান্য একটু সুগন্ধ আসিতেছে, আমাকে ঐ ঘ্রাণ গ্রহণ করিতেই হইবে। যদি কোন দুর্গন্ধ আসিত, তবে আমি বলিতাম, 'এই ঘ্রাণ গ্রহণ করিও না'; কিন্তু প্রকৃতি বলিবে, 'গ্রহণ কর'। আমি এই ঘ্রাণ গ্রহণ করি। একবার ভাবিয়া দেখুন, আমরা কি হইয়াছি। আমরা নিজেদের বাঁধিয়া ফেলিয়াছি। আমার চক্ষু আছে, ভাল-মন্দ যাহা কিছু চক্ষুর সমুখ দিয়া যাক না কেন, আমাকে দেখিতেই হইবে। শ্রবণযন্ত্রের ব্যাপারটিও এইরূপ। যদি কেহ বিরক্তির সহিত আমার সঙ্গে কথা বলে, আমাকে শুনিতেই হইবে। আমার শ্রবণেন্দ্রিয় আমাকে উহা শুনিতে বাধ্য করে এবং শুনিয়া আমি মনে মনে কত কষ্টই না ভোগ করি। নিন্দা বা প্রশংসা যাহাই হউক, মানুষকে শুনিতেই হইবে। এমন বধির লোক আমি অনেক দেখিয়াছি, যাহারা সাধারণতঃ শুনিতে পায় না, কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে কিছু বলা হইলে তাহারা সব শুনিতে পায়।

এই আন্তর ও বাহ্য ইন্দ্রিয়নিচয় সাধক বা শিষ্যের বশে থাকিবে। যে অবস্থায় মন অনায়াসে ইন্দ্রিয়ের বিরুদ্ধে, স্বভাবের আদেশের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে, কঠোর অভ্যাসের দ্বারা সাধক শিষ্য সেই অবস্থায় উন্নীত হইতে পারে। সে নিজের মনকে আদেশ করিতে সমর্থ হইবে, 'তুমি আমার। আমি তোমায় আদেশ করিতেছি, কোন কিছু দেখিও না বা বলিও না।' তৎক্ষণাৎ মন আর কিছু দেখিবে না বা শুনিবে না। কোন রূপ বা শব্দ মনের উপর প্রতিক্রিয়া করিবে না। সে-অবস্থায় ইন্দ্রিয়গুলির আধিপত্য হইতে মন মুক্ত এবং ইন্দ্রিয়গুলি হইতে মন বিচ্ছিন্ন। শরীর ও ইন্দ্রিয়গুলির সহিত ইহা আর সংযুক্ত থাকে না। বাহিরের বস্তুসকল আর এখন মনকে আদেশ করিতে পারে না। মন ঐগুলির সহিত যুক্ত হইতে অস্বীকার করে। সম্মুখে সুন্দর গন্ধ রহিয়াছে; শিষ্য মনকে বলিল, 'ঐ ঘ্রাণ গ্রহণ করিও না।' মন আর গন্ধ আঘ্রাণ করিতে পারে না। যখন এই স্তরে পৌছিয়াছ, তখন জানিবে তুমি ঠিক ঠিক শিষ্য হইতে সুরু করিয়াছ। এইজন্যই যখন কেহ বলে,

'আমি সত্য জানিয়াছি,' তখন আমি বলি, 'যদি সত্য জানিয়া থাকো, তবে নিশ্চয়ই তোমার আত্মসংযম হইয়াছে। ইন্দ্রিয়গুলি বশীভূত করিয়া সংযম-শক্তির পরিচয় দাও।'

তারপর মনকে শান্ত করিতে হইবে। মন চঞ্চল হইয়া ছুটিয়া বেড়ায়। যে মুহূর্তে আমি ধ্যান করিতে বসি, তৎক্ষণাৎ জগতের ঘৃণ্যতম বিষয়গুলি মনে আসিয়া উপস্থিত হয়। সমগ্র ব্যাপারটি অত্যন্ত বিরক্তিকর। আমি যেন মনের দাস। মন যতক্ষণ চঞ্চল এবং আয়ত্তের বাহিরে, ততক্ষণ কোনরূপ আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্ভব নয়। শিষ্যকে মনঃসংযম শিক্ষা করিতে হইবে। অবশ্য মনের কার্যই চিন্তা করা। কিন্তু শিষ্যের অনভিপ্রেত হইলে মন নিশ্চয়ই চিন্তা করিবে না; যখনই সে আদেশ করিবে, তখনই মনকে চিন্তা বন্ধ করিতে হইবে। উপযুক্ত শিষ্য হইতে গেলে মনের এরূপ অবস্থা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

সহিষ্ণুতার প্রচণ্ড শক্তিও শিষ্যকে আয়ত্ত করিতে হইবে। যখন চারিপাশে সব-কিছুই ভাল চলে, তখন জীবন বেশ আরামপ্রদ বোধ হয়, মনও ভাল থাকে। কিন্তু অপ্রীতিকর কিছু ঘটিলেই সঙ্গে সঙ্গে মনের স্থৈর্য নষ্ট হইয়া যায়। উহা ভাল নয়। সকল দুঃখকষ্ট বিনা অভিযোগে, এতটুকু দুঃখী না হইয়া, এতটুকু প্রতিরোধ প্রতিশোধ বা প্রতিকারের চেষ্টা না করিয়া সহ্য কর। ইহাই যথার্থ সহিষ্ণুতা। ইহা তোমাকে অর্জন করিতে হইবে।

পৃথিবীতে ভাল এবং মন্দ চিরকালই আছে। মন্দটির অস্তিত্ব অনেকে ভুলিয়া যায়—অন্ততঃ ভুলিবার চেষ্টা করে; যখন মন্দ আসে, তখন তাহারা উহা দ্বারা সহজে অভিভূত হইয়া পড়ে এবং বিরক্তি বোধ করে। আবার কেহ কেহ কোনরূপ মন্দের অস্তিত্বই স্বীকার করে না এবং সব কিছুকেই ভাল বলিয়া মনে করে। উহাও একটি দুর্বলতা, উহাও মন্দ জিনিসের প্রতি ভীতি হইতে সঞ্জাত। যদি কোন দুর্গন্ধ দ্রব্য থাকে, গোলাপ-জল ছিটাইয়া তাহাকে সুগন্ধ বলা কেন? হ্যাঁ, জগতে ভাল-মন্দ দুই-ই আছে। ভগবান্ মন্দ জিনিস জগতে রাখিয়াছেন। কিন্তু তোমাকে তাহার উপর চুনকাম করিতে হইবে না। কেন মন্দ রহিয়াছে, সে-সম্বন্ধে তোমার মাথা-ঘামানো প্রয়োজন নাই। ভগবানে বিশ্বাস রাখো এবং চুপ করিয়া থাকো।

আমার গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ অসুস্থ হইয়া পড়িলে জনৈক ব্রাহ্মণ রোগমুক্তির জন্য তাঁহাকে তাঁহার প্রবল মনঃশক্তি প্রয়োগ করিতে বলিয়াছিল।

তাহার মতে—আচার্যদেব যদি দেহের রোগাক্রান্ত অংশটির উপর তাঁহার মন একাগ্র করেন, তবে অসুখ সারিয়া যাইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, 'কি! যে-মন ঈশ্বরকে দিয়াছি, সেই মন এই তুচ্ছ শরীরে নামাইয়া আনিব?' দেহ এবং রোগের কথা তিনি ভাবিতে চাহিলেন না। তাঁহার মন সর্বদা ঈশ্বরে তন্ময় হইয়া থাকিত। সে-মন সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে অর্পিত হইয়াছিল। তিনি এই মন অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতে রাজী ছিলেন না।

স্বাস্থ্য, সম্পদ, দীর্ঘজীবন প্রভৃতি তথাকথিত ভাল ভাল জিনিসের জন্য এই আকাঙ্ক্ষা—মায়া বা ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই নয়। এগুলি পাইবার জন্য মনোনিবেশ করিলে ভ্রম দৃঢ় করা হয়। ইহজীবনে আমাদের এ-সকল স্বপ্ন ও মায়া আছে, এবং পরলোকে—স্বর্গে যাইয়া আমরা এগুলি আরও বেশী পরিমাণে পাইতে চাই। মায়া বাড়িয়া যায়। মন্দের প্রতিরোধ করিও না; তাহার সম্মুখীন হও। তুমি মন্দ বা অশুভ অপেক্ষা অনেক বড়।

জগতে এই দুঃখ আছে, একজনকে তো তাহা ভোগ করিতে হইবেই। কাহারও অনিষ্ট না করিয়া তুমি কোন কাজ করিতে পার না। আর যখন তুমি পার্থিব শুভ কামনা কর, তখন শুধু আর একটি অশুভই এড়াইয়া যাও। সেই অশুভ অপর কাহাকেও ভোগ করিতে হইবে। মন্দটি সকলেই অন্যের ঘাড়ে চাপাইতে চায়। সাধক বলিবে, 'জগতের সকল দুঃখ আমার নিকটে আসিতে দাও। আমি এগুলি সহ্য করিব। অপরকে মুক্ত হইতে দাও।'

ক্রুশবিদ্ধ মহামানবকে স্মরণ কর। জয়লাভ করিবার জন্য তিনি অসংখ্য দেবদূত আনিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি প্রতিরোধ করিলেন না। যাহারা তাঁহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করিল, তাহাদিগকে তিনি করুণা করিলেন। তিনি সকল দুঃখকষ্ট ও অপমান সহ্য করিলেন। সকলের ভার তিনি নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করিলেন। 'তোমরা যাহারা অতিশয় দুঃখভারাক্রান্ত, তাহারা আমার নিকটে আইস। আমি তোমাদের দুঃখ দূর করিব এবং শান্তি দিব।'[১] ইহাই যথার্থ সহনশীলতা। তিনি এই জীবনের কত ঊর্ধ্বে ছিলেন—এত ঊর্ধ্বে যে, আমরা ক্রীতদাসগণ তাহা ধারণাও করিতে পারি না! আমার গালে কেহ চড় মারিলেই আমার হাত সশব্দে আর একটি চড় মারিয়া দেয়!

১ N. T. Matt., XI, 28.

আমি কিরূপে সেই মহিমময় পুরুষের মহত্ত্ব ও চিত্তের প্রশান্তি ধারণা করিতে পারি? তাঁহার মহিমা আমি কি বুঝিব?

কিন্তু আদর্শকে আমি নীচে নামাইয়া আনিব না। আমি অনুভব করি, আমি দেহ; আমি অন্যায়ের প্রতিরোধ করি। আমার মাথা ধরিলে তাহা সারাইবার জন্য সারা পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াই, দুই হাজার শিশি ঔষধ খাই। কেমন করিয়া আমি এ-সকল অপূর্ব চরিত্র বুঝিতে পারিব? আদর্শ আমি দেখিতে পারি—কিন্তু আদর্শের কতটুকু? এই দেহের কোন চেতনা, কোন তুচ্ছ অহং-ভাব, কোন আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখ সেই স্তরে পৌঁছিতে পারে না। সর্বদা শুধু চৈতন্যবিষয়ক চিন্তা করিয়া এবং মনকে জড়বস্তুর ঊর্ধ্বে রাখিয়া আমি সেই আদর্শের আভাসমাত্র পাইতে পারি। জড়বস্তুর চিন্তা এবং ইন্দ্রিয়-জগতের রীতিনীতির কোন স্থান সেই আদর্শে নাই। ঐগুলি হইতে মন তুলিয়া আত্মায় সমাহিত কর। তোমার জীবন ও মৃত্যু, সুখ ও দুঃখ, নাম ও যশ সব ভুলিয়া যাও এবং অনুভব কর—তুমি শরীর বা মন নও, তুমি শুদ্ধ আত্মা।

আমি যখন 'আমি' বলি, তখন এই চৈতন্য বা আত্মাকেই বুঝি। যখন তুমি নিজের 'আমি' সম্বন্ধে চিন্তা কর, তখন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দেখ—কোন্ ছবি ফুটিয়া উঠে। তোমার দেহচিত্র কি মনে জাগিতেছে? অথবা মনের প্রকৃতি? যদি তাই হয়, তবে তুমি এখনও সত্য 'আমি'কে জানিতে পার নাই। এমন সময় আসিবে, যখন 'আমি' বলিতে বলিতে সমগ্র জগৎ—সেই অনন্ত সত্তা উদ্ভাসিত দেখিতে পাইবে। তখন তুমি নিজের সত্য স্বরূপকে দেখিতে পাইবে এবং নিজের অনন্ত সত্তাকে উপলব্ধি করিবে। তুমি চৈতন্যময়, তুমি জড় পদার্থ নও—ইহাই সত্য। ভ্রম বলিয়া একটি অনুভূতি আছে—এক বস্তুকে আর এক বস্তু বলিয়া ভ্রম হয়—জড়কে চৈতন্য এবং চৈতন্যকে জড় বলিয়া মনে হয়। ইহাই প্রচণ্ড ভ্রম। ইহা দূর করিতে হইবে।

(গুরুর প্রতি শিষ্যকে শ্রদ্ধাবান্ হইতে হইবে—ইহাই পরবর্তী সাধনা। পাশ্চাত্য গুরু শিষ্যকে শুধু বুদ্ধিগ্রাহ্য শিক্ষা দিয়া থাকেন। গুরুর সহিত শিষ্যের সম্পর্ক জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পর্ক। গুরু আমার নিকটতম ও প্রিয়তম আত্মীয়, তারপর মাতা, তারপর পিতা। গুরুর প্রতিই আমার শ্রদ্ধা সর্বপ্রথমে নিবেদিত। যদি পিতা বলেন, 'ইহা কর' এবং গুরু বলেন, 'ইহা

করিও না'—আমি তাহা করি না। গুরু আমার আত্মার মুক্তিসাধন করেন। পিতামাতা আমায় শরীর দিয়াছেন, কিন্তু গুরু আমাকে আত্মার মধ্যে নবজন্ম দান করিয়াছেন।

আমাদের কতকগুলি অদ্ভুত বিশ্বাস আছে। একটি এই—অতি অল্প কয়েকটি অসাধারণ আত্মা আছেন, যাঁহারা নিত্যমুক্ত এবং যাঁহারা জগতের কল্যাণের নিমিত্ত মানবরূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা মুক্তই আছেন; নিজেদের মুক্তির জন্য তাঁহারা গ্রাহ্য করেন না, অপরকে সাহায্য করিতে চান। তাঁহাদের কিছু শিখিবার প্রয়োজন নাই। শৈশব হইতে তাঁহারা সব জানেন। ছয়মাসের শিশু হইয়াও তাঁহারা পরমসত্যের বাণী বলিতে পারেন।

এই মুক্তাত্মাদের উপরেই মনুষ্যজাতির উন্নতি নির্ভর করে। তাঁহারা যেন প্রথম দীপের ন্যায়—এই দীপটি হইতে অপর দীপগুলি জ্বলিয়া উঠে। ইহা সত্য যে, সকলের অন্তরেই আলোক রহিয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তির অন্তরেই ইহা প্রচ্ছন্ন। মহাপুরুষগণ প্রথম হইতেই এই আলোকে ভাস্বর। যাহারা তাঁহাদের সংস্পর্শে আসে, তাহাদের হৃদয়দীপও যেন প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। ইহা দ্বারা প্রথম দীপটির কোন ক্ষতি হয় না, প্রথম দীপটি অপর দীপগুলিতে আলোক সঞ্চার করে। কোটি কোটি দীপ প্রজ্বলিত হয়, কিন্তু প্রথম দীপটি পূর্বের মতোই অনির্বাণ তেজে জ্বলিতে থাকে। প্রথম দীপটি গুরু। যে দীপটি এই প্রথম দীপের শিখা হইতে প্রজ্বলিত হয়, সে শিষ্য। ক্রমে এই দ্বিতীয় ব্যক্তিও গুরু হন—এইভাবে চলিতে থাকে। যাঁহাদের আপনারা অবতারপুরুষ বলিয়া থাকেন, সেই মহাপুরুষগণ বিপুল অধ্যাত্মশক্তির আধার। তাঁহারা সাক্ষাৎ শিষ্যদের মধ্যে ঐ শক্তি সঞ্চার করেন এবং শিষ্য-পরম্পরা এক বিরাট অধ্যাত্মশক্তির প্রবাহ প্রবর্তন করেন।

খ্রীষ্টান বিশপ হস্তদ্বারা কাহারও মস্তক স্পর্শ করিয়া নিজে পূর্বগ বিশপের নিকট যে শক্তি লাভ করিয়াছিলেন, সেই শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন বলিয়া দাবি করেন। বিশপ বলেন, যীশু তাঁহার সাক্ষাৎ শিষ্যদের মধ্যে নিজের শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন, শিষ্যগণ আবার অপরের মধ্যে সেই শক্তি সঞ্চার করেন। এইভাবেই পরম্পরাক্রমে খ্রীষ্টের শক্তি তাঁহার নিকট আসিয়াছে। আমরা বিশ্বাস করি, শুধু বিশপগণ নন, আমাদের প্রত্যেককেই সেই শক্তি

লাভ করিতে হইবে। আপনারা প্রত্যেকেই সেই প্রচণ্ড অধ্যাত্মশক্তির আধার হইতে পারেন। কেন হইতে পারিবেন না? না হইবার কোন কারণ নাই।

কিন্তু প্রথমে আপনাকে একজন গুরু—যথার্থ গুরু খুঁজিয়া লইতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, তিনি সামান্য মানব মাত্র নন। আপনি একজন দেহধারী গুরু লাভ করিতে পারেন, কিন্তু প্রকৃত গুরু দেহের মধ্যে নাই। চোখে যেমন দেখিতেছেন, গুরু সেইরূপ দেহধারী মানুষ নন। গুরু আপনার নিকট মানবরূপে আসিতে পারেন এবং আপনি তাঁহার নিকট শক্তিলাভও করিতে পারেন। কখন কখন তিনি স্বপ্নে দেখা দিয়া শক্তি সঞ্চার করেন। গুরুর শক্তি আমাদের নিকট নানাভাবে আসিতে পারে। কিন্তু আমাদের জন্য—মর্ত্য মানবের জন্য গুরু অবশ্যই আসিবেন। তাঁহার আবির্ভাব-ক্ষণ অবধি আমাদের প্রস্তুতি চলিবে।

আমরা বক্তৃতা শুনি, পুস্তক পড়ি, ঈশ্বর আত্মা ধর্ম ও মুক্তি সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক করি। এগুলি আধ্যাত্মিকতা নয়, কারণ আধ্যাত্মিকতা পুস্তকে দর্শনে বা মতবাদে নাই। ইহা বিদ্যা বা বিচারে নাই, অন্তরের প্রকৃত বিকাশে নিহিত। তোতাপাখিও বুলি মনে রাখিয়া আওড়াইতে পারে। যদি আপনি বিদ্বান্ হইয়া থাকেন, তাহাতে কি আসে যায়? গর্দভেরা সমগ্র গ্রন্থাগারটি পৃষ্ঠে বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারে। সুতরাং যখন যথার্থ আলোক আসিবে, তখন পুঁথিগত বিদ্যার আর প্রয়োজন হইবে না। নিজের নামটি পর্যন্ত সই করিতে অক্ষম ব্যক্তিও ধার্মিক হইতে পারেন, আবার পৃথিবীর যাবতীয় গ্রন্থাগারের জ্ঞানরাশি যাঁহার মস্তকে পুঞ্জীভূত আছে, তিনিও পারেন না। আধ্যাত্মিক উন্নতি পুঁথিগত বিদ্যার অপেক্ষা রাখে না। পাণ্ডিত্যের উপর আধ্যাত্মিকতা নির্ভর করে না। গুরুর স্পর্শ—শক্তি-সঞ্চার দ্বারা আপনার হৃদয় জাগ্রত হইবে। তারপরই আধ্যাত্মিক উন্নতির আরম্ভ। উহাই যথার্থ অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা। আর থামিতে হইবে না, আপনি ক্রমেই অগ্রসর হইবেন।

কয়েক বৎসর পূর্বে আমার এক বন্ধু খ্রীষ্টান ধর্মযাজক আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি কি খ্রীষ্টে বিশ্বাসী?' আমি উত্তর দিলাম, 'হ্যাঁ, বোধ হয় একটু অধিক শ্রদ্ধার সহিত বিশ্বাসী।' 'তাহা হইলে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হও না কেন?' 'কেমন করিয়া দীক্ষিত হইব? কাহার দ্বারা?' যথার্থ

দীক্ষাদাতা কোথায়? দীক্ষা কি? ইহা কি কতকগুলি বাঁধা-ধরা মন্ত্র আওড়াইয়া জল ছিটানো, না জোর করিয়া ধরিয়া জলে ডুবানো?

দীক্ষা হইতেছে সাক্ষাৎভাবে আধ্যাত্মিক জীবনে প্রবেশ। যথার্থ দীক্ষালাভ করিলে জানিবেন—আপনি দেহ নন, আপনি আত্মা। যদি পারেন, তবে সে দীক্ষা আমায় দিন, যদি তাহা না পারেন, তবে তো আপনারাই খ্রীষ্টান নন। তথাকথিত দীক্ষালাভের পরেও আপনারা তো পূর্বের মতোই রহিয়া গিয়াছেন। খ্রীষ্টের নামে আপনারা দীক্ষিত হইয়াছেন —এ-কথা বলার অর্থ কি? শুধু কথা আর কথা—আর জগৎকে নিজ নিজ মূর্খতার দ্বারা বিরক্ত করিয়া তোলা! 'অজ্ঞান-অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিয়াও নিজেদের জ্ঞানী ও বিদ্বান্ মনে করিয়া মূর্খেরা অন্ধচালিত অন্ধের ন্যায় যত্র তত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।'[১] সুতরাং এ-কথা বলিবেন না যে, আপনারা খ্রীষ্টান; আর দীক্ষা (Baptism) প্রভৃতির ন্যায় তত্ত্ব লইয়া বাগাড়ম্বর করিবেন না।

অবশ্য যথার্থ দীক্ষা আছে, জগতে আসিয়া যীশু যখন প্রথম তাঁহার বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, তখন দীক্ষা ছিল। যুগে যুগে যে-সকল মুক্তাত্মা মহাপুরুষ আবির্ভূত হন, আমাদের নিকট অতীন্দ্রিয় জ্ঞান প্রকাশ করিবার শক্তি তাঁহাদের আছে। ইহাই যথার্থ দীক্ষা। আপনারা দেখিতেছেন, প্রত্যেক ধর্মের বিধি ও অনুষ্ঠানাদি প্রচলিত হইবার পূর্বেই সর্বজনীন সত্যের বীজ বিদ্যমান রহিয়াছে। কালক্রমে এই সত্য লোকে ভুলিয়া যায়; বাহ্য অনুষ্ঠানাদি যেন ইহার শ্বাসরোধ করিয়া ফেলে। বাহিরের পদ্ধতিগুলি বজায় থাকে, কিন্তু ভিতরের ভাবটি চলিয়া যায়। শুধু বাহিরের আধারটি আমরা দেখিতে পাই। দীক্ষার বাহ্য রূপটি আছে।

কিন্তু অতি অল্প ব্যক্তিই ইহার অন্তর্নিহিত শক্তি উদ্বুদ্ধ করিতে পারেন। বাহ্য আচারই যথেষ্ট নয়। আমরা যদি প্রত্যক্ষ সত্যের সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ করিতে চাই, তবে আমাদিগকে ঐ বিষয়ে যথার্থভাবে দীক্ষিত হইতে হইবে। ইহাই আদর্শ।

গুরু আমাকে অবশ্যই শিক্ষাদান করিয়া আলোকের পথে পরিচালিত করিবেন এবং যে গুরুশিষ্য-পরম্পরার তিনি নিজে একটি যোগসূত্র, আমাকেও

১ কঠ উপ., ১।২।৫

তাহার যোগসূত্র করিয়া লইবেন। যে-কোন লোক নিজেকে গুরু বলিয়া দাবি করিতে পারে না। গুরু হইবেন তিনি, যিনি সেই পারমার্থিক সত্য জানিয়াছেন—প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, যিনি নিজেকে চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া অনুভব করিয়াছেন। শুধু কথা বলিলেই কেহ গুরু হইতে পারে না। আমার মতো বাক্যবাগীশ মূর্খ অনেক কথা বলিতে পারে, কিন্তু গুরু হইতে পারে না। যথার্থ গুরু শিষ্যকে বলিবেন, 'যাও, আর পাপ করিও না'—সে আর পাপ করিতেই পারে না। তাহার আর পাপ করিবার শক্তিই থাকে না।

আমি এই জীবনে এরূপ ব্যক্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বাইবেল প্রভৃতি শাস্ত্র আমি পড়িয়াছি। এগুলি অপূর্ব। কিন্তু পুস্তকে সেই প্রাণবন্ত শক্তির সাক্ষাৎ পাইবেন না, যে-শক্তি মুহূর্তে জীবন পরিবর্তন করিতে পারে, তাহা শুধু জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়; জ্ঞানের উজ্জ্বল বিগ্রহ এই মহাপুরুষগণ মাঝে মাঝে আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হন। তাঁহারাই গুরু হইবার উপযুক্ত। তুমি আমি কেবল বৃথা বচনবাগীশ, গুরু বা আচার্য নই। শুধু কথার কোলাহলে জগৎকে বিব্রত করিতেছি। চিন্তাজগতে অশুভ কম্পনের সৃষ্টি করিতেছি। আশা, প্রার্থনা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়া আমরা অগ্রসর হই, একদিন আমরা সত্যে উপনীত হইব, তখন আর আমাদের কথা বলিতে হইবে না।

'গুরুর বয়ঃক্রম ষোড়শবর্ষ; তিনি অশীতিপর বৃদ্ধকে শিক্ষা দিতেছেন। গুরুর শিক্ষাপদ্ধতি নীরবতা আর শিষ্যের সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইতেছে।'[১] ইহাই গুরুর বর্ণনা। ভাবিয়া দেখুন, এইরূপ এক ব্যক্তিকে পাইলে তাঁহার প্রতি আপনার কিরূপ বিশ্বাস ও ভালবাসা হইবে। কারণ তিনি স্বয়ং ভগবান্ অপেক্ষা কিছু কম নন! এ জন্যই খ্রীষ্টের শিষ্যগণ তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিতেন। শিষ্য গুরুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিবে। যতক্ষণ না মানুষ ভগবান্‌কে সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করিতেছে, ততক্ষণ সে ভগবানের যতটুকু জানিতে পারে, তাহা এই মানবদেহধারী নরদেবতারূপেই জানিতে পারে। আর অন্য কি ভাবে সে ভগবানকে জানিতে পারে?

১ তুলনীয়: চিত্রং বটতরোর্মূলে বৃদ্ধাঃ শিষ্যাঃ গুরুর্যুবা।
গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ॥ দক্ষিণামূর্তিস্তোত্রম্, ১২

এখানে আমেরিকায় একজন ব্যক্তি—খ্রীষ্টজন্মের উনিশ-শত বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, খ্রীষ্ট যে জাতিতে জন্মিয়াছিলেন, সে সেই ইহুদীজাতিসম্ভূতও নয়, সে যীশু অথবা তাঁহার পরিবারবর্গকে দেখে নাই। সে বলে, 'যীশু ছিলেন ভগবান্। যদি বিশ্বাস না কর, তবে নরকে যাইবে।' আমরা বুঝিতে পারি, যীশুর শিষ্যগণ কিভাবে বিশ্বাস করিতেন, খ্রীষ্ট ভগবান্। তিনি তাঁহাদের গুরু ছিলেন। সুতরাং তাঁহারা যীশুকে অবশ্যই ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। উনিশ-শত বৎসর পূর্বে আবির্ভূত মানুষটিকে লইয়া এই আমেরিকান কি করিবে? এই যুবকটি আমায় বলিতেছে, যীশুকে আমি বিশ্বাস করি না, অতএব আমাকে নরকে যাইতে হইবে। যীশু সম্বন্ধে সে কি জানে? সে পাগলা-গারদে থাকিবার উপযুক্ত। এরূপ বিশ্বাস চলিবে না। তাহাকে তাহার গুরু খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

যীশু আবার জন্মগ্রহণ করিতে পারেন, আপনার নিকট আসিতে পারেন। তখন যদি আপনি তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া পূজা করেন, ভাল কথা। গুরুর আবির্ভাব অবধি আমরা অবশ্যই প্রতীক্ষা করিব এবং গুরুকে ঈশ্বরের ন্যায় পূজা করিতে হইবে। তিনি ঈশ্বর, ঈশ্বর অপেক্ষা কিছু কম নন। গুরুকে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবে, ক্রমে তিনি লীন হইয়া যাইতেছেন। পরে কি থাকে? গুরুমূর্তি ভগবানের জন্য আসন ছাড়িয়া দেন। আমাদের নিকট আসিবার জন্য ভগবান্ গুরুর জ্যোতির্ময় মূর্তি ধরিয়া থাকেন। স্থিরভাবে নিরীক্ষণ করিতে থাকিলে এই মূর্তির আবরণ ক্রমশঃ খসিয়া যায়, ভগবান্ প্রকাশিত হন।

'আমি গুরুকে প্রণাম করি, যিনি ব্রহ্মানন্দের মূর্ত বিগ্রহ, পরমসুখদ ও পরমজ্ঞানের প্রতিমূর্তি, যিনি পবিত্র পূর্ণ অদ্বিতীয় অনন্ত সুখ-দুঃখের অতীত অচিন্ত্য ভাবাতীত ও ত্রিগুণরহিত।'[১] ইনিই প্রকৃত গুরু। শিষ্য যে তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া মনে করিবে, তাঁহাকে বিশ্বাস করিবে, শ্রদ্ধা করিবে, এবং সন্দেহাতীত ভাবে অনুসরণ করিবে, তাহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই। গুরু-শিষ্যের মধ্যে ইহাই সম্বন্ধ।

১ ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্বধীসাক্ষীভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি॥—গুরুগীতা

মুক্তিলাভের জন্য শিষ্যকে প্রবল আকাঙ্ক্ষা করিতে হইবে—ইহাই পরবর্তী সাধন। ইন্দ্রিয়নিচয় আমাদিগকে কেবল দগ্ধ করে, বাসনা বৃদ্ধি করে—ইহা জানিয়াও পতঙ্গের ন্যায় আমরা অগ্নিশিখায় ঝাঁপাইয়া পড়িতেছি। 'উপভোগের দ্বারা বাসনা কখনও তৃপ্ত হয় না। ঘৃতাহুতির দ্বারা অগ্নি যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি ভোগের দ্বারা ভোগ বাড়িয়াই চলে।'[২] বাসনা দ্বারা বাসনা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ইহা জানিয়াও মানুষ সর্বদাই ইহাতে ঝাঁপাইয়া পড়ে। জন্ম জন্ম ধরিয়া তাহারা ভোগ্য বস্তুর পশ্চাতে ধাবিত হইতেছে এবং ফলে অপরিসীম দুঃখ ভোগ করিতেছে, তথাপি বাসনা ত্যাগ করিতে পারে না। যে-ধর্ম তাহাদিগকে এই ভীষণ বাসনার বন্ধন হইতে মুক্ত করিবে, তাহাকেও তাহারা বাসনা-পরিতৃপ্তির উপায় করিয়া তুলিয়াছে। শরীর ও ইন্দ্রিয়ের বন্ধন এবং বাসনার দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভের জন্য তাহারা ক্বচিৎ কখন ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকে। তৎপরিবর্তে তাহারা স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবনের জন্য প্রার্থনা করে, 'হে ঈশ্বর! আমার মাথার বেদনা সারাইয়া দাও। আমায় কিছু টাকাকড়ি বা অন্য কিছু দাও।'

দৃষ্টির পরিধি এত সঙ্কীর্ণ, এত নীচু, এত পশুবৎ হইয়া দাঁড়াইয়াছে! কেহই এই দেহের উর্ধ্বে কিছু চাহিতেছে না। হায়, কি ভয়ঙ্কর অবনতি! কি ভয়ানক দুর্দশা! এই মাংসপিণ্ড, পাঁচটি ইন্দ্রিয় আর উদর! শিশ্ন ও উদরের সমাবেশ ছাড়া জগৎটা আর কি? কোটি কোটি নরনারীর পানে চাহিয়া দেখ—তাহারা এইজন্যই জীবনধারণ করিয়া আছে। তাহাদের নিকট হইতে এই বস্তু-দুইটি সরাইয়া লও, তাহারা মনে করিবে জীবন শূন্য অর্থহীন ও অসহনীয়। আমরা এইরূপ, আর আমাদের মনও এইরূপ। এই মন সর্বদা ক্ষুধা ও কাম চরিতার্থ করিবার পথ ও উপায় খুঁজিতেছে। সর্বদাই এইরূপ চলিতেছে। দুঃখকষ্টও তেমনি অনন্ত। দেহের এই-সকল তৃষ্ণা শুধু ক্ষণিক তৃপ্তি এবং অশেষ দুঃখের কারণ হয়। এ যেন পয়োমুখ বিষকুম্ভের অবস্থা। কিন্তু তথাপি আমরা এগুলির জন্য লালায়িত হই।

২ ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভুয় এবাভিবর্ধতে।

শ্রীমদ্ভাগবত, ৯।১৯।১৪

কি করা যায়? ইন্দ্রিয়-দমন এবং বাসনা-ত্যাগই এই দুঃখমোচনের একমাত্র উপায়। আধ্যাত্মিক জীবন লাভের জন্য বাসনা ত্যাগ করিতে হইবে। ইহা প্রকৃত পরীক্ষা। এই নিরর্থক ইন্দ্রিয়সর্বস্ব সংসার বর্জন কর। যথার্থ বাসনা মাত্র একটি আছে: সত্যোপলব্ধির বাসনা—আধ্যাত্মজীবন-লাভের বাসনা। জড়বাদ বা অহংসর্বস্বতা আর নয়। আমাকে আধ্যাত্মিক হইতে হইবে। দৃঢ় ও তীব্র ইচ্ছা চাই। কোন ব্যক্তির হাত-পা বাঁধিয়া তাহার শরীরে এক-টুকরা জলন্ত কয়লা রাখিয়া দিলে সে উহা ফেলিয়া দিতে যথাশক্তি চেষ্টা করে। যদি এই জলন্ত সংসারকে দূরে সরাইয়া ফেলিতে আমার সেইরূপ তীব্র ইচ্ছা ও অবিরাম চেষ্টা চলিতে থাকে, তবেই পরম সত্যের আভাস লাভ করিবার সময় উপস্থিত হইবে।

আমাকে লক্ষ্য করুন। দুই-তিনটি ডলার সহ আমার ছোট পকেট বইটি হারাইয়া গেলে ঘরের মধ্যে বিশবার খুঁজিয়া বেড়াই। কত উদ্বেগ, কত দুশ্চিন্তা, কত চেষ্টা! যদি আপনাদের কেহ আমাকে কোন বাধা দেন, তবে কুড়ি বৎসর উহা আমার মনে থাকে, সেই ঘটনাটি ক্ষমা করিতে বা ভুলিয়া যাইতে পারি না। ইন্দ্রিয়ের অতি ক্ষুদ্র বিষয়গুলির জন্য আমি ঐরূপ চেষ্টা করিতে পারি। ভগবানের জন্য কে ঐরূপ চেষ্টা করে? 'ক্রীড়ারত শিশু সব কিছুই ভুলিয়া থাকে। যুবকগণ ইন্দ্রিয়সম্ভোগের জন্য উন্মত্ত; তাহারা অন্য কিছুর চিন্তা করে না। প্রাচীনেরা তাহাদের অতীত দুষ্কর্মের চিন্তায় মগ্ন।'[১] বৃদ্ধেরা আর উপভোগ করিতে পারে না, তাহারা অতীতে যাহা ভোগ করিয়াছিল, তাহার কথাই ভাবিতেছে। জাবর কাটিতেই বৃদ্ধেরা খুব দক্ষ। বিষয়ভোগের জন্য মানুষ যেভাবে তীব্র আকাঙ্ক্ষা করে, ভগবানের জন্য কেহই তেমন করে না।

সকলেই বলিয়া থাকে ঈশ্বর সত্য-স্বরূপ, একমাত্র নিত্য বস্তু, আত্মাই আছে, জড় নাই। তথাপি ভগবানের নিকট তাহারা যে-যে বিষয়ে প্রার্থনা করে, সেগুলি কদাচিৎ আত্মবিষয়ক। তাহারা সর্বদাই জড়বস্তু চায়। তাহাদের প্রার্থনায় জড়বস্তু হইতে আত্মাকে পৃথক্ করা হয় না। ধর্মের

---

১ বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তস্তরুণস্তাবৎ তরুণীরক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ।—মোহমুদ্গার, শঙ্করাচার্য

কতদূর অবনতি ঘটিয়াছে! সমগ্র ব্যাপারটিই মেকী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেলেও কোন আধ্যাত্মিক উপলব্ধি হইতেছে না। মানুষ শুধু একটি জিনিসের জন্যই আকাঙ্ক্ষা করিবে—আত্মার জন্য, কারণ একমাত্র আত্মাই আছে। ইহাই আদর্শ। যদি আপনি এখনই ইহা লাভ করিতে না পারেন, তবে বলুন, 'আমি ইহা লাভ করিতে পারিতেছি না; আমি জানি ইহাই আদর্শ, কিন্তু এখনও অনুসরণ করিতে পারিতেছি না।' কিন্তু আপনি তো তাহা করেন না। ধর্মকে আপনারা নিম্নস্তরে নামাইয়া আনিয়া আত্মার নামে জড়বস্তু খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। আপনারা সকলেই নাস্তিক, ইন্দ্রিয় ব্যতীত আর কিছুতেই বিশ্বাস করেন না। 'অমুক ব্যক্তি এইরূপ বলিয়াছিল—ইহার মধ্যে কিছু থাকিতে পারে। এস, চেষ্টা করি আর মজা দেখি। হয়তো কোন উপকার হইবে; হয়তো আমার ভাঙা পা-খানি জোড়া লাগিয়া যাইবে।'

রুগ্নব্যক্তিরা বড় দুঃখী, তাহারা ঈশ্বরের পরম উপাসক, কারণ তাহাদের ধারণা—ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি তাহাদিগকে রোগমুক্ত করিয়া দিবেন। যদি এই প্রার্থনা আন্তরিক হয় এবং যদি তাহারা মনে রাখে যে, এই প্রার্থনা ধর্ম নয়, তবে এরূপ প্রার্থনা যে একেবারে মন্দ, তাহা নয়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, 'চার প্রকার লোকে আমাকে ভজনা করে—আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী।'[১] আর্ত মানুষ দুঃখমোচনের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে। অসুস্থ হইলে তাহারা আরোগ্য-কামনায় পূজা করে; সম্পদ হারাইলে পুনঃপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করে। আবার অনেকের মন কামনায় পূর্ণ বলিয়া ভগবানের নিকট নাম, যশ, সম্পদ, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি প্রার্থনা করে। তাহাদের প্রার্থনা এইরূপ: 'হে মাতা মেরী! আমি যাহা চাই, তাহা পাইলে তোমার পূজা দিব। তুমি যদি আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর, তবে আমি ঈশ্বরের পূজা করিব এবং তোমাকে সব কিছুর অংশ দিব।' যাহারা অতটা জড়বাদী নয়, অথচ ঈশ্বরে বিশ্বাসীও নয়—এমন লোকেরা তাঁহাকে জানিতে চায়। তাহারা তত্ত্বান্বেষী। তাহারা দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করে, বক্তৃতাদি শ্রবণ করে, তাহারা

---

১ গীতা, ৭।১৬

জিজ্ঞাসু। যাহারা ভগবানের আরাধনা করে এবং তাঁহাকে জানিতে পারে—তাহারা সর্বশেষ শ্রেণীর সাধক। এই চারি স্তরের সাধকই ভাল—কেহই মন্দ নয়। তাহারা সকলেই ঈশ্বরের আরাধনা করে।

কিন্তু আমরা শিষ্য হইবার সাধনা করিতেছি। আমাদের সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য হইবে পরমসত্যকে জানা, আমাদের লক্ষ্য উচ্চতম। 'পরিপূর্ণ উপলব্ধি' প্রভৃতি বড় বড় কথা আমরা বলিয়াছি। কথা অনুযায়ী কাজ করা চাই। (আত্মভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আসুন আমরা আত্মার উপাসনা করি। আমাদের সাধনার ভিত্তি, সাধনার পথ ও চরম ফল সবই হউক চৈতন্যময়। কোথাও জড়-জগৎ থাকিবে না। জগৎ চলিয়া যাক্, মহাশূন্যে ঘুরিতে থাকুক—কে ইহা গ্রাহ্য করে? আত্মায় প্রতিষ্ঠিত হউন। উহাই লক্ষ্য। আমরা জানি, এখনও লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিতে পারি নাই। কিছুই আসে যায় না; হতাশ হইবেন না। হতাশ হইয়া আদর্শকে নীচে নামাইয়া আনিবেন না। প্রয়োজনীয় কথা এই: নিজেকে আপনি কতটা কম এই প্রাণহীন জড়দেহ বলিয়া ভাবিতেছেন, আর কতটাই বা জ্যোতির্ময় অমর আত্মা বলিয়া চিন্তা করিতেছেন। যতই নিজেকে জ্যোতির্ময় অমর আত্মারূপে চিন্তা করিবেন, ততই দেহ ও ইন্দ্রিয়ের বন্ধন হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হইবার জন্য ব্যাকুল হইবেন। ইহাই তীব্র মুমুক্ষুত্ব।)

শিষ্য হইবার চতুর্থ এবং সর্বশেষ সাধন—নিত্যানিত্য-বিচার। ঈশ্বরই একমাত্র নিত্য বস্তু। সদাসর্বদা মন ঈশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট থাকিবে, নিবেদিত থাকিবে। ঈশ্বরই আছেন, আর কিছুই নাই; আর সব কিছু আসে এবং চলিয়া যায়। এই সংসারের জন্য কোনরূপ বাসনাই ভ্রম, কারণ এ সংসার অনিত্য। যতক্ষণ পর্যন্ত না অন্য সব কিছু অনিত্য বলিয়া বোধ হয়, ততক্ষণ একমাত্র ঈশ্বরসম্বন্ধে ক্রমে ক্রমে—মনকে সচেতন করিয়া তুলিতে হইবে।

যিনি শিষ্য হইতে চান, তাঁহাকে এই সকল শর্ত পূর্ণ করিতে হইবে। নচেৎ তিনি প্রকৃত গুরুর সান্নিধ্যে আসিতে পারিবেন না। আর যদি সৌভাগ্যবশতঃ গুরুলাভও হয়, তথাপি গুরু যে আধ্যাত্মিক শক্তি তাঁহার মধ্যে সঞ্চার করিবেন, তাহা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইতে পারিবেন না। এ-সকল সাধনার মধ্যে কোন আপস চলিবে না। এই শর্তগুলি পূর্ণ করিলে এবং এইরূপ প্রস্তুতি থাকিলে শিষ্যের হৃদয়কমল বিকশিত হইয়া উঠিবে, তখনই মৌমাছি আসিবে। শিষ্য তখন জানিতে পারিবেন যে, গুরু তাঁহার দেহের

মধ্যেই, তাঁহার অন্তরের অন্তস্তলেই বিরাজিত ছিলেন। তখনই তিনি বিকশিত হইয়া উঠেন, তখনই তিনি উপলব্ধি করেন। সংসার-সমুদ্র পার হইয়া তিনি জন্মমৃত্যুর অতীত হইয়া যান। এ ভয়ঙ্কর সাগর তিনি পার হইয়াছেন; কোন লাভ বা প্রশংসার কথা না চিন্তা করিয়া করুণাবশতঃ তিনি তখন অপরকেও সংসার-সাগরের পারে যাইতে সাহায্য করেন।[১]

১ বিবেক চূড়ামণি, ৩৯

গুরুর যোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর

স্বামীজী বিশেষ জোরের সঙ্গে বললেন : আপনারা ব্যবসায়ী-সুলভ হিসেবী মনোভাব ছাড়ুন—সামান্য একটি জিনিসের প্রতি আপনার যে-আসক্তি আছে, তা ছাড়তে পারলে বুঝব, আপনি মুক্তির পথে পা বাড়িয়েছেন। আমি তো কোন পতিতা, পাপী বা সাধু দেখতে পাচ্ছিনে। যাকে পতিতা বলছেন, সেও তো মহামায়াই। সন্ন্যাসীরা একবার বা দুবার তাকে 'মা' ব'লে আহ্বান ক'রে, তারপর আবার তাদের ভ্রান্ত ধারণা জন্মায়, তারা বলে, 'হে অসতী পতিতা নারী, দূরে সরে যাও'। একমুহূর্তেই আপনার সকল অজ্ঞানতা দূর হ'তে পারে—অজ্ঞানতা ধীরে ধীরে দূর হয় বলা মূর্খতামাত্র। বহু গুরু আদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়ার পরেও তাঁর প্রতি শিষ্যকে অনুগত থাকতে দেখা গিয়েছে। রাজপুতানায় দেখেছি, জনৈক ভক্তের গুরু খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার পরেও শিষ্য তাঁকে নিয়মিত ভাবে পূর্বের মতো সাহায্য দিত, সাহায্য বন্ধ করেনি। আপনারা পাশ্চাত্য ধারণা ছাড়ুন। কোন বিশেষ গুরুর উপরে আপনারা যখন আপনাদের সকল বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করেছেন, তখন সকল শক্তি দিয়ে তাঁকেই ধরে থাকুন।

একমাত্র বালকেরাই ব'লে থাকে যে, বেদান্তের মধ্যে কোন নৈতিকতা নেই। তাদের কথা ঠিকই—কারণ বেদান্ত নৈতিকতার ঊর্ধ্বে। সন্ন্যাসী আপনারা, উচ্চ চিন্তা ও আলোচনা করুন।

আপনাদের জোর ক'রে অন্ততঃ একটি বস্তুতে ব্রহ্মবুদ্ধি আনতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণকে ঈশ্বর ব'লে চিন্তা করা অনেক সহজ। কিন্তু বিপদ হ'ল এই —আমরা মানুষে ঈশ্বরবুদ্ধি আনতে পারি না। ঈশ্বর তো নিরাকার, নিত্য, সর্বত্র বিরাজিত।

তাঁকে সাকার ব'লে চিন্তা করা মহাপাপ, ঐরূপ চিন্তা করলে ঈশ্বর-নিন্দা করা হয়। কিন্তু সাকার উপাসনার মূলকথা এই যে, ঐ প্রকার উপাসনার মাধ্যমে উপাসক ভগবদ্বিষয়ে ধারণার উৎকর্ষ লাভ করে।[১]

[১] ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ—বেদান্তসূত্রম্, ৪।১।৫

মন্ত্র ও মন্ত্রচৈতন্য

মন্ত্রবাদের সমর্থকদের বিশ্বাস—কতকগুলি শব্দ গুরু বা শিষ্যপরম্পরায় চলে এসেছে। এই-সকল শব্দের বার বার উচ্চারণে বা জপে একপ্রকার উপলব্ধি হয়। 'মন্ত্রচৈতন্য' শব্দের দু-রকম অর্থ করা হয়। এক মতে মন্ত্র জপ করতে করতে জাপকের সামনে তার ইষ্টদেবতার আবির্ভাব হয়। 'ইষ্ট' হচ্ছেন মন্ত্রের বিষয় বা মন্ত্রের দেবতা। আর একটি মত এই: যে-গুরুর উপযুক্ত শক্তি নেই, তাঁর কাছে মন্ত্রদীক্ষা নিলে—সেই মন্ত্রে চেতনা সঞ্চার করতে হ'লে দীক্ষিতকে কতগুলি অনুষ্ঠান[১] করতে হয়, তখন সেই মন্ত্রজপের ফল পাওয়া যায়। বিভিন্ন মন্ত্রে চেতনা সঞ্চারিত হ'লে তার বিভিন্ন লক্ষণ দেখা যায়। একটি সাধারণ লক্ষণ হচ্ছে—বহুক্ষণ জপ করলেও জপকারী কোন রকম অস্বস্তি বোধ করে না এবং অতি অল্পসময়ের মধ্যেই তার মনঃসংযোগ হয়। এ হচ্ছে তান্ত্রিক মন্ত্রের কথা।

বৈদিক যুগ থেকেই মন্ত্র সম্পর্কে এই দুটি মত চলে আসছে। যাস্ক ও অন্যান্যের অভিমত এই—বেদমন্ত্রের অর্থ আছে। কিন্তু প্রাচীন মন্ত্রশাস্ত্রীরা বলেন: এগুলির কোন অর্থই নেই। তবে কোন কোন যজ্ঞানুষ্ঠানে এই-সকল মন্ত্র বার বার উচ্চারিত হ'লে এগুলি যজ্ঞকর্তাকে বৈষয়িক সুখ-সমৃদ্ধি অথবা আধ্যাত্মিক জ্ঞান দান করে। উপনিষদের মন্ত্র-আবৃত্তিতে আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভ হয়।

ঈশ্বর-সম্পর্কে ধারণা

প্রকৃতির নিয়ম-বন্ধনের অতীত—সর্বপ্রকারে স্বাধীন স্বতন্ত্র কাহারও সন্ধান লাভ করাই মানুষের অন্তরের আকাঙ্ক্ষা। বেদান্তবাদীরা এরূপ নিত্য শাশ্বত পুরুষ ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন। কিন্তু বৌদ্ধ ও সাংখ্যবাদীরা বিশ্বাস করেন 'জন্য ঈশ্বরে',—অর্থাৎ যিনি একদা মনুষ্য ছিলেন, তারপর আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন ক'রে ঈশ্বরে পরিণত হয়েছেন। পুরাণসমূহে অবতারবাদের মাধ্যমে এই দুটি মতের সামঞ্জস্য সাধিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, 'জন্য ঈশ্বর' তো নিত্য (শাশ্বত) ঈশ্বর ছাড়া অন্য কিছু নন, মায়া দ্বারা তিনি

---

১ পুরশ্চরণ

কেবল এই প্রকার রূপ পরিগ্রহ করেছেন। 'নিত্য ঈশ্বরে'র বিরুদ্ধে সাংখ্য-বাদীরা যুক্তি দেন: 'মুক্ত আত্মা কি ক'রে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করতে পারে?' মিথ্যা ভিত্তির উপর সাংখ্যবাদীদের এই যুক্তি স্থাপিত। মুক্ত আত্মা তো কারও অধীন নয়, তাকে তো তুমি নির্দেশ দিতে পার না—এই কর বা এই ক'রো না। সে মুক্ত, সে যা-ইচ্ছে করতে পারে। বেদান্তের মতে জন্য-ঈশ্বর ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি বা লয় করতে পারেন না।

ঈশ্বর: ব্যক্ত ও অব্যক্ত

যাঁকে তোমরা ব্যক্তিত্বভাবাপন্ন ঈশ্বর বলো, আমার ধারণা তিনি এবং নৈর্ব্যক্তিক সত্তা একইকালে সাকার ও নিরাকার। আমরাও ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন নৈর্ব্যক্তিক সত্তা। কথাটি নিরপেক্ষভাবে ব্যবহার করলে আমরা 'অব্যক্ত', আর আপেক্ষিকভাবে ব্যবহার করলে আমরা 'ব্যক্তি'। তোমরা প্রত্যেকেই বিশ্ব-সত্তা, সকলেই সর্বব্যাপী। শুনলে প্রথমটা মাথা ঘুরে যায়, কিন্তু আমি তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, এ কথা যতখানি সত্য, ঐ কথাও ততখানি সত্য, আত্মা সর্বব্যাপী না হয়ে পারে কি ক'রে? আত্মার দৈর্ঘ্য নেই, প্রস্থ নেই, বেধ নেই—জড়ের কোন ধর্মই আত্মায় নেই। আমরা সবাই যদি আত্মা হই, তাহলে দেশ (space) দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হ'তে পারি না, দেশ দেশকেই সীমাবদ্ধ করতে পারে, জড় জড়কে; আমরা যদি শরীরে আবদ্ধ থাকতাম, তাহলে আমাদের জড়বস্তুই হ'তে হ'ত। শরীর, আত্মা—সব কিছুই জড় হ'ত। 'শরীরে বাস করা', 'আত্মাকে শরীরে আটকে রাখা' প্রভৃতি কথাগুলি শুধু সুবিধার জন্য ব্যবহৃত হ'ত, এর অতিরিক্ত এদের কোন অর্থ থাকত না।

তোমাদের অনেকেরই মনে আছে—আত্মার কি সংজ্ঞা আমি দিয়েছি: প্রত্যেকটি আত্মা হচ্ছে এক একটি বৃত্ত, একটি বিন্দুতে যার কেন্দ্র এবং যার পরিধি কোথাও নেই। কেন্দ্র হচ্ছে শরীরে, সেখানেই সব কর্মশক্তি প্রকাশিত। তোমরা সর্বব্যাপী, তবে সত্তাচেতনা একটি বিন্দুতে ঘনীভূত। সেই বিন্দুটি কিছু জড় কণা সংগ্রহ ক'রে সেগুলিকে আত্মপ্রকাশের যন্ত্রে পরিণত করেছে। যার মাধ্যমে সত্তা নিজেকে প্রকাশ করে, তাকে বলে 'শরীর'।

তাহলে তুমি সর্বত্র আছ। যখন একটি শরীর বা যন্ত্র আর কাজ করতে পারে না, তখন শরীরের কেন্দ্র 'তুমি' সরে যাও, আবার নতুন স্থূল বা সূক্ষ্ম জড়কণা সংগ্রহ ক'রে তাদের মাধ্যমে আবার কাজ করতে থাকো। এই হ'ল মানুষ। তাহলে ঈশ্বর কি? ঈশ্বর হচ্ছেন একটি বৃত্ত, যার পরিধি কোথাও নেই এবং যার কেন্দ্র সর্বত্র; এই বৃত্তের প্রতিটি বিন্দু চেতন ও সক্রিয়। সীমাবদ্ধ আত্মা আমাদের সঙ্গে সমানে কাজ ক'রে চলেছে। আমাদের শুধু একটি চেতন বিন্দু, সেই বিন্দু একবার এগিয়ে চলেছে, একবার পিছিয়ে যাচ্ছে।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় শরীর যেমন অতি ক্ষুদ্র, ঈশ্বরের সঙ্গে তুলনায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তেমনি নগণ্য। আমরা যখন বলি, ঈশ্বর কথা বলছেন, তখন তার অর্থ—তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মাধ্যমে বলছেন। আমরা যখন বলি—তিনি দেশ-কালের সীমার অতীত, তার অর্থ—তিনি ব্যক্তিত্বশূন্য সত্তা। এই উভয়ই এক সত্তা।

একটি দৃষ্টান্ত দিই: আমরা এখানে দাঁড়িয়ে সূর্যকে দেখছি। মনে কর, তুমি সূর্যের দিকে এগিয়ে চলেছ। কয়েক হাজার মাইল কাছে গিয়ে দেখবে আর এক সূর্য—অনেক বড়। সবশেষে দেখবে, প্রকৃত সূর্য লক্ষ মাইল জুড়ে। এখন এই যাত্রাটিকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করা যাক, প্রত্যেক স্তর থেকে ছবি তোলা হ'ল। প্রকৃত সূর্যেরও ছবি তুলে নিয়ে ফিরে এসে সবগুলি তুলনা কর, মনে হবে প্রত্যেকটি পৃথক্। প্রথম দেখা গিয়েছিল একটি ছোট লাল গোলাকার পদার্থ, এবং শেষে দেখা গেল লক্ষমাইল-ব্যাপী বিরাট প্রকৃত সূর্য। দুটি একই সূর্য।

ঈশ্বর সম্বন্ধেও তাই। অসীম সত্তাকে আমরা দেখছি বিভিন্ন স্থান থেকে, মনের বিভিন্ন স্তর থেকে। নিম্নতম মানুষ দেখছে তাঁকে পূর্বপুরুষ-রূপে; দৃষ্টি যখন আরও বড় হ'ল, তখন তাঁকে দেখছে একটি গ্রহের নিয়ন্তা-রূপে; দৃষ্টি আরও ব্যাপক হ'লে মানুষ বুঝতে পারে, তিনি বিশ্বের নিয়ামক। সর্বোচ্চ মানব অনুভব করেন, 'তিনি আমাদের স্বরূপ'। ঈশ্বর সর্বদা একই, তাঁকে যে বিভিন্নভাবে বোধ হয়, তার কারণ দৃষ্টির প্রভেদ ও তারতম্য।

ভগবৎ-প্রেম

১৮৯৪, ১৫ই ফেব্রুআরি আমেরিকার ডেট্রয়েট শহরের ইউনিটারিয়ান চার্চে প্রদত্ত ভাষণের সারাংশ।

ভগবান্‌কে আমরা মানি, যথার্থই তাঁকে চাই ব'লে নয়—নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাঁকে দরকার ব'লে। প্রেম হচ্ছে এমন কিছু, যা সম্পূর্ণ স্বার্থহীন; এ প্রেম যাঁকে অর্পিত হয়, শুধু তাঁরই মহিমা ও স্তুতি ছাড়া তাতে অন্য কোন চিন্তার স্থান নেই। প্রেমের স্বভাব হচ্ছে প্রণতি আর পূজা, প্রতিদানে প্রেম কিছু চায় না। শুধু ভালবাসাই হ'ল বিশুদ্ধ প্রেমের একমাত্র আবেদন।

একজন হিন্দু-সাধিকা[১] সম্পর্কে এ-রকম শোনা যায়—বিবাহের পর তিনি তাঁর পতি রাজাকে বলেছিলেন, 'ইতিপূর্বেই আমি বিবাহিতা।' রাজা জিজ্ঞাসা করেন, 'কার সঙ্গে?' সাধিকা উত্তর দেন, 'ভগবানের সঙ্গে।' দীন-দরিদ্রের দ্বারে দ্বারে গিয়ে তিনি তাদের শিখিয়েছিলেন ঈশ্বরকে গভীরভাবে ভালবাসতে। তাঁর হৃদয়ের ব্যাকুলতা কত গভীর ছিল তা তাঁর প্রার্থনাগীতিগুলির একটি হ'তে জানা যায়: 'আমি ধন মান কিছুই চাই না—এমন কি মুক্তিও চাই না; প্রভু, তুমি ইচ্ছা করলে আমাকে শত শত নরক-যাতনাও দিতে পারো,—তথাপি শুধু তোমাতেই আমার অনুরাগ দাও।' আমাদের প্রাচীন ভাষা এই সাধিকার মধুর ভজনাবলীতে পূর্ণ। তাঁর মৃত্যু যখন ঘনিয়ে এল, তখন এক নদীর তীরে গিয়ে তিনি সমাধিতে নিমগ্ন হলেন। এক মর্মস্পর্শী সঙ্গীতে তিনি ব্যক্ত ক'রে যান যে, তাঁর প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলনের জন্যই তিনি যাত্রা করেছেন।

পুরুষেরা ধর্মের দার্শনিক বিচারে সমর্থ। নারী স্বভাবতঃ ভক্তিপ্রবণ; সে ভগবান্‌কে ভালবাসে হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে, বুদ্ধি দিয়ে নয়। সলোমনের প্রার্থনা-সঙ্গীতগুলি বাইবেলের চমৎকার অংশগুলির অন্যতম। এগুলির ভাবও অনেকটা ঐ হিন্দু-সাধিকার ভজনগীতের মতো অনুরাগে পূর্ণ। তথাপি শুনেছি, এই অতুলনীয় সঙ্গীতগুলি খ্রীষ্টানরা নাকি বাইবেল থেকে বাদ দিতে চাচ্ছেন। এর একটা কৈফিয়তও আমি শুনেছি,—সলোমন নাকি কোন যুবতীর প্রতি অনুরক্ত ছিলেন এবং যুবতীর কাছ থেকে তাঁর রাজোচিত

---

১ মীরাবাঈ

প্রেমের প্রতিদান চেয়েছিলেন। যুবতী অন্য কোন যুবককে ভালবাসত, সলোমনের সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখতে চাইত না। এ কৈফিয়তটি কারও কারও কাছে হয়তো বেশ ভালই লাগবে, কারণ এ-সব ভজনগীতের অন্তর্নিহিত ভাব—অলৌকিক ভগবৎ-প্রেম—তারা বুঝতে অক্ষম। ভারতের ভগবদ্‌ভক্তি অন্যান্য দেশের ভগবদ্‌ভক্তি থেকে কিছু স্বতন্ত্র, কারণ যে-দেশের তাপমান-যন্ত্র শূন্যের নীচে ৪০ ডিগ্রী স্থচিত করে, সে-দেশের লোকের প্রকৃতিও কিছু ভিন্ন ধরনের হয়। যে-জলবায়ুতে বাইবেল রচিত হয়েছিল ব'লে শোনা যায়, সেখানকার লোকের আশা-আকাঙ্ক্ষা—যারা ঈশ্বরোপাসনার চেয়ে সঙ্গীতগুলিতে ব্যক্ত হৃদয়াবেগ দিয়ে সর্বসিদ্ধিপ্রদ অর্থের পূজা করতেই অধিকতর অভ্যস্ত—সে-সব আবেগশূন্য পাশ্চাত্য জাতিগুলি থেকে পৃথক্ ছিল। 'এতে আমার কি লাভ?'—এটাই যেন ভগবদ্‌ভক্তির ভিত্তি। প্রার্থনাদিতে তারা শুধু স্বার্থপূর্ণ বিষয়গুলিই কামনা করে।

খ্রীষ্টানরা সর্বদা চান, ভগবান্ তাঁদের কিছু না কিছু দিন। সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের সিংহাসন-সমীপে তাঁরা ভিক্ষুকরূপে উপস্থিত হন। গল্পে আছে এক ভিক্ষুক কোন সম্রাটের কাছে ভিক্ষাপ্রার্থী হয়েছিল। ভিক্ষুক যখন অপেক্ষা করছিল, সম্রাটের তখন প্রার্থনার সময়। সম্রাট্ প্রার্থনা করছিলেন: 'হে জগদীশ্বর, আমাকে তুমি আরও ঐশ্বর্য দাও, আরও শক্তি দাও, আরও বড় সাম্রাজ্য দাও।' ভিক্ষুক এই শুনে চলে যাচ্ছিল। সম্রাট্ পিছনে ফিরে জিজ্ঞাসা করেন, 'চলে যাচ্ছ কেন?' উত্তর হ'ল, 'ভিক্ষুকের কাছে আমি ভিক্ষা চাই না।'

যে তীব্র আধ্যাত্মিক উন্মাদনা মহম্মদের হৃদয় আলোড়িত করেছিল, অনেকের পক্ষেই তা বোঝা কঠিন। তিনি ধুলোয় গড়াগড়ি দিতেন এবং বিরহযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করতেন। যে-সব লোকোত্তর পুরুষ এরূপ তীব্র হৃদয়াবেগ অনুভব করেছেন, লোকে তাঁদের বায়ুরোগগ্রস্ত বলেছে। (অহং-শূন্যতাই ঈশ্বরানুরাগের প্রধান লক্ষণ; ধর্ম আজকাল মানুষের এক-রকম শখ বা বিলাসমাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। লোকে গির্জায় যায় গড্ডলিকা-প্রবাহের মতো; তারা ভগবান্‌কে স্বেচ্ছায় বরণ করে না, কারণ তাঁর সঙ্গে তো তাদের প্রয়োজন বা স্বার্থের সম্বন্ধমাত্র। অধিকাংশ লোকই এক-রকম প্রচ্ছন্ন নাস্তিক, অথচ নিজেদের খুব ধর্মপ্রাণ বিশ্বাসী ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রে থাকে।)

মাতৃভাবে উপাসনা

১৯০০, জুন মাসে নিউ ইয়র্কে প্রদত্ত ভাষণের সংক্ষিপ্ত লিপির অনুবাদ।

প্রত্যেক ধর্মেই মানুষ বিভিন্ন গোষ্ঠী-দেবতার ভাব হইতে তাহাদের সমষ্টি পরমেশ্বর-ভাবে উপনীত হইয়াছে; একমাত্র কন্‌ফিউসিয়াস চিরন্তন একটি নীতির কথা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন। মন্দুদেবতা আহরিমানে রূপান্তরিত হইয়াছেন। ভারতে পুরাণের গল্প চাপা পড়িয়াছে, তাহার ভাব রহিয়া গিয়াছে। ঋগ্‌বেদেই একটি মন্ত্র[১] পাওয়া যায়, 'অহং রাষ্ট্রী সঙ্গমনী বসূনাম্—'।

মাতৃ-উপাসনা একটি স্বতন্ত্র দর্শন। আমাদের অনুভূত বিবিধ ধারণার মধ্যে শক্তির স্থান সর্বপ্রথম। প্রতি পদক্ষেপে ইহা অনুভূত হয়। অন্তরে অনুভূত শক্তি—আত্মা, বাহিরে অনুভূত শক্তি—প্রকৃতি। এই দুই-এর সংগ্রামই মানুষের জীবন। আমরা যাহা কিছু জানি বা অনুভব করি, তাহা এই দুই শক্তির সংযুক্ত ফল। মানুষ দেখিয়াছিল, ভাল এবং মন্দ—উভয়ের উপর সূর্যের আলো সমভাবে পড়িতেছে। ঈশ্বর সম্বন্ধে এ এক নূতন ধারণা—এক সার্বভৌম শক্তি সব কিছুর পশ্চাতে। এইভাবেই মাতৃভাব উদ্ভূত।

সাংখ্য-মতে ক্রিয়া প্রকৃতির ধর্ম, আত্মা বা পুরুষের নয়। ভারতে নারীর সর্ববিধ রূপের মধ্যে মাতৃমূর্তি সবার উপরে। মা সর্বাবস্থায় সন্তানের পাশে পাশে থাকেন। স্ত্রী-পুত্র মানুষকে ত্যাগ করিতে পারে, মা কিন্তু কখন সন্তানকে ত্যাগ করিতে পারেন না। আবার মাতৃশক্তিই পক্ষপাতশূন্য মহাশক্তি। মায়ের স্বচ্ছ স্নেহ প্রতিদানে কিছু চায় না, কিছু কামনা করে না, সন্তানের দোষগুলি গ্রাহ্য করে না—সে জন্য বরং আরও বেশী ভালবাসে। বর্তমানে মাতৃ-উপাসনা উচ্চস্তরের হিন্দুদের সাধনার প্রধান অঙ্গ।

যাহা এখনও পাওয়া যায় নাই, তাহাকেই 'লক্ষ্য' বলিয়া বর্ণনা করা হয়। মাতৃ-সাধনায় লক্ষ্য বলিয়া কিছু নাই। সব কিছু মায়ের খেলা, কিন্তু ইহা আমরা ভুলিয়া যাই। স্বার্থবোধ না থাকিলে দুঃখও আনন্দের অনুভূতি আনিতে পারে, যদি আমরা আমাদের জীবনের সাক্ষিরূপে পরিণত হই। জগদ্-ব্যাপারের পিছনে একটি শক্তি ক্রিয়াশীল, এই ধারণাই এই ভাবের

[১] দেবীসূক্ত—ঋগ্‌বেদ, ১০।১০।১২৫

সাধককে বিস্মিত করে। আমাদের ধারণা—ঈশ্বর মানুষের মতো সসীম ও ব্যক্তিত্ব-যুক্ত। শক্তির সঙ্গে এক বিশ্বব্যাপী ক্ষমতার ধারণা আসে। শক্তি বলিতেছেন, 'আমি রুদ্রের জন্য ধনু বিস্তৃত করি, যাহাতে তিনি ব্রহ্মদ্বেষীকে ধ্বংস করিতে পারেন।'[১] উপনিষদে এই ভাবের চিন্তা নাই, বেদান্ত এই বিষয়ে বেশী অগ্রসর হন নাই—ঈশ্বরতত্ত্ব লইয়া মাথা ঘামান নাই। কিন্তু গীতায় অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি: 'সদসচ্চাহমর্জুন'—আমি ব্যক্ত, আমিই অব্যক্ত; ভাল মন্দ—সবই আমার সৃষ্টি।

এই ভাব কিছুকাল সুপ্ত অবস্থায় থাকে। পরে আবার দেখা দেয় নূতন দর্শন। এই জগৎ সৎ ও অসতের সংমিশ্রণ—উভয়ের মধ্য দিয়া একই শক্তি আত্মপ্রকাশ করিতেছে। বিশ্বজগতের আংশিক অনুভূতি হইতে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে ধারণা হয়, তাহাও আংশিক মাত্র। সহানুভূতির অভাবে এই ধারণা মানুষকে পশুভাবাপন্ন ও হিংস্র করিয়া ফেলে। এই ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত নীতি পশুর ধর্ম।

সাধু পাপীকে ঘৃণা করে, আবার পাপীর বিদ্রোহ পুণ্যবানের বিরুদ্ধে। এই ভাবও অবশ্য তাহাকে আগাইয়া লইয়া যায়। বারংবার আঘাতে নিষ্পিষ্ট হইয়া দুষ্ট স্বার্থপর মন মরিয়া যায়—তখন আমরা জাগিয়া উঠি এবং মায়ের সত্তা অনুভব করি।

মায়ের কাছে প্রতিনিয়ত অকুণ্ঠ শরণাগতিই আমাদের শান্তি দিতে পারে। তাঁহার জন্যই তাঁহাকে ভালবাসো—ভয়ে নয়, বা কিছু পাইবার আশায় নয়। তাঁহাকে ভালবাসো, কারণ তুমি সন্তান। ভালোয় মন্দে সর্বত্র তাঁহাকে সমভাবে দেখ। যখন আমরা তাঁহাকে এইরূপে অনুভব করি, তখনই আমাদের মনে আসে সমত্ব ও চিরশান্তি—ইহাই মায়ের স্বরূপ। যতদিন এই অনুভূতি না হয়, ততদিন দুঃখ আমাদের অনুসরণ করিবে। মায়ের কোলে বিশ্রাম করিতে পারিলেই আমরা নিরাপদে থাকি।

১ দেবীসূক্ত, ৬

তথ্যপঞ্জী

তথ্যপঞ্জী

ভক্তিযোগ

গ্রন্থপরিচয় : 'ভক্তিযোগ' বক্তৃতাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ১৮৯৫ খৃঃ প্রথমে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। ঐ বৎসরই পাদটীকাদি সহ 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকায় বর্ধিতাকারে মুদ্রিত হয়। স্বামী শুদ্ধানন্দ কৃত বাংলা অনুবাদের বিজ্ঞাপন উদ্বোধনে ১৩০৬ সালের (২য় বর্ষ) ৬ষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত দেখা যায়।

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি	
৭	লণ্ডনে প্রথম বক্তৃতামালা : ১৮৯৫ খৃঃ সেপ্টেম্বর হইতে নভেম্বর পর্যন্ত স্বামীজী লণ্ডনে ছিলেন, মিঃ স্টার্ডির উদ্যোগে কয়েকটি বক্তৃতা দেন এবং নভেম্বরের শেষ দিকে নিউ ইয়র্কে ফিরিয়া যান, পর বৎসর (১৮৯৬ খৃঃ) এপ্রিলের শেষে আবার ইংলণ্ডে আসেন এবং এইবার বক্তৃতামালা শুরু হয়। স্বামী সারদানন্দ এই সময় উপস্থিত ছিলেন।
২	বেদান্ত-মাসিক 'ব্রহ্মবাদিন্' : আলাসিঙ্গা পেরুমলের ব্যবস্থাপনায় এবং জি. ভেঙ্কটরঙ্গ রাও ও নাঞ্জুণ্ড রাও-এর সহযোগিতায় ১৮৯৫ খৃঃ ১৪ই সেপ্টেম্বর মাদ্রাজ শহর হইতে পাক্ষিক পত্রিকারূপে 'ব্রহ্মবাদিন্' প্রকাশিত হয়।
৫	শঙ্কর (৭—৮ শতক) : অদ্বৈতবাদী আচার্য, বেদান্তসূত্রাদি প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্যকার এবং দশনামী বৈদান্তিক সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। ৫ম খণ্ড ৪৭৩ পৃঃ দ্রঃ।
৫	রামানুজ (১০১৭-১১৩৭) : বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী আচার্য ও বৈষ্ণব-ধর্মের প্রচারক। ৫ম খণ্ড ৪৭১ পৃঃ দ্রঃ।
৩	নারদ তদীয় 'ভক্তিসূত্রে' : এই খণ্ডেই স্বামীজী-কৃত অনুবাদ দ্রষ্টব্য পৃঃ ৩৩১
১১	ব্যাসসূত্রের মহান্ ভাষ্যকার : আচার্য শঙ্কর

৯	১	জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গের আচার্যগণ : জ্ঞানমার্গের আচার্য গৌড়-পাদ শঙ্কর প্রভৃতি; ও ভক্তিমার্গের আচার্য রামানুজ মধ্ব প্রভৃতি।
১১	৫	ভোজ : ভোজরাজ ধারা (উজ্জয়িনী নগরী)র রাজা, তাঁহার রাজত্বকাল ৯৩২-৯৮৩ শকাব্দ বলিয়া নির্ণীত। পাতঞ্জলসূত্রে তাঁহার 'রাজমার্তণ্ড-বৃত্তি' বা 'ভোজবৃত্তি' বলিয়া একটি সহজ বৃত্তি আছে। তিনি শৈবমতের আচার্য; রামায়ণ-চম্পূ প্রভৃতি আরও কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ।
	১০	শাণ্ডিল্য : শাণ্ডিল্য ঋষি, ইঁহার প্রণীত একটি ভক্তিবিষয়ক সূত্র-গ্রন্থ আছে। ইহাতে ১০০টি সূত্র আছে।
	১১	ভক্তরাজ প্রহ্লাদ : এই গ্রন্থাবলীর ৮ম খণ্ডে ২৮২ পৃঃ 'প্রহ্লাদচরিত্র' দ্রষ্টব্য।
১২	৪	রামানুজ শ্রীভাষ্যে এক প্রাচীন আচার্যের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন দ্রাবিড়াচার্যের অধুনালুপ্ত 'বোধায়ন ভাষ্য'।
১৪	৫	মধ্বাচার্য (১১—১২ শতক) : দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ বেদান্ত ভাষ্যকার। ইনি দ্বৈতবাদী। ৫ম খণ্ডে ৪১৬ পৃঃ দ্রঃ।
	৫	বরাহপুরাণ : অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত বিষ্ণুর মাহাত্ম্যসূচক একটি পুরাণ।
১৬	১৮	'প্রকৃতিলীন' : সাংখ্যে আধিকারিক পুরুষকে 'প্রকৃতিলীন' পুরুষ বলে। পূর্ণজ্ঞানলাভের পূর্বে লোককল্যাণ-বাসনা থাকায় তাঁহারা প্রকৃতিতে লীন হইয়া আধিকারিক পুরুষরূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং ষড়ৈশ্বর্যসম্পন্ন হইয়া এক কল্পকাল পর্যন্ত অশেষ প্রকারে লোককল্যাণ সাধন করিয়া শেষে স্বরূপে লীন হন। সাংখ্যাচার্যগণ 'প্রকৃতিলীন' পুরুষগণের মধ্যে দুইটি শ্রেণী নির্দেশ করিয়াছেন, যথা—'কল্পনিয়ামক ঈশ্বর' ও 'ঈশ্বরকোটি'। [শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গে অবতরণিকা (৪ পৃঃ) ও বিজ্ঞানভিক্ষু রচিত সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য দ্রঃ]
১৮	১৬	ভগবান্ কপিল : 'চতুর্বিংশতিতত্ত্ব'-সমন্বিত সাংখ্যদর্শনের প্রথম ও প্রধান উপদেষ্টা বিখ্যাত ঋষি। ৫ম খণ্ডে ৪৭৯ পৃঃ দ্রঃ।

১৯ ৪ বিজ্ঞানবাদ (Idealism) ও বাস্তববাদ (Realism) :
যাঁহারা বলেন, মনোজগৎই সত্য, বাহিরের কোন ভিন্ন সত্তা নাই, রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ, যাহা লইয়া আমাদের বাহ্য জগৎ গঠিত, উহা সবই আমাদের মানসিক বৃত্তি ব্যতীত অন্য কিছুই নয়, তাহাদিগকেই পাশ্চাত্যদার্শনিকগণ Idealist বা বিজ্ঞানবাদী বলেন। জেনো (Zeno), প্লেটো, বার্কলে প্রভৃতি এই শ্রেণীতে পড়েন। ফিক্‌টে শেলিং ও হেগেলকেও বিজ্ঞানবাদী বলা হয়। আর যাঁহারা মনে করেন, বাহিরের জগৎই সত্য ও আমাদের সকল জ্ঞান বাহির হইতে ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া আসে, মন বলিয়া পৃথক কোন পদার্থ নাই, পাশ্চাত্যে তাঁহাদিগকে Realist বা বাস্তববাদী বলে। লক, হিউম, হ্যামিলটন, মিল প্রভৃতি এই শ্রেণীর দার্শনিক।

২১ ২৮ ইষ্টাপূর্ত : বৈদিক যজ্ঞাদি কর্মকে 'ইষ্ট' ও জনহিতার্থ স্মার্তকর্মকে (স্মৃতিবিধানোক্ত) 'পূর্ত' বলে।

ইষ্ট— অগ্নিহোত্রং তপঃ সত্যং বেদানাং চানুপালনম্।
আতিথ্যং বৈশ্বদেবশ্চ ইষ্টমিত্যভিধীয়তে॥

পূর্ত— বাপীকূপতড়াগাদি দেবতায়তনানি চ।
অন্নপ্রদানমারামং পূর্তমিত্যভিধীয়তে॥

২৯ ২৩ যিনি বিদ্বান্ নিষ্পাপ ও কামগন্ধহীন, যিনি শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিৎ
'শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতঃ'—গুরুর এই লক্ষণ শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। বৃহ. উপ., ৪।৩।৩৩, তৈত্তি. উপ., ২।৮

৩৬ ৪ ভারতীয় দর্শনের মতে সমুদয় জগৎ নামরূপাত্মক
বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্॥
ছান্দোগ্য উপ., ৬।১।৪

১৭ ব্রহ্মা, হিরণ্যগর্ভ বা সমষ্টিমহৎ :
হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং…॥ হিরণ্যগর্ভসূক্তম্ ঋগ্বেদ ১০।১২১, ইহাকেই হিরণ্যগর্ভসূক্তে 'হিরণ্যগর্ভ', মুণ্ডকোপনিষদে 'ব্রহ্মা' ও

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

বেদান্তশাস্ত্রে 'হিরণ্যগর্ভ', 'সূত্রাত্মা' বা 'প্রাণ' বলা হইয়াছে (বেদান্তসার দ্রঃ)। স্বামীজী ইহাকেই 'সমষ্টিমহৎ' বলিয়াছেন।

৩৬ ১৯ স্ফোট : বৈয়াকরণ পতঞ্জলি প্রভৃতির মতে, সৎ-চিৎ-আনন্দ এক নিত্য শব্দরূপ। ব্রহ্মই শব্দরূপে ও অর্থরূপে বিবর্তিত হন। এক ব্রহ্মই পরা পশ্যন্তী মধ্যমা ও বৈখরী-রূপে প্রসিদ্ধ। সেই এক সত্তাই যখন 'নাদের' দ্বারা (অর্থাৎ কণ্ঠ তালু প্রভৃতির সংযোগে যে অন্তঃস্থ বায়ু নাদরূপে উত্থিত হয়) নানাপ্রকারে রাম, কৃষ্ণ ইত্যাদি বর্ণ পদ ও বাক্যরূপে অভিব্যক্ত হয়। উহাই অর্থের জ্ঞান জন্মায়—তাহাকেই স্ফোট বলে। 'অর্থং স্ফোটয়তি ইতি স্ফোটঃ' এবং বর্ণই 'স্ফুট্যতে অভিব্যজ্যতে ইতি' অর্থাৎ বর্ণের দ্বারা যাহা অভিব্যক্ত হয়, এবং অর্থবোধ জন্মায়, তাহাই 'স্ফোট'। স্বামীজী ওঁকারকে স্ফোটের বাচক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। [পতঞ্জলির মহাভাষ্য, তাহার টীকা কৈয়ট, ভর্তৃহরি-কৃত 'বাক্যপদীয়' ইত্যাদি গ্রন্থ দ্রঃ।]

৩৮ ১২ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ : গীতা (গুণত্রয়বিভাগযোগ) ১৪শ অঃ দ্রঃ।

৪১ ৩ প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্ম : খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে সংস্কারের ফলে উদ্ভূত খ্রীষ্টধর্মের শাখা। ১৫২০ খৃঃ জার্মানির ১৯টি রাজ্য ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধির (Private Judgment) অধিকার হরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়—এই প্রতিবাদকারীদের 'প্রোটেস্ট্যাণ্ট' বলিত। যাঁহারা রোমান ক্যাথলিক বা গ্রীক চার্চের প্রাধান্য স্বীকার করেন না, সেই সকল খৃষ্টীয় ধর্মমতকে সাধারণভাবে 'প্রোটেস্ট্যাণ্ট' ধর্ম বলে। মার্টিন লুথারই এই ধর্মসংস্কারের নেতা। প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্ম বহু শাখায় বিভক্ত; প্রধানগুলি : মেথডিস্ট, ব্যাপ্টিস্ট, লুথারিয়ান, কংগ্রিগেশনাল, প্রেসবিটেরিয়ান, এপিস্‌কোপাল।

৮ অগস্ট কম্‌তে (১৭৯৮-১৮৫৭) : ফরাসী দার্শনিক, প্রত্যক্ষ-বাদের (Positivism) উদ্ভাবক। ঈশ্বর-কেন্দ্রিক ধর্মমতের বিরুদ্ধে তিনি তাঁহার দর্শন রচনা করিয়াছেন। ২য় খণ্ডে 'দার্শনিক পরিচিতি' দ্রঃ ৪৯৩ পৃঃ।

৮ অজ্ঞেয়বাদী (Agnostic) : ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে জানা সম্ভব নয় —এই মতবাদকে অজ্ঞেয়বাদ বলে। অজ্ঞেয়বাদীরা সেইজন্য ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয় লইয়া বিচার হইতে বিরত থাকার পক্ষপাতী। পাশ্চাত্যের ক্যাণ্ট, স্পেন্সার প্রভৃতি এই মতের সমর্থক।

৪৩ ১১ পরমকরুণাপরবশ হইয়া বেদান্ত···

তুলনীয় : শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ···। শ্বে. উপ., ২।৫

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং
তমসঃ পরস্তাৎ তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়। শ্বে. উপ., ৩।৮

৪৪ ৪ সাধু তুলসীদাস : স্বনামখ্যাত সাধক ও কবি। হিন্দী রামায়ণ 'রামচরিতমানস' ইঁহার অমর রচনা। ইঁহার রচিত দোঁহাগুলিও গভীর উপদেশপূর্ণ।

৪৭ ১১ পঞ্চমহাযজ্ঞ : ব্রহ্ম, পিতৃ, ঋষি, ভূত, নৃ—এই পাঁচটিকে কেন্দ্র করিয়া।

অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্ ॥—মনুসংহিতা

(১) ব্রহ্মযজ্ঞ—বেদাধ্যয়ন, (২) পিতৃযজ্ঞ—পিতৃতর্পণাদি, (৩) দেব বা ঋষিযজ্ঞ—হোমাদি, (৪) ভূতযজ্ঞ—সাধারণ প্রাণীকে অন্নদান, (৫) নৃযজ্ঞ—অতিথিসেবাদি।

৫৯ ২১ এরূপ ভক্ত সর্পদষ্ট হইলে বলে,···দূত আসিয়াছিল

পওহারী বাবাকে সর্প দংশন করে ; চৈতন্য ফিরিয়া আসিলে তিনি বলিয়াছিলেন, প্রিয়তমের নিকট হইতে দূত আসিয়াছিল।

৬৭ ১১ আমরা শকুনির মতো,···মাংসখণ্ডের প্রতি আকৃষ্ট

তুলনীয় শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে : 'চিল শকুনি অনেক উঁচুতে ওঠে, কিন্তু নজর ভাগাড়ে'।

৮১ ২ যে-সকল ধর্মসম্প্রদায় বিশ্বাস করেন—ভগবান্ অবতীর্ণ হন

একমাত্র হিন্দুরাই নররূপে ভগবানের অবতরণ বিশ্বাস করেন। ইসলাম ধর্মমতে ঈশ্বরের অবতার হয় না ; 'মহম্মদ' ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ। খ্রীষ্টধর্মে যীশুখ্রীষ্টকে 'ভগবানের পুত্র' বলা হয়। রোমান

ক্যাথলিকগণ বিশ্বাস করেন, ঈশ্বর খ্রীষ্টশরীরে মানবরূপে আবির্ভূত। তবে ইঁহারাও ঈশ্বরের একাধিক অবতার স্বীকার করেন না।

৮৬ ৬ চিনি হওয়া ভাল নয়, চিনি খেতে ভালোবাসি

রামপ্রসাদের গানে আছে—'চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি।' শ্রীরামকৃষ্ণ বহুবার এই কথা বলিয়াছেন।

১৫ আমি একজনকে জানি, লোকে তাহাকে পাগল বলিত

এখানে শ্রীরামকৃষ্ণের কথাই বলা হইতেছে।

ভক্তিরহস্য

গ্রন্থ-পরিচয়: ১৮৯৫ খৃঃ লণ্ডনে প্রদত্ত বক্তৃতামালা, এগুলি 'Addresses on Bhakti-Yoga' নামে পরিচিত। ১৩১৭-১৮ সালে (১২ বর্ষের) উদ্বোধনে বিভিন্ন সংখ্যায় এগুলির অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

১০২ ২ ভক্তিযোগের আচার্যগণ

রামানুজাচার্য, মধ্বাচার্য, বল্লভাচার্য প্রভৃতি।

১০৮ ৭ এমার্সন (১৮০৩-৮২): রাল্‌ফ ওয়াল্ডো এমার্সন বিখ্যাত আমেরিকান লেখক ও কবি। ধর্মযাজকের পুত্ররূপে তিনি প্রথম জীবনে হার্ভার্ডে ঐ কার্যের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিতেছিলেন, কিন্তু শীঘ্রই আনুষ্ঠানিক ধর্মে বিশ্বাস হারাইয়া ঐ কার্য ত্যাগ করেন। ইওরোপ ভ্রমণের ফলে তিনি ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ, কার্লাইল প্রভৃতি কবি ও মনীষীর সাহচর্যে আসেন এবং জার্মান দর্শন সম্বন্ধে নূতন চেতনা লাভ করেন। তাঁহার সময়ে নিউ ইংলণ্ডে যে অতীন্দ্রিয়বাদের স্থচনা হয়, তিনি উহার এক উৎসাহী প্রবক্তা। তাঁহার রচনা ও ব্যক্তিগত সাহচর্য থোরো প্রভৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করে।

১০৯ ১৮ যীশুখ্রীষ্টের 'শৈলোপদেশ': নিউ টেস্টামেণ্টের অন্তর্গত 'Sermon on the Mount'—ম্যাথ্যু (৫-৭), ল্যুক (৬: ২০-৪৯)। ৫ম খণ্ডে ৪৮৫ পৃঃ দ্রঃ।

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

১৩৭ ১৪ যীশু···ক্রেতা-বিক্রেতাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন

জেরুসালেমে আসিয়া যীশু যিহোবার মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখেন, সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য—টাকা-লেনদেন চলিতেছে, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া সকলকে তাড়াইয়া দিয়া বলেন, শাস্ত্রে লিখিত আছে : আমার মন্দির প্রার্থনা-ভবন, তোরা ইহাকে চোরের আড্ডায় পরিণত করিয়াছিস। (N. T., Matt. XXI, 12)

১৩৮ ২৪ হিতবাদিগণ (Utilitarians) : ধর্মীয় ও সামাজিক সকল ব্যাপারে ব্যক্তিবিশেষের ও সমাজের হিতসাধনের নীতিই এই তত্ত্বের মূল কথা। ইঁহাদের মতে—ব্যক্তিবিশেষের জীবনে যাহা সর্বাপেক্ষা অধিক সুখ আনে, তাহাই সৎ ধর্ম এবং সমাজ-জীবনে যাহা সর্বাপেক্ষা অধিক লোকের সর্বাধিক সুখবিধান করে, তাহাই সামাজিক সৎ কর্ম। জেরেমী বেন্থাম, জেম্‌স্ মিল, জন স্টুয়ার্ট মিল প্রভৃতি এই মতের প্রবক্তা।

১৪৩ ২৭ ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্টিস্ট : আমেরিকান মহিলা মিসেস এডি বেকার (১৮২১-১৯১০) কর্তৃক ১৮৭৬ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় সংস্থা। ১৮৯২ খৃঃ বস্টনে ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্টিস্টদের প্রথম গির্জা স্থাপিত হয়। ইঁহারা মানসিক ও আধ্যাত্মিক উপায়ে রোগ-নিরাময়ে বিশ্বাস করেন। যীশু একটি রুগ্ন ব্যক্তিকে যাহা বলিয়াছিলেন, বাইবেল-এ (ম্যাথ্যু, ৯ : ২) তাহা পাঠ করিয়া মিসেস বেকারের এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায়।

১৪৪ ১ থিওজফিস্টদের মতে একজন 'মহাত্মা'

থিওজফিস্টগণ বিশ্বাস করেন, বড় বড় সাধক মহাপুরুষগণ দেহ-ত্যাগের পরও সূক্ষ্মশরীরে থাকেন এবং পৃথিবীর উপর প্রভাব বিস্তার করেন। ইঁহাদিগকে 'মহাত্মা' বলা হয়।

২১ তালমুড (Talmud) : ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ, ইহার দুইটি ভাগ। প্রথমটি মিশ্‌না (Mishnah or Mishna)—ইহাতে Rabbi Judah the Prince কর্তৃক সংক্ষিপ্তাকারে সংকলিত (১৩৫-২২০ খৃঃ) মৌখিক অনুশাসন (Torah) আছে। ওল্ড টেস্টা-

মেণ্টের প্রথম পাঁচটি পুস্তকে (Books) যে অনুশাসনবিধি আছে, 'মিশনা' তাহারই পরিশিষ্ট। ইহার সংকলনের পর বহু শতাব্দী ধরিয়া ইহার উপর পণ্ডিতগণ যে ভাষ্য লিখিয়াছেন, সেইগুলিকে জেমারা (Gemara = completion) বলা হয়।

১৪৫ ১২ ঈশ্বর যে ঘুঘুর রূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছিলেন

He saw the Spirit of God descending like a dove. —(N. T. Matt., III, 16)

১৩ তিনি যে গোরূপ ধারণ করিয়াছিলেন

শ্রীমদ্ভাগবতে ১ম স্কন্ধে ১৬শ অধ্যায়ে বৃষ এবং গাভীকে ধর্ম ও ধরণীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। 'গো' শব্দের অর্থ বেদ, ধর্ম, ধরণী প্রভৃতি। ঈশ্বর বেদমূর্তি। পুরাণে তাঁহাকে গোরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে; গাভীর শরীরে সর্বদেবের কল্পনা করা হয়।

১৪ দুইদিকে দুই দেবদূত বসানো সিন্দুকের আকৃতি একটি মূর্তি

মুশার নেতৃত্বে মিশর হইতে নির্গত হইয়া ইহুদীরা যখন গৃহহীন-ভাবে ঘুরিতেছিল, তখন তাহারা একটি তাঁবুতে (Tabernacle-tent) একটি সিন্দুকে ঈশ্বরের আদেশ-লিখিত পত্রটি রাখিত, পরমপবিত্র (Holy of holies) স্থানে সেই আধারে ঈশ্বরের উপস্থিতি কল্পনা করিত এবং মনে করিত উহার মাধ্যমে ঈশ্বর তাহাদের রক্ষা করিতেছেন।

১৮ 'কাবা': মক্কায় অবস্থিত পবিত্র কৃষ্ণপ্রস্তর। ৫ম খণ্ডে ৪৭০ পৃঃ দ্রঃ।

১৪৭ ২১ জিন: 'জিন' শব্দের অর্থ জয়ী। জৈনধর্মের প্রবর্তক মহাবীরকেও 'জিন' বলা হয়।

২৭ অরুন্ধতী (নক্ষত্র): উত্তরাকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডলে বশিষ্ঠের নিকট অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্র। ৫ম খণ্ডে ৪৮৯ পৃঃ দ্রঃ।

১৫০ ৫ পরমাণুর গঠনপ্রণালী···জগতের গঠনপ্রণালী জানিতে পারিবেন

ইলেক্ট্রন-মতবাদ অনুসারে পরমাণুর গঠন এইরূপ: কেন্দ্রীয় নিউক্লিয়াসের চারিদিকে কতকগুলি ইলেক্ট্রন ঘুরিতেছে,

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

সৌরজগৎ বা নক্ষত্রজগতের গঠনপ্রণালীও অনুরূপ, এক ঘনীভূত শক্তিকেন্দ্রের চারিদিকে ক্ষুদ্রতর শক্তিপুঞ্জ ঘুরিতেছে। স্বামীজী অণু ও মহতের এই সাদৃশ্য ইঙ্গিত করিতেছেন। বৈজ্ঞানিক নীলস্ বোর ইলেক্ট্রন-তত্ত্ব উপস্থাপিত করেন ১৯১৩ খৃঃ।

১৫৫ ১১ প্রেসবিটেরিয়ান: প্রোটেস্ট্যাণ্ট শাখার প্রধান সম্প্রদায়গুলির একটি, নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা শাসিত। জুরিখে ১৫১৯ খৃঃ উদ্ভূত, ক্যালভিন কর্তৃক ব্যাখ্যাত, স্কটলণ্ডে বহুল প্রচারিত, পরে পৃথিবীর নানাস্থানে বিস্তৃত।

১৫ কোয়েকার: ১৫৫০ খৃঃ জর্জ ফক্স-প্রতিষ্ঠিত একটি খ্রীষ্টান সম্প্রদায়। এই গোষ্ঠীর নাম 'Society of Friends'. এই সম্প্রদায় ইংলণ্ড ও আমেরিকায় দ্রুত প্রসার লাভ করে। তাহাদের মধ্যে ছিল অনেক উৎসাহী প্রচারক। বস্টন ও নিউইংলণ্ড হইতে বিতাড়িত হইয়া তাহারা রোড দ্বীপে (Rhode Island) আশ্রয় গ্রহণ করে। পরে বিখ্যাত কোয়েকার উইলিয়াম পেন নিজ সম্প্রদায়ের জন্য 'পেনসিলভানিয়া' নামে নূতন উপনিবেশ স্থাপন করেন।

১৮ পিটর: সেণ্ট পিটর খ্রীষ্টের অন্যতম প্রধান শিষ্য, তিনি 'ব্যাপ্টিস্ট' জনের নিকট দীক্ষা লাভ করেন। তাঁহারই মাধ্যমে 'ধর্মসংস্থা' প্রতিষ্ঠা করিবেন, ক্রুশবিদ্ধ হইবার পূর্বে খ্রীষ্ট এইরূপ জানান। (Upon this rock I will build my Church. —N. T. Matt., XVI, 18)। জেরুসালেমে প্রচারের পর তিনি রোমে যান এবং সেখানেই ধর্মসংস্থা স্থাপন করেন। তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যগণই পরে 'পোপ' নামে পরিচিত হন।

১৬৪ ১৬ সেণ্ট পল (৩-৬৭?): প্রথম জীবনে খ্রীষ্টবিদ্বেষী ছিলেন, পরে অলৌকিকভাবে খ্রীষ্টের আদেশ পাইয়া একান্ত বিশ্বাসী ও ভক্ত হন, গ্রীসে ও রোমে খ্রীষ্টের বাণী প্রচার করেন, রোম সম্রাট্ নীরোর আদেশে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়। ৯ম খণ্ডে ৫১৩ পৃঃ দ্রঃ।

১৬৭ ১৩ 'জিম জিম' কূপ: এব্রাহামের পত্নী সারার প্রথমে কোন পুত্র

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

হয় নাই, দাসী হাগার সন্তানসম্ভবা হইলে সারা ক্রুদ্ধ হন এবং তাঁহার নির্দেশে এব্রাহাম দাসীকে ঐ অবস্থায় মরুভূমিতে ফেলিয়া আসিতে বাধ্য হন। সেখানে জলের অভাবে হাগার মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলে ঈশ্বর নিকটেই জলের সন্ধান দেন এবং আশ্বাস দিয়া বলেন, তোমার পুত্র হইতে একটি বিরাট জাতি হইবে। এই পুত্রই ইসমাইল। ঐ কূপকে মুসলমানগণ 'জিম জিম' কূপ বলেন, এবং ইহার জল পবিত্র মনে করেন। (O. T., Genesis, Ch. 16)

১৮০ ২৪ বুদ্ধ একটি ছাগশিশুর জন্য প্রাণ দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন

বিম্বিসার বুদ্ধদেবকে রাজগৃহে আহ্বান করিয়া লইয়া যান। তখন তিনি পুত্রকামনায় যজ্ঞার্থে পশুবলি দিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, বুদ্ধ ইহা দেখিয়া মর্মাহত হন এবং বলেন, 'পশুবলি না দিয়া পরিবর্তে আমাকে বলি দাও, নিশ্চয়ই অপেক্ষাকৃত ভাল পুত্র লাভ করিবে।' এই আত্মত্যাগের ভাবে প্রভাবিত হইয়া বিম্বিসার পশুবলি বন্ধ করেন ও বুদ্ধের ধর্ম গ্রহণ করেন।

দেববাণী

গ্রন্থপরিচয় : ভূমিকা ও পটভূমিকা দ্রষ্টব্য।

১৮৭ ৩ সহস্রদ্বীপোদ্যান : আমেরিকায় সেণ্ট লরেন্স নদীর উপর পার্বত্য দ্বীপপুঞ্জে অবস্থিত একটি উদ্যানবেষ্টিত কুটীর। ৮ম খণ্ডে পত্রাবলীর তথ্যপঞ্জী ৪৬৭ পৃঃ দ্রঃ।

৭ জনৈক শিষ্যা : মিস্ ওয়াল্ডো। (৭ম খণ্ডে পরিচয় দ্রষ্টব্য)

১৮৮ ২৪ দেবমাতা (Sister Devamata, Miss Laura Glenn) : ১৮৯৫ খৃঃ শেষে নিউ ইয়র্কে স্বামীজীর ক্লাসে যোগদান করেন, কিন্তু সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হন নাই। ১৯০৯ খৃঃ বস্টন কেন্দ্র-গঠনে স্বামী পরমানন্দকে বিশেষ সাহায্য করেন; ভারতে আসিয়া মাদ্রাজে কিছুকাল স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের কাছে শিক্ষা-লাভ করেন। পরে আমেরিকায় ফিরিয়া বেদান্তপ্রচারকার্যে স্বামী পরমানন্দকে আজীবন সাহায্য করেন।

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

১৮৯ ৭ কয়েকজন বাছাবাছা ভক্ত শিষ্যের সম্মুখে

ল্যাণ্ডস্‌বার্গ, মেরী লুই, মিস ওয়াল্ডো, সিস্টার ক্রিষ্টিন, মিসেস ফাঙ্কি, মিস ডাচার প্রভৃতি।

১৯২ ৭ তাঁহার জনৈক বন্ধুর মেইন ক্যাম্প

মিঃ লেগেটের নিউ হ্যাম্পশায়ারের পার্সিতে 'Maine Camp' নামক বাড়ির কথা এখানে বলা হইয়াছে।

১৯৪ ২ আচার্যদেবের সহিত সাতটি সপ্তাহ

১৮৯৫ খৃঃ ১৮ই জুন হইতে ৬ই অগস্ট—এই সাত সপ্তাহ স্বামীজী সহস্রদ্বীপোদ্যানে অবস্থান করেন।

১৯৫ ২৭ দুইজন পরে সহস্রদ্বীপোদ্যানে···সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন

লিয়ন ল্যাণ্ডস্‌বার্গ (স্বামী কৃপানন্দ) ও মেরী লুই (স্বামী অভয়ানন্দ)কে স্বামীজী এখানে সন্ন্যাসদীক্ষা দিয়াছিলেন।

২৯ পাঁচজনকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করিয়াছিলেন

মিস ওয়াল্ডো (ভগিনী হরিদাসী), মিস গ্রীনস্টাইডেল (সিস্টার ক্রিষ্টিন) প্রভৃতি পাঁচজনকে।

১৯৮ ১৭ সেজন্য কৃতিত্ব একজনের

সাঙ্কেতিক লিপিকার গুডউইন। ৭ম খণ্ডে ৪৪৭ পৃঃ দ্রঃ।

১৯৯ ৫ যে তিন-চারজন উপস্থিত ছিলাম

মিস্ ওয়াল্ডো, মিস ডাচার, মিস রুথ এলিস, ল্যাণ্ডসবার্গ প্রথমদিকে উপস্থিত ছিলেন।

২৩ জন (সেণ্ট): খ্রীষ্টের দ্বাদশ শিষ্যের একজন, বিশেষ প্রিয়, ইনিই চতুর্থ গস্পেলের রচয়িতা।

২৩ জনলিখিত গ্রন্থের প্রথম পাঁচটি শ্লোক

প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাঁচটি শ্লোক খুবই দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ:

1. In the beginning was the Word, and the Word was with God and the Word was God.
2. The same was in the beginning with God.
3. All things were made by Him; and without Him was not anything made that was made.

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

4. In Him was life; and the life was the light of men.
5. And the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not.

(Gospel according to St. John., N. T.)

২০০ ১৪ একত্ববাদী (Unitarian): খ্রীষ্টধর্মের একটি শাখা। এই মতে ঈশ্বর পরমপিতারূপেই আছেন। ইঁহারা ত্রিত্ববাদ (Trinity—Father, Son, Holy Ghost) এবং খ্রীষ্টের দেবত্ব অস্বীকার করেন। আনুমানিক ১৭০০ খৃঃ পোল্যাণ্ড ও ট্রান্‌সিলভানিয়াতে উদ্ভূত হইয়া এই মতবাদ ইংলণ্ড ও আমেরিকায় বিস্তার লাভ করে। এই মতের প্রধান নীতি: ঈশ্বরের পিতৃত্ব, মানবের ভ্রাতৃত্ব ও খ্রীষ্টের নেতৃত্ব এবং মানুষের ক্রমোন্নতি।

২০১ ১৪ (কাঁটা) দুটোকেই ফেলে দাও

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বহুবার এই কথা বলিয়াছেন। এখানে 'দুটো কাঁটা' অর্থে জ্ঞান ও অজ্ঞান বুঝাইতেছে।

২০৩ ২১ প্রবর্তক: যিনি সবে সাধনপথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

২০৫ ২১ ভক্তি ঈশ্বরে পরমপ্রেমস্বরূপ......স্তব্ধ হয় ও আত্মারাম হয়।

'ওঁ সা কস্মৈ পরমপ্রেমরূপা

ওঁ অমৃতস্বরূপা চ।

ওঁ যৎ লব্ধ্বা পুমান্ সিদ্ধো ভবতি অমৃতো ভবতি তৃপ্তো ভবতি।

ওঁ যৎ প্রাপ্য ন কিঞ্চিৎ বাঞ্ছতি ন শোচতি ন দ্বেষ্টি ন রমতে নোৎসাহী ভবতি।

ওঁ যজ্জ্ঞানাৎ মত্তো ভবতি স্তব্ধো ভবতি আত্মারামো ভবতি।'

—নারদ-ভক্তিসূত্র, ১।২-৬

২০৬ ১২ ব্যাপ্‌টিজম (Baptism): খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করার অনুষ্ঠান। ধর্মসংস্থায় সকলের সমীপে খ্রীষ্টে বিশ্বাস স্বীকার করিতে হয়। নবদীক্ষিত ব্যক্তি 'পবিত্র আত্মা'র শক্তি লাভ করে। জর্ডন নদীতে স্নান করিয়া যীশু স্বয়ং জন-কর্তৃক দীক্ষিত হইয়াছিলেন। 'পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মা'র নামে জল সিঞ্চিত হয়।

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

২১০ ১৩ 'নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু': বাছুর প্রথমে যেন অহঙ্কারে 'হাম্বা হাম্বা' করে, তার শেষ পরিণতি ধুনুরীর তাঁতের 'তুঁহু তুঁহু' শব্দে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত দ্রষ্টব্য।

২১১ ২৫ সেই মেছুনীদের মতো

গল্পটির বিস্তৃত রূপ 'কথামৃতে' দ্রষ্টব্য।

২১৪ ১০ সব চক্ষু তোমার চক্ষু, অথচ তোমার চক্ষু নাই……

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা

পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। শ্বেতাশ্ব. উপ., ৩।১৯

২১৫ ৯ 'কাঁচা আমি, পাকা আমি': 'তাঁর দাস আমি, তাঁর সন্তান আমি, তাঁর অংশ আমি; এই হচ্ছে পাকা আমি, বিদ্যার আমি——… আর এই যে বামুন আমি, কায়েত আমি, অমুকের ছেলে আমি, অমুকের বাপ আমি—এ-সব হচ্ছে অবিদ্যার আমি কাঁচা আমি'। —শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ

২২ 'জ্ঞানবৃক্ষের ফল': বাইবেলে বর্ণিত আছে, প্রথম সৃষ্ট মানব-মানবী আদম ও ঈভকে ঈশ্বর স্বর্গে ইডেন-উদ্যানে রাখেন এবং সেখানকার জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা শয়তানের প্ররোচনায় জ্ঞানবৃক্ষের ফল খান ও স্বর্গ-ভ্রষ্ট হন। 'জ্ঞান' অর্থে ভাল-মন্দ আপেক্ষিক জ্ঞান—ইহাই সকল দুঃখের মূল কারণ।

২৬ চোখ-ঢাকা বলদের মতো

'মা আমায় ঘুরাবি কত

কলুর চোখঢাকা বলদের মতো।'—রামপ্রসাদ

২১৭ ১৫ মৌমাছি আপনি এসে জোটে

তুলনীয় কথামৃত—'ফুল ফুটলে ভ্রমর আপনি এসে জোটে।'

১৬ কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪): ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের নেতা ও বিখ্যাত বাগ্মী, দেশবিদেশে ধর্মসংস্কার-বিষয়ক বহু বক্তৃতা দেন, শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আসেন ও সংবাদপত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা প্রচার করেন, পরে 'নববিধান' ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন।

পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি

২১৮ ৭ যীশুখ্রীষ্ট যে শান্তিদাতা পাঠিয়ে দেবেন বলেছিলেন

যীশুখ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন, আমি তোমাদের নিকট হইতে চলিয়া যাইব বটে, কিন্তু তোমাদের কল্যাণের জন্য শান্তিদাতাকে (Comforter) পাঠাইয়া দিব। খ্রীষ্টানেরা মনে করেন, Holy Ghost বা পবিত্রাত্মারূপী ঈশ্বরই এই শান্তিদাতা।

১৪ আদম : ইহুদী পুরাণমতে (Old Testament) সৃষ্টির পর ষষ্ঠ দিনে সৃষ্ট প্রথম মানুষ। প্রথম মানবী ঈভ তাঁহার পঞ্জর হইতে সৃষ্ট। ভগবানের নির্দেশ অমান্য করিয়া নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করায় তাঁহারা ইডেন উদ্যান হইতে বিতাড়িত হইয়া পৃথিবীতে আসেন। তারপর আদম ও ঈভ হইতেই পৃথিবীতে মানুষের জন্ম।

২২ প্রথম সৃষ্ট চারিজন ঋষিকে হংসরূপী ভগবান শিক্ষা দিয়াছিলেন

পাদটীকা দ্রষ্টব্য। শ্রীমদ্‌ভাগবত, ২।৭।৫ দ্রঃ

২১৯ ২৭ এ যেন একটুকরো নুনের সমুদ্রে পড়ে যাওয়া

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে আছে—'নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিছিল। আর খপর দেওয়া হ'ল না। সমুদ্রেই গলে গেল।'

২২২ ৯ মিল্টন (১৬০৮-৭৪) : জন মিল্টন, প্রসিদ্ধ ইংরেজ কবি। প্রথম জীবনে চার্চের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, পরে সাহিত্যসাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিপ্লবের সহিত তিনি জড়িত ছিলেন। ১৬৫২ খৃঃ তাঁহার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া যায়। তাঁহার রচিত দুইটি মহাকাব্য—Paradise Lost (১৬৬৭ খৃঃ) এবং Paradise Regained (১৬৭১ খৃঃ)।

২২৫ ১৮ শ্রীরামকৃষ্ণের পিতা : শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়।

২২৬ ২৭ তাঁর এক আত্মীয় : শ্রীরামকৃষ্ণের ভাগিনেয় হৃদয় মুখোপাধ্যায়।

২৯ এক সন্ন্যাসিনী : যোগেশ্বরী ভৈরবী শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে তান্ত্রিক সাধনায় সহায়তা করেন।

২২৮ ৯ এক সুদূর পল্লীতে : শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জন্মভূমি বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত জয়রামবাটী গ্রাম।

৪—এই

পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি

সাক্ষাৎ অনুভব করিয়া বিশ্বাস করেন। এই সেণ্ট টমাসই দক্ষিণ ভারতে আসিয়া খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করেন।

২৫০ ৩ অ্যাংলো-স্যাক্সন: জার্মানির টিউটনিক জাতি, এঁঙ্গল স্যাক্সন ও জুটগণ ব্রিটেন আক্রমণ করিয়া রাজ্য স্থাপন করে। তাহাদের নামানুসারে দেশের নাম হয় England, এবং জাতির নাম হয় English বা ইংরেজ। আমেরিকানরা প্রধানতঃ এই অ্যাংলো-স্যাক্সনদেরই বংশধর।

২৫১ ১৮ 'প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক': প্রায় হাজার বৎসর পূর্বে মধ্যভারতের ভক্তরাজা কীর্তিসিংহের দরবারে বাঙালী কবি বর্ধমাননিবাসী শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র প্রথম রূপক নাটক 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' রচনা করেন। জ্ঞান ভক্তি বৈরাগ্য প্রভৃতি চরিত্র অবলম্বনে একটি রূপক নাটকে দেখানো হইয়াছে—কিভাবে জীবের জ্ঞান হয়, কি কি বিঘ্ন হইতে পারে, ইত্যাদি।

২৫২ ২২ রাবিয়া: (আনুমানিক ৭১৭-৮০১) পারস্যের বসরার একজন উন্নত স্তরের সুফী সাধিকা। বালিকা বয়সে তিনি ক্রীতদাসীরূপে বিক্রীতা হইয়াছিলেন, কিন্তু একদা প্রার্থনারত অবস্থায় তাঁহার দিব্যভাব অনুভব করিয়া মনিব তাঁহাকে মুক্তি দেন। তিনি অবিবাহিতা থাকিয়া কঠোর তপস্যায় প্রার্থনাপূর্ণ জীবন যাপন করেন। ঈশ্বরকে তিনি প্রিয়তম বা পতিরূপে ভাবনা করিতেন।

২৫৫ ১৩ যমেবৈষ বৃণুতে

বেদাধ্যয়ন দ্বারা আত্মাকে লাভ করা যায় না, মেধা দ্বারা বা বহু শাস্ত্র-শ্রবণেও উহা লাভ করা যায় না। এই আত্মা যাঁহাকে বরণ করেন, তিনি তাঁহাকে লাভ করেন, তাঁহার নিকটেই এই আত্মা নিজরূপ প্রকাশ করেন। কঠ উপ, ১।২।২৩

২৬০ ৫ ক্যাণ্ট: ইম্যানুয়েল ক্যাণ্ট (১৭২৪-১৮০৪) প্রসিদ্ধ জার্মান দার্শনিক। ইনি হিউমের 'সন্দেহবাদ' খণ্ডন করিয়া 'সবিচারবাদ' (Criticism) প্রবর্তন করেন। উনবিংশ শতাব্দীর দার্শনিক চিন্তার রাজ্যে তাঁহার প্রভাব অসামান্য। ১ম খণ্ড দ্রঃ।

২৬০ ৭ শোপেনহাওয়ার (১৭৮৮-১৮৬০) : বিখ্যাত নৈরাশ্যবাদী জার্মান দার্শনিক। ২য় খণ্ডে ৪৯৭ পৃ: দ্র:।

২৭০ ১১ ওয়াশিংটন : জর্জ ওয়াশিংটন (১৭৩২-৯৯) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেণ্ট (১৭৪৯ খৃ: ৩০শে এপ্রিল)। আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধের তিনি ছিলেন প্রধান সেনাপতি। তাঁহাকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের 'জন্মদাতা' বলা হয়।

২৭৩ ২৬ পতঞ্জলি : 'মহাভাষ্য'কার এবং যোগদর্শন-সূত্রকার। ৫ম খণ্ড, ৪৭৭ পৃ: দ্র:। ১ম খণ্ডে পাতঞ্জল যোগসূত্র দ্র:।

২৭৪ ২৫ প্রাণ সর্বশুদ্ধ দশটি, তন্মধ্যে পাঁচটি অন্তর্মুখ, পাঁচটি বহির্মুখ

অন্তর্মুখ : প্রাণ অপান সমান উদান ব্যান।

বহির্মুখ : নাগ কূর্ম কৃকর দেবদত্ত ধনঞ্জয়।

২৭৬ ১৯ যিনি কামক্রোধের বেগ······তিনি মহাযোগী পুরুষ

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্‌শরীর-বিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥ গীতা ৫।২৩

২৭৮ ৫ প্রত্যক্ষানুভূতি করাতেই সেণ্ট পলকে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করতে হয়েছিল

প্রথম জীবনে সেণ্ট পল খ্রীষ্টবিদ্বেষী ছিলেন, তখন তাঁর নাম ছিল সল (Saul)। খ্রীষ্টের শিষ্য ও ভক্তদের উপর নির্যাতন করিতে তিনি দামাস্কাসে আসিবার পথে অলৌকিকভাবে খ্রীষ্টের আদেশ পাইয়া পূর্বসংকল্প ত্যাগ করেন এবং খ্রীষ্টে বিশ্বাসী হইয়া 'পল' এই নাম গ্রহণ করিয়া গ্রীসে ও রোমে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করেন। রোমান চার্চের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা; খ্রীষ্টের সাক্ষাৎ শিষ্য না হইয়াও তিনি খ্রীষ্টশিষ্যের মতো সম্মানিত। (Acts, XIII দ্র:)

২১ যোগসিদ্ধিগুলি : যোগসাধনার ফলে আটটি ঐশ্বর্যলাভের বর্ণনা পাওয়া যায়, যথা—অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবসায়িত্ব।

২৭৯ ১৭ বাসনারূপ অশ্বত্থ বৃক্ষটি······কেটে ফেল

অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলম্
অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা।—গীতা, ১৫।৩

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

২৮৬ ২৫ খ্রীষ্টানদের ইউক্যারিষ্ট নামক অনুষ্ঠান

বাইবেলের নিউ টেস্টামেণ্টে আছে, যীশুখ্রীষ্ট তাঁহার দেহত্যাগের পূর্বে শিষ্যগণকে সমবেত করিয়া রুটি ও মদ্য ঈশ্বরোদ্দেশে নিবেদন করিয়া বলেন, 'এই রুটি আমার মাংস এবং এই মদ্য আমার রক্ত।' তৎপরে শিষ্যগণকে উহা খাইতে বলেন। খ্রীষ্টানগণ এখনও প্রতি বৎসর এই উপলক্ষে Eucharist of the Lord's Supper অনুষ্ঠান পালন করেন।

২৮৭ ১৭ 'সত্যমেব জয়তে নানৃতম্' : মুণ্ডকোপনিষদ, ৩।১।৬

২৮৮ ২ অবধূতগীতা : অবধূত একপ্রকার সন্ন্যাসী, অবধূত দত্তাত্রেয় বিষ্ণুর অবতার (শ্রীমদ্ ভাঃ ১।৩।৬,২।৭।৪)। দত্তাত্রেয়-বিরচিত অবধূতগীতা আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত, চরম জ্ঞানের একখানি গ্রন্থ।

২৯২ ৮ হৃদয়ের গ্রন্থি সব ছিন্ন হয়ে যায়

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥—ঐ ২।২।৮

২৯৩ ১১ বাইবেলে আছে মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিস্বরূপ

And God said, Let us make man in our image, after our likeness...O.T. Genesis : I,26

২২ ইঙ্গারসোল : রবার্ট ইঙ্গারসোল (১৮৩৩-৯৯) আমেরিকার বিখ্যাত অজ্ঞেয়বাদী লেখক ও বক্তা। স্বামীজীর সঙ্গে ইঁহার তর্কবিচার হইয়াছিল। ৭ম খণ্ডে ৪৩৪ পৃঃ দ্রঃ।

২৯৮ ১ সোনার মতো পালকযুক্ত দুটি পাখি একটি গাছে বসে আছে

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥

মুণ্ডক. উপ., ৩।১ ; শ্বেতাশ্ব. উপ., ৪।৬

১৪ লুথার (১৪৮৩-১৫৫৬): প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মসংস্থাপক প্রসিদ্ধ জার্মান ধর্মসংস্কারক এবং ওল্ড টেস্টামেণ্টের অনুবাদক। ১ম খণ্ড ৪৪০ পৃঃ দ্রঃ।

২২ মীরাবাঈ (১৫শ শতক): কৃষ্ণপ্রেমে সংসারত্যাগিনী সাধিকা।

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

ইনি রাজস্থানের রতিয়া-রাণার কন্যা এবং কিম্বদন্তী অনুসারে রাণা কুম্ভের পত্নী ছিলেন। রাণী হইয়াও ইনি ভিখারিনীর বেশে তীর্থে তীর্থে কৃষ্ণ-বিষয়ক গান গাহিয়া ঘুরিয়া বেড়ান। তাঁহার রচিত ভজনাবলী আজও সারা ভারতে অত্যন্ত সমাদরের বস্তু। এই খণ্ডেরই ৪২২ পৃঃ দ্রঃ।

১৩ তিনিই সতীদাহ প্রথা বন্ধ করেন

রামমোহন রায়ের চেষ্টায় ১৮২৯ খৃঃ লর্ড বেণ্টিঙ্ক আইন প্রণয়ন করিয়া সতীদাহ প্রথা বন্ধ করেন।

৩১৩ ১৬ সাধনচতুষ্টয়: নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক; ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয়ে বিরাগ; শমদমাদি ষট্‌সম্পত্তি (শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা, সমাধান) এবং মুমুক্ষুত্ব।

৩১৬ ৮ মহাযান সম্প্রদায়: বৈশালী নগরে আহূত দ্বিতীয় ধর্মসংগীতির অধিবেশনে একদল ভিক্ষু 'থেরবাদ' সমর্থন করেন এবং ইহার বিরুদ্ধবাদিগণ কর্তৃক 'মহাসাংঘিক' মতবাদ প্রবর্তিত হয়। পরবর্তী-কালে থেরবাদ হইতে হীনযান এবং মহাসাংঘিক হইতে মহাযান সম্প্রদায় উদ্ভূত হয়। ব্যক্তিগত নির্বাণই হীনযান-পন্থীদের কাম্য, কিন্তু মহাযানপন্থিগণ সকলের নির্বাণ বা মোক্ষ কামনা করেন।

৩১৮ ৫ কংফুছ (Confucius): ১ম খণ্ড তথ্যপঞ্জী ৪২৫ পৃঃ দ্রঃ।

৬ জরথুষ্ট্র (Zoroaster): ঐ—৪২৮ পৃঃ দ্রঃ।

১২ লাওৎসে (Laotse): ঐ—৪২৫ (তাওধর্ম) পৃঃ দ্রঃ

৩২১ ২৯ মানবের পতন (Fall of Man) এবং পুনরুত্থান (Resurrection): খ্রীষ্টানদের বিশ্বাস ঈশ্বরাদেশ লঙ্ঘন করিয়া আদম ও ঈভের স্বর্গ হইতে পতন হয়, এবং ঈশ্বরেচ্ছা পূর্ণ করিয়া যীশুখ্রীষ্ট যে আত্মদান করেন, তাহাতে মানবজাতি আবার স্বর্গে ফিরিয়া যাইবার অধিকার লাভ করে। এই প্রসঙ্গে মিণ্টনের অমর গ্রন্থদ্বয় (Paradise Lost ও Paradise Regained) স্মরণীয়।

৩২২ ২৭ ত্রিত্ববাদ (Trinity): খ্রীষ্টধর্ম অনুসারে একই ঈশ্বরে তিনটি ব্যক্তিত্ব আছে—পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর ও পবিত্রাত্মা

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

ঈশ্বর। ইঁহারা ব্যক্তি হিসাবে পৃথক্, সত্তা হিসাবে এক। সকলেরই মহিমা সমান। পিতা ঈশ্বর বিশ্বস্রষ্টা, পুত্র ঈশ্বর মানবজাতির পরিত্রাতা, পবিত্রাত্মা ঈশ্বরবিশ্বাসীদের চিত্ত পবিত্র করেন।

৩২৩ ২৪ যীশুর বারটি জেলে শিষ্য: সাইমন (পিটার) ও তাঁহার ভ্রাতা এণ্ড্রু, জেম্‌স্ ও তাঁহার ভ্রাতা জন, ফিলিপ, বার্থোলোমিউ, টমাস (Doubting Thomas), ম্যাথ্যু, জেম্‌স্, থ্যাডিয়ুস, সাইমন, জুডাস (Iscariot)। (Matt. X. 2-5) ইঁহারা প্রায় সকলেই জেলে এবং অশিক্ষিত ছিলেন।

৩২৮ ১৩ চোর ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে···ফললাভ করলে

যীশুখ্রীষ্টকে ক্রুশে বিদ্ধ করিবার সময় সেই সঙ্গে আর একজন চোরকেও ক্রুশে বিদ্ধ করা হইয়াছিল। খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সে মুক্ত হইয়া গেল, বাইবেলে এইরূপ উল্লেখ আছে। হিন্দুমতে চোর নিশ্চয়ই পূর্বের কোন সুকৃতির ফলে এইরূপ কৃপালাভ করিয়াছিল। (Matt. XXVII, 38)

১৯ বুদ্ধ তাঁর প্রবলতম শত্রুকেও মুক্তি দিয়েছিলেন

অন্যতম শাক্যকুমার দেবদত্ত প্রথম জীবন হইতে বুদ্ধের প্রতি বৈরভাব পোষণ করিতেন। পরবর্তীকালে তিনি বুদ্ধের ভিক্ষুসঙ্ঘে প্রবেশ করিয়া উহাতেও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করেন এবং বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রুর সাহায্য লইয়া বুদ্ধের প্রাণনাশের চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রতিবারই তিনি বিফল হন; অবশেষে একদিন তাঁহার মুখ হইতে উত্তপ্ত রক্ত বাহির হইয়া তাঁহার জীবননাশ হয়। তখন অনুতপ্ত অজাতশত্রু বুদ্ধের শরণাপন্ন হইলে তিনি তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া মুক্তিমার্গ শিক্ষা দেন।

ভক্তিপ্রসঙ্গে

৩৪৬ ২৩ প্রেমিক ইথিওপের ললাটে হেলেনের সৌন্দর্য দেখিয়া থাকে

সৌন্দর্যের জন্য হেলেন বিখ্যাত; ইথিওপ কৃষ্ণবর্ণ (হাবসী) কুরূপ। তুলনীয়: ডেসডিমোনা ও ওথেলো।

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

৩৪৮ ২৩ ইগনেসিয়াস লয়লা (Ignatius Loyola, Saint, ১৪৯১-১৫৫৬): স্পেনের অভিজাত বংশে জন্ম। প্রথম জীবনে সৈন্যবিভাগে কাজ করিতেন, সেই সময় গুরুতরভাবে আঘাত পাইবার ফলে ধর্মপথে তাঁহার জীবনের মোড় ঘুরিয়া যায়। নয়জন সঙ্গী লইয়া তিনি ১৫৩৪ খৃঃ প্যারিসে একটি Society of Jesus (Jesuits)-এর পরিকল্পনা করেন। ১৫৪০ খৃঃ সম্প্রদায়টি পোপের অনুমোদন লাভ করে। লয়লার মৃত্যুর পূর্বেই এই সোসাইটি নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়ে।

৩৬২ ৩ আইডা আনসেল (উজ্জ্বলা): ১৯০০ খৃঃ প্রথম দিকে ওকল্যাণ্ডের একেশ্বরবাদী গির্জায় স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন, পরে স্বামীজীর সান্নিধ্যে আসেন। তিনি সাংকেতিক লিপি জানিতেন এবং স্বামীজীর অনেক বক্তৃতার নোট লইয়াছিলেন। Reminiscences of Vivekananda গ্রন্থে স্বামীজী সম্বন্ধে তাঁহার একটি বড় প্রবন্ধ পাওয়া যায়।

৩৭৮ ২৩ একজন যোগী ছিলেন

শ্রীরামকৃষ্ণের কথাই এখানে বলা হইয়াছে।

৩৮৩ ২৫ সেণ্ট টেরেসা (১৫১৫-৮২): মাত্র আঠার বৎসর বয়সে সিরীয় খ্রীষ্টান সন্ন্যাসিনী-সম্প্রদায়ে যোগদান করেন। ১৫৬২ খৃঃ তিনি অনেকগুলি মঠ স্থাপন করেন, যদিও সাধারণ চার্চভুক্ত বহু লোক তাঁহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছিল। তিনি অতীন্দ্রিয়বাদ সংক্রান্ত বহু অলৌকিক কাহিনী লিখিয়াছেন। বিচক্ষণতা, কৌতুকপ্রিয়তা ও উচ্চ আদর্শপ্রীতি প্রভৃতি বহু গুণের তিনি অধিকারিণী ছিলেন।

৩৮৮ ১ 'ভক্তমাল': অর্থাৎ 'ভক্তজীবনমালা', নাভাজী লিখিত হিন্দী কাব্যগ্রন্থ, ইহাতে প্রধানতঃ মধ্যযুগের বহু ভক্তের কাহিনী বর্ণিত আছে। পুস্তকখানির বঙ্গানুবাদ আছে। 'কথামৃতে' শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন—'ভক্তমাল বড় একঘেয়ে'।

১ বিল্বমঙ্গল: 'ভক্তমাল' গ্রন্থে বিল্বমঙ্গলের কাহিনী পাওয়া যায়।

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশচন্দ্রকে বিল্বমঙ্গলের উদাহরণ দেন। তাহাতেই উদ্বোধিত হইয়া তিনি 'বিল্বমঙ্গল' নাটক রচনা করেন। কিম্বদন্তী অনুসারে অন্ধ সাধককবি সুরদাসই বিল্বমঙ্গল; 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' বিল্বমঙ্গলের রচনা।

৩৯২ বাল-গোপালের কাহিনী: গল্পটি স্বামীজী বহুবার বলিয়াছেন; মিস ফাঙ্কির স্মৃতিকথায় (Inspired Talks: The Master) গল্পটি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ আছে। মহেন্দ্রনাথ দত্ত-লিখিত স্বামীজীর 'বাল্যজীবনী'তে আছে, গল্পটি নরেন্দ্রনাথ তাঁহাদের ধাত্রীর নিকট শুনিয়াছিলেন এবং বাল্যকালে উহা ভ্রাতাদের শুনাইতে ভালবাসিতেন।

৪০১ 'শিষ্যত্ব' বা 'শিষ্যের সাধনা' বক্তৃতায় প্রধানতঃ 'সাধনচতুষ্টয়' আলোচিত হইয়াছে, তবে ক্রমের একটু পার্থক্য লক্ষিত হয়, এখানে প্রথমে 'বৈরাগ্য', তারপর 'ষট্‌সম্পত্তি' ও 'মুমুক্ষুত্ব', শেষে 'বিবেক' আলোচিত হইয়াছে।

৪১০ ১২ দীক্ষা (Baptism): এই খণ্ডে তথ্যপঞ্জী ৪৪০ পৃঃ দ্রঃ।

৪১৫ ১৮ চার প্রকার লোকে আমাকে ভজনা করে:

গীতার ক্রম: আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী।

৪২২ ২১ সলোমন (১০১৫-৯৭৫ খৃঃ পূঃ): ডেভিডের পুত্র রাজা সলোমন, জেরুসালেমের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ঈশ্বরকে প্রেমিকভাবে দেখিতেন, ইঁহার ভজন 'Song of Solomon' নামে বিখ্যাত।

৪২৪ ৮ মাতৃ-উপাসনা একটি স্বতন্ত্র দর্শন

ইহার কিছু আভাস 'শাক্তাদ্বৈত'-দর্শনে পাওয়া যায়, বিভিন্ন তন্ত্রে ইহা আলোচিত। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন: মাতৃভাব শুদ্ধভাব, আমার মাতৃভাব। ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ।

নির্দেশিকা